চতুরঙ্গ

আশ্বিন,
১৩৪৫

প্রথম বর্ষ,
প্রথম সংখ্যা

সাম্যবাদের উৎপত্তি ও পরিণতি

সুশোভন সরকার

এক

ইউরোপের সাম্প্রতিক ইতিহাস ১৯১৭ সালের রুষবিপ্লব থেকে আরম্ভ করা কিছু অন্যায় হয় না। এই বিপ্লবের পিছনে একটা বিশিষ্ট মতবাদ ও এক দীর্ঘ আন্দোলন ছিল। সে-মতবাদ এবং প্রচেষ্টা উভয় অর্থেই কমিউনিজ্‌ম্ অথবা সাম্যবাদ কথাটির ব্যবহার আছে। উভয়কেই রূপ দিয়েছিলেন কার্ল্ মার্ক্স্ ও তাঁর আজীবন সহকর্ম্মী ফ্রিড্‌রিশ্ এঙ্গেল্‌স্। এই সাধনা তাঁদের মৃত্যুর বহুপরে আজকের ইউরোপে এক প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত হয়েছে; এমন কি তার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই ফাশিজ্‌ম্-এর উৎপত্তি। রুষবিপ্লবের নেতা লেনিনের প্রধান কীর্ত্তি, মার্ক্স্‌বাদের প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করে' তার উপযুক্ত প্রয়োগ। মার্ক্স্-এর চিন্তা ও কর্ম্মের সঙ্গে তাই পরিচয় না থাকলে আধুনিক ইতিহাস বোঝা অসম্ভব।

সাম্যের স্বপ্ন পৃথিবীতে চিরকালই চলে' এসেছে, প্রতি যুগেই চিন্তাশীল লোকে বৈষম্যবিহীন সমাজের আদর্শ এঁকেছেন; কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে যোগ না থাকায় ইতিহাসে এ-সব প্রাচীন কল্পনার বেশী সার্থকতা নেই। ধনতন্ত্রের প্রভাবে আর্থিক সম্পদ ও ক্ষমতার বৈষম্য অত্যধিক হয়ে ওঠার পরই সমাজতন্ত্রবাদ বা সোশ্যালিজ্‌ম্ মূর্ত্ত প্রশ্নের রূপ নিল। তার আক্রমণের লক্ষ্য হ'ল ধনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গগুলি। প্রতিযোগিতায় সামাজিক শক্তির অপচয়, একচেটিয়া কর্ত্তৃত্ব যেখানে সম্ভবপর সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে তার অপব্যবহার, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে আর্থিক প্রভুত্বের সমাবেশ, শুধু মালিকদের লাভের জন্যই পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন; অর্থবলের কল্যাণে মাত্র এক শ্রেণীর লোকেদের জীবন উপভোগ করবার ব্যবস্থা,

জনসাধারণের ভাগ্যে আজীবন পরিশ্রমের পরিবর্ত্তেও কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ—ধনতন্ত্রের এই বিবিধ অমঙ্গল বর্জ্জন করে' নূতন সমাজগঠনের আদর্শ তখন অনেককে আকৃষ্ট করতে লাগ্‌ল।

পূর্ব্বগামী সোশ্যালিষ্ট্‌দের মার্ক্স্‌ ইউটোপীয় বা অবাস্তব আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁরা আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখলেও সেদিকে অগ্রসর হবার উপযুক্ত পথ বা কর্ম্মপ্রণালী দেখাতে পারেন নি। তাছাড়া তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ ভাবপ্রবণ। অতীতের স্বর্ণযুগে ও প্রকৃতির মঙ্গলময়তায় তাঁদের বিশ্বাস ছিল। মানুষ বুদ্ধির দোষে প্রাকৃতিক বিধান ত্যাগ করে' দুঃখে নিমগ্ন হয়েছে। ন্যায় বুদ্ধির সাহায্যেই আবার সত্যমঙ্গলের আদর্শকে ফিরিয়ে এনে দুঃখমোচন সম্ভব। শান্ত অহিংস প্রচারকার্য্যের তাই প্রয়োজন, পশুবল উপদ্রব মাত্র। প্রচারের ফলে ও প্রকৃত শিক্ষার গুণে ধীরে ধীরে কঠিন হৃদয় দ্রব এবং অজ্ঞান তিমির অপসারিত হবে। তখন নূতন সমাজের আদর্শ আপনা থেকেই জয়যুক্ত হ'তে বাধ্য। স্পষ্টই বোঝা যায় যে ইউটোপীয় সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে ধর্ম্মবিশ্বাসের একটা আন্তরিক যোগ আছে, যদিও নেতারা অনেকে প্রচলিত ধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন না। যে আঠারো শতকের যুক্তিবাদ থেকে এর উৎপত্তি ঐতিহাসিক সম্বার্ট্‌ সবিস্তারে দেখিয়েছেন, তার মূল বিশ্বাস হ'ল প্রকৃতির চিরন্তনী বিধানের অস্তিত্ব, মানুষের তার থেকে বিচ্যুতি এবং যুক্তি দিয়ে পূর্ব্বাবস্থার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা।

মার্ক্স্‌ দেখ্‌লেন যে তাঁর পূর্ব্বগামীরা বুঝতে চান নি যে ইতিহাসে একটা ক্রমবিকাশ আছে, তদনুসারে অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, সামাজিক ইতিহাস পাপের দোষে স্বর্গ থেকে বিদায় এবং পুণ্যের জোরে স্বর্গে পুনঃ প্রবেশের কাহিনী না। তাঁর মনে হ'ল যে নূতন সমাজ গঠনের বাধা অজ্ঞানান্ধকার নয়, ধনিকদের স্বার্থ মাত্র, কারণ বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সঙ্গতিবান শ্রেণীর সন্তুষ্ট থাকবার যথেষ্ট হেতু আছে। পরিবর্ত্তন তাই আসতে পারে তাদেরই উদ্যমে যারা শ্রমিক হিসাবে সমাজ ব্যবস্থার খারাপ ফলটাই ভোগ করছে এবং সে-পরিবর্ত্তনে ধনিক ও সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলি স্বার্থের খাতিরে বরাবরই বাধা দেবে। নৈরাশ্যের বদলে মার্ক্সের মনে কিন্তু আশা এল, কেন না ক্রমবিকাশের একটা ধারা তাঁর মাথায় রূপ নিচ্ছিল যার প্রভাবে বিশ্বাস হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে শ্রমিকবিপ্লব অনিবার্য্য।

ইতিমধ্যে যন্ত্রশিল্পের প্রভূত প্রসারে শ্রমিক অসন্তোষ দেশে দেশে দেখা গিয়েছিল। ইউটোপীয়েরা এর প্রকৃত তাৎপর্য্য ধরতে পারেন নি—রবার্ট ওয়েনের চার্টিষ্ট্‌দের সঙ্গে অসহযোগ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রমিকেরাও কিন্তু নিষ্ফল

আক্রোশে শক্তি ক্ষয় করছিল—কোন নির্দ্দিষ্ট পথ তারা খুঁজে পায় নি। ইংরাজ চার্টিষ্টদের বৃথা আফালন ও ফরাসী কারিগরদের অযথা দাঙ্গায় মৃত্যুবরণ তার উদাহরণ। মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্‌সের জীবনের প্রধান কাজ হ'ল সোশ্যালিজ্‌মের নূতন রূপ সাম্যবাদের সঙ্গে শ্রমিক-আন্দোলনের সংযোগ-স্থাপন। এর প্রভাব সহজেই অনুমেয়। ষ্টালিনের ভাষায় বলা যায় যে ব্যবহার-বর্জ্জিত থিওরি বন্ধ্যা আর মতবাদশূন্য প্র্যাক্‌টিস্ অন্ধ আচরণ মাত্র।

মার্ক্স্ ও তাঁর সহযোগীর জীবন বৃত্তান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক। প্রায় ছাত্রাবস্থায় তাঁরা জার্মানিতে রাষ্ট্রিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং প্রাণভয়ে তাঁদের ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় নিয়ে সেখানেই সারাজীবন কাটাতে হয়। তার পূর্ব্বেই ১৮৪৭ এর শেষে সাম্যবাদের ঘোষণা-পত্রিকায় তাঁরা নিজেদের বিশিষ্ট মতামত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তারপর বহুকাল ধরে' সে-মতবাদের প্রসার ও প্রচারে তাঁদের সময় কাটে। জার্মানে লেখা তাঁদের রচনা প্রথমতঃ সে-দেশেই সাড়া পায়। ইংল্যাণ্ডে তখন ভিক্টোরীয় সমৃদ্ধির যুগে তাঁদের সমাদর না হবারই কথা। ডাস্ কাপিটাল্ গ্রন্থরচনা মার্ক্সের শেষজীবনের প্রধান কীর্ত্তি কিন্তু সাম্যবাদ বুঝতে বোধ হয় তাঁর ছোট ছোট পুস্তিকাগুলি বেশী সাহায্য করে। কিন্তু মার্ক্স্‌কে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অধ্যয়নরত পণ্ডিত হিসাবে দেখা উচিত নয়। তিনি শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনিই প্রথম ১৮৬৪ সালে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করেন। পরে বাকুনিনের সঙ্গে তীব্র মতভেদের ফলে এই সভা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। বাকুনিন্ আধুনিক নৈরাজ্যবাদ বা এনার্কিজ্‌ম্-এর জনক। সেই থেকে মার্ক্স্‌বাদী ও বাকুনিন্-পন্থীদের প্রকাশ্য ও গোপন বিবাদ আজ পর্য্যন্ত চলে এসেছে। পরবর্ত্তী ইতিহাসের দিক থেকে মার্ক্সের চিন্তা বা কর্ম্মধারার একটা বৈশিষ্ট্য প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। সারা জীবন তিনি দুই শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করে' চলেছিলেন—একদিকে অতিমাত্রায় সাবধানী রক্ষণশীলতা এবং অন্যদিকে অধীর ভাববিলাসের অতিক্রান্ত অগ্রসর আকাঙ্ক্ষা। সমসাময়িক বাদানুবাদে লেনিন্ ষ্টালিন্‌কেও এই দুই শত্রুর সঙ্গে লড়তে হয়েছে।

মার্ক্স্‌বাদের প্রাণবস্তু একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী, তাকে ডায়ালেক্‌টিক্ আখ্যা দেওয়া হয়। এই ডায়ালেকটিক্সের উৎপত্তি একদিকে আদর্শবাদের শীর্ষস্থানীয় হেগেলের চিন্তাপ্রণালী ও অন্যদিকে জড়বাদের দার্শনিক বিশ্বাসের মধ্যে। বিশ্বসংসারকে স্থিতিশীল না ভেবে ক্রমবিবর্ত্তনের নিয়মানুগ মনে করা হেগেলের

বিশেষত্ব ছিল—সেই পরিবর্ত্তনের মূল-সূত্রকে তিনি প্রাচীন বাদানুবাদ পদ্ধতির স্মরণেই বোধ হয় ডায়ালেক্‌টিক্স্ নাম দেন। ভাববাদী হেগেলের কাছে ক্রমবিকাশ ছিল অবশ্য আইডিয়ারই রূপান্তর। শিষ্যস্থানীয় মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্‌স্ কিন্তু জড়বাদের মূল-বিশ্বাস—বিদেহীজ্ঞানের আগে জড়বস্তুর অস্তিত্ব—ত্যাগ করতে পারলেন না। পুরাতন জড়দর্শন তাঁদের কাছে অত্যন্ত যান্ত্রিক মনে হচ্ছিল—নূতন কিছুর উদ্ভবের সঙ্গত ব্যাখ্যা তার মধ্যে তাঁরা পেলেন না। তাই হেগেলের ডায়ালেক্‌টিক্ দৃষ্টিভঙ্গী তাঁরা জড়বাদের মধ্যে এনে তাকে নূতন রূপ দিলেন। পরমমনের আইডিয়ার ক্রমবিকাশ তাই প্রকৃত বস্তুর বিবর্ত্তন বিশ্বাসে পরিণত হ'ল—তার মধ্যে অবশ্য জীবের মানসিক ক্রিয়ারও স্থান রইল। হেগেলের সঙ্গে মার্ক্সের তফাৎ মূলবস্তু নিয়ে, তাঁদের মিল ক্রমবিকাশের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশ্বাসে। সে-ধারাকে থিসিস্, অ্যান্টিথিসিস্, ও সিন্‌থেসিস্ নাম দেওয়া হয়।

মার্ক্স্‌দর্শনের সত্যাসত্য যাই হোক না কেন, তার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বোঝা বিশেষ শক্ত না। এ-মত অনুসারে বিশ্লেষক ব্যাপক দৃষ্টির কাছে চিরস্থিরতা নেই; মানুষের সকল বিধিব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান, এমন কি আইডিয়ার ক্ষেত্রেও এই গতি লক্ষিত হয়। পরিবর্ত্তনের বীজ, বস্তুর মধ্যেই অন্তর্নিহিত পরস্পরবিরোধী শক্তির সজ্ঘর্ষের ফল; কিন্তু এভলিউশন্ আকস্মিক বা লক্ষ্যহীন নয়—তার একটা বিশেষ ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক। বিবর্ত্তন প্রণালীর ধাঁচ হচ্ছে—বস্তুবিশেষের অবস্থান, অন্তর্নিহিত বিরোধী শক্তির সজ্ঘাত, তারপর সামঞ্জস্য; সেই সমন্বয় থেকে আবার নূতন পরিবর্ত্তন ধারার সূত্রপাত। একই সময়ে পরস্পরবিরোধী শক্তির পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে একত্র অবস্থান সম্ভব কিন্তু পরিণামে ভারসাম্য ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য, তাই বিরোধই হচ্ছে সামঞ্জস্যে অগ্রসর হবার উপায়—শ্রেণীসজ্ঘর্ষের মধ্য দিয়ে এভাবে শ্রেণীভেদের অবসান হ'তে পারে। পরিবর্ত্তনের ধারা অনেকটা কম্বুরেখা বা স্পাইরালের মতন—বৃত্তাকার বা সরলরেখা নয়; অর্থাৎ প্রতিপদেই উন্নতির সোপান অধিরোহণ হয় না অথচ সিন্‌থেসিসের সময় আমরা ঠিক গোড়ার অবস্থায় ফিরে যাই না। গতির বেগ কখনও দ্রুত, কখনো বা মৃদুমন্দ; পরিবর্ত্তন কিন্তু অবিচ্ছিন্ন স্রোত নয়—স্তর থেকে স্তরান্তরে যাওয়াতে একটা উল্লম্ফন থাকে; সিন্‌থেসিসের মধ্যে নূতন কোন গুণ দেখা যায়—আর এই বিপ্লব ইতিহাসের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

এঙ্গেল্‌স্ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে এই ডায়ালেক্‌টিক্ প্রকৃতি, ইতিহাস ও চিন্তাধারা তিন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইতিহাস চর্চ্চায় এই দৃষ্টিভঙ্গীকে

নাম দেওয়া হ'ল ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা।* কথায় যাই বলুন না কেন, ঐতিহাসিক মাত্রেই ইতিহাসের ধারার খোঁজ করেন এবং প্রতি ইতিহাস রচনার মধ্যে একটা দেখবার ধরণ বা মূল বিশ্বাস থাকতে বাধ্য। ভাববাদীরাও এ নিয়ম থেকে বাদ পড়েন না। যান্ত্রিক জড়বাদের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা এক বা একাধিক জড়বস্তু বা অবস্থার (খাদ্যের প্রকারভেদ, ভৌগলিক সংস্থান প্রভৃতি) প্রভাব-নির্ণয়ে পর্য্যবসিত হয়। অথচ সে-নিয়মে পরিবর্ত্তনের সঙ্গত ব্যাখ্যা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। মার্ক্স্‌বাদে ইতিহাসের মূলসূত্র ধনোৎপাদনে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিবর্ত্তনশীল সম্বন্ধের মধ্যে। সেই সম্বন্ধ সমাজে ভিন্ন ভিন্ন স্তর অর্থাৎ শ্রেণীর রূপ নেয়। তাদের ঘাতপ্রতিঘাত ও ক্রমবিকাশ ইতিহাসের মূলকথা। যুগ-বিশেষে শ্রেণীসম্বন্ধের উপরই তৎকালীন বিধি-ব্যবস্থা, আইন-কানুন, ধারণা-সমষ্টি ও পরিশীলন-সম্পদ গড়ে ওঠে। শ্রেণীসম্বন্ধ সমাজমন্দিরের ভিত্তি অথবা কাঠামো—তার উপর বা মধ্যে বৈচিত্র্যের লীলাকে মার্ক্স্‌ কখনোই অস্বীকার করেন নি। কিন্তু মূলসূত্রের সাহায্যে মার্ক্স্‌ ইউরোপের ইতিহাসে একটা পর্য্যায়ক্রম দেখতে পেলেন—যার প্রাণবস্তুই হ'ল শ্রেণীর উত্থানপতন অর্থাৎ শ্রেণীসম্বন্ধের ক্রমবিকাশ। দাসত্ব-প্রথা, ফিউডাল্‌ সমাজ ও তারপর ধনতন্ত্রের প্রথমে পুষ্টিসাধন ও পরে ক্ষয়োন্মুখ অবস্থা—ইউরোপের ক্রমবিকাশ এই পথেই চলেছে। এর পর সোশ্যালিজ্‌মের আগমন তাই মার্ক্সপন্থীদের কাছে ইতিহাসের স্বাভাবিক পরিণতি বলেই মনে হ'ল। মার্ক্স্‌ এ-কথা বলেন নি যে সে-পরিণাম হবেই হবে কারণ ইউরোপীয় সভ্যতা ধ্বংস হ'য়ে যাবার সম্ভাবনাও তাঁর মনে উদয় হয়েছিল। আর তিনি একথাও বলেন নি যে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ মানুষের বিনা চেষ্টাতেই আপনা থেকে হাজির হবে। শেষোক্তরূপ অদৃষ্টবাদের সঙ্গে শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের থিওরি খাপ খায় না, এ-কথা বলা বাহুল্য।

দর্শন অথবা ইতিহাস ছেড়ে অর্থনীতি বা রাষ্ট্রচর্চ্চায় মার্ক্সের মূল বিশ্বাসের প্রয়োগই অবশ্য বেশী পরিচিত। ব্যক্তিবিশেষ যাই করুক না কেন, শ্রেণীবিশেষের অস্তিত্ব তার বিশিষ্ট স্বার্থের উপর নির্ভর করছে, সে-স্বার্থলোপ শুধু সেই শ্রেণীর লুপ্তির মধ্যে। সেইজন্য শ্রেণীভেদ থাকলে শ্রেণীস্বার্থ এবং শ্রেণীসঙ্ঘর্ষও থাকতে বাধ্য। সীমারেখা স্পষ্ট না হ'লেও শ্রেণীর পৃথক অস্তিত্ব নিঃসন্দেহ। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় প্রধান প্রতিপক্ষ—ধনিক ও মজুর শ্রেণী; অন্য সকলে সংশ্লিষ্ট পার্শ্বচর মাত্র। ধনতন্ত্রের যুগে অন্য সামগ্রীর মতন শ্রমশক্তিও ক্রয়বিক্রয়ের বস্তু কিন্তু এই ক্রীত শ্রমশক্তির সাহায্য ছাড়া নূতন ধনোৎপাদন অসম্ভব। সমগ্র

সমাজের দিক থেকে দেখতে গেলে শ্রমশক্তিই পণ্যোৎপাদনের মূল। যদি কোনও কারণে শ্রম বন্ধ হয়ে যায় তা'হলে সঞ্চিত মূলধনের কোন মূল্য থাকে না, এ-কথা বোঝা শক্ত না। শ্রমিকের পারিশ্রমিক উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের চাইতে কম বলেই মূলধনী মালিকের ব্যবসায় লাভ থাকে। কিন্তু এই অতিরিক্ত সম্পদ ন্যায্যতঃ ধনিকশ্রেণীর চাইতে সমস্ত সমাজেরই প্রাপ্য। ধনতন্ত্রের প্রচলিত ব্যক্তিগত লাভের জন্য উৎপাদন-পদ্ধতিকে মার্ক্স্ তাই শোষণ আখ্যা দিলেন। তাঁর এ-কথাও মনে হ'ল যে সকল ষ্টেট্ বা রাষ্ট্রই শ্রেণীবিশেষের স্বার্থরক্ষার উপায় মাত্র। শ্রেণীভেদ যতদিন থাকে ততদিন সেখানে দেশ বা জাতির সম্মিলিত স্বার্থ শুধু কথার কথা এবং সে-কথা আসলে শাসকশ্রেণীর প্রভুত্বের আবরণ মাত্র। এইজন্যই মার্ক্স্ সকল দেশের শ্রমিকদের একজোট হ'তে আহ্বান করেছিলেন। সে-একত্রীকরণের পরিণতি শ্রমিকবিপ্লবে আর তখন ধনিকদের উচ্ছেদসাধনের পর শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজগঠনই শ্রমিকদের মুক্তির একমাত্র উপায়। মার্ক্স্ তার নাম সাম্যতন্ত্র দিলেন ; তাঁর মতে শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের নিষ্পত্তি এইভাবে আসবে।

পূর্ব্বতন সমাজতন্ত্রবাদের থেকে মার্ক্স্-প্রচারিত সাম্যবাদের দুস্তর পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। পরবর্ত্তী শ্রমিকনেতা সোশ্যালিষ্টেরা তাই অধিকাংশই মার্ক্সপন্থী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতেন। জার্মানির বিশাল সোশ্যাল্ ডেমক্রাট্ পার্টি গোঁড়া মার্ক্স্বাদী বলে' নিজেদের গণ্য করে' গর্ব্ব অনুভব করত। কিন্তু কার্য্যতঃ তাদের মধ্যে বিপ্লবচেষ্টার সাধনা ক্ষীণ হয়ে শান্তিপ্রিয় কর্ম্মপদ্ধতিতে পর্য্যবসিত হ'ল। সেই থেকে সোশ্যাল্ ডিমক্রাসির একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ভূত হয় যার সঙ্গে মার্ক্স্ ও এঙ্গেলসের চিন্তার ধরণের মিল ক্রমশঃ কমে' আসে। প্রাক্সামরিক যুগে জার্মান্ পণ্ডিত কার্ল্ কাউট্স্কি দেশে বিদেশে মার্ক্স্বাদের প্রধান পুরোহিতরূপে পূজা পেতেন। ১৮৮৯ সালে স্থাপিত শ্রমিকদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ক্রমে তিনিই গুরুর স্থান নেন। বের্ণষ্টাইন্ মার্ক্স্কে সংশোধন করবার প্রস্তাব আনলে, তাঁর অনুচররা দল থেকে বহিষ্কৃতপ্রায় হ'ল অথচ আসলে কাউট্স্কিও যে মার্ক্স্বাদকে ভদ্র ও বিকৃত করে' ফেল্‌ছিলেন সেকথা অনেকদিন ধরা পড়ে নি।

মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্-এর প্রকৃত মতামতের পুনরুদ্ধার হ'ল লেনিনের চেষ্টায়। যুদ্ধের পর বাদানুবাদে কাউট্স্কি এমন পরাস্ত হলেন যে এখন তাঁর ব্যাখ্যাকে মার্ক্স্-পন্থা ভাববার ভুল অতি অল্প লোকেই করবেন। উপরে সাম্যবাদের পরিচয়ে তাই লেনিনকে অনুসরণ করা হয়েছে। তাঁর প্রভূত অধ্যবসায়ে

মার্ক্স্‌বাদের কয়েকটি অঙ্গ প্রথম পরিস্ফুট হ'ল। প্রথম সোপান হিসাবে শ্রমিকবৃন্দের সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া শ্রেণীবর্জ্জিত নূতন সমাজ গঠনের অন্য উপায় নেই; সুতরাং বিপ্লব সম্ভব ও সার্থক করে' তোলার সাধনাই শ্রমিকপ্রতিভূ সাম্যবাদীদের কর্ত্তব্য। এই বিশ্বাসের জন্যই আজ প্রায় প্রতি দেশে মার্ক্স্‌বাদের দমনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বিপ্লবের পর নূতন সমাজ গড়ে তোলার জন্য বহুদিনের পরিশ্রম চাই। লেনিনের ব্যাখ্যায় সে-যুগসন্ধির সময় শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য প্রয়োজন—অর্থাৎ তখন গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রশ্রয় সম্ভব না। এইখানে কাউট্স্কির সঙ্গে ঘোর মতানৈক্যের ফলে সোশ্যাল্ ডিমক্রাসি ও সাম্যবাদ পরস্পরবিরোধী হয়ে পড়ল। লেনিন্ আরও বল্লেন যে বিপ্লবের পর ক্রমে ক্রমে শ্রেণীভেদ শেষ হ'য়ে গেলে, এঙ্গেল্‌সের ভাষায় ষ্টেটের নিষ্পেষণযন্ত্র শুকিয়ে যাবে। তখনই পূর্ণ সাম্যতন্ত্র আসতে পারবে আর তার সঙ্গে নৈরাজ্য-বাদের ঈপ্সিত অবস্থা সম্ভবপর হবে। এইভাবে লক্ষ্যে পৌঁছবার পদ্ধতিই লেনিনের সাম্যবাদ এবং মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তা' অভিন্ন।

দুই

আঠারো শতক থেকে রাশিয়া ইউরোপে প্রধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আসন পেয়েছে। উত্তরোত্তর তার শক্তি অনেকদিন বৃদ্ধি পেল। উনবিংশ শতাব্দীতে রুষসম্রাট জারদের রাজ্যমধ্যে স্বেচ্ছাচার ও বাইরে প্রতাপ প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়। ১৯১৭ তে সে-শক্তির উচ্ছেদসাধন সুতরাং সম্পূর্ণ আকস্মিক হ'তে পারে না। বস্তুতঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর থেকে রুষরাজ্যের প্রসার অনেকখানি বাধাপ্রাপ্ত হ'তে লাগল। দেশের মধ্যে সংস্কার কামনার উদয়ও প্রায় সেই একই সময়ে। প্রথম নিকোলাসের রাজত্বে, অর্থাৎ ঠিক একশত বৎসর আগে, রুষ চিন্তারাজ্যে প্রখর বাদানুবাদের পর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপাসক শ্লাভোফিল্ দলের চাইতে সংস্কারক পশ্চিমপন্থীদের প্রভাব প্রবলতর হ'তে লাগ্‌ল। ক্রমে সে-ভাবধারা রাষ্ট্রিক আন্দোলনে পরিণত হ'লে দ্বিতীয় আলেক-জাণ্ডার রাষ্ট্রশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে' নেবার জন্য কয়েকটি সংস্কার করলেন। ব্যবস্থাগুলি বহুপূর্ব্বে আসা উচিত ছিল—সে জন্য, এবং তাদের মধ্যেও উদারতার অভাবের ফলে দেশে কিন্তু অসন্তোষ লাঘব হ'ল না। কৃষকসাধারণ অর্দ্ধদাসত্ব প্রথা লোপের পর দেশের কিছু জমি পেলেও পূর্ব্বতন প্রভুদের ক্ষতিপূরণের

ভার তাদের উপরই পড়ল। রাষ্ট্রশাসনেও অবাধ রাজতন্ত্রের তখনও অবসান হয়নি। তাই চরমপন্থীদের সঙ্গে শাসকদের প্রবল সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। এ-সময়ের আন্দোলন (গত শতকের তৃতীয় পাদে) নারোদ্‌নিকি নামে খ্যাত। একদিকে রাজার অত্যাচার, অন্যদিকে নিহিলিষ্ট্ নামে পরিচিত সন্ত্রাসবাদ রাশিয়াকে তখন মথিত করে। বাকুনিনের প্রভাবান্বিত এসার দল রাশিয়ায় প্রথম সোশ্যালিজ্‌মের ধ্বজা তুল্‌ল কিন্তু তার কিছু পরে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে মার্ক্সের অনুগামী সোশ্যাল্ ডেমক্রাট্‌দের উদ্ভব হয় প্লেকানভের নেতৃত্বে। তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ও দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে ওদিকে দমননীতির পরাকাষ্ঠা দেখা গেল। শুধু সন্ত্রাসবাদীরা নয়, সকল প্রকার সোশ্যালিষ্ট্, এমন কি উদার মতাবলম্বী লোকেরা এবং সংখ্যান্যূন জাতিদের নেতারা পর্য্যন্ত দণ্ডিত হতেন। দমন ও বিপ্লব প্রচেষ্টার সজ্ঘাত তখনকার রুষসাহিত্যে পটভূমিকা; সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন-দণ্ডের কথাও সুপরিচিত।

বিদেশে লণ্ডনে রুষ সোশ্যাল্ ডেমক্রাটদের দ্বিতীয় মহাসভায় দলভঙ্গ হ'ল—মেন্‌শেভিক্ মত অগ্রাহ্য করে' লেনিনের অনুচরেরা তাদের সে-সভায় সংখ্যাধিক্যের জন্য বল্‌শেভিক্ নামে খ্যাত হয়। মতভেদের কারণ লেনিনের মতামত—তিনি মার্ক্সীয় দলটিকে বিপ্লবব্রতী রূপে সঙ্গঠিত কর্‌তে চান আর অনেক বিষয়ে মার্ক্স-বাদের প্রচলিত ব্যাখ্যা তাঁর ভুল মনে হতে লাগ্‌ল। প্লেকানভ্ ক্রমশঃ মেন্‌শেভিক্ ভাবাপন্ন হ'য়ে পড়েন, তাই লেনিন্‌ই বলশেভিক্‌দের প্রকৃত নেতা হন। তাঁর স্বদেশে ফেরার উপায় ছিল না কিন্তু ষ্টালিন্ প্রভৃতি বল্‌শেভিক্ কর্ম্মীরা দেশের মধ্যে গোপনে প্রচার চালালেন। মেন্‌শেভিক্‌দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রাশিয়া আর্থিক হিসাবে অনুন্নত বলে' প্রথমে পশ্চিম ইউরোপের অনুরূপ উদার গণতন্ত্র সে-দেশে স্থাপিত হবে, তারপর কালে সোশ্যালিজ্‌ম্ স্থাপন সম্ভব হবে। বল্‌শেভিক্ মতে মার্ক্স্ কখনও এমন যান্ত্রিকভাবে বিবর্ত্তনের কল্পনা করেন নি। লেনিন্ দেখালেন যে ধনতন্ত্র এখন পৃথিবীব্যাপী, কাজেই রাশিয়া অন্য দেশের মতন অগ্রসর না হলেও সেই আর্থিক ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে পড়েছে। বিরোধের ফলে ধনতন্ত্র ভেঙ্গে পড়াকে লেনিন্ টানের চোটে শৃঙ্খল ছেঁড়া রূপে কল্পনা করেছিলেন। শিকল ছিঁড়বে নিশ্চিত জান্‌লেও ঠিক কোথায় ছিঁড়বে আগে থাকতে তা জানা যায় না, তবে এটুকু বলা সম্ভব যে দুর্ব্বলতম স্থানটিই আগে ছিন্ন হবে। কাজেই কোনও কারণে ধনতন্ত্রের ব্যবস্থা কোথাও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়লে সেখানেই শ্রমিক-বিপ্লব ঘটতে পারে। যুদ্ধের ফলে রাশিয়ায় তাই হ'ল কিন্তু বল্‌শেভিক্

মতবাদ আগে থাকতেই সে-সম্ভাবনা ধরতে পেরেছিল। ১৯১২ সালের মধ্যে বল্‌শেভিকেরা মেন্‌শেভিক্‌দের সম্পূর্ণ ছেড়ে পৃথক দল গঠন করল।

জাপানের হাতে পরাজয়ের পর রাশিয়ায় তুমুল আন্দোলন হয় (১৯০৫)—নানা দলের মিলিত চাপে সম্রাটকে বাধ্য হ'য়ে নিয়মতন্ত্র অঙ্গীকার করতে হ'ল। ডুমা অর্থাৎ প্রতিনিধি সভা এভাবে স্থাপিত হ'লেও গণ্ডগোল অবসানের পর ধীরে ধীরে তার সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু দেশের মধ্যে অসন্তোষ আরও পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠতে লাগল। তারপর এল মহাসংগ্রাম (১৯১৪)।

মার্ক্স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ বরাবরই বলেছিলেন যে তাঁরা শুধু মূলসূত্র ও বিশ্লেষণ-প্রণালীর উদ্ভাবন করেন, তাঁদের মতবাদ মুখস্থ বিদ্যা নয়, বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র। কাউট্‌স্কির প্রামাণ্যতা অগ্রাহ্য করে' লেনিন্‌ ইতিমধ্যে পারিপার্শ্বিকের পর্য্যালোচনায় মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়োগ করেছিলেন। ধনতন্ত্রের সমসাময়িক রূপকে তিনি সাম্রাজ্যবাদ আখ্যা দিলেন—তার চালক শক্তি হচ্ছে ফিনান্স্‌ ক্যাপিটাল, তার ঝোঁক মনোপলি বা একচেটিয়া কর্ত্তৃত্বের দিকে। শক্তিশালী দেশ মাত্রই তাই আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধনিকদের তাড়নায় কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়তে উদ্যত। স্বভাবতঃই পৃথিবী-ভাগাভাগি কাড়াকাড়িতে পরিণত হলে যুদ্ধের উদয় হবে—আর তখনই আসবে শ্রমিকদের সুযোগ। ধনিকতন্ত্রের শান্তভাবে সমাজতন্ত্রে পরিণত হবার প্রত্যাশা কাউট্‌স্কির মনে ছিল। সে-আশা ইংরাজ ফেবিয়ান্‌দের মন্থর পরিবর্ত্তনের ধারণা থেকে অভিন্ন। লেনিন্‌ ঘোষণা করলেন যে সাম্রাজ্যতন্ত্র তিন দিক থেকে চাপের জন্য অচিরে ভেঙ্গে পড়বে—দেশের মধ্যে শ্রমিকদের অসন্তোষ, অধীন অনুন্নত জাতিদের মুক্তিপ্রয়াস এবং মহাশক্তিদের স্বার্থপ্রণোদিত সঙ্ঘর্ষে। লেনিনের ধারণাগুলিকে, ষ্টালিনের ভাষায়, সাম্রাজ্যতন্ত্রের যুগোপযোগী মার্ক্সবাদ রূপে অভিহিত করাই সঙ্গত।

মহাযুদ্ধের সময় জারতন্ত্রের অক্ষমতা বারবার প্রকাশ পাওয়াতে অসন্তোষ ও সংস্কারকামনা আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। রাস্‌পুটিন্‌ নামে এক খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী রাজপরিবারের শনিরূপেই সম্রাট সম্রাজ্ঞীর অপ্রিয়তাবৃদ্ধির কারণ হ'ন। তাঁর মৃত্যুর পর সম্রাটের শিথিল হাত থেকে রাজদণ্ড খসে' পড়বার উপক্রম হ'ল। ১৯১৭ সালের প্রথমে রণক্লান্তি, খাদ্যাভাব, ধর্ম্মঘট, দমনচেষ্টা অবস্থা সঙ্গীণ করে' তোলে। পেট্রোগ্রাডে মার্চ্চের প্রথমে সৈন্যেরা শ্রমিকদের উপর গুলি চালাতে চাইল না। তারপর বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়াতে, ডুমাসভার এক

সমিতি রাজ্যভার গ্রহণ করে এবং সম্রাটকে পদত্যাগ করতে হয়। ইতিহাসে এর নাম ১৯১৭ সালের প্রথম বা মার্চ্চ্ বিপ্লব।

ক্রমে এসার নেতা কেরেন্স্কি দেশের শাসক হয়ে পড়েন; কিন্তু নানা দলের মিলিত কর্তৃত্ব নূতন সাধারণতন্ত্রকে তখন চালাতে থাকে। স্থির হয় যে সমস্ত জনসাধারণের এক বিরাট প্রতিনিধিসভা ভবিষ্যৎ শাসন পদ্ধতি ঠিক করবে আর নূতন রাষ্ট্রশক্তি আগের মতনই যুদ্ধ চালাতে থাকবে। ইতিমধ্যে লেনিন্ ও নির্ব্বাসিত অন্য সকল নেতাদের দেশে ফেরা সম্ভব হয়েছিল। মেন্শেভিকেরা তাঁদের মতানুসারে দেশে পরবর্ত্তী পর্য্যায় হিসাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্র স্থাপন প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু লেনিনের মনে হ'ল ধনিকদের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে শ্রমিক বিপ্লবের সুবিধা উপস্থিত হয়েছে।

তিনি তৎক্ষণাৎ নূতন কর্ম্মপদ্ধতির উদ্ভাবন করে' ফেলেন। সময়োপযোগী ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন মার্ক্স্‌পন্থার একটা বৈশিষ্ট্য। ১৯০৫ এর বিপ্লবে পেট্রোগ্রাডে শ্রমিকেরা সোভিয়েট্ নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়েছিল। ১৯১৭-র মার্চ্চে তার পুনস্থাপন হয় এবং অন্যান্য স্থানেও অনেক সোভিয়েট্ দেখা যায়। সোভিয়েট্ শুধু শ্রমজীবিদের সমিতি—কিন্তু নির্ব্বাচনের কেন্দ্রগুলি বাসস্থান অনুযায়ী পল্লীসমূহ নয়, কারখানা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মস্থল হিসাবে প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা এর বিশেষত্ব। যে-কোনও মুহূর্ত্তে পুরাতনের জায়গায় নূতন প্রতিনিধি পাঠাবার ক্ষমতা থাকায় সোভিয়েটে শ্রমিকদের ইচ্ছা সক্রিয় থাকতে পারে। লেনিনের আন্দোলনের মন্ত্র হ'ল এখন যে সোভিয়েট্গুলির হাতে সকল ক্ষমতা দেওয়া হোক। সহসা সমগ্রদেশের প্রতিনিধিসভার আদর্শ খর্ব্ব করে' শ্রমিক শ্রেণীর প্রাধান্যের কলরব উঠ্ল। কৃষকদের দলে টানবার জন্য লেনিন্ দাবী করলেন যে জমিদারের জমি কেড়ে চাষীদের হাতে দেওয়া হোক। অত্যাচারিত সংখ্যান্যূন অনেক জাতির রুষদেশে বসবাস; লেনিনের তৃতীয় প্রস্তাব, এদের পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া। আর সমস্ত দেশের গুপ্ত ইচ্ছা মূর্ত্ত হ'ল তাঁর চতুর্থ প্রস্তাবে—যুদ্ধ থামিয়ে তৎক্ষণাৎ শান্তির আয়োজনে।

জুলাই মাসে বিদ্রোহের একটা চেষ্টা ব্যর্থ হ'লে লেনিন্‌কে অজ্ঞাতবাসে থাকতে হয়। সেই দারুণ উদ্বেগের সময় তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা—রাষ্ট্র ও বিপ্লব—রচনা হ'ল। তারপর নভেম্বরে বিপ্লবচেষ্টা করল সাফল্যলাভ। নবাগত ট্রট্স্কির সাহায্যে লেনিন্ ও তাঁর সহকর্ম্মীরা শাসনযন্ত্র অধিকার করলেন। এই সময়ে দশটি স্মরণীয় দিনের প্রত্যক্ষ বিবরণ রীড্ নামে এক আমেরিকান্ লিপিবদ্ধ

করে' রেখেছেন। যে-চার প্রস্তাবে লেনিন্ জনমতকে উত্তেজিত করেছিলেন, বল্‌শেভিক্‌দের প্রথম কর্ত্তব্য হ'ল সেগুলি অনুমোদন এবং কাজে পরিণত করবার প্রয়াস। জাতীয় প্রতিনিধি-সভার বদলে শ্রমিক সমিতি বা সোভিয়েট্‌গুলি নূতন রাষ্ট্রের অঙ্গ হওয়াতে রাশিয়া সোভিয়েট্ ইউনিয়ান্ নামে পরিচিত হ'ল। ইতিমধ্যে অবশ্য সোভিয়েট্‌সমূহ বল্‌শেভিক্‌দের হাতে এসে পড়েছিল।

১৯১৭-র নভেম্বর থেকে ১৯১৮ সালের জুন পর্য্যন্ত আট মাস বল্‌শেভিক্ শাসনের প্রথম অধ্যায়। লেনিনের প্রস্তাবের কিছু কিছু সোশ্যালিষ্ট্ আদর্শের আপাতবিরোধী হ'লেও তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে প্রথম কর্ত্তব্য হ'ল শাসনযন্ত্র অধিকার এবং দ্বিতীয় হচ্ছে সে-অধিকার অটুট রাখার চেষ্টা। তাই কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করা হয় এবং ছোট ছোট জাতিরা স্বায়ত্তশাসন পেল আর ব্রেষ্ট্‌লিটভ্‌স্কের সন্ধিতে রাশিয়া রাজ্যক্ষয় করেও শান্তি আনে। ধনিকদের একেবারে উচ্ছেদ তখনও হয়নি; কেন্দ্রীয় আর্থিক পরিষদ ও ফ্যাক্টরিগুলিতে শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়ে পরিচালক সমিতি গঠন আর্থিক ব্যাপারে প্রথমটা ধনিকদের সহযোগে একরকম দ্বৈতশাসনের প্রবর্ত্তনা করে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯১৮-র জুন থেকে ১৯২১-র আগষ্ট্ পর্য্যন্ত। এই সময়টা বল্‌শেভিক্‌দের অগ্নিপরীক্ষার যুগ। অন্তর্বিরোধ আরম্ভ হ'ল—বল্‌শেভিক্-বাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে নানা দিকে বিদ্রোহ দেখা দিতে লাগ্‌ল। উত্তরে য়ুডেনিচ্, দক্ষিণে ডেনিকিন্ ও রাঙ্গেল্, পূর্ব্বে কল্‌চাক্ বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। জারতন্ত্রের ঋণ শোধে বল্‌শেভিকেরা অস্বীকার করার নজিরে মিত্রশক্তিরা সোভিয়েটের শত্রুদের সাহায্যে উদ্যত হ'ল। ইংরাজ, ফরাসী, জাপানী ও মার্কিন সৈন্য রুষদের আক্রমণ করে। বল্‌শেভিক্‌দের দৃঢ়তা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হয়। মধ্য ইউরোপে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা, রাশিয়াকে আক্রমণ করাতে পশ্চিমে শ্রমিকদের অসন্তোষ ও সোভিয়েটের গৃহশত্রুদের অকৃতকার্য্যতা শেষ পর্য্যন্ত মিত্রশক্তিদের অভিযান ব্যর্থ করে। পোলেরা শুধু এই সুযোগে রাজ্য-বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল। এই জীবনমরণের সমস্যার সময়ই লেনিন্‌কে বাধ্য হ'য়ে সামরিক সাম্যতন্ত্রের ব্যবস্থা করতে হয়। নূতন রাষ্ট্রশক্তি তখন সমস্ত আর্থিক ব্যবস্থা নিজের হাতে নেয়। ধনিকদের উচ্ছেদ হ'ল, যন্ত্রশিল্প এল ষ্টেটের কর্ত্তৃত্বে, কৃষকদের সঙ্গে শস্যের পরিবর্ত্তে অন্য পণ্য সামগ্রী সরবরাহের চুক্তি হয়। রাষ্ট্রশক্তির সর্ব্বেব কর্ত্তৃত্ব যুদ্ধজয়ে সাহায্য করল বটে কিন্তু এতে দেশের ভিতর অভাব ও গণ্ডগোল বহুল বৃদ্ধি পেল।

১৯২১-এ লেনিন্ নূতন আর্থিক ব্যবস্থা—সংক্ষেপে নেপ্-পদ্ধতির আশ্রয় নিলেন। সাম্যবাদের অবসান হ'ল চারিদিকে তখন এই রব উঠলেও বোঝা সহজ যে বল্‌শেভিকেরা শুধু নানা সাময়িক উপায়ে নিজেদের কর্ত্তৃত্ব দৃঢ়তর করছিল, মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয় নি। পরে ১৯২৮-এ আর্থিক নীতি পরিবর্ত্তন একথা সপ্রমাণ করে। নেপের আমলে কৃষকদের এবং ব্যবসায়ীদের স্বাধীনতা অনেকখানি ফিরে আসে আর বিদেশী ধনিকদেরও কিছু কিছু সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু ধনতন্ত্রের পূর্ব্বাবস্থায় দেশ ঠিক ফিরে যায় নি মনে রাখতে হবে।' বড় কারখানাগুলি এবং বহির্বাণিজ্যের কর্ত্তৃত্ব নেপের আমলেও রাষ্ট্রের হাতে থাকে। তাই ধনিকদের ক্ষমতা কিছু ফিরে এলেও আর্থিক ব্যবস্থা একেবারে সোভিয়েট্ শক্তির মুষ্টিচ্যুত হ'ল না। নেপ্‌কে বস্তুতঃ নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর হিসাবে দেখা উচিত। কিন্তু এরই মধ্যে ১৯২৪-এর প্রথমে লেনিনের মৃত্যু হ'ল।

লেনিনের শাসন সম্পর্কে আর দুইটি বিষয়ের—বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ এবং নূতন রাষ্ট্রশক্তি সঙ্গঠনের উল্লেখ ক'রেই এ-প্রসঙ্গ শেষ করতে হবে। ১৯১৮—১৯-এ শ্রমিকবিপ্লব নানা দেশে ছড়িয়ে পড়বার খুবই সম্ভাবনা ছিল। বল্‌শেভিকেরা মার্ক্সের ব্যবহৃত সাম্যবাদী নাম গ্রহণ করে' কমিন্‌টার্ন অথবা তৃতীয় শ্রমিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করল—সর্ব্বত্র বিপ্লবের প্রসার ছিল তার লক্ষ্য। যুগসন্ধির সময় কিন্তু পাশ্চাত্য জগৎ লেনিন্‌কে অগ্রাহ্য করে' উইলসন্-পন্থা-ই অনুসরণ করে। কিছুদিনের মধ্যে সাম্যবাদীরা পর্য্যন্ত বুঝ্‌ল যে ধনিকতন্ত্র টল্‌মল্ করে' উঠ্‌লেও খানিকটা সাম্‌লে নিয়েছে। হাঙ্গারিতে বেলাকুনের বল্‌শেভিকি আধিপত্য ধনিকেরা ধ্বংস করল রোমানিয়ার সৈন্যের সাহায্যে। জার্মানিতে বিপ্লবের পর ধীরে ধীরে মধ্যশ্রেণীর কর্ত্তৃত্ব পুনর্প্রতিষ্ঠ হ'ল। রাশিয়ার মধ্যে বিপ্লব জয়যুক্ত হ'লেও শেষ পর্য্যন্ত বাইরে তার পরাজয় হয়। ১৯২৩-এর পর আমেরিকার আর্থিক সাহায্যের সম্ভাবনা-ই পশ্চিমে বিপ্লবের ভয় অপসারণ করতে পেরেছিল। কিন্তু সে-সম্ভাবনার অনেক আগে থাকতেই সোভিয়েট্ রাশিয়া বিদেশ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ-নীতি অবলম্বন করে। ১৯২০ সালে-ও চিচেরিন্ মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট্‌কে জানান যে সোভিয়েট্ শক্তি অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। জারদের সুবিদিত অগ্রসর নীতি তাই প্রথম থেকে সযত্নে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তার উদাহরণ—ব্রেষ্ট্-লিটভ্‌স্কের রাজ্যক্ষয় অঙ্গীকার পালন, দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র জাতিগুলির স্বায়ত্ত-শাসন অধিকার প্রদান এবং একদিকে তুরস্ক অন্যদিকে চীনের উপর চাপ দেবার লোভ

সম্বরণ। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে শান্তিপ্রিয়তা শুধু এখন নয়, লেনিনের আমল থেকেই সোভিয়েট্ ইউনিয়ানের বিশেষত্ব। এর কারণ বোধ হয় আভ্যন্তরীণ সঙ্গঠন কার্য্যে ব্যস্ততা এবং বিদেশে ছড়িয়ে পড়বার আর্থিক তাগিদার অভাব। তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্থানের সঙ্গে রুষদের নূতন সদ্ভাব ১৯২১-এর সন্ধিগুলির থেকে আরম্ভ; চীনের সঙ্গেও মৈত্রী হ'ল ১৯২৪-এ। ক্রমে ক্রমে পশ্চিমের প্রতিবেশীদের সঙ্গেও সন্ধি-স্থাপন হয় যদিও সীমান্ত নিয়ে পোল্যাণ্ড ও রোমানিয়ার সঙ্গে কিছু মনোমালিন্য থেকে গেল। এ-সময় বড় রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েট্‌কে অস্পৃশ্য করে' রাখাতে জার্মানির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল। (রাপালোর সন্ধি, ১৯২২)।

নূতন রাশিয়ার আভ্যন্তরিক অবস্থার আলোচনা স্থানাভাবে এখানে সম্ভব নয়। অশেষ দুর্গতি ও অনেকখানি অত্যাচারের মধ্য দিয়েও এক সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থা গড়ে' উঠবার সূত্রপাত হ'ল। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তিতে স্থানীয় সোভিয়েট্‌গুলি গ্রামে গ্রামে ও প্রতি নগরে বিরাজ করতে লাগ্‌ল। তাদের প্রতিনিধি নিয়ে প্রাদেশিক সোভিয়েট্ এবং প্রদেশগুলির প্রতিনিধি দিয়ে সোভিয়েট্ কংগ্রেস গঠিত হ'ল—এই কংগ্রেসই দেশের ব্যবস্থা পরিষদ। কংগ্রেস দুইভাগে বিভক্ত এক সংসদ নির্ব্বাচন করে, তার একভাগে দেশান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও আসন পেল। এর থেকে আবার কমিসার অথবা মন্ত্রীদের সমিতির নিয়োগ। ১৯২৩-এর শাসন-পদ্ধতি অনুসারে সোভিয়েট্ রাষ্ট্র এক ফেডারেশন অথবা সংহত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এতে আসল রাশিয়ার সঙ্গে আরও ছয়টি সোভিয়েট্ রেপাব্লিক্ সংযুক্ত হ'ল; তাদের নাম—শ্বেতরাশিয়া, উক্রেন্, ট্রান্স্‌ককেশিয়া, তাজিকিস্থান, উজ্‌বেকিস্থান, এবং তুর্ক্‌মানিয়া। মূল রুষদেশেও আবার নানা অঞ্চলে স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এই জটিল বন্দোবস্ত চালাতে লাগল এক মূল শক্তি—এবং সে চালক হচ্ছে সাম্যবাদী দল। প্রকৃত নেতৃত্ব রইল পার্টিকংগ্রেস ও তার সমিতির হাতে। শেষ পর্য্যন্ত পলিট্-বুরো নামক সাম্যবাদী কর্ম্মসমিতি-ই রাশিয়ার শাসক—মন্ত্রী প্রভৃতিরা তাদের-ই আশ্রিত। রুষ অধিনায়ক ষ্টালিন কেবল সাম্যবাদীদলের কর্ম্মসচিব ও পলিট্‌বুরোর সভ্য মাত্র।

লেনিন্-গঠিত যন্ত্রের মূল কথা ছিল শ্রমিক আধিপত্য—তার রূপ হ'ল সোভিয়েট্‌গুলি। কিন্তু শ্রমিক-সাধারণকে ঠিক পথে চালাবার জন্য নেতার প্রয়োজন। সে-অভাব দূর করে সাম্যবাদী দল। বিরোধীদের তাই দেশমধ্যে

দমন করা হ'ল। এই চণ্ডনীতির কোন সার্থকতা থাকলে, মার্ক্স্ ও লেনিনের মতবাদে বিশ্বাস থেকেই তার উৎপত্তি।

তিন

যুদ্ধান্তের জগতে সব চেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনা—সোভিয়েট্ ইউনিয়ানের সৃষ্টি; ১৯৩৭-এর নভেম্বরে তার কুড়িবছর পূর্ণ হয়েছে। বিপ্লবের পর থেকে রাশিয়া শ্রমিক-রাষ্ট্ররূপে গণ্য হয়েছে এবং অন্য সকল দেশ থেকে তার পার্থক্য এইখানেই। এর পূর্ব্বগামী অনুরূপ রাষ্ট্র ১৮৭১-এর প্যারিস্-কমিউন্ আকারে ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী ছিল। চারিদিকের পৃথিবীব্যাপী ধনতন্ত্রকে ছাড়িয়ে নূতন আর্থিক ব্যবস্থা ও নবীন শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজ গড়ে' তোলবার প্রচেষ্টা সোভিয়েট্ রাশিয়ার বৈশিষ্ট্য। মার্ক্সের মতে সাম্যতন্ত্র গঠন একটা সম্পূর্ণ যুগের কাজ, ধনিকতন্ত্রও যেমন একদিনে ফিউডাল্ ব্যবস্থার স্থান নিতে পারে নি। রাশিয়ায় তাই এখনই সাম্য-তন্ত্রী সমাজ দেখার প্রত্যাশা, আদর্শ কতখানি কৃতকার্য্য হ'ল তার সঠিক পরিমাণ নির্দ্দেশ কিম্বা রুষ অভিজ্ঞতার থেকে সে-আদর্শের সম্ভাবনীয়তা অথবা দোষগুণ বিচার—এ সমস্তই অনেকখানি অবান্তর আলোচনা ও পণ্ডশ্রম মাত্র। ঐতিহাসিকের চোখে পড়ে শুধু একটা বিরাট সুসম্বদ্ধ উদ্যম, তার ফলাফল এখনও ভবিষ্যতের অন্ধকারে। সে-উদ্যমের প্রাণ হচ্ছে মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাস। বল্‌শেভিকেরা থিওরি এবং প্র্যাক্‌টিসের অঙ্গাঙ্গী যোগ মানে, তাই তাদের আচরণের বিচার শেষ পর্য্যন্ত একটি প্রশ্নে গিয়ে দাঁড়ায়—মার্ক্সের নির্দ্দিষ্ট পন্থা থেকে তারা ভ্রষ্ট হচ্ছে কি না। রুষ বিপ্লবের পর গোঁড়া মার্ক্সীয় নামে খ্যাত কাউট্‌স্কি অভিযোগ আনলেন যে লেনিন্ মার্ক্স্‌বাদকে বিকৃত করেছেন। তখন বহু বাদানুবাদ হয়েছিল, তার ফলে আজকের দিনে আর কেউ এ-কথা বলেন না। কিন্তু গত কয়েক বছর বার বার কথা উঠেছে যে ষ্টালিন্ নির্দ্দিষ্ট আদর্শ ও পন্থা থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন—এখন প্রধান অভিযোগকারী লেনিনের সহযোগী স্বয়ং ট্রট্‌স্কি। এ-তর্কবিতর্ক এখনও চলেছে কিন্তু মার্ক্স্‌তত্ত্বে অভিজ্ঞ অধিকাংশের মতে ষ্টালিনই মার্ক্সের প্রকৃত শিষ্য। সাম্যবাদের চিন্তাধারার প্রকাশ বোঝাতে গেলে তাই মার্ক্স্-এঙ্গেল্‌স্-লেনিন্-ষ্টালিন্ এঁদেরই নির্দ্দেশ অনুসরণ করা সঙ্গত।

লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪) পর, তিনজন নেতার হাতে রাজ্যভার এসে পড়ে। তাঁরা তখন ত্রয়ী নামে খ্যাত হয়েছিলেন—সে-তিনজন জিনোভিয়েভ্, কামেনেভ্ এবং ষ্টালিন্। বহির্জগতে লেনিনের সহকর্ম্মীদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি লাভ

করেছিলেন ট্রট্স্কি। বিপ্লবের সময় ট্রট্স্কির উপর নেতৃত্বের ভার অনেকখানি পড়ে এবং পরে নূতন লোহিতবাহিনীর স্বষ্টিকর্ত্তা হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ হন। কিন্তু ট্রট্স্কি বহুদিন মেন্‌শেভিক্ ছিলেন, লেনিন্-বিবৃত মার্ক্স্-তত্ব তাঁর ঠিক দুরস্ত ছিল না। থিওরির ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত তাঁর দুর্ব্বলতা থেকে গেছে, তাঁর লেখাতে ডায়ালেক্‌টিক্ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব সুবিদিত। তাছাড়া তাঁর স্বভাব ছিল রোমান্টিক ধরণের, কমিউনিষ্ট্ দলের নেতৃত্বের তিনি ঠিক উপযোগী ছিলেন না। ট্রট্স্কির মনের গড়নই আদর্শবাদ, বিপ্লব-বিলাস ও নৈরাজ্যতন্ত্রের অনুকূল। লেনিনের ব্যক্তিত্ব তাঁকে আচ্ছন্ন করে' থাকলেও, অবিসম্বাদী নেতার মৃত্যুর পর কমিউনিষ্ট্ দল তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারে নি। নেতার পার্শ্বচর হিসাবে তিনি খ্যাত হলেও, লেনিনের যথার্থ মতবাদ হৃদয়াঙ্গম করে' প্রচার ট্রট্স্কি করেন নি—সে কাজ ষ্টালিনের। ষ্টালিন্ বিপ্লবের বহু পূর্ব্ব থেকে রাশিয়ায় দলের গুপ্ত প্রচার কার্য্যে জীবন সংশয় করে' পরিশ্রম করেছিলেন। বিপ্লবের পর তিনি নির্দ্দিষ্ট কাজ যোগ্যতার সঙ্গেই সম্পন্ন করতেন। বক্তৃতায় ও লেখায় লেনিনের মতবাদ তিনিই পরিস্ফুট করেন। দলের কর্ম্মসচিব হিসাবে তিনি কমিউনিষ্ট্‌দের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন।

লেনিনের মৃত্যুর সময় রাশিয়াতে নেপের আমল চল্‌ছিল। ট্রট্স্কি তার প্রকৃত রূপ বুঝ্‌তে না পেরে গণ্ডগোল আরম্ভ করলেন; নেপ্ আরম্ভ হবার এত পরে তাঁর এই অভিযান নূতন নেতাদের বিব্রত করবারই উপায় মনে হয়। বহির্জ্জগতের অভিমত প্রতিধ্বনিত করে' ট্রট্স্কি বল্‌লেন যে রাশিয়ায় বিপ্লবের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, ফরাসী বিপ্লবে যেমন রোব্‌স্‌পিয়ারের মৃত্যুর পর থার্মিডরের প্রতিক্রিয়া এসেছিল, এখন তেমনি রুষদেশেও বিপ্লবীদল পশ্চাৎগমন করছে। তখন দলের মধ্যে তর্ক উঠ্‌ল কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ে। ট্রট্স্কির মতে শুধু একদেশে অর্থাৎ রাশিয়ায় নূতন সমাজগঠনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। তার আগে পৃথিবীর নানা দেশে শ্রমিক-বিপ্লব সঙ্ঘটিত হওয়া প্রয়োজন। বিপ্লবকে আগুণের মতন দেশ থেকে দেশান্তরে না নিয়ে যেতে পারলে সব ব্যর্থ হবে। শ্রমিকবিপ্লব জগদ্ব্যাপী করা আবশ্যক, তাই প্রধান কাজ হ'ল কমিন্‌টার্নের সাহায্যে সর্ব্বত্র বিপ্লব আনয়নের চেষ্টা। ট্রট্স্কির মতবাদে তাঁর অবাস্তবতা সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে—মার্ক্স্‌তত্ত্বের জটিলতা আয়ত্ত না করে' তিনি তাকে মন্ত্রের রূপ দিতে এবং বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে ছেলেখেলায় পরিণত করতে চাচ্ছিলেন। ষ্টালিনের মতে সাম্যবাদীদের কর্ত্তব্য সর্ব্বদা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার। লেনিন্‌ও লক্ষ্য অবিচলিত রেখে স্থানকাল অনুসারে কর্ম্মপদ্ধতি

পরিবর্ত্তিত করতেন। অধীর আস্ফালনকে তিনি এক বিখ্যাত পুস্তিকায় শৈশব-সুলভ ব্যাধি নাম দিয়েছিলেন। এরও বহু আগে স্বয়ং মার্ক্স্ ব্ল্যাঙ্কির নির্বিবচার বিপ্লবের উচ্ছ্বাস ও ষ্টার্ণার-এর উগ্রপন্থার নিন্দা করেন। দেশে নিশ্চেষ্টতা ও বিদেশে শক্তিক্ষয়ের মধ্য দিয়ে ট্রট্স্কির নীতি নামে চরমপন্থা ও কাজে পশ্চাদগমনে পর্য্যবসিত হবে। ১৯২৪-এ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল যে ধনতন্ত্র অনেকখানি টাল সাম্‌লেছে। এ-অবস্থায় রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ সঙ্গটন দলের প্রধান কর্ত্তব্য। লেনিন্ নিজেই তার পথপ্রদর্শন করেছিলেন। রাশিয়ার মতন একদেশেও নূতন সমাজের প্রথম অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব—তার মূলসূত্র হচ্ছে যে প্রত্যেককে শ্রম করতে হবে এবং প্রত্যেকে শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাবে। এই প্রথম অবস্থাকে সমাজতন্ত্র নাম দেওয়া যায়। পূর্ণ সাম্যতন্ত্র এর পরের অবস্থা—আর সে-অবস্থায় পৌঁছতে গেলে সম্ভবতঃ বিপ্লবের সর্ব্বদেশে প্রসার প্রয়োজন। শ্রমিক-কর্ত্তৃত্ব জগদ্ব্যাপী হ'লেই নূতন শ্রেণীবিহীন সমাজের পূর্ণগঠন সম্ভব আর তখনই এঙ্গেল্‌সের প্রতিশ্রুত ষ্টেটের নিষ্পেষক যন্ত্রের সম্পূর্ণ লোপ হ'তে পারবে। এই দ্বিতীয় অবস্থাকেই সাম্যতন্ত্র নাম দেওয়া হ'ল—এর মূলসূত্র হবে যে প্রত্যেকে শক্তি অনুসারে শ্রম করবে বটে কিন্তু সমাজের কল্যাণে সে পাবে তার যা কিছু প্রয়োজন সমস্তই।

১৯২৬-এ জিনোভিয়েভ্ ও কামেনেভ্ হঠাৎ পূর্ব্ববৈরী ট্রট্স্কির দলে যোগ দিলেন, অবশ্য এঁদের দুজনের মতিস্থিরতার অভাব বল্‌শেভিক্‌দের পূর্ব্ব ইতিহাসেও লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৭-এ বিস্তর আলোচনার পর কমিউনিষ্ট্ দল ষ্টালিনের মতই গ্রহণ করল—আর সেই সময় ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ্, কামেনেভ্, রাডেক্, রাকভ্স্কি দল থেকে বহিষ্কৃত হলেন। পরে অন্য সকলে ভুল স্বীকার করে' দলে ফিরে আসেন কিন্তু ট্রট্স্কি অবিচলিত থাকায়, তাঁর নির্ব্বাসন হয় (১৯২৯)। ১৯৩১-এ দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রে এর অনুরূপ সঙ্ঘর্ষ দেখা দেয়। ডেবোরিন্, কারেভ্ প্রভৃতি দার্শনিকদের বিরুদ্ধে মিটিন্ ইত্যাদি অভিযোগ আনেন যে তাঁরা চিন্তার রাজ্যে আদর্শবাদের দিকে ঝুঁকছেন। ট্রট্স্কির মতন ডেবোরিন্‌ও পরাস্ত হ'লেন।

মার্ক্স্ ও লেনিনের সময়ও সাম্যবাদকে দুইদিকের বিকৃতির ঝোঁক সাম্‌লাতে হয়েছিল। এখনও ট্রট্স্কির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উল্টোদিকের চরমপন্থাকেও ষ্টালিন বর্জ্জন করেন। ১৯২৮-এ বুকারিন্, টম্‌স্কি, রাইকভ্ প্রভৃতি নেতারা ষ্টালিনের নীতিকে অতিমাত্রায় দুঃসাহসিক মনে করিলেন। ট্রট্স্কির অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই বিপদ ছিল মার্ক্স্‌বাদের বিকৃতি। এবারও সাম্যবাদীদল ষ্টালিনকে সমর্থন করে। এই বাদানুবাদের সময়ই সুবিখ্যাত

পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের সাহায্যে দেশের মধ্যে নূতন সমাজের প্রথম স্তর গড়ে তুলবার উদ্যোগ হয়েছে।

১৯২৮-এর নবপদ্ধতির দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথম লক্ষ্য, যন্ত্রশিল্পের প্রভূত প্রসার, রাশিয়াকে এখন আমেরিকা বা জার্মানির মতন যন্ত্রপ্রধান দেশের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছে। আজকের দিনের সোভিয়েট্ রাষ্ট্রের লোহা, ইস্পাত বা কেমিক্যালের কারখানা, কয়লার খনি কিম্বা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা বিস্ময়ের বস্তু। আরও আশ্চর্য্য এই যে এত বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের অভ্যুত্থান এদেশে জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টার ফল—এর পিছনে স্বদেশী বা বিদেশী ধনিকের লাভের জন্য অর্থনিয়োগ নেই। দ্বিতীয় লক্ষ্য, কৃষিকার্য্যে রাশিয়ার অনুন্নতির অপবাদ ঘোচানো। সমগ্র দেশ এতদিন লক্ষ লক্ষ কৃষকের খণ্ডসম্পত্তিতে বিভক্ত ছিল। বিপ্লবের পর কৃষকদের জমির উপর অধিকার অটুট ছিল, এমন কি জমিদারদের জমিও তাদের হাতে দেওয়া হ'ল কৃষকদের সহায়তা লাভের জন্য। সামরিক সাম্য-তন্ত্রের যুগে কৃষকদের চেপে রাখার চেষ্টা নেপের আমলে বর্জ্জিত হয়, ফলে অবস্থাপন্ন কৃষক অথবা কুলাক্দের গ্রামে সম্পদ ও শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু কুলাক্দের নীচে মধ্যবিত্ত কৃষক এবং আরও নীচে গরীব চাষীদের দুরবস্থা ও অসন্তোষ তখনও কমে নি। পঞ্চবার্ষিক সংকল্পে কুলাক্শ্রেণীর উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়। দেশে ষ্টেট্ পরিচালিত কয়েক হাজার আদর্শ ফার্মের সৃষ্টি হ'ল, কিন্তু সব জমির হঠাৎ এভাবে সরকারী চাষ সম্ভব হয় নি। সুতরাং একত্রিক কৃষিকার্য্যের উদ্ভব হ'ল—অর্থাৎ স্থানীয় সব কৃষকদের জমি একত্র করে' চাষের ভার তাদেরই সম্মিলিত সমিতিদের হাতে দেওয়া হয়। একত্রিক চাষের সুবিধা সহজেই বোঝা যায়—সম্মিলিত কৃষিকার্য্যে যন্ত্রের সাহায্যে শ্রমলাঘব চলে, স্বতন্ত্র চাষে যন্ত্রের বহুল ব্যবহার অসম্ভব। সরকারী চাষ ও একত্রিক কৃষিকার্য্য এইভাবে রাশিয়ার গ্রামে যুগান্তর আনল। এই ব্যবস্থা সাম্যবাদের ইতিহাসে ষ্টালিনের এক প্রধান কীর্ত্তি হিসাবে স্থান পাবে। কৃষকেরা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ও ভূমিসম্বন্ধে লোভী—সোশ্যালিজ্‌মের বাধা হিসাবেই তাদের এতদিন দেখা হয়েছে। ষ্টালিনের নীতি মোটামুটি সফল হ'লেই সে বাধা অপসারণের এক উপায় হবে।

নেপের আমলে রাশিয়ার বাইরে বিশ্বাস ছিল যে সে-দেশে আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছে। বিদেশী ধনিকদের লাভের জন্য টাকা খাটাবার সুযোগ কিন্তু নেপের সময়ও হ'ল না। পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের সময়ও যন্ত্রনির্ম্মাণের টাকা আসতে লাগ্‌ল জনসাধারণ ও শ্রমিকদের আয় ও ব্যয়-সঙ্কোচের

মধ্যে। রাশিয়ায় তাই প্রচুর অভাব রইল, কিন্তু অভাবের ফলে শ্রমিক-অসন্তোষ প্রবল হ'য়ে ওঠে নি। তার কারণ অবশ্য সোভিয়েট্ রাষ্ট্রশ্রমিকদেরই নিজস্ব এই ধারণার অস্তিত্ব। শ্রমিকেরা কষ্টস্বীকারে প্রস্তুত ছিল, যতদিন তাদের অভাবের ভিতর দিয়ে সঞ্চিত অর্থ অল্পসংখ্যক ধনিকের ভোগে না এসে দেশের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধনে নিয়োজিত থাকবে। অশেষ কষ্টের মধ্যে গোড়াপত্তন এভাবে হবার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক সংকল্প এল। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি—আর তার মধ্যে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের প্রাচুর্য্য স্থান পেল। ক্রমে রাশিয়াতে এখন সাধারণ জীবনযাত্রা স্বচ্ছলতর হ'য়ে এসেছে। বিদেশী পর্য্যটকেরা অনেকে সম্প্রতি এই পরিবর্ত্তনকে ধনতন্ত্রের প্রত্যাবর্ত্তন ভেবেছেন কিন্তু আর্থিক উৎপাদন পদ্ধতিতে এর অনুযায়ী পূর্ব্ব ব্যবস্থা ফিরে আসার লক্ষণ দেখা যায় না। পণ্যোৎপাদন প্রসার চেষ্টার মধ্যে ষ্টাকানভ্ আন্দোলনের উল্লেখ করা উচিত। শ্রমিকদের মধ্যে কর্ম্মকুশলতা ও শ্রমশীলতার উৎসাহবিধান এর বৈশিষ্ট্য। সে-উৎসাহ প্রকাশ্য সম্মানের মধ্য দিয়েই বেশী আসে, কিন্তু আর্থিক পুরস্কারও রয়েছে। কিন্তু মাহিনার অসমতা আর ধনতন্ত্র এক কথা নয়। স্বতন্ত্র ধনিকশ্রেণীর অস্তিত্ব, তাদের উদ্বৃত্ত অর্থের লাভের জন্য খাটাবার সুবিধা, পণ্যোৎপাদনে ধনিকদের প্রভুত্ব, আর্থিক মূলধনের জন্য তাদের উপর নির্ভর—এইগুলি সব রুষদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিপ্লবের আমলের অবসান হবে না।

নূতন রাশিয়ার বর্ণনা এখানে অসম্ভব। ওয়েব্-দম্পতির বিখ্যাত গ্রন্থে তার অনেক পরিচয় এখন সহজেই পাওয়া যায়। কেবলমাত্র মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখই স্বল্পকলেবর আখ্যানে স্থান পেতে পারে। আর্থিক ব্যবস্থায় দেশব্যাপী প্ল্যানিং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—কিন্তু পৃথিবীর অন্যত্র এর যত অনুকরণ প্রস্তাবিত হয়েছে, তার সঙ্গে এ-উদ্যমের মূলগত পার্থক্য হচ্ছে এই যে এর পিছনে একটা বিশিষ্ট মতবাদের সাধনা রয়েছে, যার সঙ্গে এ-সংকল্পের অঙ্গাঙ্গী যোগ। রাষ্ট্রিক ব্যাপারে প্রথমে শ্রমিকদের প্রতিভূ সাম্যবাদীদলের অধিনায়কত্ব ছিল; বিরোধীদের স্বাধীনতা লোপ হয়েছিল, স্বীকার করতেই হবে। ১৯৩৬-এর নূতন শাসন-পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক উদারনীতি অনেকখানি ফিরে এসেছে। থিওরি এই যে ধনিকশ্রেণীর উচ্ছেদসাধনের পরই এই নীতি প্রথম সার্থক হতে পারে, আর রাশিয়ায় সে-অবস্থা আগতপ্রায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে নিরক্ষরতাদূর রাশিয়ার মত দেশে এক বিপুল কীর্ত্তি। রাষ্ট্রশক্তি তাদের নিজস্ব,

এই বিশ্বাস শ্রমিক ও কৃষকদের মনে বিরাজ করছে। তাদের আর্থিক সুবিধা-বিধান ষ্টেটের এক প্রধান কর্ত্তব্য। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য সাদরে রক্ষিত হচ্ছে—এদের পরস্পরের সদ্ভাব ষ্টালিনের আমলের আর একটি কীর্ত্তি।

কিন্তু বিরোধের অবসান এত সহজে হয় না। ট্রট্স্কির পরাজয়ের পরও তাঁর মতবাদ অসংখ্য লোকের মনে সন্দেহের কারণ হয়ে রইল। ষ্টালিনের মূল বিশ্বাসে ভুল থাকলে দেশও ভুল পথে চল্‌ছে বলতে হবে। আর্থিক উন্নতিকে অভ্যর্থনা করে' ষ্টালিন বলেছিলেন যে রাশিয়ায় এতদিনের পরিশ্রমের পর জীবনে আনন্দ ফিরে আস্‌ছে। ট্রট্স্কির চোখে দেখলে সে-আনন্দ বিপ্লব-অবসানের মুখোষ নয় ত'? ১৯৩৩-এর পর বহির্জগতে পরিবর্ত্তনের ফলে সমস্যা উপস্থিত হ'ল। জার্ম্মানি বা জাপানের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে ষ্টালিন্ যখন ব্যস্ত, তখন অনেক পূর্ব্বতন নেতা আবার ট্রট্স্কি-পন্থার দিকে গোপনে ঝুঁকলেন। তাঁদের ব্যবহারে পরস্পর-বিরোধী আচরণ থিওরির দুর্ব্বলতা-ই প্রমাণ করে। কেউ কেউ ভাবলেন জার্ম্মানি ও জাপানকে কিছু রাজ্য ছেড়ে দিলে গোল চুক্‌বে। অন্যদের মনে হ'ল এই সুযোগে ফাশিষ্ট্‌দের সাহায্যে ষ্টালিন্‌কে ধ্বংস করা সম্ভব। কারো মতে যুদ্ধ এলে ভালই—তাতে বিপ্লবেরই সুবিধা। অন্যরা বিদেশে গণ্ডগোল সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। দু'টি বৈশিষ্ট্য এঁদের আচরণে ধরা পড়ে—ফাশিষ্ট্-বিপদকে সামান্য জ্ঞানে তুচ্ছ করা এবং ষ্টালিনের পতনের জন্য ষড়যন্ত্র। গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ পাওয়াতে রাশিয়ায় এই ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার ও দণ্ডবিধান সম্প্রতি সমস্ত জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

১৯৩৪-এর ডিসেম্বরে কিরভ্ নিহত হ'লেন। ষ্টালিনের প্রাণনাশের চেষ্টা হয়, তাঁর প্রধান সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র হয়েছিল। দেশে নানা গণ্ডগোল সৃষ্টির প্রয়াস দেখা গেল। মস্কোর বিচারে দণ্ডিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ-গুলির অধিকাংশই যে সাজানো নয়, বিচারের সম্পূর্ণ প্রতিলেখন পাঠে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। দণ্ডিত নেতারাও অনেকে প্রায় দশবছর ধরে' সাম্যবাদীদলের আচরণে সন্দেহ পোষণ করে' এসেছেন। তাঁরাই খাঁটি প্রাচীন বল্‌শেভিক্, একথা অমূলক। ষ্টালিনের প্রধান সমর্থক—কাগানোভিচ্, ভোরোশিলভ্, মোলোটভ্, লিট্‌ভিনভ্ প্রভৃতি সকলেই দলের পুরাতন সভ্য। দণ্ডিত নেতারা কেউ কেউ লেনিনের সময়ও ভুলনীতির অনুসরণ করেন—লেনিনের সময় তাঁরা উচ্চপদে

থাকলেও ট্রট্স্কি-স্টালিনের দ্বন্দ্বে তাঁরা ষ্টালিনের নেতৃত্বে খানিকটা সন্দিগ্ধ হ'য়ে পড়েন। ষড়যন্ত্রকারীদের তাই সাধারণ ভাবে ট্রট্স্কিপন্থী বললে অন্যায় হবে না, তাঁদের পরস্পর-বিরোধ সে-পন্থার-ই দৌর্বল্যের পরিচায়ক। মতের কথা ছেড়ে দিলেও অভিযোগগুলি যে সম্ভবতঃ সত্য সে সম্বন্ধে ক্রমশই জনমত প্রবল হচ্ছে।

মস্কোতে সম্প্রতি চারটি বড় বিচার হয়ে গিয়েছে। দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন—জিনোভিয়েভ্ ও কামেনেভ্ (আগষ্ট, ১৯৩৬); রাডেক্, সকল্‌নিকভ্ ও পিয়াটোকভ্ (জানুয়ারী, ১৯৩৭); মার্শাল্ তুকাচেভ্স্কি ও অন্য কয়েকটি সেনাপতি (জুন, ১৯৩৭); বুকারিন, য়াগোভা ও রাকভ্স্কি (মার্চ্চ, ১৯৩৮)। রাডেক্ ও তুকাচেভ্স্কি ব্যতীত এঁদের প্রভাব বহুদিন আগেই রাশিয়াতে প্রায় ম্লান হয়ে এসেছিল। দেশের মধ্যে ষ্টালিনের সমর্থক যে অজস্র সে-কথা ভোলাও উচিত না। অভিযুক্তেরা বিখ্যাত ও অভিযোগ অপ্রত্যাশিত হ'লেও এক্ষেত্রে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। উৎপীড়ন বা প্রলোভনের সাহায্যে যে বন্দীদের কাছ থেকে দোষস্বীকার আদায় করা হয়েছিল, এর কোন প্রমাণই নেই। দোষ স্বীকার অনিবার্য্য হ'য়ে পড়েছিল প্রমাণের প্রাচুর্য্যে, এ-কথাই বরং বেশী বিশ্বাসযোগ্য।

পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের সাফল্য অপ্রত্যাশিত হওয়াতে রব উঠেছিল যে ষ্টেটকর্ত্তৃত্ব ও শ্রমিকদের দাসত্বের জন্যই এ-সংকল্প ব্যর্থ হয় নি। প্রচলিত অর্থনীতি কিন্তু বহুদিন বলে' এসেছে যে রাষ্ট্রশক্তি কখনও আর্থিক কর্ত্তৃত্ব সুচারুভাবে করতে পারে না এবং দাসশ্রমে উৎপাদন কার্য্য ভাল চলে না। জগদ্ব্যাপী আর্থিক সঙ্কট রাশিয়াকে বিশেষ বিচলিত করল না, এটাও বিস্ময়ের কারণ। কিন্তু সোভিয়েট্ ইউনিয়ানের অগ্রগতি অবাধ বা নিরঙ্কুশ হয় নি। এর ভবিষ্যৎ আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন। যুদ্ধে পরাজয় হয়ত রাশিয়ার সকল প্রচেষ্টা একদিন ব্যর্থ করবে আর তখন সাম্যবাদীদের আবার প্রথম থেকে পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হ'তে হবে। ১৯৩৩-এ হিট্লারের অভ্যুদয় এই বিপদের সূচনা করল। দুই প্রতিপক্ষ—জার্মানি ও জাপান—রাশিয়ার দুই দিকে অবস্থান করছে। উভয়েই ফাশিষ্ট্ ও সাম্যবাদের ঘোর শত্রু। উভয়েই সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত তাড়নায় প্রসরোন্মুখ। এরা পরিণামে রাশিয়াকে বিধ্বস্ত করবে কি না, সমসাময়িক কালের প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সমস্যা। ট্রট্স্কি হয় এ বিপদ বোঝেন না, নয়ত সোভিয়েটের পতন তাঁর কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু রাশিয়ার আত্মরক্ষা পৃথিবীর শ্রমিক সমাজের কাছে সামান্য কথা হতে পারে না।

লেনিনের আমলেও রাশিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিপ্রয়াসী ছিল। তারপর অস্ত্রত্যাগের জল্পনার সময়ও রুষরাষ্ট্রের চেষ্টা ছিল সেই দিকেই। ১৯৩৩-এর নাৎসি-বিপ্লবের পর শান্তি-সংরক্ষণ সোভিয়েট্ বৈদেশিক নীতির মূলকথা হ'ল আত্মরক্ষার খাতিরে। লিট্ভিনভ্ ১৯৩৪-এ বৃথাই প্রস্তাব করলেন যে অস্ত্র-ত্যাগের বৈঠককে শান্তিরক্ষক সভারূপে পুনর্গঠিত করে' আক্রান্ত কোন দেশের তৎক্ষণাৎ সাহায্যের জন্য সকলে অঙ্গীকারবদ্ধ হোক। ১৯৩৪-এ রাশিয়া বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দেয়—আর ১৯৩৫-এ ফ্রান্স ও রাশিয়া পরস্পরের সাহায্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হ'ল। এই চুক্তিতে যোগ দেবার প্রস্তাব জার্মানিই অস্বীকার করেছে। ফ্রান্স ও রাশিয়া উভয়েই চেকো-শ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করবার কথা দিয়েছে এবং সেইজন্যই হিট্লার এ-দেশ অধিকার করতে ইতস্ততঃ করছেন। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ বিকল হয়ে পড়াতে সোভিয়েট্ রাশিয়া স্পেন ও চীনে ফাশিস্ট্-প্রগতি আটকাবার জন্য সাহায্য পাঠিয়েছে। জগদ্ব্যাপী ফাশিস্ট্-বিরোধী আন্দোলন গড়ে' তোলাই এখন সাম্যবাদীদের প্রধান লক্ষ্য। ফাশিজ্মের অগ্রগতি আটকাতে পারলে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলে তার পতন হবে এই বিশ্বাস সাম্যবাদের মজ্জাগত। পৃথিবীর সকল দেশের সাম্যবাদীদের উপস্থিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হ'ল ১৯৩৫-এ কমিন্টার্ণের অধিবেশনে। এই সভায় ডিমিট্রভ্ ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট্ অথবা একত্রীভূত দলসমষ্টির আদর্শ প্রচার করলেন। প্ল্যানিং-এর মতন এ-কথাটিও আজ সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে অথচ এর প্রকৃত স্বরূপ সর্ব্বদা মনে রাখা হয় না। সম্মিলিত গণশক্তি গঠনের একমাত্র আদর্শ ফাশিজ্মের প্রতিরোধ; ফাশিস্ট্ আমলের চাইতে গণতন্ত্রে শ্রমিকদের সুবিধা, এই জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষার চেষ্টা এই কর্ম্মপদ্ধতিতে স্থান পায়। শ্রমিকদের মধ্যে গৃহবিবাদ-বর্জনই সাধারণ শত্রুকে আটকাবার উপায়; তাই সোশ্যাল্ ডেমক্রাট্দের সঙ্গে অযথা কলহের অবসান এখন বিধেয়, কিন্তু তাই বলে' সাম্যবাদীদলের পৃথক অস্তিত্বের কোথাও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত হয় নি। সাময়িক কারণে উদার মতবাদীদের সঙ্গেও এখন সহযোগীতা আবশ্যক ও সম্ভব এই বিশ্বাসও ইউনাইটেড্ ফ্রণ্টের উদ্ভাবনার কারণ। ফ্রান্সে ও স্পেনে পপুলার ফ্রণ্ট্ গঠন নূতন পদ্ধতির প্রধান সাফল্যের নিদর্শন।

নারী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বাতন্ত্র্য স্পর্ধায় মত্ত পুরুষেরে করিবারে বশ
যে-আনন্দ রস
রূপ ধরেছিল রমণীতে,
ধরণীর ধমনীতে
তুলেছিল চাঞ্চল্যের দোল,
মদির হিল্লোল,
তাহারি সংকল্পচ্ছবি বিধাতার মনে
আছে তাঁর তপস্যার সংগোপনে।
সেই আদি ধ্যান-মূর্তিটিরে
সন্ধান করিছে ফিরে ফিরে
রূপকার।
পলাতকা লাবণ্য তাহার,
বাঁধিবারে চেয়েছে সে আপন সৃষ্টিতে
প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে।
দুর্বাধ্য প্রস্তরপিণ্ডে দুঃসাধ্য সাধনা
সিংহাসন করেছে রচনা
অধরাকে করিতে আপন
চিরন্তন।
সংসারের ব্যবহারে যত লজ্জা ভয়
সংকোচ সংশয়,—
বচনের ঘের,
ব্যবধান বিধি বিধানের
সকলি করিয়া দূর
ভোগের অতীত মূল সুর
নগ্নতা করেছে শুচি;
দিয়ে তারে ভুবনমোহন শুভ্ররুচি।

পুরুষের অনন্ত বেদন
মর্ত্তের রূপের মাঝে স্বর্গের সুধারে অন্বেষণ,—
তারি চিহ্ন যেখানে-সেখানে,
কাব্যে গানে,
ছবিতে মূর্তিতে,
দেবালয়ে দেবীর স্তুতিতে।
কালে কালে দেশে দেশে শিল্পস্বপ্নে দেখে রূপখানি,
নাহি তাহে প্রত্যহের গ্লানি ;
দুর্বলতা নাহি তাহে, নাহি ক্লান্তি
টানি' লয়ে বিশ্বের সকল কান্তি,
যেন সর্ব পুরুষের নির্বাসিত মন
রূপ আর অরূপের ঘটায় মিলন।
মনে পড়ে যেন কবে ছিল অন্যলোকে.
অপূর্ব আলোকে।
তারি ছবি আনে ধ্যানে ধরি'
সেথায় যে ছিল তার চিরসহচরী।

মুদ্রারাক্ষস

বিষ্ণু দে

আমাকে আজ বিদায় দাও ভাই।
ঢুকেছে কৌটিল্য পাশ ঘেঁষা
মারণাচারে ইষ্টঅন্বেষা।
মেনেছি হার, তুলেছি দেখ হাই।
ঘরের খেয়ে রাজনীতি কি পেশা?

মার্কস্ ন্যা মথি শুনেছি নাকি বলে,
কল্কি যবে বৃহন্নলাবেশে
চালাবে রথ, মাড়াবে দলে দলে,

শুনবি তাতে ইতিহাসেরই হ্রেষা।
তাইতো ভুলে রাজনীতিকে পেশা।

কুহকী আশা, হারাই ভাষা, ছলা
কতই তার, সে চিরচঞ্চলা!
অর্থ যে রে অনর্থেই মেশা!
ধর্না দেওয়া আশ্রিতের পেশা!
রেষারেষিতে ইতিহাসের নেশা।

ছুটল বুঝি, ফুটল ত্রিলোচন।
মন্ত্রী খুঁজে তবু বেড়াস্ মন?
নানামুনির নানাদলের বন
হায়েনা আর শিবার দলে ঠাসা
সেখানে কিবা অমাত্যের পেশা?

যেখানে যাই মৌরসী পাট্টা রে!
নগরপাল হবার চাল নেই।
ধারে তো নয়, আশ্রিতের ভারে
রাজন্যেরা গুপ্তচরে মেশা।
বিদ্যাদানও বংশগত পেশা।

তোমাতে, মাগো, ইষ্ট খুঁজি তাই,
নির্বিকার সোহমে যাবে মেশা।
নির্বিচারে হৃদয়ে ঢালো নেশা
বাহুতে তুমি শক্তি মাগো তাই
ছেড়েছি আজ গণেশ ঘেঁষা পেশা।

একান্নটি প্রণাম করে' যাই,
আমাকে আজ বিদায় দাও ভাই।

ফুটপাথে

জীবনানন্দ দাশ

অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে ;
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মত এই যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ
অনুভব করে হাঁটছি আমি।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে,—কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস ;
কোন্ দূর সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকীর কথা মনে পড়ে আমার,—
তারা কোথায় ?
তারা কি হারিয়ে গেছে ?
পায়ের তলে লিক্‌লিকে ট্রামের লাইন,—মাথার ওপরে
অসংখ্য জটিল তারের জাল
শাসন করছে আমাকে।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস ;
এই ঠাণ্ডা বাতাসের মুখে এই কলকাতার শহরে এই গভীর রাতে কোনো
নীল শিরার বাসাকে কাঁপতে দেখবে না তুমি ;
জলপাইয়ের পল্লবে ঘুম ভেঙে গেল বলে কোনো ঘুঘু তার কোমল নীলাভ
ভাঙা ঘুমের আস্বাদ তোমাকে জানাতে আসবে না।
হলুদ পেঁপের পাতাকে একটা আচম্‌কা পাখী বলে ভুল হবে না তোমার,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে চোখ নিবিড় হয়ে উঠবে না তোমার !
পেঁচা তার ধূসর পাখা আমলকীর ঠালে ঘষবে না এখানে,
আমলকীর শাখা থেকে নীল শিশির ঝ'রে পড়বে না,
তার স্থর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকীর মত খসিয়ে আনবে না এখানে,
রাত্রিকে নীলাভতম করে তুলবে না !
সবুজ ঘাসের ভিতর অসংখ্য দেয়ালি পোকা ম'রে র'য়েছে দেখতে
পাবে না তুমি এখানে,

পৃথিবীকে মৃত সবুজ সুন্দর কোমল একটি দেয়ালি পোকার
মত মনে হবে না তোমার,
জীবনকে মৃত সবুজ সুন্দর শীতল একটি দেয়ালি পোকার মত মনে হবে না ;
পেঁচার সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকীর মত খসিয়ে আনবে না এখানে,
শিশিরের সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকীর মত খসিয়ে আনবে না,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে চোখ নিবিড় হয়ে উঠবে না তোমার।

অনাবশ্যক

হেমচন্দ্র বাগচী

সে কা'রো প্রয়োজনে লাগ্‌ল না,
কাজের উত্তাপ যেখানে, যেখানে সদাচঞ্চলতার আবর্ত্ত,
সেখানে তা'র প্রবেশের অধিকার রইল না—
তা'র ললাটে লেখা রইল, সে অনাবশ্যক !

ভারি একটা মজা হ'ল তারপর,
যে অবাধপ্রসারিত বিধাতার জগৎ প্রাণহিল্লোলে স্পন্দমান
যেখানে পিঁপ্‌ড়েরা সারি বেঁধে যায় বনতলের অন্ধকারে,
যেখানে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পাখীর একতানধ্বনি
সেই অলখলোকে তা'র মনের চল্‌তে লাগ্‌ল লীলা।

সেখানে ঝিঙেফুল ফুটে থাকে—বৃষ্টিতে ভেজা হল্‌দে ঝিঙে ফুল,
কোনো অজ্ঞাতনামা পতঙ্গের দংশনপীড়ায় পাতাগুলি ক্ষত বিক্ষত
ভিজে মাটির উপরে লাফ দিয়ে আগিয়ে চলে সবুজ গঙ্গাফড়িং
তা'র চোখের ঔজ্জ্বল্যে আছে বিদ্যুতের বেগ, গতিতে নিঃসঙ্কোচ দ্রুততা,
মনের অন্ধকার রহস্যময় মণিকোঠার মত ছায়াচ্ছন্ন বাঁশের বন,
আর সেখানে বর্ষার নদী, মধ্যাহ্নের অগাধ ক্লান্তিতে উদাস,
সেই অলখলোকে তা'র মনের চল্‌তে লাগ্‌ল লীলা।

মনের মাঝখানে কোথাও কি আছে কোনো মহাদেশ
যেখানকার সীমাহীন স্পন্দন এসে লাগে বাইরের জগতে—
তা'র সমস্ত বেদনা কি সেই অলক্ষিত দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত ?
সে কি সেই দূরভিসারী কলশ্বাস—
চিরপরিচিত সাধারণ জগতে যা'র তৃপ্তি হ'ল না !
বিধাতা তা'কে দিলেন নির্ব্বাসন তা'র মনের মধ্যে—
একাকীত্বের এই দুঃসহ ভার তা'র কাছে বোঝা হ'য়ে রইল না !

একদিকে তা'র প্রাণহিল্লোলে স্পন্দমান অবাধপ্রসারিত জগৎ—
আর একদিকে সন্ধ্যার প্রচ্ছন্ন অন্ধকারে
দু'টি ঘনপক্ষ্ম আঁখির অতলস্পর্শী মৌনতা
এই তার সারাজীবনের পাথেয়।

বিরোধ

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নিরাপদ এই নীড়ে বাঁধ্‌লাম নিজেকে
জানালায় নীল আকাশ দিলাম টানিয়ে,
মনের ঘোড়াকে ঘরের দেয়াল ডিঙিয়ে
চিনিয়ে দিলাম সীমানাহীনের ঠিকানা।

সুবাসিত তেল কেশারণ্যের গভীরে
স্নান চলে বেশ নিরীহ টবের জলেতে—
শুক্‌নো ডাঙায় নির্ভয়ে দিই মনকে
অতলান্তিক সাগরে সাঁতার কাটতে।

শাদা ডিশ্‌টায় স্বাদু হরিণের মাংস,
মনের হরিণ সোনা হ'লো কার নয়নে ?
নরম চটির গুহায় গোপন পা দুটি
নিয়েছে কখন্‌ যাযাবরদের সঙ্গ !

পুরু বিছানায় ডেকেছি ফ্যানের হাওয়াকে
নীল আলোটায় নীলিমার নীল স্বপ্ন
হৃদয়ে উধাও বোশেখি ঝড়ের ঝাপ্‌টা,
কালো কুয়াশায় দিগ্বধূ কূল হারালো।

কখনো আবার মেরুযাত্রার কাহিনী
টেনে নেয় মন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে—
এখুনি বিরল বলয়ের ক্ষীণ শব্দে
দুঃসাহসিক স্বপ্নে পড়বে ছেদ কি?

ঈশ্বর, এই শরীর মনের দ্বন্দ্বে
একি নিষ্ঠুর নীরব গ্রহণ ক'রেছো?
যেখানে ভাবনা তোমারে সৃষ্টি ক'রেছে
দৃষ্টি সেখানে দাঁড়ালো প্রতিদ্বন্দ্বী।

ব্যাঙ্‌

বুদ্ধদেব বসু

বর্ষায় ব্যাঙের ফুর্তি। বৃষ্টি শেষ, আকাশ নির্বাক;
উচ্চকিত ঐক্যতানে শোনা গেলো ব্যাঙেদের ডাক।

আদিম উল্লাসে বাজে উন্মুক্ত কণ্ঠের উচ্চস্বর,
আজ কোনো ভয় নাই—বিচ্ছেদের, ক্ষুধার, মৃত্যুর।

ঘাস হ'লো ঘন মেঘ; স্বচ্ছ জল জ'মে আছে মাঠে
উদ্ধত আনন্দগানে উৎসবের দ্বিপ্রহর কাটে।

স্পর্শময় বর্ষা এলো; কী মসৃণ তরুণ কর্দম!
স্ফীতকণ্ঠ, বীতস্কন্ধ—সংগীতের শরীরী সপ্তম।

আহা কী চিক্কণ কান্তি মেঘস্নিগ্ধ হলুদে-সবুজে!
কাচস্বচ্ছ ঊর্ধ্বদৃষ্টি চক্ষু যেন ঈশ্বরেরে খোঁজে

ধ্যানমগ্ন ঋষি-সম।　বৃষ্টি শেষ, বেলা প'ড়ে আসে,
গম্ভীর বন্দনাগান বেজে ওঠে স্তম্ভিত আকাশে।

উচ্চকিত উচ্চস্বর ক্ষীণ হ'লো ; দিন মরে ধুঁকে ;
অন্ধকার শতচ্ছিদ্র একচ্ছন্দা তন্দ্রা-আনা ডাকে।

মধ্যরাত্রে রুদ্ধদ্বার আমরা আরামে শয্যাশায়ী,
স্তব্ধ পৃথিবীতে শুধু শোনা যায় একাকী উৎসাহী

একটি অক্লান্ত সুর ; নিগূঢ় মন্ত্রের শেষ শ্লোক
নিঃসঙ্গ ব্যাঙের কণ্ঠে উৎসারিত—ক্রোক, ক্রোক, ক্রোক।

বাংলার কাব্য

হুমায়ুন কবির

বাংলা কবিতার দেশ। একমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্যই বাঙালীকে কবি করে নি—তার কাব্যপ্রতিভার মূলে মননরীতির বৈশিষ্ট্যও সমানই পরিস্ফুট। বাংলার আকাশে যাঁরা নিদাঘ রৌদ্রের নিষ্ঠুর দীপ্তি দেখেছেন, আষাঢ়ের ঘনবর্ষার মেঘসম্ভারের মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও মহিমা এবং শ্রাবণের রাত্রিদিনহীন অবিরাম বর্ষণ-ধারার সঙ্গীতে হৃদয়াবেগের প্রতিচ্ছবি পেয়েছেন—তাঁরা জানেন যে বাঙালীর কবিমানসের উৎস কোথায়। শরতের নীলাকাশে কূলে কূলে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে, কাশের শ্বেতহাসিতে নদীকূল ভরে ওঠে, হেমন্তের পরিপূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও দ্বন্দ্বের নিরসন মেলে। শীতার্ত্ত কুহেলী রাত্রির অবগুণ্ঠিত, মায়াজালে নিদ্রিত ধরণীর যে জড়িমা, মানুষের আশা ও নিরাশার অঙ্কুর তারই মধ্যে প্রথম প্রকাশিত, বসন্তের বাতাসে নতুন উন্মাদনার সঙ্গে নবীন জীবনের সঞ্চার তারই মধ্যে নিহিত। ছয়টি ঋতুর এ বিচিত্র খেলা, প্রকৃতির চঞ্চল পরিবর্ত্তনশীল সৌন্দর্য্যের সে ঐশ্বর্য্য যে বাঙালীর মনকে কাব্যজগতে আকর্ষণ করেছে, তাতে বিচিত্র কি ?

কেবলমাত্র ঋতুর লীলা বলে নয়—বাংলার নৈসর্গিক সংগঠনের বৈচিত্র্য কম নয়। সমুদ্রমেখলা সোনার বাংলা, মাথায় তার হিমালয়ের কিরীট, আকটিকণ্ঠ-জড়ানো গঙ্গা-পদ্মা-যমুনা-মেঘনার তার মালা। পশ্চিম বাংলার শালবন আর কাঁকরের পথ—দিগন্তে প্রান্তর দৃষ্টিসীমার বাইরে মিলিয়ে আসে। শীর্ণ জলধারার গভীর রেখা কেটে দীর্ঘ সংখ্যাহীন স্রোতস্বিনী। বাতাসে তীব্রতার আভাস, তপ্ত রৌদ্রে কাঠিন্য, দিনের তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট দীপ্তির পর অকস্মাৎ সন্ধ্যার মায়াবী অন্ধকারে সমস্ত মিলিয়ে যায়। রাত্রিদিনের অনন্ত অন্তরাল মনের দিগন্তে নতুন জগতের ইঙ্গিত নিয়ে আসে, তপ্ত রৌদ্রালোকে মূর্চ্ছাহত ধরণী অন্তরকে উদাস করে তোলে। পশ্চিম বাংলার প্রকৃতি তাই বাংলার কবিমানসকে যে রূপ দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্যের আভাস, অনির্ব্বচনীয়ের আস্বাদে অন্তর সেখানে উন্মুখ ও প্রত্যাশী, জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণ।

পূর্ব্ব বাংলার নিসর্গ হৃদয়কে ভাবুক করেছে বটে কিন্তু উদাসী করে নি। দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের অভাব সেখানেও নেই, কিন্তু সে প্রান্তরে রয়েছে অহোরাত্রি জীবনের চঞ্চল লীলা। পদ্মা-যমুনা-মেঘনার অবিরাম স্রোতধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংস, প্রকৃতির বিপুল শক্তি নিয়তই উদ্যত হয়ে রয়েছে, কখন আঘাত করবে তার ঠিকানা নেই। কূলে কূলে জল ভরে উঠে, সোনার ধানে পৃথিবী ঐশ্বর্য্যময়ী আর সেই জীবন এবং মরণের অনন্ত দোলার মধ্যে সংগ্রামশীল মানুষ। প্রকৃতির সে ঔদার্য্য, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সেই সংহত শক্তি ভোলার অবসর কই? চরের মানুষ জলের সাথে লড়াই করে, জলের ঐশ্বর্য্যকে লুটে জীবনের উপাদান আনে। তাই লোকাতীতের মহত্ত্ব হৃদয়কে সেখানেও স্পর্শ করে, কিন্তু মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেই তার পরিসমাপ্তি, প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণের সেখানে অবকাশ কই?

বাংলার কাব্যের যে দুইটী ধারা, মননরীতি ও প্রকাশভঙ্গির যে দুইটী রূপ, বাংলার নিসর্গগঠনের বৈচিত্র্যের মধ্যে তার খানিকটা পরিচয় মেলে। কিন্তু কেবলমাত্র নিসর্গগঠন দিয়েই সে বৈচিত্র্যকে পরিপূর্ণভাবে বোঝা যায় না। বাঙালীর জাতিগত ইতিহাসের মধ্যেও তার অঙ্কুরের সন্ধান রয়েছে, সে কথা ভুললে চলবে না। ঐতিহাসিক গবেষণার সময় নেই, এবং সে গবেষণার যোগ্যতাও আমার নেই। কিন্তু একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে ভারতবর্ষের কোন দেশেই বাংলার মতন রক্তের মিশ্রণ হয় নি। বাংলার আদিম অধিবাসী হয়তো নিগ্রয়েড্, কিন্তু অতি পুরাতন কাল থেকেই তার মধ্যে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় রক্ত মিশেছে। মঙ্গোলীয় মনোবৃত্তির যে অহিংস্রতা সকলেই লক্ষ্য করেছেন, বাঙালীর স্বভাবে তারও পরিচয় মেলে, কিন্তু তারই সঙ্গে মিশেছে অবিকশিত মনোবৃত্তির আকস্মিক উত্তেজনা। দ্রাবিড় রক্ত বাংলার কাব্য, সাহিত্য ও সভ্যতায় কি দান এনেছে, সে কথা বলা কঠিন; হয়তো গোষ্ঠিপ্রীতি দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণেরই ফল। তারপর এসেছে আর্য্য, কিন্তু বারে বারে আর্য্য আক্রমণ ও বিজয় সত্ত্বেও আর্য্যরক্তের অংশ বাঙালীর মধ্যে অল্প। নিসর্গপ্রীতি আর্য্যমানসের অঙ্গ, সংগ্রামশীলতা এবং আত্মপ্রত্যয় তার স্বভাব। বাংলার কাব্যলোকে যে নিসর্গপ্রীতি, প্রকৃতির প্রকাশের মধ্যে লোকাতীতের যে সন্ধান, তাকে আর্য্যরক্তের দান মনে করলে বোধ হয় অন্যায় হবেনা। ইতিহাসের আরম্ভ থেকে মোগল রাজত্বের প্রায় অবসান পর্য্যন্ত বারে বারে যে আর্য্য আক্রমণ, বাংলার কাব্যসৃষ্টিতে তার প্রভাব কম নয়। নানান দিক

থেকে বাংলার মানসকে সংসারমুখী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে বাংলা কাব্যসাহিত্যের অপরূপ বিকাশে তা সহায়তা করেছে।

ধর্ম্মের বিপ্লবের মধ্যেও বাংলার কাব্যরূপ নতুন নতুন উপাদান পেয়েছে। বৌদ্ধবিপ্লব বাংলা দেশে যে ভাবে জাতির মজ্জাগত হয়ে উঠেছিল, আর কোথাও বোধ হয় তার নিদর্শন মেলেনা। পূর্ব্ব বাংলায় সে মনোবৃত্তি কেন বেশী ছড়িয়েছিল, তাও সহজেই বোঝা যায়। প্রকৃতির শক্তির উদ্যত আঘাতের সম্মুখে সংগ্রামশীল মন, নদীপ্রবাহের ভাঙ্গাগড়ায় গৃহসৃষ্টির ব্যর্থতাবোধ এবং মঙ্গোলীয় রক্তের অহিংস্রতা মিলে পূর্ব্ব বাংলাকে বৌদ্ধমানসের উপযোগী ক্ষেত্র করে রেখেছিল। পশ্চিম বাংলায় স্থিরতা বেশী, রাজশক্তির প্রভাবও সেখানে অধিকতর কার্য্যকরী, তাই বৌদ্ধযুগের অবসানে যেদিন হিন্দু অভ্যুত্থানে বৌদ্ধমানসকে ধ্বংস করবার চেষ্টা প্রবল হয়ে উঠে, প্রাক্তন মজ্জাগত জাতিবিচারের পূর্ব্বস্মৃতির মধ্যে পশ্চিম বাংলায় তা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ভঙ্গুর, বিপ্লবী, পরিবর্ত্তনশীল পূর্ব্ব বাংলায় জাতিসৃষ্টির প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে নি। তাই হিন্দু অভ্যুত্থানের বিজয়ের দিনে, কৌলীন্য ও জাতিবিচারের প্রাবল্যের মধ্যেও পূর্ব্ব বাংলায় বৌদ্ধ মনোবৃত্তির অহিংস্রতা ও সাম্য প্রচ্ছন্ন হয়ে বেঁচে ছিল; মোস্‌লেম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আত্মপ্রকাশ করে পূর্ব্ব বাংলার ধর্ম্মীয় রূপ বদলে দেয়।

বাংলার বৌদ্ধবিপ্লব উত্তর ভারতীয় আর্য্যসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিল, সেই বিদ্রোহের মধ্যে পেয়েছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেরণা। তার ফলে সংস্কৃতের হ'ল পরাজয়, প্রাকৃত ও দেশভাষার দিকে পড়ল ঝোঁক। ভারতের বিভিন্ন ভাষার সূত্রপাত তারই মধ্যে, বাংলা ভাষারও গোড়াপত্তন সেইখানে। হিন্দু অভ্যুত্থানের প্রাবল্যের যুগে কালপ্রবাহকে ফেরাবার চেষ্টা হয়েছিল, সংস্কৃতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে বাংলার মানসকে সংস্কৃতের মধ্য দিয়ে প্রকাশের চেষ্টাও প্রবলতর হ'ল, কিন্তু বিপ্লবী পূর্ব্ববাংলায় বৌদ্ধমানস জনসাধারণের অবচেতনার মধ্যে মজ্জাগত, সেই প্রচ্ছন্ন চিত্তসংগঠন বদলাতে হলে যতখানি সময়, যতখানি সুবিধা এবং সুযোগের প্রয়োজন, বাংলার হিন্দু অভ্যুত্থান তা পায় নি। তাই মোস্‌লেম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার সংস্কৃতভাষাকে প্রতিষ্ঠার সে চেষ্টা পরাজিত হ'ল। বাঙালীর চিত্তও মুক্তি পেল। তাই বাংলার কাব্যসৃষ্টির প্রথম প্রকাশ বৌদ্ধ দোঁহায়, তারই মধ্যে উত্তরভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বাঙালীর বিদ্রোহ আপনাকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করল।

সে যুগের বাংলা কাব্যের প্রেরণা ধর্ম্মের মধ্যে। পশ্চিম বাংলার নিসর্গের স্থিরতা এবং দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরের ইঙ্গিতের কথা আগেই বলেছি। সংসারকে অতিক্রম করে লোকাতীতের দিকে হৃদয় আকর্ষণ করা তার স্বভাব। বাংলার প্রথম কাব্যপ্রচেষ্টা তাই লোকাতীতের জন্য মানুষের যে সাধনা, তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে। বাংলার মাটীতে বৈষ্ণব কবিতার সে আবির্ভাব বিস্ময়কর। কিন্তু তাকে আকস্মিক মনে করা চলে না। বৌদ্ধবিপ্লব বৌদ্ধ দোঁহা ও গানের মধ্যে বাংলার মানসকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছে, তা আমরা দেখেছি, সে চেষ্টা পূর্ব্ব বাংলার মতন পশ্চিম বাংলায় অতখানি সার্থক না হলেও তার প্রভাব জাতির অবচেতনার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। ইসলামের সাম্যবাদ যখন এসে বাঙালীর মনকে আহ্বান করল, প্রথম মোস্‌লেম রাজ্য গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখন অবনমিত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমনোবৃত্তি আবার আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়ে জেগে উঠ্‌ল। পশ্চিম বাংলায় সে বৌদ্ধবিপ্লবের শক্তি অপেক্ষাকৃত কম ছিল বলে হিন্দুসমাজের সংগঠন তাতে ভাঙ্গল না, অথচ হিন্দু সমাজমানস তাতে সাড়া না দিয়েও থাকতে পারল না। ইসলামের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার আহ্বান এবং পশ্চিম বাংলার নিসর্গসংগঠনের মধ্যে ব্যক্তির দিগন্তকে অতিক্রম করে অনন্তের মধ্যে আত্মবিস্মরণ—এই দুই বিরুদ্ধ ভাবপ্লাবনের যে সংঘর্ষ, তারই ফলে বাঙালীর মন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠ্‌ল। পশ্চিম বাংলায় সেদিন বৈষ্ণব কবিতার যে বিকাশ দেখা দিল, পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে তার স্থান বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে লোকাতীতের মিলন। সীমার মধ্যে অসীমের সন্ধানের আকুতিতে তাই বৈষ্ণব কবিতা প্রাণবন্ত; যে ঐশ্বর্য্য বাঙালীর মানসে সেদিন জমে উঠেছিল, তারই অভিব্যক্তির পরাকাষ্ঠা চণ্ডীদাস। সে যুগের বৈষ্ণব কবিতার বিস্তারিত আলোচনার স্থান আজ এখানে নেই, কেবলমাত্র বৈষ্ণব কাব্যবিকাশের ঐশ্বর্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করেই আমার কাজ শেষ। তারই মধ্যে মিলনে বিরহে রাগ-অভিমানে বাঙালীর চিত্ত সুখদুঃখ-উদ্বেল হয়ে উঠেছিল; জাতির সমাজস্মৃতির মধ্যে আজও তার পরিচয় প্রতিপদে সুস্পষ্ট।

ধর্ম্মের প্রভাব বাঙালীর কাব্যে চিরদিন প্রবল, বৈষ্ণব কাব্যে রয়েছে তার গীতিমুখর ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রকাশ। সে প্রকাশ প্রতি পদে ব্যক্তিকে অতিক্রম করে গেলেও তাই সাধারণ মানুষ তার বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজের হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি দেখে, আপনার দুঃখসুখের বিচিত্র লীলার সন্ধান পায়। ধর্ম্মের সামাজিক প্রকাশ রূপ নিয়েছিল রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদের মধ্যে। ইংরাজি সাহিত্যের যাঁরা ছাত্র, তাঁরা জানেন যে কি ভাবে ইংরেজের মানস বাইবেলকে

কেন্দ্র করে ইংরেজের গদ্য সাহিত্য, ইংরেজের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভঙ্গিতে সৃষ্টি করে তুলেছিল। বারে বারে তাই বাইবেলের অনুবাদ হয়েছে, বারে বারে চেষ্টা হয়েছে যে তার শিক্ষা, তার সংস্কৃতি, তার সম্পদ ইংরেজের মানসসংগঠনের অঙ্গীভূত হয়ে যাক। মোস্‌লেম রাজত্বের প্রারম্ভে বাংলা দেশেও হয়েছিল তাই। একদিকে পাঠান সুলতান বাংলাকেই স্বদেশ করে তার চিত্ত জয় করতে উন্মুখ, অন্যদিকে সেদিনকার হিন্দু চিন্তানায়ক ইসলামের বিপুল সংহতিশক্তির আঘাতের সম্মুখে হিন্দুসমাজকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ব্যস্ত। তাই মুসলমান রাজা সেদিন চেয়েছেন যে বাংলার হিন্দুর মনোজগতের পরিচয় চাই, অন্যদিকে হিন্দুনায়কের চেষ্টা যে জনসাধারণ যেন আত্মবিস্মৃতির দরুণ যখন তখন আত্মপরিচয়ের অভাবে ইস্‌লামের বিজয়প্লাবনে ভেসে না যায়। এই যুগ্মদাবী মেটাবার জন্যই তাই সেদিন বাংলা মহাভারত-রামায়ণের সৃষ্টি। মোস্‌লেম রাজসভায় তার সুরু, কিন্তু বাংলার বিপুল হিন্দু-সমাজের মধ্যে তার পরিব্যাপ্তি। তাই সেদিন কাশীরাম দাস এবং কৃত্তিবাস ওঝা কেবলমাত্র রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদই করেন নি, বাঙালীমানসের মধ্যে তাদের প্রতিষ্ঠা করে মহাভারতের ও রামায়ণের বাংলা রূপ সৃষ্টি করেছেন।

ধর্ম্মের ব্যক্তিগত ও সামাজিক রূপ তাই বাংলা কাব্যের প্রেরণা যুগিয়েছে, কিন্তু মোস্‌লেম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন দিগন্তও খুলে গেল। মানুষের সাংসারিক দিকের পরিচয় যে বৈষ্ণব কবিতা বা রামায়ণ মহাভারতে নেই, তা নয়, কিন্তু এ সাংসারিক দিক সেখানে গৌণ। সে কাব্যসৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য অনন্তের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে আত্মপ্রতিষ্ঠা, অথবা সামাজিক ধর্ম্মভাবকে সংহত রূপ দান। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সেখানে অবান্তর হলেও গৌণ, গল্পসৃষ্টি ও গল্প উপভোগের প্রেরণা তার মধ্যে নেই। পাঠান সুলতানের কাছে কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের সামাজিক ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার চেয়ে গল্প হিসাবেই মূল্য বেশী, সমাজমানসকে বোঝবার জন্যই তাদের প্রয়োজন। পারশ্য এবং আরব্য সাহিত্যের গল্পসৃষ্টির সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় সজীব ও সজাগ, তাই মোস্‌লেম রাজত্বের সময়েই বাংলা কাব্যে সামাজিক ও সহজ সাংসারিক রূপের প্রথম প্রকাশ। বৌদ্ধ দোঁহার মধ্যেও গল্প আছে, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের মতই সেখানেও গল্পাংশ গৌণ। তাই মোস্‌লেম রাজসভায়ই মানুষকে সাংসারিক রূপ দিয়ে কাব্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা সুরু হ'ল, এবং পূর্ব্ব বাংলায়ই তার প্রথম পরিচয় মেলে।

পূর্ব্ব বাংলায় যে কেন এ ভাবে সাংসারিক অনাধ্যাত্মিক কাব্য আত্মপ্রকাশ করল, তার ইঙ্গিত আমাদের আলোচনার মধ্যেই রয়েছে। পশ্চিম বাংলার নিসর্গের মধ্যে যে লোকাতীতের সদাজাগ্রত ইঙ্গিত, পূর্ব্ব বাংলার প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য ও মহিমা সত্ত্বেও সেখানে তা প্রবল হয়ে উঠতে পারে নি। কারণ নিসর্গের সঙ্গে সংগ্রামশীল মানুষ মুহূর্ত্তের জন্যও নিজের কাজ ভুলে থাকতে পারেনি। বৌদ্ধবিপ্লবে যে সাম্যবাদ পূর্ব্ব বাংলার মজ্জাগত, মোস্‌লেম বিজয়ে তা আরও আত্মবিকাশ ক'রল, এবং সেই সঙ্গে জেগে উঠ্‌ল নতুন আত্মপ্রত্যয়, নতুন ব্যক্তিত্ববোধ এবং স্বাধিকারের জ্ঞান। আরাকানের রাজসভায়ই তাই বাংলার সামাজিক কবিতার পত্তন এবং পরবর্ত্তী যুগে মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের গীতিকার মধ্য দিয়ে কেমন ভাবে তা সমস্ত সমাজসত্ত্বাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, সে সম্বন্ধে আরো আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে। সেই সঙ্গে আরো দেখতে হবে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কাব্যসৃষ্টির যখন মন্দা পড়ে এসেছে, সেই মুহূর্ত্তে কি ভাবে পশ্চিমের সংস্পর্শে বাংলা কাব্যের নবযুগের সূচনা। তার আলোচনা আজ থাক্।

অল-ইণ্ডিয়া রেডিয়োর সৌজন্যে।

রাজনীতি, সংস্কৃতি ও শান্তি

বুদ্ধদেব বসু

অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে কবি কি শিল্পীর পক্ষে রাজনীতির চর্চা অবৈধ। পেশাদার রাজনৈতিকের প্রতি সাহিত্যিকের অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা জগতে সাহিত্যের সূত্রপাত থেকেই পাওয়া যায়। রাজনীতির সঙ্গে কূটবুদ্ধি, গুপ্ত ষড়যন্ত্র, বিবেকহীন আত্মবৃদ্ধি ও পরের সর্বনাশ, এ-সব জিনিসই জড়িত হ'য়ে এসেছে, এবং সেটা অন্যায়ও নয়। শিল্পীর মন যে এতে বিদ্রোহ করবে, সেটাও স্বাভাবিক। সুতরাং, ও-সব ব্যাপার নিকৃষ্টশ্রেণীর হীনবুদ্ধি লোকদের জন্য, এই বিশ্বাসে নির্ভর ক'রে শিল্পীরা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র জগতে বাস ক'রে এসেছেন। রাজনীতির প্রতি শিল্পী-মনের অবজ্ঞামিশ্রিত ঘৃণা আনাতোল ফ্রাঁস অতি সুন্দর প্রকাশ করেছিলেন, যখন তিনি তাঁর এক চরিত্রকে দিয়ে বলিয়েছিলেন, 'I am not so devoid of talent, madam, as to take any interest in politics.'

অবশ্য এরও ব্যতিক্রম দেখা যায়। সমসাময়িক সমাজের তীব্র সমালোচনা ও নতুন মানবসমাজের পরিকল্পনা, উভয়ই সাহিত্যিকের প্রদেশভুক্ত। ল্যাংল্যাণ্ড, টমাস মোর, সুইফ্‌ট্‌, শেলি, উইলিয়ম মরিস (কয়েকজনের মাত্র নাম করলুম)— ইংরিজি সাহিত্যে এঁদের কোনো-কোনো সৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবেই রাজনৈতিক। সুইফ্‌ট্‌ রাজনৈতিক কর্মীও ছিলেন। কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে যাঁরা একেবারেই উদাসীন, সংখ্যা হিসেবে ধরলে তাঁরাই অনেক বেশি। অবশ্য যে-কোনো লেখকই সমাজ-জীবনকে বিশ্লেষণ ও পরোক্ষে শোধন করেছেন, কিন্তু সে-কথা আলাদা। এখানে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সচেতনতার কথা হচ্ছে।

এটাই আমরা দেখতে পাই যে বেশির ভাগ শিল্পী 'জনতার কোলাহলে'র বাইরে স্বতন্ত্র জগতে আত্মআশ্রয়ী। অন্তত খুব সম্প্রতি ইয়োরোপের সমস্ত লেখক যে রকম প্রকাশ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে নেমেছেন, এমন বোধ হয় পৃথিবীতে আগে কখনো দেখা যায়নি। তার কারণ কী? কেন তাঁরা সেই 'স্বতন্ত্র জগত' থেকে

The Mind in Chains (Frederick Muller Ltd., 5/-).
In Letters of Red (Michael Joseph Ltd., 6/-).
An Encyclopædia of Pacifism—Aldous Huxley (Chatto & Windus, 6d.).

বেরিয়ে এসে রাজপথের ভিড়ে ভিড়লেন? তার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা ছাড়া কিছু নয়। কেননা শিল্পীর স্বাধীনতা ও 'স্বতন্ত্র জীবন' আজকের জগতে ঘোরতর বিপদগ্রস্ত। তাঁর সর্বনাশ হয়-হয়। রাজনৈতিক প্রচার-কার্যে না নামলে—ও জয়ী না-হ'লে—তাঁদের অস্তিত্বই বহুযুগের মতো সমূলে উৎপাটিত হ'তে পারে, ইয়োরোপের লেখকরা আজ এটা নিষ্ঠুরভাবেই উপলব্ধি করেছেন। যাতে তাঁরা বেঁচে থাকতে পারেন, এবং সাহিত্যসৃষ্টির অক্ষুণ্ণ অবসর ও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেন, তারই জন্যে তাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা। এবং এ-চেষ্টা শুধু তাঁরা লেখা ও বক্তৃতার দ্বারাই করছেন না; তরুণ ইংরেজ লেখকদের মধ্যে অনেকেই স্পেনে স্বেচ্ছা-সৈন্য হ'য়ে গিয়েছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যে দু'জন নিহত হয়েছেন তা আমরা জানি।

লেখা ও বক্তৃতা—অর্থাৎ প্রোপাগাণ্ডার মূল্যও কম নয়। নিগ্রো অভিনেতা পল রোবসন স্পষ্টই ব'লে দিয়েছেন যে আজকের দিনের শিল্পীকে শুধু শিল্পচর্চা নিয়েই থাকলে চলবে না, জগতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনায় নিজেকে দিতে হবে, নয় তো সমস্ত শিল্প ও সাহিত্যের বিনাশ ধ্রুব। বর্তমান জর্মানি ও ইটালির দিকে তাকালে এ-কথা মোটেই অযৌক্তিক মনে হয় না। ফাশিষ্ট শক্তি আজ জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিশ্রুত শত্রু। মানবজাতিকে আবার বর্বরিত ক'রে তোলাই তার উদ্দেশ্য। আইনষ্টাইন ও ফ্রয়েড থেকে আরম্ভ ক'রে জর্মানির প্রত্যেক মনীষী, প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও শিল্পী আজ বিতাড়িত কি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী। এক নাৎসি 'পণ্ডিত' আবিষ্কার করেছেন যে যীশুখৃষ্ট 'আরিয়ান' ছিলেন, এবং তাঁর জন্ম ফ্র্যাঙ্কফোর্টের কাছে। নাৎসি পাণ্ডিত্য আরো আবিষ্কার করেছে যে আমেরিকা কলম্বসের আবিষ্কার নয়, পেনিং নামীয় এক নর্ডিক মহাপুরুষের। ঐ একই মতে পীতত্বক জাপানিরা আর্যসন্তান। হিটলারের দক্ষিণহস্ত জেনারেল গোয়েরিং স্পষ্টই ব'লে দিয়েছেন, 'Whenever I hear the word culture, I feel for my revolver.' জর্মান ফাশিষ্টদের, আর যা-ই হোক্, স্পষ্টবাদিতা আছে।

সুতরাং, সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁরা আস্থাবান, সংস্কৃতির রক্ষণ ও বিকাশ যাঁরা প্রয়োজন মনে করেন, ফাশিষ্ট বর্বরতাকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট না হ'য়ে তাঁদের আজ উপায় নেই। ইয়োরোপের অনেক লেখক ও মনীষী আজ তাই বাধ্য হ'য়েই বামপন্থী। তাঁরা অনেকেই রাজনৈতিক আবর্ত থেকে দূরে থাকতে পারলেই হয়তো খুসি হতেন, কিন্তু নিরপেক্ষ থাকলে একদিন বেয়নেটের খোঁচায় সাহিত্যিকজীবনের

অবসান হ'তে পারে, এ-কথা স্বীকার করবার সাহস তাঁদের আছে। 'এইজন্য,' তাঁরা বলেন, 'আমরা আজ সংস্কৃতিরক্ষার যুদ্ধে অবতীর্ণ, তাতে আমাদের বিনাশ যদিই বা হয়, জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাঁচবে।'

এ-কথার যাথর্থ্য অস্বীকার করা যায় না। এটা ক্রমশই অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে যে সভ্যজগতের বাসিন্দারা আজ দু'দলে বিভক্ত: ফাশিষ্ট ও সাম্যবাদী। মাঝামাঝি কোনো রাস্তা নেই। আপনি যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তি হন, ও স্বেচ্ছা-অন্ধ না হন তাহ'লে আপনার স্বার্থ ও শিক্ষা অনুসারে দুদিকের একদিকে আপনাকে ঝুঁকতেই হবে। যাঁরা বলেন, কোনোদিকেই তাঁদের ঝোঁক নেই, মনে-মনে তাঁরা ফাশিষ্ট। এর চমৎকার উদাহরণ বর্তমান ইংলণ্ডের শাসক-সম্প্রদায়। 'শক্তির ভারসাম্য' রক্ষার যে-প্রহসন ইংলণ্ড (অর্থাৎ, ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণী) কিছুকাল ধ'রে জগতকে দেখিয়ে আসছে, তাতে একদিকে তার শক্তিহীনতা ও অন্যদিকে তার ফাশিষ্ট ঝোঁকই বেরিয়ে পড়ছে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত উদারপন্থা আজ নপুংসকতারই ছদ্মনাম।

সুখের বিষয়, ইংলণ্ডের শাসক-সম্প্রদায়ই ইংলণ্ড নয়। আজকের এই ধনতন্ত্র-সাম্যবাদের দ্বন্দ্বে ইংলণ্ডের দায়িত্ব বৃহৎ সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই; ইংলণ্ডের উপরেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভরশীল। সুতরাং সে-দেশের মনীষীরা—বিশেষ যাঁদের বয়েস অল্প—তাঁদের বামপন্থিতা পৃথিবীরই ভরসাস্থল। 'The Mind in Chains' বইটির লেখকরা সকলেই সাম্যবাদী। সম্পাদক স্বনামধন্য আধুনিক কবি ডে লুইস। বইটিকে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আধুনিক সংস্কৃতিক জীবনের বিচার বলা যায়। শিক্ষা, সাহিত্য, নীতি, বিজ্ঞান, রেডিও, সিনেমা, নাটক, চিত্রশিল্প ও মনস্তত্ত্ব—প্রত্যেকটি বিষয়েই বিভিন্ন লেখক একটি ক'রে প্রবন্ধ লিখেছেন। সম্পাদক ও লেখকদের বিশ্বাস যে ক্ষীয়মাণ ধনতন্ত্রের অধীনে মানুষের মন শৃঙ্খলিত; সে-শৃঙ্খল সোভিয়েট ইউনিয়নে ভেঙেছে, সমস্ত পৃথিবীতেই ভাঙা দরকার, নয় তো সংস্কৃতির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই যে লক্ষ লক্ষ কর্মী, যারা 'have nothing to lose but their chains and have a world to win,' তাদের সঙ্গে শক্তিযোগ করা ছাড়া কোনোই উপায় নেই। তাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে এ-পর্যন্ত মানুষের মনীষার কোনো সৃষ্টিরই স্বাধীনতা ছিলো না; ইয়োরোপের মধ্যযুগে ধর্মযাজক, ও ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ের পর থেকে বণিক-শাসক মানুষের শিক্ষা শিল্প সাহিত্যের উপর নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য স্বেচ্ছাচারী শাসন চালিয়েছে, স্বীয় স্বার্থহানির সুদূর সম্ভাবনা দেখলেও শিল্পী কি বৈজ্ঞানিককে নির্যাতন

করতে ত্রুটি করেনি। এর কতগুলো খুব মোটা প্রমাণ অবশ্য আমাদের সকলেরই চোখের সামনে আছে। কোপরনিকস ও গ্যালিলিওর কথা ভাবুন। মধ্যযুগের রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতদের শিল্পকলার মস্ত বড়ো মুরুব্বি ব'লে আমাদের ভাবতে শেখানো হয়েছে; কিন্তু, সত্যি কথা কি এটাই নয় যে মাইকেলেঞ্জেলো বাধ্য হ'য়েই ধর্মবিষয়ক মূর্তি গড়েছিলেন, রাফায়েল ম্যাডোনাকে আঁকবার অছিলায় তাঁর অবৈধ শয্যাংশিনীকেই এঁকেছিলেন? বিষয়বস্তু নির্বাচনের স্বাধীনতা ধর্মরাজ কি বণিকরাজ কখনো দিতে পারে না, এবং শাসকসম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী যে-কোনো শিল্প কি শিক্ষাকে লৌহহস্তে নিষ্পেষণ নিছক আত্মরক্ষার জন্যেই তাঁদের করতে হয়। এ-অত্যাচার ধর্মরাজে প্রত্যক্ষ ছিল, বণিকরাজে পরোক্ষ হয়েছে। আপনি যদি এমন কোনো বই লেখেন বা ছবি আঁকেন যার মর্ম শাসকসম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী তবে আজকের দিনে আপনাকে (ইংলণ্ড কি ফ্রান্সের মতো গণতান্ত্রিক দেশে) জেলে পাঠানো হবে না, কি বিষ খাওয়ানো হবে না; কিন্তু আপনার বই কি ছবি মোটেও বিক্রি হবে না। কেন হবে না? শিক্ষা ও প্রোপাগাণ্ডার সমস্ত উপায় শাসকশ্রেণীর করতলগত, তাঁরা জনগণকে বাল্যকাল থেকে এমনভাবে 'তৈরি' করেন যাতে সেইজাতের শিল্পই 'জনপ্রিয়' হ'তে পারে যাতে সমসাময়িক সামাজিক সত্য কিছুমাত্র প্রতিফলিত হয়নি। অর্থাৎ যে-শিল্প মিথ্যা কথা বলে, খোসামোদ করে, দিবাস্বপ্নের অলীক পরিপূর্ণতা আনে, সেই শিল্পই সাধারণ লোক গ্রহণ করে। তার আর একটা খুব বড়ো কারণ আছে। ধনতান্ত্রিক দেশে বেশির ভাগ লোকই অতি কষ্টে নিতান্ত হীন জীবন যাপন করে, ইচ্ছাপূরণ-শিল্পেরই তাই সব চেয়ে বেশি চাহিদা। যে-শিল্প সমসাময়িক সমাজজীবনের সত্য উদ্‌ঘাটন করে তা সাধারণের চোখে অপ্রিয় ও কুৎসিত ঠেকে, এবং শিল্পীরও তাই দুর্দশার সীমা থাকে না। নির্যাতিত অপমানিত এমনকি নিরন্ন লেখক ও শিল্পীর কথা সব দেশে সব সময়েই আমরা শুনতে পাই; তাঁদের ট্র্যাজিডির মূল কথাটা এই। কবির দারিদ্র্য প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়ে গেছে এই কারণেই।

'The Mind in Chains'-এর লেখকদের বিশ্বাস যে শিল্পীর আত্ম-প্রকাশের অক্ষুণ্ণ ও অপরিমিত অধিকার সাম্যবাদী সমাজেই সম্ভব। যতদিন সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্যক্তি প্রভুস্থানীয় ও অন্য সমস্ত লোক জ্ঞানে কি অজ্ঞানে তাঁদের দাস, ততদিন সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র শিল্পের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে অনুধাবন করলে এ-কথাই মনে হয় যে ফিউডল সমাজে প্রত্যক্ষভাবে ও ক্যাপিটালিষ্ট সমাজে পরোক্ষভাবে সমস্ত শিল্পকলা শিক্ষা ও সংস্কৃতি

কয়েকটি কর্তাব্যক্তির স্বার্থ-শাসিত ; এবং পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পের যেটুকু উন্নতি হয়েছে তা হয়েছে কর্তাদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, এবং এই শাসন থেকে মুক্ত হ'তে পারলে তবেই মানবসমাজে সংস্কৃতির বিপুল সম্ভাবনা পূর্ণ হবে। এ-দিক থেকে বার্বারা নিক্সনের নাটক সম্বন্ধে লেখাটি উল্লেখযোগ্য ; খুব অল্প কথায়, এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ইংরিজি নাটকের এই ইতিহাস কয়েকটি গভীর সত্য সম্বন্ধে আমাদের চোখ খুলে দেয়।

এই বই আসল যে-সত্যটি আমাদের বলে, সে-বিষয়ে এ-দেশে আমরা বেশির ভাগ লোকই জন্মান্ধ, কি স্বেচ্ছান্ধ। সে-সত্যটি শুধু এই যে শিল্পকলা জ্ঞান-বিজ্ঞান যা-ই বলুন, সব জিনিসেরই ভিত্তি মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে, সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। আপনি কি বলবেন যে কথাটি এত বেশি সত্য যে তা না বললেও চলে? কিন্তু আমরা ভারতীয়রা এই অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে সচেতন একেবারেই নই। আমরা মনে করি যে শিল্পকলা ইত্যাদি মানুষের 'আধ্যাত্মিক' জীবনের অংশ ; ক্ষুধিত জঠরে 'সত্য শিব সুন্দরে'র পূজাই শিল্পী-জীবনের 'মহৎ আদর্শ' ব'লে ঘোষিত। ছবি কবিতা কি গান 'ঐশ্বরিক' অনুপ্রেরণার ফল, বাস্তব জীবনের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের শিল্পী অনেক উর্ধ্বে, পশুশক্তির চেয়ে অনেক প্রবল 'আধ্যাত্মিক' শক্তি, এ-সব বিশ্বাস আমাদের এখনো আছে। এ একরকমের আত্মবঞ্চনা মাত্র, পতিত, পরাজিত ও চরিত্রহীনের আত্মরতি। আসলে মানবজীবনই সাহিত্য ও শিল্পের বিষয়, সত্য শিব ও সুন্দর নয় ; এবং মানবজীবন অতি ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা গঠিত, তাছাড়া ক্ষুধিত জঠর হত্যা কি আত্মহত্যা ছাড়া আর-কোনো আবেগের উদ্রেক করতে পারে না। শুধু যে শিল্প আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন থেকে উৎসারিত তা নয় ; ছবি, কবিতা কি গান অন্যান্য কারিগরের তৈরি যে-কোনো জিনিসের মতোই পণ্যদ্রব্য ; এবং ইকনমিক্সের নিয়মাধীন। কথাটা শুনতে খারাপ লাগে, কিন্তু বাজার-দরের ওঠা-পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই শিল্পবস্তুর প্রগতি কি অধোগতি দেখা যায়। ভারতবর্ষের লেখক ও শিল্পীদের এ-বিষয়ে এখন সচেতন হবার সময় এসেছে।

অন্য একটি বইতে এরিক গিল্ একটি কথা বলেছেন : সমস্ত আর্ট-ই প্রোপাগাণ্ডা। আমাদের দেশের যাঁরা প্রোপাগাণ্ডা বলতেই আঁৎকে ওঠা কি নাক শিঁটকিয়ে চুপ ক'রে থাকা কর্তব্য মনে করেন, তাঁরা শুনলে মর্মাহত হবেন যে তাঁদের ঐ আঁৎকে ওঠা ও নাক শিঁটকোনোও প্রোপাগাণ্ডারই ফল।

কোনো-না-কোনো জিনিসের স্বপক্ষে কি বিপক্ষে কোনো মন্তব্য না ক'রে কিছু লেখা কি আঁকা অসম্ভব, এরিক গিল্-এর এ কথা অগ্রাহ্য নয়। নির্বাচনে ও সজ্জাতেই আর্ট; এবং সেই নির্বাচনে ও সজ্জাতেই প্রোপাগাণ্ডা ধরা পড়ে। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রোপাগাণ্ডা সচেতন ইচ্ছাপ্রসূত নয়। কিন্তু কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্তই সচেতন ও ইচ্ছাপ্রসূত, যেমন আজকের দিনের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, খবরের কাগজে ও সিনেমায়। ইস্কুল কলেজে আমাদের ইচ্ছে ক'রেই ভুল ইতিহাস, ভুল ভূগোল, ভুল অর্থনীতি, ভুল সাহিত্যসমালোচনা ও জীবনদর্শন শেখানো হয়, খবরের কাগজে আসল খবর অল্পই থাকে, এবং যেটুকু থাকে তাও বিকৃতভাবে, আর সিনেমায় জীবনের যে-ছবি সাধারণত দেখানো হয় তা লক্ষ লক্ষ লোকের মনে আফিমের কাজই করে। এখানেও সেই সমস্যা: বেশির ভাগ খবরের কাগজ, সিনেমা কোম্পানি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালিক তাঁরাই, শাসকশ্রেণীর সঙ্গে যাঁদের স্বার্থ অভিন্ন। উঠতে বসতে, খেতে-শুতে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বহুবিধ প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে এ-কথা যদি বলি যে প্রোপাগাণ্ডা অতি তুচ্ছ ও বাজে জিনিস তাহ'লে এটাই প্রমাণ করা হয় যে নেশার একেবারে তুরীয় অবস্থায় এসে পৌঁচেছি। ঘুম-ভাঙানো, নেশা-ছোটানো বিপরীত প্রোপাগাণ্ডা চালাবার যাঁরা পক্ষপাতী তাঁদের পক্ষে এটুকু নিশ্চয়ই বলবার আছে যে সমগ্র মানবজাতির মহত্তম স্বার্থরক্ষার জন্যই তাঁদের চেষ্টা, সমগ্র মানবজাতির মূল্যে ক্ষুদ্র এক শ্রেণীর স্বার্থবৃদ্ধির জন্য নয়।

'The Mind in Chains'-এ কল্ডর-মার্শল সিনেমা সম্বন্ধে যে মূল্যবান প্রবন্ধটি লিখেছেন, তাতে ধনতান্ত্রিক প্রোপাগাণ্ডার স্বরূপ খুলে দেখানো হয়েছে। বিলেতে স্পেনের যুদ্ধের একটি নিউজ-রীল দেখানো হয়, তাতে গবর্মেণ্ট-দলের কয়েকজন সৈন্য যীশুখৃষ্টের একটি মূর্তিকে গুলি করছে। ক্যামেরা মিথ্যে কথা বলে না, সুতরাং যীশুর মূর্তিকে গুলি তারা নিশ্চয়ই করছিলো। ঐ ছবিটি যত লোক দেখেছিলো তাদের মনে স্পেনের গবর্মেণ্ট-দল সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ ভাব জন্মাবে এটাও স্বাভাবিক। কিন্তু এ-কথা অবশ্য তারা কেউ জানতো না যে ছবিওলা আগে প্রত্যেক সৈন্যকে পাঁচটি ক'রে রৌপ্যমুদ্রা দিয়েছিলো, তবে তারা গুলি ছুঁড়েছিলো, এবং তবেই এই ছবি নেয়া সম্ভব হয়েছিলো। মুখে যাঁরা বলেন, 'আমরা ফাশিষ্টও নই, কমিউনিষ্টও নই, আমরা শুধু নিরপেক্ষ সত্য কথা শোনাচ্ছি', এই সব গুপ্ত কারসাজির আশ্রয় তাঁরাই নিয়ে থাকেন। ক্যামেরাকে দিয়েও মিথ্যে কথা বলানো যায়, অন্তত ভুল কথা তো অনায়াসেই বলানো

যায় ও সর্বদাই বলানো হচ্ছে। এই নিউজ রীলই তার চমৎকার উদাহরণ।

'In Letters of Red' বইটিতে রবর্ট হেরিং এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে নিউজ রীলগুলো আগাগোড়াই ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রোপাগাণ্ডা; তাতে ফ্যাশানের ও সৈন্যদের কুচকাওয়াজই বড্ড বেশি, আজকের দিনের মানুষের সত্যিকারের খবর যেগুলো, সেগুলো প্রায় থাকেই না, কি থাকলেও এমনভাবে থাকে যাতে লোকের মনে তার ছাপ গভীর হ'য়ে না পড়ে।

'In Letters of Red' বইটি বিভিন্ন লেখকের গল্প, কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধের সংগ্রহ। লেখকদের মধ্যে অনেক নামজাদা লোক আছেন। বইয়ের গোড়াতেই Low অঙ্কিত চমৎকার কার্টুনটি থেকে আরম্ভ ক'রে শেষের পাতা পর্যন্ত সবগুলি রচনারই মূল সুর এক। 'The Mind in Chains'-এর মতো আঁটোসাঁটো ও এককেন্দ্রিক না-হ'য়েও এ-বইয়েরও উদ্দেশ্য ফাশিজম্-এর বিরুদ্ধে ও সাম্যবাদের স্বপক্ষে প্রচারকার্য। বিষয়বস্তুর ও সাহিত্যরূপের বিচিত্রতায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে বইটি উপভোগ্য, এদিক থেকে ছুটির দিনে পড়বার মতো বই। যাঁরা প্রোপাগাণ্ডা ও 'আর্ট'কে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এমনকি পরস্পর-বিরোধী সংজ্ঞা ব'লে বিশ্বাস করেন, তাঁরা এ-বই পড়তে-পড়তে এই ভেবে অবাক হবেন যে এ দুয়ের মধ্যে সীমারেখা কোথায়, যদি কোনো সীমারেখা আদৌ থাকে। ডে লুইস-এর 'News Reel' কবিতা প্রোপাগাণ্ডার শেষ কথা, অথচ কবিতাও নিঃসংশয়ে প্রথম শ্রেণীর। অডেন-এর 'Dover' কবিতাটি সম্বন্ধেও সেই কথা। এ-শ্রেণীর রচনায় যা পাবেন আপনার ইচ্ছে হ'লে তাকে প্রোপাগাণ্ডা বলতে পারেন, কিন্তু আধুনিক সামাজিক জীবন সম্বন্ধে সচেতনতা বললেই বোধ হয় ঠিক সত্যটি বলা যায়। এ-সব কবিতা হচ্ছে এডওয়ার্ড অপওয়র্ড-এর ভাষায় 'true to the fundamental realities of today.' অপ্ওয়র্ড 'The Mind in Chains'-এ তাঁর সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে বেশ একটু গোঁড়ামির ভাবেই বলেছেন যে 'no book written at the present time can be "good" unless it is written from a Marxist or near Marxist viewpoint.'। পরে তিনি বিস্তৃতভাবে বুঝিয়েছেন কেন সাম্যবাদী না হ'লে প্রতিভাশালী লেখকও আজকের দিনে ভালো বই লিখতে পারবেন না। এই প্রসঙ্গ জড়িয়ে অন্তহীন তর্ক উঠতে পারে, তার ভিতর

আপাতত যেতে চাইনে। তবে ফলেই যদি গাছের পরিচয়, তবে এটা বলতেই হয় যে আজকের দিনে ইংলণ্ডের বামপন্থী তরুণরাই সব চেয়ে ভালো লিখছেন। লরেন্স মৃত, অল্ডস হক্সলি নিঃশেষিত, বৃদ্ধদের মধ্যে একমাত্র মহাকবি ইয়েট্‌স্‌ই এখনো সজীব মনের পরিচয় দিচ্ছেন, এবং সেটাও নতুন কালের সঙ্গে তাঁর যোগস্থাপনের ফল। এলিয়ট্‌ ও পাউণ্ডকে বাদ দিয়ে ইংরেজি ভাষায় আজ যে-ক'জন উল্লেখযোগ্য লেখক, সকলের মধ্যেই অপ্‌ওয়র্ড-এর উক্তির সমর্থন মিলবে। অডেন, ডে লুইস, কল্ডর-মার্শল প্রভৃতির কবিতায় ও গল্পে নতুন একটা উদ্দীপনা আছে যার তুলনায় বয়স্ক প্রথিতযশাদের রচনা ম্লান ও নিঃসার মনে হয়, তাছাড়া আঙ্গিকের দিক থেকেও তাঁদের অভিনব পরীক্ষাশীলতায় বিস্মিত হ'তে হয়। তবে অপ্‌ওয়র্ড শেষের দিকে বলেছেন যে যাতে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত থেকে আমরা লেখকরা সমস্তটা সময় ও শক্তি অব্যাহতভাবে লেখাতেই দিতে পারি, সেইজন্য আপাতত আমাদের নিজেদের প্রকৃত কাজের, অর্থাৎ লেখার, ক্ষতি ক'রেও শ্রেণীহীন সমাজ গ'ড়ে তোলবার জন্য কাজ করতে হবে। শ্রেণীহীন সমাজে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থাকবে না—সাহিত্যিক তাঁর সমসাময়িক জীবনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন না হ'য়েও তাঁর লেখার কাজেই সমস্তটা মন দিতে পারবেন—আর, তার চেয়ে সুখের জীবন লেখকের পক্ষে আর কী হ'তে পারে? এতে আমরা আমাদের প্রথম প্রস্তাবেই ফিরে এলুম যে শিল্পীর পক্ষে রাজনীতি ব্যাপারটাই বিরক্তিকর, কিন্তু আজ যে তাঁকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে যোগ দিতে হচ্ছে তা অন্য উপায় নেই ব'লে, নিছক আত্ম-রক্ষারই প্রেরণায়।

আত্ম-রক্ষার আর-একটা দিকও আছে। শিল্পী ও লেখক হিসেবে বাঁচবার আগে জীব হিসেবে বাঁচা দরকার। ইয়োরোপে আর-একটি মহাযুদ্ধ অনিবার্য মনে হচ্ছে, এবং আগামী যুদ্ধে স্ত্রীলোক কি শিশু, কবি কি দার্শনিক কারুরই বাঁচবার নিশ্চয়তা নেই। সমস্ত ইয়োরোপে আজ করাল আতঙ্কের ছায়া। এ-অবস্থায়, যাতে যুদ্ধ আর না লাগে, সকলেরই সে-চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু কী অবস্থা হ'লে যুদ্ধ আর লাগবে না? জর্মানি, ইটালি ও জাপানের সাম্রাজ্য-ক্ষুধা প্রশমিত করা হোক্‌, স্পেনে ফ্র্যাঙ্কোর জয় হোক, তবেই সব মিটমাট হবে, অনেকে এ-রকম মত পোষণ করেন। কিন্তু তখন সম্মিলিত ফাশিষ্ট-শক্তির কাছে ইয়োরোপ ও এশিয়ার অন্য সমস্ত দেশকে যে দাসত্ব স্বীকার করতে হবে না, তার বিশ্বাস কী? 'রাগের মার থামে, লোভের মার থামে না'; সাম্রাজ্যক্ষুধিত দেশগুলোকে কিছু টুকরো ছেড়ে দিলেই যে তারা চুপ ক'রে থাকবে, এমন ভরসা

নেই। অন্যপক্ষে, জর্মানি কি ইটালিকে অতিরিক্ত পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠতে ইংলণ্ড কি ফ্রান্স কখনোই দেবে না, চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। জোড়াতালি দিয়ে, রাজনৈতিক 'চাল' মেরে কিছুদিন হয়তো যুদ্ধ থামিয়ে রাখা যাবে, কিন্তু বেশিদিন যাবে না, এটা নিশ্চিত।

ইংলণ্ডে আর-একদল আছেন, যাঁরা অহিংসা দ্বারা পশুশক্তিকে জয় করতে বদ্ধপরিকর। তাঁরা শান্তিধর্মী, বা প্যাসিফিষ্ট। অল্ডস্ হক্সলি মহাশয় তাঁদেরই একজন। তাঁর শেষ উপন্যাস 'Eyless in Gaza'-তেই তাঁর প্যাসিফিজ্‌ম্-এর উপর ঝোঁক দেখা গিয়েছিলো, এবারে একেবারে পুরোদস্তুর প্যাসিফিষ্ট হ'য়ে একটি ছোটোখাটো অবতারের মতো আমাদের সামনে দেখা দিয়েছেন। Peace Pledge Union-এর পক্ষ থেকে সম্প্রতি তিনি একটি 'Encyclopædia of Pacifism' ছ' পেনি মূল্যে প্রণয়ন করেছেন। বইটি প'ড়ে বিমূঢ় হ'য়ে যেতে হয়। প্রথমে ভেবে অবাক লাগে, অল্ডস্ হক্সলির মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কী ক'রে এ-বই লিখলেন। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে তাঁর প্রাক্তন বইগুলি থেকে এ-বইটি বিচ্ছিন্ন নয়। কেননা যদিও তিনি মানবজীবন সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত বিষয়েই কিছু-কিছু বলেছেন, তবু কখনোই মুহূর্তের জন্যও কোনো বিষয়েই মন স্থির করতে পারেন নি। এক ধরণের নীরক্ত অপক্ষপাত এঁর সমস্ত লেখায় বর্তমান—এবং সেই কারণে রচনার সমস্ত চতুরালি সত্ত্বেও তিনি চিন্তাশীল লেখক হিসেবে শেষ পর্যন্ত অতৃপ্তিকর। এই কিছুতেই মন স্থির করতে না-পারার শেষ শূন্যগর্ভ ফল হ'লো প্যাসিফিজম্।

অল্ডস হক্সলির তথা প্যাসিফিষ্টদের মত এই যে জগতের সব লোকই যদি শান্তিব্রত গ্রহণ করে তাহ'লেই আর যুদ্ধ হবে না। যুদ্ধ কয়েকজন রাজনৈতিকদের—আরো বেশি, হাতিয়ার-নির্মাতাদের ষড়যন্ত্রের ফল মাত্র, কোনো দেশেরই জনসাধারণ যুদ্ধ চায় না। সুতরাং যথাসময়ে যদি তারা জীবনপণ ক'রেও অস্ত্রগ্রহণে অস্বীকার করে তবেই প্রবল শাসকশ্রেণীর সমস্ত চক্রান্ত ভণ্ডুল ক'রে জগতে শান্তি স্থাপিত হবে। 'যুদ্ধ আমরা কিছুতেই করবো না', এ-কথা সব লোক মিলে জোর ক'রে একবার বলতে পারলেই হ'লো।

যুদ্ধনিবারণের এমন চমৎকার সহজ উপায়ের কথা শুনে আপনারা নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবেন। অবশ্য শুধুই শান্তিব্রতের প্রচার যথেষ্ট নয়, হক্সলি সে-কথাও মানেন। যুদ্ধের অর্থনৈতিক কারণও আছে। সাম্রাজ্য নিয়েই তো ঝগড়া? সাম্রাজ্য কেন দরকার? মাল বেচতে। তা সমস্ত দেশ ফ্রী ট্রেড করলেই পারে। তাছাড়া,

উপনিবেশগুলির যারা খাস বাসিন্দা, তাদের কথাও ভাবতে হয়। আজকের দিনে তাদের পরাধীন ক'রে রাখা অন্যায়। সুতরাং ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশকে স্বাধীন ক'রে দেয়া হোক্, কিংবা (যদি মনে হয় তারা স্ব-রাজের অযোগ্য) তবে একটি আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষ সমিতির হাতে তাদের শাসনভার দেয়া হোক্। এদিকে শ্রেণী-বিরোধ ব'লে একটি জিনিস আজকালকার জগতে আছে এ-রকম কথা হক্সলি শুনেছেন। সত্যিই তো, শ্রমিকদের এ-ভাবে শোষণ করা বড়ো অন্যায়। তবে তারা কনস্যুমর্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি ক'রে নিজেদের অবস্থার অনেক উন্নতি করতে পারে—ব্রিটেনে ও আয়র্লণ্ডে করেছে। ক্যাপিট্যালিষ্টরা তাঁদের মুনফার একটা মোটা অংশ শ্রমিকদের ছেড়ে দিলেই তো পারেন। কমিউনিজ্‌ম্-এর কোনো দরকার নেই, যদি তাতে বলপ্রয়োগের আশঙ্কা থাকে, কেননা 'violence breeds violence' এবং 'a good result can never be obtained by violent means.' ইংলণ্ডের উদারপন্থী গণতন্ত্রই সব চেয়ে ভালো এবং ধনতন্ত্রকে কিছু-কিছু শোধন ক'রে নিয়ে স্বচ্ছন্দে কাজ চলতে পারে, হক্সলির এই বিশ্বাস বেশ স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধনিবারণের প্রেস্ক্রিপশন্ তাহ'লে (১) ফ্রী ট্রেড ও (২) কনস্যুমর্স কো-অপারেটিভ।

সত্যি বলতে, এই বইটির আগাগোড়া টি, এইচ্ হক্সলির এই প্রচণ্ড পৌত্র কখনো বালকের মতো, কখনো খৃষ্টের মতো কথা বলেছেন। জড়বাদী পিতামহের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে এতদিন গল্পাদি লিখে আজ তিনি বহু পরিশ্রমে এইটে প্রমাণ করেছেন যে যীশু যুদ্ধবিরোধী ছিলেন! চীন ও ভারতের সমস্ত প্রাচীন সম্প্রদায় অহিংসধর্মী ছিলো আবিষ্কার ক'রে তাঁর কী উল্লাস! যে ব্যক্তিকে একদিন তিনি 'mild graminovorous Mahatma' আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই গান্ধির নন্-কো-অপারেশনের প্রশস্তি পদে-পদে। অবশ্য মানুষের মত বদলাবার অধিকার আছে, এবং আন্তরিক বিশ্বাস জন্মালে নির্ভয়ে সেটা ঘোষণা করাও ভালো। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকারই মধ্যে দুর্বল যুক্তি ও আত্ম-প্রতিবাদ প্রতি পৃষ্ঠায়। একটি দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। 'So-called class-war' সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য :

> '. . . the idea of class war is based on conditions which no longer exist. In a world of economic scarcity, the wealth of one group means the poverty of another. But we live in an age of potentially unlimited plenty. There is, therefore, no economic reason for the class struggle.'

শ্রেণী-বিরোধের কোনো অর্থনৈতিক কারণ নেই, এ-কথা বলবার সময় হক্সলি ভুলে

যাচ্ছেন যে তাঁর নিজের স্বীকৃতিতেই পৃথিবীর অপরিমিত সচ্ছলতা এখনো 'potential', সম্ভাবনা মাত্র। সে সম্ভাবনা সার্থক হবে কেমন ক'রে? সে-বিষয়ে প্যাসিফিষ্টদের কোনো গ্রাহ্য নির্দেশ নেই। হক্সলি নিশ্চিন্ত মনে বলেছেন যে আসল কারণটা 'economic' নয়, 'psychological' যথা :

> 'There is, however, a psychological factor. Some men desire power over others. This lust for power is the principal source of evil, and it is essential to combat it by every means, psychological as well as political.'

কিন্তু এই 'lust for power'-এর উৎস কোথায়? শ্রেণী স্বার্থেরই সংরক্ষণে। হক্সলি বলেছেন, শিক্ষা-পদ্ধতি বদলে দিতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাঁদের হাতে, শিক্ষাপদ্ধতিও তাঁদেরই সৃষ্টি, তাঁরা নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার উদ্দেশ্য মনে রেখেই দেশের তরুণদের গঠন করবেন। 'The economic power in the hands of individuals must be limited.' (*Must* কথাটা কি প্যাসিফিষ্টনীতির বিরোধী নয়?) কিন্তু সেটা কেমন ক'রে হ'তে পারে? হক্সলি নিরুত্তর। ব্যক্তিবিশেষের অর্থনৈতিক ক্ষমতা কমানো মানেই কি শ্রেণী-বিরোধ নয়?

এখানে 'In Letters of Red'--এর একজন লেখকের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করতে পারি। 'National Hypnotism' নামক প্রবন্ধে জেফ্রি মাসটন বলছেন :

> 'It (capitalism) changed that world of scarcity into a world of abundance. It solved the problem of production. . . . It created abundance. And then, when confronted with the task of distributing that abundance equitably and efficiently it failed. It was inevitable that it should fail.

খুব পরিষ্কার কথা। ধনতন্ত্র উৎপাদনের সমস্যার সমাধান করেছে, কিন্তু সঙ্গত বিতরণের ব্যবস্থা তার পক্ষে অসম্ভব। দয়া, দাক্ষিণ্য কি সমবায় সমিতি দ্বারা বিতরণের ব্যবস্থা হবে না। তার জন্যেই সাম্যবাদের প্রয়োগ দরকার। ধনিকরা যদি আজ হক্সলির নির্দেশমতো তাঁদের মুনফার অংশ ছেড়ে-ছেড়ে দিতে থাকেন তাহ'লে তাঁদের ধনিকত্বই আর বজায় থাকবে না। নিজেদের অস্তিত্বের স্বেচ্ছায় অবসান করতে রাজি হবার কোনোই জীবতাত্ত্বিক কি মনস্তাত্ত্বিক কারণ নেই।

বরং, আসন্ন সর্বনাশের মুখে টিঁকে থাকবার তাঁদের যে শেষ ভয়াবহ চেষ্টা তারই নাম ফাশিজ্‌ম্‌।

ধনতন্ত্র পৃথিবীতে যে অপরিমিত সচ্ছলতার সৃষ্টি করেছে তা বাস্তবিকই অভূতপূর্ব। এখন সেই সচ্ছলতা যাতে সকলেই সঙ্গতভাবে ভোগ করতে পারে, তার জন্যেই সাম্যবাদের প্রয়োগ। এ ছাড়া উপায় নেই, কেননা ধনোৎপাদনের সমস্ত উপায়ের মালিক যতদিন দেশের সমস্ত লোক না হয়, ততদিন সেই সঙ্গত বিতরণ অসম্ভব। বিতাড়িত জর্মান লেখক লিয়ন ফক্টভাগ্‌নার গোঁড়া মার্ক্সিষ্ট ব'লে মনে হয় না। সোভিয়েট রুশদেশের কোনো-কোনো জিনিস তাঁর চোখে বিসদৃশ ঠেকেছে। কিন্তু 'In Letters of Red'-এ 'Democracy and Dictatorship' প্রবন্ধে তিনি মানতে বাধ্য হয়েছেন যে যে-দেশে ধনোৎপাদনের উপায় জনগণের হাতে নেই সে-দেশে গণতন্ত্র প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃত শক্তি যেখানে, তা যদি সমস্তই কয়েকটি ব্যক্তিবিশেষের হাতে আবদ্ধ, তাহ'লে দেশের সমস্ত ব্যাপার তাঁদের ইচ্ছা ও সুবিধে অনুসারেই চলবে, জনসাধারণের কোনো ইচ্ছাই টিঁকবে না। ভোট দেবার ক্ষমতাটা ছেলে-ভুলোনো চুষি মাত্র। অর্থনৈতিক শক্তির বাইরে রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্ব নেই, এ-কথা আজ পৃথিবীর বেশির ভাগ লোক বুঝে ফেলেছে।

ফক্টভাগ্‌নার-এর প্রবন্ধটি আর একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। হিটলার কি মুসোলিনির সঙ্গে ষ্টালিনের পার্থক্য কোথায় তা তিনি দেখিয়েছেন। রুশদেশে বিস্তৃত ভ্রমণ ও ষ্টালিনের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থেকেই বলেছেন। আমাদের দেশে অনেকেরই বোধ হয় ধারণা যে ষ্টালিন হিটলার কি মুসোলিনির মতোই অবাধ স্বেচ্ছাচারী। অল্ডস্ হক্সলিরও মনে-মনে তাই বিশ্বাস ব'লে মনে হয়। ফাশিজ্‌ম্ ও কমিউনিজ্‌ম্ উভয়েরই তিনি বিরোধী। কমিউনিজ্‌ম্ অহিংসধর্মী নয়, সুতরাং তা ফাশিজ্‌ম্-এর মতোই দূষ্য! তাঁর মতে, সাম্যবাদ যদি যুদ্ধই করে, এবং যুদ্ধ দ্বারাই জয়ী হয় তবে তা আর সাম্যবাদ থাকলো না, ফাশিজ্‌ম্ হ'য়ে গেলো।

> ('The defence of Socialism against Fascism by military means entails the transformation of the socialist community into a fascist community.')

এই যুক্তি অনুসারে চীনেরা আজকাল ফাশিষ্ট, স্পেনের গবর্মেণ্টের দলও ফাশিষ্ট! হক্সলির মতো পণ্ডিতের মুখ থেকে এ-রকম একটা হাস্যকর কথা

শুনতে পাবো কখনো ভাবিনি। ষ্টালিন অন্য সমস্ত দেশকে জোর ক'রে সাম্যবাদ গ্রহণ করাতে ইচ্ছুক নন ব'লেই ট্রটস্কি আজ নির্বাসিত; কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি শত্রুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে না থাকে, তাহ'লে যে-কোনো মুহূর্তে পৃথিবীর একমাত্র সাম্যবাদী দেশ ফাশিষ্ট শক্তির চাপে বিধ্বস্ত হ'য়ে যেতে পারে, এবং তার ফলে হয়তো পৃথিবীর আর একটি অন্ধকার বর্বর যুগেরই সূত্রপাত। এ-বিষয়ে ফক্টভাগ্নার বলছেন :

> 'It is an actual fact that there (in U. S. S. R.) the people and not individuals are in possession of the means of production, and it is a fact, too, that whilst the democratic nations, by their empty talk of disarmament and their continual compromise, were encouraging the Fascist States to commit more and more acts of violence, the Soviet Union alone, with its systematic armament, was preventing Fascism from beginning its war against an inadequately armed world.'

ফক্টভাগ্নার ব্যক্তিগতভাবেও ষ্টালিন সম্বন্ধে লিখেছেন। হিটলার মুসোলিনির দামামা আজ সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিদিন নানাভাবে বাজছে, কিন্তু ষ্টালিন সেদিক থেকে অত্যন্ত সংযত। তাঁর নিজের দেশের লোকও তাঁর ব্যক্তিগত কি পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিছু জানে না। তিনি কোনো বিরাট খেতাব নেননি, তাঁর আখ্যা 'Secretary of the Central Committee'। যেখানে সমস্ত অর্থনৈতিক শক্তি দেশের লোকের হাতে, সে-দেশে তাদের ইচ্ছাই চরম হ'তে বাধ্য, এবং ষ্টালিন ইচ্ছে করলেও সেই ইচ্ছার প্রতিনিধি ছাড়া কিছু হ'তে পারেন না। অবশ্য রুশদেশে ষ্টালিন-পূজা অত্যন্ত ব্যাপক, ফক্টভাগ্নারের সেটি ভালো লাগেনি। কিন্তু এই পূজা সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও নতুন অবারিত জীবনের জন্য স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতারই উচ্ছ্বাস। ষ্টালিন নিজেও জানেন যে এই উচ্ছ্বাসের উদ্দেশ্য তিনি নন, তাঁর প্রবর্তিত নীতি। উপরন্তু, নেতাদের অহৈতুক পূজার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই আন্দোলন সুরু হয়েছে।

'নেশন এণ্ড নিউ ষ্টেটসম্যান্' পত্রিকার সম্পাদক কিংসলি মার্টিন 'In Letters of Red'-এ স্পেন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি বলেছেন যে যে-তিনশ্রেণীর লোক স্পেনে ফ্যাঙ্কোর জয় কামনা করে, প্যাসিফিষ্টরা তাদের অন্যতম। কথাটা প'ড়ে প্রথমে অবাক হয়েছিলুম, কিন্তু হক্সলির পুস্তিকাটি

প'ড়ে বুঝতে পারলুম, কথাটা কত সত্য। যুদ্ধ কিছুতেই নয়, ভয়ঙ্কর হত্যা-লীলার অবসান চাই, তার জন্য যে-কোনো আদর্শ পরাস্ত হয় তো হোক। ফ্র্যাঙ্কো জিৎলে যদি যুদ্ধ থামে ফ্র্যাঙ্কোরই তবে জয় হোক্। এতে এটাই প্রমাণ হয় যে আসলে তাঁরা শান্তিপন্থী নন, কিংবা কী হ'লে জগতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'বে সে-বিষয়ে তাঁদের ধারণা অস্পষ্ট। ফ্র্যাঙ্কো জয়ী হ'লে তাঁর বর্ধিত বিক্রম সভ্যতার শত্রুদেরই শক্তি বাড়াবে, স্পেন জয়ী হ'লে সভ্যতার যুদ্ধ-লোলুপ শত্রুদের পরাজয়। বর্তমান যুগে যুদ্ধের ভয়াবহতা অতুলনীয় তা সকলেই জানে, কোনো প্রগতিপন্থীই যুদ্ধ চান না, চাইতে পারেন না ; কিন্তু এমন অবস্থাও আসে যখন যুদ্ধ করা উচিত কি উচিত নয়, সে-কথাই ওঠে না। ভারতবর্ষে ব'সে আমাদের পক্ষে, কিংবা ইংলণ্ডের এখনো নিরাপদ রাজধানীতে ব'সে অহিংসা পরমো ধর্ম বুলি আওড়ানো সোজা, কিন্তু বিদেশী ভাড়াটে সৈন্য বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যখন একটা দেশকে ধ্বংস করতে উদ্যত, তখন সে-দেশের লোক কী করবে ? স্পেনের অবস্থা দেখে এসে কিংসলি মার্টিন তাই লিখছেন :

> 'On such occasions it is useless to argue whether men ought to fight. They know no alternative.'

সভ্যতাকে যদি বাঁচাতে হয় তবে জগতে যুদ্ধের অবসান নিশ্চয়ই দরকার। তবে তার উপায় প্যাসিফিজ্‌ম্ নয়। হক্সলির বইটি প'ড়ে এ-বিশ্বাসই দৃঢ় হয় যে এই শান্তিপন্থা পলায়নেরই নামান্তর। বর্তমান জগতের আসল সমস্যাগুলো এঁরা দেখছেন না, কি দেখতে ইচ্ছে করছেন না, কি দেখলে নিজের অসুবিধা হয় ব'লে চোখ বুজে আছেন। অল্ডস্ হক্সলি নিজে ইচ্ছে ক'রে অন্ধ হ'য়ে আছেন এ-কথা বিশ্বাস করা শক্ত। তবে কিনা আজকালকার মানবজীবনের সত্যগুলো এতই রূঢ় ও নির্মম যে তার সঙ্গে কোনোরকম আপোষ চলে না, এবং সেগুলো প্রত্যক্ষ দেখতে গেলে প্রচণ্ড ঘা খেতে হ'তে পারে। হয়তো সেইজন্যেই হক্সলি চোখ বুজে আছেন। কিন্তু নিদারুণ সর্বনাশের মুখে চোখ বুজে থেকে ক'দিন চলবে ? আশা করি অল্ডস্ হক্সলিকে শিগগিরই আমরা পণ্ডিচেরিতে কি আলমোড়ায় দেখতে পাবো ; তাঁর বৈষ্ণবত্বকে পূর্ণ করতে এখন শুধু একটি কাঠের মালা দরকার।

প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মাঝামাঝি কোনো রাস্তা আজ নেই, এ-কথা একবারে স্বীকার ক'রে নেয়াই ভালো। মাঝামাঝি রাস্তা খুঁজতে গেলেই বুদ্ধির কত বড়ো বিপর্যয় ঘটে, হক্সলি তার উদাহরণ। পৃথিবী এখন কালের সঙ্গমস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে। এ-সময়ে প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকেরই চোখ খোলা রেখে চারদিকে

তাকিয়ে নিজের বিশ্বাস গঠন করা কর্তব্য। যাঁরা আপোষ করবার চেষ্টায় লোকের দৃষ্টির পরিচ্ছন্নতা নষ্ট ক'রে দেবেন, তাঁরা আজ সমগ্র মানবজাতির অনিষ্টই করবেন। যুদ্ধের কারণ দূর না হ'লে যুদ্ধ দূর হবে না, এবং পৃথিবীতে সর্বত্র ধনোৎপাদনের উপায় সমস্ত সমাজের লোকের হাতে না এলে যুদ্ধের কারণও দূর হবে না। যুদ্ধ উপনিবেশের জন্য, উপনিবেশ দরকার জিনিস বেচতে ; একমাত্র সমাধান হয় যদি স্বদেশেই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুর খদ্দের জোটে। সেটা সম্ভব একমাত্র সকলেরই যদি সঙ্গত আয় থাকে, ও কারুরই এত বেশি না থাকে যা দিয়ে ভূমি কি ধনোৎপাদনের অন্য-কোনো উপায়ের মালিক হওয়া যায়। এবং এ-ব্যবস্থা সাম্যবাদী সমাজেই সম্ভব। যাঁরা বলেন, সাম্যবাদই জগতে স্থায়ী শান্তিস্থাপনের একমাত্র উপায়, সব দিক ভেবে দেখতে গেলে তাঁদের কথা বিশ্বাস না ক'রে উপায় থাকে না। তা ছাড়া, একমাত্র শ্রেণীহীন সমাজেই 'lust for power'-এর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি সম্ভব।

বোমা

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর কত জায়গায় কত বোমাই তো ফাটছে, হিসাব রাখা কেবল অসম্ভব নয়,—অন্যায়। তাতে পৃথিবীর অনেক যায়গায় এখনকার মত অসংখ্য বোমা ফাটায় বাধা হতে পারে। বোমার চেয়ে মানুষকে বেশী কাবু করে হিসাব। বোমা ফাটার অতি আন্দাজী অতি বেঠিক হিসাবও হয়ত অনেকগুলি মানুষকে করে দেবে অনেকগুলি জীবন্ত প্রশ্ন : এত বোমা ফাটে কেন?

জীবন্ত প্রশ্ন জবাব আবিষ্কার করবেই। তার ফলে পৃথিবী জুড়ে হয়ত বোমা ফাটাফাটি সম্বন্ধে এমন কড়া ব্যবস্থাই হবে যে বোমা আর একরকম ফাটবেই না।

আর তার ফলে হয়তো পৃথিবী জুড়ে এমন ভীষণ নিঃশব্দ শান্তি বিরাজ করবে যে গোপালের পর্য্যন্ত মনে হবে আর একবার পৃথিবীটা পাক দিয়ে আসা যাক। ঘরের চেয়ে বাইরের শান্তি বেশী হলে অশান্ত মানুষের কি ঘরের টান থাকে?

আহা, এত ভাল মানুষ হয়েছে গোপাল, দোতলা একটা বাড়ীতে এত যত্নে সে এমন নিবিড় শান্তিপূর্ণ সংসার পেতেছে, রোজ রাত্রে নীল আলো জ্বালা ঘরে তাকেই বিবসনা করার অধিকার পেয়েছে, যার জন্য একবার পৃথিবীটাই সে পাক দিয়ে এসেছিল, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বোমার ফাটাফাটিতে উড়ে যেতে হলেও কি আর তাকে ঘরছাড়া করা উচিত?

এই ধরণের ভাবনাই সুধা ভাবে,—সম্পূর্ণ অন্য ভাবে। সে এমন ভীরু আর চালাক মেয়ে যে আরও কয়েকটা বছর গোপালের দিনান্তের কর্ম্মান্তিক অবসাদের সঙ্গে ঘরের আবহাওয়ার সামঞ্জস্য সে বজায় রাখবেই। এখনও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা সে পছন্দ করে না। এখনও হিষ্টিরিয়াকে সে ঘেন্না করে। কারণ সুধার স্নায়ু এখনও বড় দুর্ব্বল। মাঝে মাঝে এখনও তার হিষ্টিরিয়া হয়। কিন্তু স্নায়ু তো একদিন সবল হবে? হিষ্টিরিয়া তো একদিন সেরে যাবে? নিজমূর্ত্তি ধারণ করলে কি বিপদটাই না জানি তখন তার হবে!

পৃথিবীর আর কোন জীবন্ত প্রাণী বাঁচুক মরুক কিছুই তার এসে যায় না

এমনভাবে সুধাকে গোপাল ভালবাসে, রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি থেকে আরম্ভ করে নৈতিকনীতি পর্য্যন্ত চুলোয় পাঠান যায় এমনভাবে গোপাল সুধাকে ভালবাসে, তবু সুধার ভয় আর চালাকির শেষ নেই। আবার যদি গোপাল পৃথিবী পাক দিতে চলে যায়? কিছুতেই মুখ ফুটে বিয়ের কথাটা বলছিল না বলে কথাটা বলাবার জন্যই অন্য একজনের কাছে আত্মসমর্পণের ভাণ করায় কুমারী অবস্থায় তাকে ত্যাগ করে সাত বছরের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে আর ভাণটা কার্য্যে পরিণত করা সত্ত্বেও সাত বছর পরে ফিরে এসে সেই আর একজনের বিধবা অবস্থায় বিনা বাক্যব্যয়ে যে তাকে বিয়ে করে ফেলতে পারে, তাকে বিশ্বাস নেই। সে সব পারে। একা সে তাকে বেশী দিন বেঁধে রাখতে পারবে না। সেজন্য ছেলে মেয়ে চাই!

যে দুটি ছেলে তার আছে তারা নয়। গোপালের নিজের ছেলে মেয়ে।

ছেলে সুধার হল,—পর পর তিনটি। স্নায়বিক দুর্ব্বলতাও সুধার কমে গেল, হিষ্টিরিয়াও বিদায় হল। কিন্তু দুই আর তিনে যে পাঁচ হয় এই হিসাবটাই তাকে করে রেখে দিল কাবু। পর পর পাঁচ ছেলে কোলে পাওয়া যে কোন মেয়েমানুষের পক্ষে সাংঘাতিক ব্যাপার,—অদ্ভুত অকথ্য রহস্য। মেয়ে কই? কেন মেয়ে হয় না তার? গোপাল ছাড়া এ জগতে কার কাছে কবে সে কি অপরাধ করেছে যে তার মেয়ে হয় না,—হয়ত হবে না?

এবারও যদি ছেলে হয়?

টের পাওয়ার একমাসের মধ্যে সুধা দুর্ভাবনায় শুকিয়ে গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, অসুখ নয়, অন্য কিছু, এরকম হয়, ভাবনার কিছু নেই, টনিক খেলেই ঠিক হয়ে যাবে, চেঞ্জের ব্যবস্থা করতে পারলে—

সুধা রাগ করে বললে, 'চেঞ্জ না হাতী। ছুটি তো তোমার একদিনও পাওনা নেই, কার সঙ্গে যাব?'

'তোমার দাদার সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, তোমাকে ফেলে রেখে দাদার সঙ্গে চেঞ্জে যাব—অত সখে আমার কাজ নেই।'

পাঁচবার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, পাঁচবার ছেলে হয়েছে। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার জন্য এবার যদি মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনাটা একটু বাড়ে, স্বাস্থ্য ভাল করার চেষ্টা করাটা কি উচিত হবে? সুধা টনিকও খেল না, চেঞ্জেও গেল না, খারাপ শরীর খারাপ করেই রেখে দিল। এমন কি বেশীরকম চুল উঠে যেতে

আরম্ভ করায় চুলের সঙ্গে জীবনটাই যেন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে মনে হতে লাগল বটে তবু চুলের জন্য পর্য্যন্ত টনিকের ব্যবস্থা করল না।

ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে গোপালকে জিজ্ঞাসা করল, 'এবারও যদি ছেলে হয় ?'

গোপাল উদাসভাবে বলল, 'হলে হবে।'

খানিকটা ঝিমিয়ে সুধা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা এমন কি কোন উপায় নেই, যাতে লোকে ছেলে চাইলে ছেলে পায়, মেয়ে চাইলে মেয়ে পায় ?'

গোপাল হঠাৎ সচেতন হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা কি শুনি ? তোমার হয়েছে কি ?'

সুধা রেগে বলল, 'ব্যাপার পরে শুনো, আগে যা বললাম তার জবাবটা দিয়ে নাও।'

জবাব গোপাল কি দেবে ? এ তো জীবন্ত প্রশ্ন নয় যে মানুষ প্রশ্ন করতে শিখবার পর অনেককাল কেটে গিয়েছে বলেই জবাব একটা আবিষ্কৃত হয়ে থাকবে,—জীবনের এ একটা সাধারণ প্রশ্ন, সাধারণ কৌতূহল। গোপাল তাই চিরন্তন যুক্তি দেখিয়ে বলল, 'হয়তো উপায় আছে, মানুষ তা জানে না।'

মানুষ কেন জানেনা এরকম কুটিল প্রশ্ন করার মত জটিল মনোবিকার সুধার জন্মে নি, সে তাই বিনা প্রতিবাদে প্রতিদিন রোগা হয়ে যেতে আরম্ভ করল। রোগা হতে হতে মাস দেড়েকের মধ্যে এমন রোগাই হয়ে গেল যে জন্মাবার আগেই মেয়েটি তার গেল মরে।

সুধা কেঁদেই অস্থির। হায়, মেয়ে মেয়ে করে পাগল হয়ে মেয়েকেই সে হারিয়ে বসল ! মাথা খারাপ না হলে মেয়ে কিনা জানার আগে মেয়ে নয় মনে করে মানুষ এমন ব্যাকুল হয় ? কদিন খুব কাঁদাকাটা করে সুধার মন শান্ত হবার আর স্নায়ু অবসন্ন হবার সুযোগ পেল। তার ফলে ধীরে ধীরে এল স্থায়ী বিষাদ, যা অনেকটা পরিতৃপ্তির সামিল।

পরের বার একটি মেয়ে হল সুধার। অনেকদিন পরে—প্রায় চারবছর।

এইখানে উনিশ বছরের ছেদ দেবার সুযোগে সুধার মেয়ে হওয়ার সঙ্গে পৃথিবীর বোমা ফাটাফাটির সম্পর্কটা সংক্ষেপে একটু ব্যাখ্যা করি। এটা অবশ্য একটা চরম দৃষ্টান্ত কিন্তু সেজন্য কিছু এসে যায় না। দুয়ে আর দুয়ে যে যুক্তিতে চার হয় দু'লাখে আর দু'লাখে সেই যুক্তিতেই হয় চারলাখ। তুলনামূলকতার ঘোরপ্যাঁচ ছাড়া এর মধ্যে আর কোন বিস্ময়কর অসত্য নেই,—অতি সহজ কথা। এ যুগের চরম আর পরিণত দৃষ্টান্ত হিসাবে না ধরে সুধাকে ছেঁটে কেটে যদি

সেযুগের মৌলিক আর অপরিণত দৃষ্টান্তে দাঁড় করান যায়, তবু দেখা যাবে এই সুধার এভাবে মেয়ে হওয়ার মত সেই সুধার অতি সামান্য রকম এভাবে মেয়ে হওয়ার জন্যই মানুষের দাঁত আর নখে বোমার রক্ত' পিপাসা জেগেছিল। 'নখের আঁচড় আর বোমার বিস্ফোরণের মধ্যে যে পার্থক্য নেই,' এই ধারণা পোষণ করাই প্রত্যেকের উচিত। তা না হলে তুলনামূলক ঘোর প্যাঁচের ফাঁদে পড়ে মানুষ তর্ক আর হাতাহাতি করে,—কোন সময় নখ দিয়ে আচড়ায় আর দাঁত দিয়ে কামড়ায়, কোন সময় এক ঝাঁক এরোপ্লেন পাঠিয়ে বোঁমা বৃষ্টি করায়।

মন্দা একদিন সুধাকে বলল, 'মা, আজ বাড়ী থেকো, সন্দেবেলা অনাদি আসবে। বাবাকে বলতে পারবে না, তোমায় বলবে। তুমি বাবাকে বোলো।'

সুধা ভয়ানক চিন্তিত হয়ে বলল, 'অনাদি ? তাই তো।'

মন্দার মুখ গম্ভীর হল, চোখ বড় হল, দৃষ্টিতে তীব্রতা এল। ভীরু মাকে একটি আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, তুমি ভাব এখনও আমি কচি খুকীটি আছি, না? কিছু বোঝো না, কেন ভেবে মর, কি দরকার তোমার এত ভাবনার? কাল সন্দেবেলা সমীর আসবে—আসতে বলেছি।'

সুধার বয়স প্রায় পঞ্চাশে এসে ঠেকেছে, বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের জটিলতাগুলি সরল হতে আরম্ভ করায় ভয় পরিণত হয়েছে বুকের ধড়পড়ানিতে আর চালাকি পরিণত হয়েছে প্রায় নির্বুদ্ধিতায়। কিছুই যেন সহজে বোধগম্য হয় না। গল্পের মাঝখানে আমার গল্প ব্যাখ্যা করার মত সুধাকে তাই আবার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে হয়।

'আমি ওপরে থাকব। সমীর এলেই অনাদির কথাটা বলবে—বেশ হাসিমুখে বলবে, তোমাদের যেন মত আছে এমনিভাবে, বুঝলে? তারপর সমীরকে ওপরে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবে, বুঝলে?

সুধা কাতরকণ্ঠে বলল, 'এসব তুই কি বলছিস মন্দা? আজ অনাদি কাল সমীর—এসব কোন দেশী কাণ্ড?'

সুধার তখনকার মুখ দেখেই যে কোন বুদ্ধিমতীর রাগ করার কথা, তবু সুধার কথা শুনেই যেন হঠাৎ নিজের বিপন্ন অবস্থাটা খেয়াল করে মন্দা একেবারে ঝিমিয়ে গেল। গম্ভীর মুখ ম্লান হল, বড় চোখ স্তিমিত হল, দৃষ্টি ভিজে এল। কাঁদ' কাঁদ' হয়ে বলল, 'কেন ভাবছ তুমি? ভেবোনা। সমীরের জন্যেই তো— না বলালে কোনদিন মুখ ফুটে বলবে ভেবেছ?'

বলে সুধাকে হাত ধরে বসিয়ে তার পাশে বসে কোলে মুখ গুঁজে মন্দা আরম্ভ করে দিল কান্না। সুধার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। আহা, সমীরের জন্য মেয়ে যখন তার এমন করে কাঁদছে, সমীরকে নিয়েই সে তার নীড় বাঁধুক। কি আসে যায় একটু যদি একগুঁয়ে মানুষ হয় সমীর, অনাদির সঙ্গে কবে একটু বাড়াবাড়ি করেছিল বলে মেয়েকে যদি এতকাল একটু পীড়ন করেই থাকে সমীর? সব ভাল যার শেষ ভাল।

প্রগতি ও পরিবর্ত্তন

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মনোবিকলনে ধরা পড়ে যে মানুষমাত্রেই পরিবর্ত্তনবিমুখ। অথচ প্রতিনিয়ত না বদ্‌লালেও, সে বাঁচতে পারে না। যে-জগতে তার বাস, সেখানে স্থিতি তো অনুকল্প বটেই, এমনকি, এক যোগবিভূতির কিংবদন্তী বাদ দিলে, শুধু আধিদৈবিক উৎপাতই তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় না, নিজের দেহবিকারেও সে সদাসর্ব্বদা অস্থির। ফলত বিবর্ত্তনে মনের আদিম অদ্বৈত ঘুচিয়ে সে আজ অচৈতন্যের উপরে চাপিয়েছে আত্মবিপর্য্যয়ের তত্ত্বাবধান আর চৈতন্যকে নিযুক্ত করেছে অবস্থান্তরের নিয়মনিরূপণে; এবং তার বিশ্বাস যে বুদ্ধির দিগ্বিজয়ে বাধা না পড়লে, সে অচিরে বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে এ-রকম এক কার্য্যকারণশৃঙ্খলার সন্ধান পাবে যে চরাচরের ওলট-পালট আর তাকে প্রাণে মারবে না, ভবিষ্যতের সংসারযাত্রাও তার মন জুগিয়েই চলবে। বলাই বাহুল্য তার এ-আশা একেবারে বিফলে যায়নি। বহিঃ-প্রকৃতি যদিও কোনোদিনই তার কাল্পনিক হেতুবাদের তোয়াক্কা রাখে না, তবু বারম্বার ঠেকে ঠেকে সে এখন প্রকৃতির ধরণ-ধারণ অল্প-বিস্তর বুঝতে শিখেছে; এবং এই অনিশ্চয় অভিজ্ঞতার কল্যাণে তার সভ্যতাও আপাতত সমৃদ্ধ। কিন্তু এত ভুগেও তার স্বভাব শোধরায়নি, তার অন্তরস্থ পুরাণ পুরুষ বিপ্লবে ঠিক আগের মতোই সন্ত্রস্ত; এবং থামা অসম্ভব ব'লে, এই আতঙ্ক সত্ত্বেও যেমন অগত্যা তার পায়ের বিরাম নেই, তেমনি সাধ থাকলেও, অবচেতন প্রতিবন্ধকের প্রতিপক্ষে এগোনো অধিকাংশ মানুষেরই সাধ্যে কুলয় না। এইজন্যেই আধুনিক সমাজে মনোব্যাধির প্রাদুর্ভাব এত বেশি; এবং বিশেষজ্ঞদের মতে হিষ্টিরিয়া শুধু অবলাদের প্রবলাস্ত্র নয়, অনেক সময়ে পুরুষের কাছেও রোগের ভাণ স্থিতিস্থাপকতার চেয়ে অধিক প্রীতিকর।

এত দূর পর্য্যন্ত মনোবিজ্ঞানীদের প্রায় বিবাদ নেই। কিন্তু ফ্রয়েড্ নিজে এখানে থামতে অনিচ্ছুক। তিনি যেহেতু তত্ত্বত জড়বাদী, তাই তাঁর বিশ্বাস যে জড়সম্ভূত জীবের মধ্যে নিশ্চেষ্টাসংরক্ষণের পৈতৃক প্রবৃত্তি স্বধর্ম্মানুযায়ী আত্মরক্ষার অগ্রগণ্য। অর্থাৎ তাঁর বিবেচনায় আধি-ব্যাধির মানস গ্রন্থি কোন্ ছার, ম'রেও মানুষ বর্ত্তমান থেকে পালিয়ে অতীতের অঙ্কে বিশ্রাম চায়; এবং এই মুমূর্ষাকে তিনি

কেবল নৈরাশ্যের চরম অভিব্যক্তি হিসাবে দেখেন না ; রিরংসার মতো জিজীবিষু প্রবৃত্তিও মৃত্যুকামনার সংক্রাম কাটাতে পারে না ব'লেই, প্রণয়ীরা ধর্ষণ আর মর্ষণ— এই দ্বিবিধ রতির দোটানায় রাত্রি-দিন উদ্ব্যস্ত। অবশ্য মনস্তত্ত্ব এখনো বিজ্ঞান-পদবাচ্য নয় ; এবং প্রেম ও ঘৃণার স্বতোবিরোধী সমন্বয় সম্প্রতি সে-শাস্ত্রে স্বীকৃত হলেও, উক্ত ধ্রুবদ্বয় এ যাবৎ একাধারে শুধু কাব্য-নাটকেরই আশ্রয় জুগিয়েছে। কিন্তু কবিকল্পনা-সম্বন্ধে বুদ্ধিমানের অবজ্ঞা অনুচিত ; এবং কল্পনার নির্দ্দেশ ন্যায়ের বিধান মানুক বা না মানুক, বাস্তব জগতের প্রতি কবির পক্ষপাত আসলে হয়তো বৈজ্ঞানিকদের চেয়ে বেশি। অন্ততপক্ষে ভূয়োদর্শী নৃতত্ত্ববিদও এ-প্রসঙ্গে ভাব-প্রবর্ত্তিম কবির সঙ্গে একমত যে যুদ্ধ আর পুত্রেষ্টির আনুষ্ঠানিক সাদৃশ্য যেকালে সুস্পষ্ট, তখন সে-দুই প্রকরণের প্রেরণাও খুব সম্ভব অভিন্ন ; এবং ফ্রয়েড্-এর মনে বিন্দু-বিসর্গ সন্দেহ নেই যে অবচেতনের নৈরাজ্যে একাধিক স্বতোবিরোধ একত্রে বিদ্যমান।

তাহলেও স্বতোবিরোধের অস্তিত্বস্বীকার শক্ত ; এবং যাঁরা স্থান-কাল-পাত্রের অতীত ভূমানন্দে অনধিকারী, তাঁদের অভিজ্ঞতায় যত বৈষম্যই থাক না কেন, তাতে তর্কশাস্ত্রের প্রথম নিষেধ বিনা ব্যতিক্রমে মর্য্যাদা পেয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও অবশ্যমান্য যে ব্রহ্মবিদ্যাই নেতিবাদের একমাত্র পরিণতি ; এবং যেহেতু নিয়মানুবর্ত্তিতা ব্রহ্মোপলব্ধির মতো শুধু অগতির গতি না হয়ে অনেক সময়েই অভিষ্টসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়, তাই অবৈধতার অভাবে বিধানপ্রমাণের চেষ্টা অনুপকারী। সেজন্যে সদর্থক সাক্ষ্যের প্রয়োজন ; এবং নিয়ম আর নিষেধের পারস্পরিক মুখাপেক্ষা তো সন্দেহজনক বটেই, এমনকি নিয়ম ও দৃষ্টান্তের সম্পর্কও শৌণ্ডিক আর মাতালের সুপরিচিত সহযোগের সঙ্গেই তুলনীয়। সুতরাং অব্যবস্থার অবর্ত্তমানে ব্যবস্থার ব্যাপ্তি দেখা হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা ; এবং নিয়ম-সম্বন্ধে নিরুক্তি কেবল তখনই সম্ভব, যখন দৃষ্টান্ত বা বৈপরীত্য নয়, কোনো সামান্য বিধান থেকে নাতিপ্রশস্ত বিধিতে অবরোহণ সহজ ও সুকর। দুঃখের বিষয় ন্যায়শাস্ত্রের মূল সূত্র তিনটি এ-রকম কোনো সাধারণ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় ; এবং সেই কারণে অবিরোধকে অভিজ্ঞতার অপরিহার্য্য লক্ষণ ব'লে বুঝেও আমরা মরমীদের প্রলাপে অর্থ খুঁজি।

সুতরাং স্বতোবিরোধ না হোক, অন্তত বিরোধের সঙ্গে মানুষমাত্রেই সুপরিচিত ; এবং আমরণ জীবনের ধাক্কা খেলেও, সে যদিও সংঘর্ষের মধ্যে অস্তি-নাস্তির তাৎকাল্য মানতে বাধ্য নয়, তবু একবার ভাবতে বসলে, সে আর অস্বীকার

করে না যে সদসদের বিকল্প ব্যতীত প্রাণযাত্রা অচল। সময়ে বিরোধে তার ভয় ভাঙে; এবং সে ইতিহাস প'ড়ে বোঝে যে স্বতোবিরোধ সুদ্ধ অস্থায়ী। অর্থাৎ জিজ্ঞাসুর অনভিজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধির দরুন আজ যে সমস্যাকে অগভীর দৃষ্টিতে স্বতোবিরোধী লাগে, কাল জ্ঞান বাড়লে, তার ন্যায্য সমাধানে আর তিলার্দ্ধ সংশয় থাকে না। তখন হঠাৎ তার নিরাশা দুরাশায় বদলায়; এবং বর্ত্তমানের ভাবনা ভুলে সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে তাকিয়ে ভাবে যে সে না টিঁকলেও, সভ্যতার প্রগতি কোনোদিনই থামবে না, আধুনিক প্রতর্ক আগামী প্রমিতির প্রসাদ পাবে। তার পর কী ঘটবে, তা আর নিছক কল্পনাবিলাসের গোচরে আসে না। কাজেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীর দ্বারে অগত্যা ধর্ণা দিতে হয়; এবং সে-দৈবজ্ঞের কথায় শুভবাদের উপজীব্য জোটে না, জানা যায় যে এন্ট্রাপি-র চক্রবৃদ্ধি জগৎসংসারকে প্রলয়ের দিকে পাঠাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে বাজে বিশ্ববিকীরণের ধ্বংসতীব্র আকাশবাণী; এবং তারই তালে তালে চলে পরমাণুর খেয়ালী তাণ্ডব, যাতে য়ুরেনীয়ম্ সীসায় না নেমে নিঃশ্বাস নেয় না। অবশেষে উদ্বর্ত্তনের সমর্থনে ডাক পড়ে জীবলোকের। কিন্তু সেখানেও কোনো আশ্বাস মেলে না; প্রাণিবিদ্যা শেখায় যে অভিব্যক্তির উৎস এখনো শূন্যে না মিশলেও, জাতিবিশেষের বেলায় ক্ষয়ই এ যাবৎ জিতেছে।

অনন্তর প্রগতির সঙ্গে প্রকৃতির অহি-নকুল-সম্বন্ধ আর ঢাকা থাকে না; এবং প্রথমে প্রতিবেশপরাজয়ের অভিলাষ পোষণ ক'রে ক্রমশ আমরা যখন বুঝতে পারি যে শীতের প্রকোপে আপাদমস্তক রোমশ পরিচ্ছদে মুড়ে আমরা উন্নতির শিখরে উঠছি না, বিবর্ত্তনের সোপানমার্গে প্রয়োজনমতো ধাপ কয়েক নেমে আসছি, তখন বুদ্ধিগত বিরোধকে আর সাময়িক লাগে না, দেখা যায় যে মানুষী চিন্তার মুষ্টিমেয় পদার্থ-প্রত্যয়াদি চিরনির্দ্দিষ্ট ব'লেই, প্রবর্দ্ধমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগ ব্যাসকূটের রঙ্গভূমি। অবশ্য তৎসত্ত্বেও ফলিত বিজ্ঞানের প্রসার থামে না; এমনকি প্রতিযোগী অর্থাপত্তির আপত্তি-বিপত্তিও মনীষার যোগাযোগে নাকি ক্বচিৎ-কদাচিৎ মেটে; এবং উদাহরণত উল্লিখিত হয় আলোকের স্বরূপ-সম্বন্ধে কণাবাদীদের সঙ্গে তরঙ্গধর্ম্মীদের বাদ-বিতণ্ডা, যার মীমাংসা ক'রে লুই দ ব্রোগ্লি আজ বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু এ-রকম পরিকল্পনার দ্বারা গণিতের মান যতই বাড়ুক না কেন, অণু আর ঊর্ম্মির বাস্তবিক সাযুজ্য কিছুমাত্র এগোয় না, বরং আমার মতো মূর্খের মনে স্বতই সন্দেহ জাগে যে সমুৎপন্ন সর্ব্বনাশে আধুনিক পণ্ডিতেরা আর অর্দ্ধত্যাগে নিস্তার পান না, চিরাচরিত প্রথায় সমস্যার সমাধান অসম্ভব ভেবে সমস্যার সঙ্গে গতানুগতিক কাণ্ডজ্ঞানকেও যথাসম্ভব ঝেড়ে ফেলেন।

সে যাই হোক, য়ুং-এর মতো স্থিতপ্রজ্ঞের মতেও বিরোধভঞ্জনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম ; এবং যারা দারুণ দ্বিধায় দিশা হারিয়ে তাঁর কাছে পরামর্শ চায়, তাদের তিনি অধ্যবসায়ের শত নাম শোনান না, অবিলম্বে সে-দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যত্র তাকাবার উপদেশ দেন। কারণ তাঁর ধ্যানলব্ধ সিদ্ধান্তের সঙ্গে পাভ্‌লোভ্‌-এর প্রয়োগপ্রতিষ্ঠ অনুমানের এখানে কোনো বৈষম্য নেই যে ব্যক্তি আধিজৈবিক প্রয়োজনের নিমিত্তমাত্র ; এবং সেইজন্যে তার বিশ্ববীক্ষার প্রতীকাদি এক দিকে যেমন নির্ব্বিকার তেমনি অন্য দিকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাতন্ত্র্য অবস্থাবিশেষে অধিকারভেদের শাসনমুক্ত। নচেৎ সুরিখ্‌-এর কূপমণ্ডূকেরা তদ্‌গতচিত্তে ছবি আঁকতে গিয়ে তিব্বতী অলাতচক্রে ঘুরে মরতো না ; নতুবা খাদ্যের পরিবর্ত্তে রঙীন আলো দেখে কুকুরের জিহ্বায় লালা ঝরতো না ; নয়তো আমের বীজে জাম জন্মাতো, ভিন্ন জাতির নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী ভিন্ন আকার ধরতো, সীজার-নেপোলিয়ন্‌-এর অনুকরণ ছেড়ে মুসোলীনি পেতো আত্মসমাহিতির প্রয়াস। কিন্তু সোহংবাদের প্রাচীনতা সত্ত্বেও নিঃসম্পর্ক নূতন ইহলোকে দুর্লভ ; এবং এই অনেকান্ত পৃথিবীর যোগসূত্র যদিও কাকতালীয় ন্যায়ের চেয়ে দৃঢ়তর নয়, তবু ইতিহাস পুনরুক্তিময় ব'লেই, স্বদেশপ্রত্যাখ্যাত প্রবক্তারা অন্তত বিদেশে সমাদর কুড়োয়। আসলে পূর্ণতা ও সত্তার ব্যতিহার-সম্বন্ধে খৃষ্টান দার্শনিকদের নিঃসংশয় হয়তো একেবারে অমূলক নয় ; এবং আমানুষ প্রাণী স্বভাবত ইষ্টানিষ্টের পার্থক্য না চিন্‌লে, তার পাট তো ইতিপূর্ব্বে উঠতোই, এমনকি বহিঃপ্রকৃতিও এত দিন তার প্রাক্তন প্রবৃত্তির সঙ্গে তাল রেখে না চললে, সে নিশ্চয়ই নিমেষের বেশি টিঁকতো না।

দুর্ভাগ্যবশত স্বভাব প্রায়ই অচেতন ; এবং মজ্জাগত অনীহার অঙ্গীকার শুধু আমাদের আত্মপ্রসাদেই বাজে না, আমাদের দেহধর্ম্মেও বাধে। কাজেই পারেতো মানুষের অধিকাংশ ক্রিয়া-কর্ম্মে অসঙ্গতির লীলা দেখেছেন ; এবং তাঁর মতে একা বিজ্ঞানই যেহেতু উদ্দেশ্য, উৎপত্তি ও উপলক্ষ্যের সামঞ্জস্য সাধে, তাই শুধু সেই চর্চ্চাকে তিনি অযৌক্তিকের এলাকায় আনেন নি। অবশ্য পারেতো এমনি অন্তর্মুখী ছিলেন যে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত বেঁচেও বিজ্ঞানের শোচনীয় পরিণাম তাঁর চোখে প'ড়ে নি, তিনি বুঝেও বোঝেন নি যে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার জন্যে জন্মে বিজ্ঞান যদি অজ্ঞাতসারে মৃত্যুর মন জোগাতে গিয়ে সারা সভ্যতার সঙ্গে মরে, তবে অন্যায় উপাধি সর্ব্বাগ্রে তারই প্রাপ্য। কিন্তু সামাজিক কার্য্যকলাপের জাতি-বিচারে তিনি অনুরূপ আরো অনেক ভুল করেছেন ব'লেই, তাঁর মূল প্রতিপাদ্য অসার্থক নয় ; এবং তাঁর মতো অহংসর্ব্বস্ব হলে, আমরাও মানবো না বটে যে

আমাদের অদ্বিতীয় অভিমত পূর্ব্বসূরিদের প্রতিধ্বনি, তবু তাঁর মতো দিব্যদৃষ্টি থাকলে, আমরা নিশ্চয়ই জানবো যে ব্যক্তি তথা গোষ্ঠীর আচার-ব্যবহারে যুগে যুগে পরিবর্ত্তন ঘটলেও, তার সংস্কার কোনোকালেই বদলায় না। কারণ এই সংস্কার বা "রেসিডিউ" অহৈতুক, লক্ষ্যহীন বা স্বগত; এবং মানুষ এরই প্রেরণায় চল্‌লেও, তার কার্য্যক্রম এর দ্বারা ধার্য্য নয়, শুধু তার মানস প্রতিক্রিয়াই এর আজ্ঞাধীন। অর্থাৎ একই সংস্কারের বশে নানা মানুষ নানা কাজে লাগে; কেউ ভাবে ডাইনীদের না পোড়ালে, দেশের, দশের মঙ্গল নেই, কেউ ধ'রে নেয় নিরীহ-নিগ্রহের নিপীড়নই হিতৈষণার আদ্যকৃত্য; এবং উভয়ত্রই এই কুসংস্কার প্রকাশ পায় যে অকল্যাণ একটা সাময়িক উৎপাত যার প্রতিবিধান শক্তিমানের ইচ্ছাসাপেক্ষ।

এই সংস্কার ছয় পর্য্যায়ের অন্তর্গত; এবং মৌরসী সমাজব্যবস্থার পক্ষে সেগুলোর প্রত্যেকটাই অপরিহার্য্য বটে, কিন্তু গোটাকয়েক আপাতত পরস্পর-বিরোধী ব'লে, সব কটাকে একসঙ্গে একজনের মধ্যে মেলে না। ফলে কোনো সমাজই চিরকাল টিঁকে নি; এবং শুধু তাই নয়, সমস্ত সংস্কারের একত্র সমাবেশ যেকালে অসম্ভব, তখন সমাজমাত্রেই অনিকামত শ্রেণিবিভক্ত আর শ্রেণিবিশেষের প্রাধান্য স্বভাবত স্বল্পায়ু। কারণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবশ্যিক পারম্পর্য্যে একটা সংস্কার কিছু দিন চললে, তার বিপরীত সংস্কার তো আপনা থেকে জাগেই, উপরন্তু সমাজপতিরা যেহেতু অমর নয় এবং প্রতিভাবানের ঔরসেও নিষ্প্রতিভ সন্তান জন্মায়, তাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে আজ যে-দল জেতে, নিসর্গের স্বয়ম্বরসভায় কাল আর তার মাল্য জোটে না; এবং তখন সে যদি নিজের অক্ষমতা মেনে নিয়ে অপাংক্তেয়দের স্বপক্ষে স্থান দেয়, তবেই তার মঙ্গল, নচেৎ আসন্ন কুরুক্ষেত্রে তার সপরিবার নিপাত নিশ্চিত। এই কথাকেই ঘুরিয়ে বলা যায় যে এক আদর্শ সমাজ ব্যতীত অন্য কোথাও বিস্তারের ইচ্ছা আর সংরক্ষণের প্রবৃত্তি—এই অন্যোন্যবিমুখ প্রাথমিক সংস্কার-দুটো যুগপৎ কার্য্যকর নয়; এবং সাধারণত রাষ্ট্রপরিচালকেরা হয় এত সাবধান যে আত্মীয়ের অসারতা দেখেও তাঁরা তাঁদের ক্ষাত্র দুর্গে অন্ত্যজের প্রবেশ অপছন্দ করেন, নয় এমন বৈশ্যভাবাপন্ন যে শত্রু আগত জেনেও তাঁরা তাঁদের খোলা হাটে বেড়া লাগান না। সেইজন্যে বিপ্লবের রক্তগঙ্গায় আভিজাতিক শাসকগোষ্ঠীকে ডুবিয়েও মনুষ্যসংসার প্রজাতন্ত্রে এসে কূল পায় না, গণনায়কদের বেবন্দোবস্তে একাধিক যুদ্ধবিগ্রহে হেরে আবার স্বৈরাচারীর আশ্রয় চায়; এবং আমাদের সাময়িক অভিভাবকেরা প্রতিবার শক্তিহস্তান্তরের আগে ও পরে

জনহিতের ডঙ্কা পিটলেও, এই নিরন্তর পরিবর্ত্তন সর্ব্বসম্মতির অপেক্ষা রাখে না, কেবল একাগ্র অনুচরদের প্রতি পক্ষপাত দেখায়।

এমনকি বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলও একটা কথার কথা; এবং শুভবুদ্ধির সঙ্গে আত্মম্ভরিতার সম্পর্ক এত নিকট যে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্য-ব্যতিরেকে ইষ্টানিষ্টের বিচার পারেতো-র বিদ্রূপ জাগাতো। কিন্তু গণিতের পদ্ধতি যতই নিরপেক্ষ হোক না কেন, তার প্রয়োগ নির্ব্বিকল্প নয়; এবং সেইজন্যে তার নির্দ্দেশেও বিবিধ সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোনো একটার নির্ব্বাচন অসম্ভব, সে-উপায়ে হয়তো কেবল এইটুকুই জানা যায় যে উপস্থিত বিধান ভবিষ্যতে কেমন দাঁড়াবে। অর্থাৎ ভালো-মন্দের বাছাই ন্যায়াতিরিক্ত ব্যাপার, সেখানে বিবেক-নামক ব্যক্তিগত খেয়ালই সর্ব্বেসর্ব্বা; এবং সমাজতত্ত্ব যেকালে প্রামাণিক বিজ্ঞানের পদপ্রার্থী, তখন কোনো রকম হার্দ্দ্য বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়া তার উচিত নয়, কোন্ সমাজের উপকারিতা কতখানি—সে-প্রসঙ্গ অমীমাংসিত রেখে, সমাজবিশেষের উপযোগিতা কোথায় ও কিসে—সেই আলোচনায় মনোনিবেশই তার একমাত্র কর্ত্তব্য। পারেতো-র বিবেচনায় উক্ত গুণ-দুটির সমীকরণ প্রায় অসাধ্য। অন্ততপক্ষে রাষ্ট্র যত দিন সাম্প্রদায়িক আধিপত্যের শ্রীক্ষেত্র থাকবে, তত দিন পর্য্যন্ত আমরা শেষোক্ত গুণের বিচারেই আবদ্ধ। কারণ এই উপযোগিতার নিকষ প্রজারঞ্জনের ব্যাপকতায় নয়, এর পরিমাণ অন্যান্য সমাজের অনুপাতে সমাজবিশেষের প্রবলতর অস্ত্র-শস্ত্রে বা প্রশস্ততর বাণিজ্যে। প্রথমটার সম্বন্ধে এ-ধরণের বহিরাশ্রিত হিসাবনিকাশ একেবারেই অচল; এবং কেন অচল, তা বোঝার জন্যে নানা মুনির নানা মত কিম্বা ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি ইত্যাদি প্রবাদবাক্যগুলো স্মরণীয় নয়, শুধু এইটুকু ভেবে দেখলেই যথেষ্ট হবে যে কোনো অঞ্চলের প্রজননবৃদ্ধি আবশ্যক না অনাবশ্যক—এই শাশ্বত সমস্যারও সনাতন সমাধান নেই এবং রাষ্ট্র যুদ্ধব্যবসায়ীদের কবলে পড়লে, যেমন এ-প্রশ্নের উত্তর—হাঁ, তেমনি রাজদণ্ড শ্রেষ্ঠীদের হাতে এলে, এর জবাব—না। অতএব মানবচৈতন্য সদাসর্ব্বদা উভয়-সঙ্কটের সম্মুখীন; এবং উভয়সঙ্কট স্বভাবতই গতিপরিপন্থী ব'লে, মানুষের সংস্কার শত সহস্র বৎসর ধ'রে নির্ব্বিকার রয়েছে।

পারেতো-র জন্ম ও মৃত্যু, দুই দুটো রাষ্ট্রবিপ্লবের অব্যবহিত আগে আর পরে; এবং পিতা-পুত্রের অনিবার্য্য বৈপরীত্যের ফলে তিনি আজীবন মাৎসীনি-মার্কা উদারনীতির বিপক্ষে কলম চালিয়ে শেষ কালে যেহেতু বাহুবলের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে বিস্তর বাক্যব্যয় করেছিলেন, তাই এক দিকে যেমন ফাশিষ্ট্‌রা তাঁর প্রশংসায়

শতমুখ, তেমনি অন্য দিকে তিনি বামাচারীদের চক্ষুশূল। কিন্তু রাসেল্-এর মতে মানুষমাত্রেই যখন ঝোঁকের মাথায় হাঙ্গাম বাধিয়ে বুদ্ধির সাহায্যে সে-গোলোযোগ মেটাতে চায়, তখন একদেশদর্শী ভিন্ন আর কেউই ভাববেন না যে রাজনৈতিক পক্ষপাতের স্পর্শদোষ একা পারেতো-র সমাজতত্ত্বেই বর্ত্তমান; এবং জ্ঞানপাপী হেগেল্ যদি প্রুষ স্বৈরাচারের ডায়ালেক্‌টিক্ আবশ্যিকতা দেখিয়েও শুধু তত্ত্বের জোরে গুরুবাদী বিপ্লবীদের পূজা পেতে পারেন, তবে তথ্যের গুণে পারেতো-ও নিশ্চয় সদাশয়ীদের প্রণিধানযোগ্য। উপরন্তু তিনি আসলে ফাশিষ্ট্ নৃশংসতার অগ্রদূত নন, পরিবর্জ্জিত মনুষ্যধর্ম্মের অন্তিম মুখপাত্র; এবং মনুষ্যধর্ম্ম পশ্চিমাকাশেই অস্ত গিয়েছিলো বটে, কিন্তু তার উদয় খুব সম্ভব প্রাচ্যে। অন্ততপক্ষে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতো বৌদ্ধ ভাবুকেরাও বুঝেছিলেন যে জীবের বিবর্ত্তন অনিবার্য্য ব'লেই, তার বৃত্তি অস্থায়ী নয়, বরং বৃত্তি না থাকলে সংসারযাত্রায় ঘন ঘন পূর্ণচ্ছেদ পড়তো, কেউই কখনো প্রতীত্যসমুৎপাদের চেষ্টায় মাথা ঘামাতো না, এবং হয়তো সেইজন্যেই তাঁরা সত্য ও শুভের অলৌকিক আদর্শে আস্থা হারিয়ে সক্রেটিস্-এর সঙ্গে সমস্বরে মেনেছিলেন যে শ্রেয়োবোধ প্রত্যেকের মধ্যে বদ্ধমূল, চিত্তশুদ্ধির অভাবেই তা আমাদের গোচরে আসে না। আমার বিশ্বাস পারেতো-র "রেসিডিউ" এই বৃত্তিরই নামান্তর; কারণ বৃত্তির ন্যায় "রেসিডিউ"-ও মানস জগতের স্বতঃসিদ্ধ আদিভূত।

কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সম্প্রতি লিখেছেন যে ফাশিষ্ট্ রাষ্ট্র মুমূর্ষু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শেষ আস্ফালন হলেও ফাশিষ্ট্ দর্শন নাকি বেদ-বেদান্তের সমবয়সী; এবং কিছু কাল পূর্ব্বে অধ্যাপক ক্রস্‌ম্যান্ দেখিয়েছিলেন যে আসলে প্লেটো-ই এই অনর্থের জন্মদাতা। সুতরাং পারেতো-র প্রায়শ্চিত্তে গ্রীক্ বা বৌদ্ধ মনীষীদের ডেকে আনা হয়তো সঙ্গত নয়, স্বয়ং মার্ক্স্-এর শরণ নেওয়াই সমীচীন; এবং উপসংহারে এঁদের যতই অমিল থাক না কেন, অন্তত উপক্রমণিকায় উভয়েই বোধহয় একমত। কারণ মার্ক্স্-এর মতো পারেতো-ও বুঝেছিলেন যে ধনবিজ্ঞানই সমাজজীবনের একমাত্র নিয়ন্তা; এবং সেই হেতুপ্রভব বিদ্যার সংজ্ঞা-সম্পর্কে তাঁদের পার্থক্য যদিও সুপ্রকট, তবু অর্থনীতির আনুকূল্যেই যে শাসকবর্গ ক্ষমতাশালী— এ-বিষয়ে কোনো পক্ষেরই সন্দেহ ছিল না। ফলত তাঁরা দুজনেই অহিংসার নিন্দা রটিয়েছেন; এবং তাঁদের বিবেচনায় অর্থনীতি যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়মেরই প্রকারভেদ, তাই উৎপাদিকাশক্তির হস্তান্তরে রক্তপাত তাঁদের কাছে দূষণীয় ঠেকে নি। অবশ্য সে-আদ্যাশক্তি কী রকম, জড় বা চেতন—কোন্ বিশেষণ তার প্রাপ্য,

তাতে পরিবর্ত্তন না প্রগতি—কিসের সাক্ষ্য মেলে, এ-সব প্রসঙ্গে তাঁরা আপাতত বিপরীতগামী ; এবং মার্ক্‌স্ যেখানে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রচারক, পারেতো সেখানে অবাধ প্রতিযোগের পতাকাবাহী। কিন্তু মার্ক্‌স্-এর বিরুদ্ধে বাকুনিন্-এর অন্যতম অভিযোগ এই যে তিনি বাহ্যত সাম্যবাদের প্রতি পক্ষপাত দেখালেও, তাঁর উপদেশে কান পাতলে ষ্টেট্ সোশ্যালিজ্‌ম্-এর সাধারণ স্বত্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে পিষে মারবে ; এবং পারেতো মুখে স্বপ্রাধান্যের গুণ গাইলেও, সর্ব্বগ্রাসী ফাশিষ্ট্ রাষ্ট্র যে তাঁরই আদর্শসম্ভূত, এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা উদারনীতিকদের মধ্যে খুবই সুলভ। অপরন্তু উন্নয়নে আস্থা স্বত্বেও মার্ক্‌স্-এর জিহ্বায় যেমন ভবিষ্যদ্বাণী আটকায় নি, তেমনি কর্ম্মকাণ্ড থেকে কার্যাকারণের বালাই চুকিয়েও পারেতো স্বসমুখবাদে পৌঁছন নি, সমাজতত্ত্বই লিখে গেছেন।

অর্থাৎ প্রকাশ্যে না হোক, অন্তত প্রকারান্তরে মার্ক্‌স্-ও বৃত্তির দুর্ম্মরতা মেনে নিয়েছিলেন ; এবং তৎসত্ত্বেও তিনি যদিচ প্রগতির অস্বীকার কর্ত্তব্য মনে করেন নি, তবু নিশ্চয় এই বিশ্বাস থেকেই তাঁর বিরাট মতবাদের সূত্রপাত যে সভ্যতার প্রত্যেক পর্য্যায়েই মানুষ একই প্রয়োজনের দাস ; কিন্তু সেই প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় অন্যের আয়ত্তে ব'লে, সমানাধিকার নৈরাজ্যবাদের আগে সে কোনোমতেই থামতে পারবে না। উপরন্তু উক্ত কৈবল্যপ্রাপ্তির দিন-ক্ষণ অঙ্কশাস্ত্রের ধার ধারে না বটে, কিন্তু তার আবশ্যিকতা কায়মনোবাক্যে না বুঝলে, মনুষ্যজাতির উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী ; এবং মার্ক্‌স্-এর অনুসারে এই অভ্রান্ত দূরদৃষ্টি শুধু তাঁর ন্যায়-পরায়ণতার পরিচায়ক নয়, তাঁর বস্তুনিষ্ঠাও তাঁকে অন্য কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দেয় না। কারণ নিজের সম্বন্ধে মানুষের যত উচ্চ ধারণাই থাক না কেন, সাবধানে ইতিহাস পড়লে অবিলম্বে দেখা যায় যে তার আত্মিক সম্পদ বা ভাবের ঔদার্য্য তার ঐহিক অবস্থার উৎকর্ষ বাড়ায় নি, বরং তার ধনোৎপাদনপদ্ধতি ও পণ্যবিনিময়ের প্রথা তার বুদ্ধি ও ব্যুৎপত্তির সঙ্কোচ ঘুচিয়েছে। সুতরাং বিপ্লবের হেতু মনীষীদের শ্রেয়োবোধে বা দার্শনিকদের জীবনবেদে অন্বেষ্টব্য নয়, তার কার্যাকারণশৃঙ্খলা দ্রষ্টব্য তখনকার ধনবণ্টনে কিম্বা তদানীন্তন অর্থশাস্ত্রে। আসলে প্রচলিত বিধি-বন্দোবস্তে যখনই আমাদের আস্থা ঘোচে, তখনই ধরা পড়ে যে নূতন ধনোৎপাদন তথা পণ্যবিনিময় পদ্ধতির সঙ্গে গতানুগতিক সমাজ ব্যবস্থার তাল কেটেছে ; এবং মানুষের বিবেক বা বোধি এই বিরোধ-নিরাকরণের উপায় জানে না, যে-অবস্থান্তরের ফলে বিরোধবিশেষের উৎপত্তি তার মধ্যেই সামঞ্জস্যসাধনের প্রকরণও মেলে। এমনকি যে-ব্যক্তি বা সম্প্রদায়

এই নিত্য সংঘাতের নিমিত্ত, শাস্তি তার সাধ বা সাধ্যের তোয়াক্কা রাখে না, উৎপাদিকাশক্তি আর উৎপাদনপ্রণালীর অসঙ্গতি যেমন অতিমানুষিক, উভয়ের সন্ধিও তেমনি বস্তুজাত। আমাদের ভাবনা-বেদনা খুব জোর সেই প্রাকৃত ডায়ালেক্‌টিকের মুকুরমাত্র; এবং সেইজন্যে অবরোহী চিন্তার দ্বারা সে-নিয়মের আবিষ্কার সম্ভবপর নয়, ঘটনানিয়ন্ত্রিত আরোহী অভিজ্ঞতাই বার বার ঠেকে তাকে চিনতে শেখে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে মার্ক্‌স্‌ জড়বাদী না জীববাদী, কিম্বা তাঁর সম্বন্ধে রাসেল্‌-এর অনুমানই সত্য এবং তিনি ডিউই-প্রচারিত উপযোগবাদের আদিপুরুষ, এ-সমস্ত সমস্যার উত্থাপন ও সমাধান বর্ত্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। এখানে আমার এইটুকুই বক্তব্য যে বিষয়-সম্পর্কে তাঁর আর বর্ক্‌লি-র সিদ্ধান্ত যতই এক রকম শোনাক না কেন, তত্রাচ বিশ্বব্যাপারে তিনি বিশুদ্ধ চৈতন্যের লীলা-খেলা দেখেন নি, ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাই তাঁর কাছে অবশ্যস্বীকার্য্য ঠেকেছিলো। তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে বিষয় বিষয়ীর প্রভাবে বদলায় বটে, কিন্তু বিষয়ীর কর্ম্মপ্রবর্ত্তনা যেকালে বিষয় থেকেই আসে, তখন তত্ত্বত বিষয়ী গৌণ আর বিষয় মুখ্য; এবং বিষয়ীর সংস্পর্শে বিষয়ের বিকার অনিবার্য্য ব'লে, তার স্বরূপ যদিও কারোই ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তবু তার নির্গুণ সত্তা না মানলে আমাদের এক মুহূর্ত্তও চলে না। এইজন্যেই ফয়ের্বাখ্‌-এর বিরুদ্ধে গিয়েও মার্ক্‌স্‌ নিজেকে জড়বাদী আখ্যাই দিয়েছিলেন; এবং তাঁর প্রধান শিষ্যদ্বয় এঙ্গেল্‌স্‌ ও লেনিন্‌ বিজ্ঞানবাদের প্রতি গুরুর প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত লক্ষ্য সুদ্ধ করেন নি, জ্ঞানত না হোক, অন্তত অজ্ঞাতসারে মেকিয়াভেলি-র বস্তুপ্রত্যয়কেই বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। কারণ মেকিয়াভেলি-ও ইতিহাসের ভিতরে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ তন্মাত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন; এবং তাই মধ্য যুগের অতিজীবিত সমাজব্যবস্থা তাঁর দুঃসহ লেগেছিলো, তিনি ভজিয়েছিলেন যে ইতিহাসের সাহায্যে উপাধির আপদ কাটিয়ে একবার অব্যয়, অক্ষয় দ্রব্যগুণে পৌঁছতে পারলে, এমন এক আদর্শ রাষ্ট্র আপনা আপনি গ'ড়ে উঠবে যাতে ব্যক্তিত্বের বিসংবাদ থাকবে না, স্বত্বের সংঘর্ষ বাধবে না, ত্রিকালদর্শী পদার্থবিদের নেতৃত্বে ও দ্রব্যের নির্বিশেষ ঐক্যে মানুষ মানুষকে ভাববে ভাই। অর্থাৎ এখানেও সেই বৃত্তিই একেশ্বর; এবং তারই ফলে মেকিয়াভেলি-র বৈশেষিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান একাধারে সাম্য আর স্বাতন্ত্র্যের পরিপোষক, গতি ও স্থিতির মুখাপেক্ষী; তারই ফলে অহিংসায় মেকিয়াভেলি-র অভক্তি মার্ক্‌স্‌ ও পারেতো-র চেয়ে বেশি বই কম নয়।

সত্য বলতে কী, এ-ধরণের দ্বৈধ জড়বাদীর পক্ষে অনতিক্রম্য ; এবং জীববাদীদের অধিকাংশই যেহেতু ফিশ্‌তে-কীর্ত্তিত আত্মলীলার প্রতিভূকল্প নয়, সর্ব্বকালীন সাধারণ্যের ভুক্তভোগী, তাই তাঁরাও অভিব্যক্তিকে ন্যায়সঙ্গত করতে পারেন নি, ভেবেছেন যে অনুক্রমের নাম জপলেই বুঝি প্রগতির রথ নিরাপদে এগোবে। তাহলেও এ-রকম দার্শনিকদের অনুসারে, সংস্কৃতিবিশেষ কোন্ ছার, সমগ্র মানবসভ্যতা সুদ্ধ প্রাগ্রসর কিনা সন্দেহ ; এবং এঁদের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেকালে মানস ধাতুতে গঠিত আর মন স্বভাবতই পরিণামী, তখন জাগতিক ক্রমবিকাশে মানুষও অপাংক্তেয় নয় বটে, কিন্তু নিরবধি কালের তুলনায় মনুষ্য-জাতির পরমায়ু এতই সংক্ষিপ্ত যে সভ্যতার বিবিধ পর্য্যায়ের মধ্যে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের চেয়ে অনেক বেশি। অবশ্য তৎসত্ত্বেও হেগেল্ মানুষের ঐকান্তিক বিবর্ত্তনে আস্থা হারান নি, দেখিয়েছিলেন যে সমাজজীবনের আকার-প্রকার যেমন দেশে দেশান্তরে তথা যুগে যুগান্তরে অবিকার থাকে, তেমনি সেই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যে-উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের উপরে স্থাপিত, তার নিয়ত পরিবর্ত্তন কোনোমতেই থামানো যায় না ; এবং টয়েনবি-র বিশ্বাস যে সভ্যতায় সনাতন জড়প্রকৃতির স্থূল হস্তাবলেপ যতই পরিষ্কার হোক না কেন, তবু বস্তুর অভ্যাঘাতে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া তো চিরনির্দ্দিষ্ট নয়ই, এমনকি বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্কে বৈচিত্র্য অনিবার্য্য ব'লেই, একই প্রতিবেশে ভিন্ন যুগের মানুষ ভিন্ন চিৎপ্রকর্ষে পৌঁছতে বাধ্য। কিন্তু এ-কথা মানলেও প্রগতির পূজা আমাদের আশুকৃত্য নয় ; এবং তথ্যের গরজে যদি সংস্কৃতির স্তরভেদ স্বীকার্য্যই ঠেকে, তবু সত্যের খাতিরে এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য যে সভ্যতার পর্য্যায়পরম্পরায় কোনো কালাতীত গুণের তারতম্য ধরা পড়ে অথবা সেগুলোর জাতিবিচারে অগ্র-পশ্চাৎ ব্যতীত অপর কোনো পার্থক্য দ্রষ্টব্য।

অন্য সকল সিদ্ধান্ত আপাতত জাত্যভিমানের ফল ; এবং জাত্যভিমান কেবল নাৎসী বিজিগীষারই শনি নয়, দুর্দ্দমনীয় জার্মানির মতো পরাধীন ভারতও নিজেকে সভ্যতার জন্মভূমি ভাবে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সম্প্রতি যেমন মহেঞ্জো-দড়োর খবর শুনেছেন, তেমনি মায়া সংস্কৃতির বার্ত্তাও আর তাঁদের কাছে গোপন নেই ; এবং মিশর আর মায়ার অদ্ভুত সাদৃশ্য সত্ত্বেও, অব্যাহত আদান-প্রদানের অসুবিধা দেখে আমরা যখন সে-দুই ভূখণ্ডের আত্মীয়তা অস্বীকার করি, তখন নীলনদের গভীর কর্দ্দমে সিন্ধু প্রদেশের মুদ্রানুসন্ধান হয় অসাধ্যসাধনের নামান্তর, নয় আত্মপ্রসাদের সাক্ষ্য। আসলে ইতিহাসে কার্য্যকারণশৃঙ্খলার আরোপ

হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা ; এবং প্রাচীন পৃথিবীও একেবারে দুর্গম ছিলো না ব'লে, এক স্থানের সামগ্রী পর্য্যটকদের মারফৎ স্থানান্তরে যেতো বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীরা অপরিচিত বস্তুর বা ভাবের যথাযথ ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই শিখতো না, প্রায়ই তাকে নূতন কাজে লাগাতো। উদাহরণত জ্যামিতির পুরাবৃত্তান্ত স্মরণীয় ; এবং অহিন্দু গবেষকদের অনেকেও যদিচ বৈদিক সাহিত্যেই তার সাক্ষাৎ পেয়েছেন, তবু সেই ভূয়োদর্শনের সাহায্যে গ্রীক্‌রা শুধু বেদি বানায়নি, সে-নিষ্প্রমাণ প্রাচ্য বিদ্যার ভিত্তিতে তারা গ'ড়ে তুলেছিলো প্রাশ্চাত্ত্য প্রজ্ঞার অটল কীর্ত্তিস্তম্ভ। হিন্দুস্তানী গাড়ু, ঘটি বা বদ্‌নার ভাগ্যবিপর্য্যয় আরো রোমহর্ষক ; এবং অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ানের সঙ্গে কালাপানি পেরিয়ে সেই লজ্জাকর শুদ্ধিপাত্র আর আঁস্তাকুড়ের এক পাশে প'ড়ে থাকে না, সগৌরবে স্থাপিত হয় ড্রইং রুমের সমুচ্চ শেল্‌ফে। অবশ্য উত্তমর্ণ আর অধমর্ণের এতখানি বৈপরীত্য সর্ব্বত্র চোখে পড়ে না ; দুই পক্ষ যেখানে একই অঞ্চলের বাসিন্দা, সেখানে সমীক্ষার বিস্তার কমালে, একটা ধারাবাহিকতার আভাস মিললেও বা মিলতে পারে ; এবং সেইজন্যেই হোয়াইট্‌হেড্‌-প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞানীরা পশ্চিমের দর্শন-বিজ্ঞানে আজও প্লেটো-র স্বাক্ষর খোঁজেন। কিন্তু এ-কথা তাঁদের মুখেও বাধে যে আধুনিক য়ুরোপ প্লেটোনিক এথেন্স্‌-এর প্রতিচ্ছবি ; এবং ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের পরেও চীন ও জাপানের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবন যে পরিমাণ স্বকীয়, য়িহুদি-প্রস্তাবিত খৃষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে মুস্‌লিম্‌-প্রচারিত মনুষ্যধর্ম্ম ঢুকিয়ে প্রতীচ্য ততোধিক স্বতন্ত্র।

কারণ জাত্যভিমান যতই নিন্দনীয় হোক না কেন, জাতির বৈশিষ্ট্য নিরতিশয় নিশ্চিত ; এবং এই পার্থক্যের কষ্টিপাথরে যদিও উত্তম-অধমের যাচাই চলে না, তবু মানুষের আচার-ব্যবহার তথা মতিগতি এর দ্বারা এতখানি নির্দ্ধারিত যে দেখে শেখা প্রায়ই তার সাধ্যে কুলয় না, সে সাধারণত ঠেকেই শেখে। অথচ সে যেহেতু মানুষ, তাই মানুষী সমস্যার সবগুলোই তাকে আজীবন ঘিরে থাকে ; কেবল সমাধানের বেলায় পরের মুখে ঝাল খাওয়া তার বারণ ; প্রত্যেকটা নিজের বুদ্ধিতে বুঝে, নিজের উপায়ে সকলের দাবি না মেটালে সে নিজেকে সজাগ রাখতে পারে না, জীবন্মৃত্যুর অগাধে তলিয়ে যায়। সেইজন্যেই সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন ব্যক্তির বৈষম্যে মন্দা পড়ে, তখন জাতির যৌবনসুলভ তেজ ফুরিয়ে তাকে বর্ত্তায় বার্দ্ধক্যোচিত অনীহা, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের প্রেরণা ভুলে সে মজে স্মৃতির কুহকে, স্বাবলম্বীদের নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে সে ওঠে বসে সংখ্যাধিকের

পরামর্শে ; এবং তার পর প্রতিবেশীদের দৃষ্টান্ত তার গোচরে আসে না, উপযাচকের আবেদন তার কানে ঢোকে না, সে ম'রে প্রেতত্ব পায় আর কণ্ঠহারা ছায়ামূর্ত্তি নিয়ে জীবিতদের সামনে প্রহেলিকার মতো ভেসে বেড়ায়। অন্ততপক্ষে তাই ভিকো-র বিশ্বাস ; এবং সেই বিশ্বাসের পিছনে মনোবিদেরা ভিকো-র নিঃসহায় শৈশব ও অক্ষম জরার খোঁজ পেয়েছেন বটে, কিন্তু গত দু শ বছরের গভীর গবেষণাতেও এমন কোনো অবিসংবাদিত তথ্য বেরোয় নি যার ফলে এলিয়ট্-স্মিথ্-এর "সংস্কৃতিব্যাপন" আজ সর্ব্ববাদিসম্মত। বরঞ্চ সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্বে আমাদের জ্ঞান বাড়ায় আমরা নিঃসংশয়ে জেনেছি যে মানুষের ঐতিহ্যবোধ ইতিহাসের চেয়েও পুরাতন ; এবং "সাফোক্ অস্থিস্তর"-এর উপরে দাঁড়িয়ে ময়র, লীকি প্রভৃতি পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন যে প্লায়োসীন্ যুগেই ডার্ম্স্ডিনিয়ন্, আইসিনিয়ন্ ও প্রীশেলিয়ন্-নামক তিন-তিনটি সংস্কৃতি বহু সহস্র বৎসর ধ'রে পূর্ব্ব এংলিয়া-তে পাশাপাশি বাস ক'রেও কিছুমাত্র বদলায় নি বা পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যে হাত দেয় নি।

উপরন্তু সংস্কৃতির আপেক্ষিকতা শুধু প্রাগিতিহাসের সাক্ষ্যেই গ্রাহ্য নয়, ভিকো-র গুরুবিস্মৃত শিষ্য স্পেংলার সভ্য জাতিদের ইতিহাসেও অনুরূপ অবৈকল্যের সাক্ষাৎ পেয়েছেন ; এবং মুখ্যত পশ্চিমের ও গৌণত প্রাচ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতঃসিদ্ধ সংস্কৃতিধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন যে মানবসভ্যতা কোনো শাখা-প্রশাখা-যুক্ত মহামহীরুহ নয়, তাকে নিরবচ্ছিন্ন কম্বুরেখাতেও আঁকা যায় না, তার একমাত্র উপমান অবচ্ছিন্ন ব্যক্তি, উত্থান-পতন-শীল, যৌবন-জরা-সম্পন্ন স্বল্পায়ু ব্যক্তি এমনকি এ-তুলনাও আংশিক ভাবেই সত্য, এবং বংশরক্ষার ক্ষমতা আছে ব'লে মুমূর্ষু মানুষ যদিচ খানিকটা মৃত্যুঞ্জয়, তবু জাতিগত সভ্যতা সর্ব্বত্রই অপুত্রক, তার মৃত্যু পূরোপুরি বিলুপ্তি। সুতরাং সভ্যতা মণ্ডলাকার ও সীমাবদ্ধ, এবং তার স্বভাব চক্রবর্ত্তী ও আত্মঘাতী। অর্থাৎ তার জীবনের প্রথমার্দ্ধ বর্দ্ধিষ্ণু আর শেষার্দ্ধ ক্ষীয়মাণ ; যেখানে তার যাত্রারম্ভ, সেখানেই তার যাত্রাশেষ ; তার উন্নতি তথা অবনতি একই অন্তঃপ্রেরণার অবশ্যম্ভাবী ফল। স্পেংলারী পরিভাষায় উক্ত আরোহণ-পর্ব্বের নাম সংস্কৃতি আর অবরোহণটা সভ্যতা-অভিধেয় ; এবং তাঁর বিশ্বাস যে এই নাগরদোলার ওঠা-পড়া মনুষ্যজাতির জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত যেহেতু কোথাও কখনো থামে নি, তাই এর গতিবিধি নিরাসক্ত মনে বুঝে নিলে, সৃষ্টির মূল রহস্য আমাদের কাছে ধরা পড়বে। কারণ কীর্ত্তিমান মনুষ্যগোষ্ঠীর এক একটা এক একটা নক্ষত্রের মতো, যার প্রত্যেকটাই বিকর্ষণগুণে

অন্যদের থেকে একেবারে পৃথক বটে, কিন্তু আচরণে ও আয়তনে তাদের মধ্যে এতখানি সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান যে অপর সকলের প্রতিমান হিসাবে কোনোটাই নগণ্য নয়। শুধু তাই নয়, স্পেংলার-এর মতে সকল সভ্যতার কার্য্যক্রম যেমন এক, তেমনি সেই কার্য্যক্রমের নির্ব্বাহকেরা সমানধর্ম্মী, হয়তো বা আকৃতিতেও অভিন্ন, এবং সেইজন্যে দুটো সভ্যতার সংমিশ্রণ বা অন্তঃপ্রবেশ অনাবশ্যক ও অভাবনীয় হলেও, আবেষ্টনবিশেষের অবরোধে আর পাঁচটা পরিবেশের পরিকল্পনা সার্থক ও সম্ভবপর।

তবে সভ্যতার ব্যষ্টিসমূহ তুল্যমূল্য শুধু সমস্যার দিক থেকে; সমাধানের উপরে জোর দিলে, তাদের বৈচিত্র্য সুপ্রকট; এবং এই প্রভেদ প্রতিপাদনের জন্যে পাউলি-প্রস্তাবিত ব্যাবর্ত্তনবিধির ঐতিহাসিক প্রয়োগ প্রশস্ত নয়, সকল জাতির জীবনেই যদৃচ্ছার চাপ যত সমমাত্রিক হোক না কেন, ভবিতব্যের বিচারে তাদের বৈষম্য স্বতঃপ্রমাণ। এই পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে স্পেংলার প্রাচীনদের বিশ্বাত্মিক পটভূমির সঙ্গে অর্ব্বাচীনদের আধ্যাত্মিক পরিপ্রেক্ষিতের বৈরূপ্য দেখিয়েছেন; এবং তাঁর বিশ্বাস সভ্যতার এ-দুই পর্য্যায়ে অনুরূপ প্রয়োজন আনুষ্ঠানিক সৌসাদৃশ্য ঘটিয়েছে বটে, কিন্তু গ্রীকো-রোমান্‌দের দৈবানুগত্য আর আধুনিক য়ুরোপীয়ানদের স্বাবলম্বন স্বভাবত এতই পরস্পরবিরোধী যে কবিরা উভয়ত্র একই তাগিদে ট্র্যাজেডি লিখলেও সে-দু রকম ট্র্যাজেডির তাৎপর্য্য একেবারে আলাদা। অবশ্য দুটো সম্পূর্ণ সভ্যতাব্যষ্টির বৈপরীত্যও কালাবর্ত্তের বৃত্তাভাস কিনা অথবা ভূত-ভবিষ্যতের সকল সভ্যতাকে পাশাপাশি সাজালে, একটা চিরন্তন উত্থান-পতন ধরা পড়ে কি পড়ে না, সে-সম্বন্ধে স্পেংলার-এর দর্শনে কোনো হঠোক্তি নেই; এবং সারোকিন্‌-এর বিরাট পাণ্ডিত্য যদিও পারেতো-র প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না পেরে মানুষের অতীত বিবর্ত্তনে একটা একান্তর ছন্দের সন্ধান পেয়েছে, তবু সে-ছন্দের মূল সূত্র জানবে হয়তো মনুষ্যগোষ্ঠীর সর্ব্বশেষ প্রতিনিধি। কিন্তু ইতিমধ্যে রুথ্‌ বেনিডিক্ট্‌ প্রাক্‌সভ্য সমাজেও স্বাতন্ত্র্য ও সমগ্রতাই প্রত্যক্ষ করেছেন; এবং তাঁর মতে সেই রেড্‌ ইণ্ডিয়ান্‌ রূপক অক্ষরে অক্ষরে সত্য, যাতে প্রত্যেক জাতি একই প্রাণপ্রবাহ থেকে তৃষ্ণার জল তুলেছিলো ঈশ্বরদত্ত বিভিন্ন মৃৎপাত্রে। কারণ মানুষের সামনে অনন্ত সম্ভাবনা খোলা থাক বা না থাক, পরের মুখ চেয়ে বাঁচতে গেলে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের অর্জ্জন তার পক্ষেও আবশ্যিক; এবং আমাদের কণ্ঠ থেকে যত আওয়াজ বেরোয়, আলাপের সময়ে সে-সবগুলোকে কাজে লাগালে যেমন অর্থ-বোধের আশা বিড়ম্বনা, তেমনি শক্যতামাত্রেই শক্তি-রূপে ফুটে উঠলে বাইবেল্মী

সৃষ্টিবর্ণনার সঙ্গে ভূপঞ্জর বিদ্যার বিবাদ কোনোদিনই বাধতো না, প্রাণিবিজ্ঞানীরাও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে ভাগবত দাক্ষিণ্যেরই গুণ গাইতেন।

মানুষী জ্ঞানের বর্ত্তমান জটিলতায় সে-রকম সারল্য আর পোষণীয় নয় ব'লেই, টয়েনবি-র মতো সাম্যবিলাসীও আজ মানতে বাধ্য যে পরিবেশের ক্রিয়া যদিও সকল জাতির পক্ষে সমান, তবু ক্ষেত্রবিশেষে তার প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই পৃথক; এবং সারা পায়ে জুতোর ঘর্ষণ লাগলেও যখন কড়া পড়ে শুধু দু-একটা জায়গায়, সেকালে চার দিক থেকে অনুরূপ আক্রমণ সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে তাদের জোর দেখালে বিস্ময়প্রকাশ অসঙ্গত। কেননা জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সাদৃশ্য এখানেও সুপরিস্ফুট; এবং আড্‌লার-এর মতে একই উত্তরাধিকারে জন্মে, একই শিক্ষা পেয়ে দুই ভাই যেমন তাদের নিজস্ব দেহের অসম্পূর্ণতাবশত দু ধরণের মেজাজ বেছে নিয়ে সেই মৌলিক ক্ষতিপূরণের প্রয়াস পায়, তেমনি টয়েন্‌বি-র বিবেচনায় দুটো জাতির বাহ্য পরিমণ্ডলে আপাতত কোনো তারতম্য না থাকলেও তাদের বিশ্ব-বীক্ষায়, তাদের জীবনবেদে, তাদের শ্রেয়োবোধে সারূপ্যের কোনো আভাস মেলে না। তৎসত্ত্বেও টয়েন্‌বি প্রগতিতে আস্থাবান; এবং তাঁর বিচারে সভ্যতার মশাল বারম্বার হাত বদলালেও, প্রত্যেক আলোকপ্রাপ্ত জাতি তাকে আপন আগুনে জ্বালে নি, উদ্বর্ত্তনের কুটিল পথে অগ্রগামীরা বয়সোচিত অবসাদে ধূলোয় লুটলে, কোনো পশ্চাদ্বর্ত্তী তরুণদল ছুটে এসে তাদের বোঝা আরও দু-এক পাক এগিয়ে দিয়েছে। তখন অনুসন্ধানে জানা গেছে যে এই অজ্ঞাতকুলশীল স্বেচ্ছাসেবকেরা পরমায়ুতে ও পরাক্রমে পুরশ্চারীদের সমকক্ষ হলেও, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে এদের সম্বন্ধ যেহেতু অগ্রজদের চেয়ে অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক, তাই ক্ষিপ্রতার প্রতিযোগিতায় এদের সাময়িক উৎকর্ষ হয়তো বা অনিবার্য্য। তাহলেও স্থিতিস্থাপকতার সীমা তথা প্রকারভেদ আছে; এবং সম্প্রতি জেরাল্ড্ হর্ড্ লিখেছেন বটে যে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করতে পেরেই মনুষ্যেতর প্রাণিজগতের প্রাগ্রসর শাখা এখন মনুষ্যপদে প্রতিষ্ঠিত, তবু কীথ্-এর ন্যায় সাধারণিক নৃতত্ত্ববিদ্‌ও সৌজাত্যবিদ্যার ঠেলায় আজ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে মানুষের জাতিগত বিভাগ প্রাঙ্‌মানুষিক অনৈক্যের পরিণাম।

বলাই বাহুল্য এই প্রভেদ অতিভৌগোলিক; এবং নিসর্গের নির্দ্দেশ এ-রকম নেতিবাচক যে দ্বৈপায়ন জাতিমাত্রেই নৌবহরে ইংলণ্ডের প্রতিযোগী নয়, শুধু যে-দেশের ত্রিসীমানায় জলের নাম-গন্ধ নেই, সেখানে পোতনির্ম্মাণের প্রয়োজনও স্বভাবত অনুপস্থিত। এমনকি শ্বেত, কৃষ্ণ ও পীত—এই তিন মহাজাতির বিশেষ বিশেষ দৈহিক

দোষ-গুণও যে অন্তর্বিবাহের পরে একাকার হয় না, এমন নিরুক্তি শুধু নাৎসীদেরই সাজে ; এবং যদি তর্কের খাতিরে মানাও যায় যে নীল চোখ, কটা চামড়া, সোনালী চুল ইত্যাদি উপলক্ষণগুলো মেণ্ডেলীয় নিয়মেরই আজ্ঞাধীন, তবু আমাদের বুদ্ধি ও ব্যুৎপত্তি, আমাদের মেধা ও মনীষা যে প্রকৃতির দান নয়, পালনের ফল, এ-বিষয়ে আজ আর বোধহয় খুব বেশি তর্ক-বিতর্ক নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-প্রসঙ্গেও বিশেষজ্ঞেরা একমত যে রক্তের চাতুর্ব্বর্ণ্যে সঙ্করের উদ্ভব অসম্ভব এবং যে-পুরুষানুক্রমিক রোগ মাথার আকৃতি বা নাসার খর্ব্বতার মতো একাধিক ক্রোমোসোম্-এর বশবর্ত্তী, বহির্বিবাহের দ্বারাও তার প্রতিকার দুঃসাধ্য। উপরন্তু সন্তানপোষণের রীতি-নীতি শুধু পিতা-মাতার ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়, তার উপরে প্রতিবেশীদের প্রভাবও যথেষ্ট ; এবং যে-নিগ্রোর মার্কিনে জন্ম, সে যেমন বর্ণবৈষম্য সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গদেরই কুটুম্ব, তেমনি মিশনারী প্রচেষ্টা কাফ্রিদের এখনো সাহেব বানাতে পারে নি, তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান যে-পরিমাণে অনুপকারী, স্বদেশী ইন্দ্রজাল সেই অনুপাতেই মঙ্গলময়। অবশ্য আবহ সকল ক্ষেত্রে সমান ক্ষমতাশালী নয় ; এবং বর্ত্তমান জগতে পশ্চিমের প্রতিপত্তি এত পরিব্যাপ্ত যে প্রবাসী য়ুরোপীয়দের ছেলে-মেয়েরা আপাতত স্বধর্ম্মানুসারেই বেড়ে ওঠে। কিন্তু আজীবন প্রাচ্যে কর্মঠবৃত্তি বজায় রেখে তারা যখন শেষ বয়সে স্বজনের মাঝে ফেরে, তখন তাদের অনেকেই আর স্বস্তি পায় না, নিজ বাসভূমিতেও তারা কাল কাটায় বিদেশিসুলভ সঙ্কোচে। হয়তো সেইজন্যেই জীববিদ্যার পূর্ব্বাচার্য্যেরা পারিপার্শ্বিককে কুলসংক্রামের উপরে স্থান দিয়েছিলেন ; এবং যান-বাহনের ক্ষিপ্রতায় আর যন্ত্রপাতির আশীর্ব্বাদে পৃথিবীর প্রাথমিক বৈচিত্র্য ক্রমেই মিলিয়ে আসছে বটে, কিন্তু মানুষের শরীরে যত দিন জল-বায়ুর প্রভুত্ব খাটবে, তার ব্যবসা যত দিন সামবায়িক সঙ্কল্পের মুখ চাইবে, তত দিন সে যে কী ক'রে গোষ্ঠীর গণ্ডি খণ্ডাবে, তা অন্তত আমার কাছে দুর্ব্বোধ্য।

অবশ্য আমার বোধশক্তি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ; এবং আমি বুঝি বা না বুঝি, ভূমাবাদী হেগেল্-এর মতো ভূয়োদর্শী মার্ক্স্-ও নির্ভাবনায় রটিয়েছিলেন যে গুণ তো গণনার অমোঘ পরিণতি বটেই, এমনকি পরস্পরবিরোধী পদার্থের সমন্বয় সেধেই সৃষ্টি কৈবল্যের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু মর্য্যাদাবিচারে আমার স্থান উক্ত তত্ত্বজ্ঞদের যত নিচেই হোক না কেন, তবু তাঁদের সিদ্ধান্তও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা অক্ষমতার ফল ; অন্ততপক্ষে তার পিছনে কোনো সর্ব্ববাদিসম্মত যুক্তির সমর্থন নেই ; এবং বিপরীতধর্ম্মী পিতা-মাতার সঙ্গম সন্তান-সম্ভাবনার একমাত্র উপায় ব'লে, যদি

আরিষ্টটেলী তর্কশাস্ত্র অর্ব্বাচীনদের কাছে অস্বীকার্য্যই ঠেকে, তবে অশ্বেতরের ক্লৈব্যও নিশ্চয় ডায়ালেক্‌টিক্‌ ন্যায়দর্শনের পরিপন্থী। হয়তো এ-আপত্তির আশঙ্কা মার্ক্‌স্‌-এর মনেও সতত জাগরূক ছিলো; এবং সেইজন্যেই তিনি কখনো আন্বীক্ষিকী নিয়ে মাথা ঘামান নি, সেই শ্রেণিসংরক্ষিত রহস্যের সামান্যীকরণ শিষ্যদের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে নিজে ডায়ালেক্‌টিকের ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহে প্রাণপাত করেছিলেন। তবে অত গবেষণার পরেও ডায়ালেক্‌টিকের ঐকান্তিক প্রগতি অদ্যাবধি অপ্রমাণিত রয়েছে; এবং গত পাঁচ শ বছরের পাশ্চাত্ত্য ইতিবৃত্তে তার সাক্ষ্য যেমন নিঃসন্দেহে মেলে, তেমনি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগ তথা অত্যাধুনিক কাল স্পষ্টতই মার্ক্‌সীয়দের বিপক্ষে। তাছাড়া ইতিহাস একা য়ুরোপেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, তাতে পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডেরও স্বত্ব আছে; এবং উন্নতিসূচক নির্দ্বন্দ্বের দাবি যখন রোম সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেই অশোভন, তখন অন্যত্র সে-আদর্শের গুণগান ভূতের মুখে রামনামের চেয়েও শ্রুতিকটু। আসলে মানুষের বয়স এত অল্প যে তার মতিগতিনিরূপণের সময় এখনো আসে নি; এবং ইতিমধ্যে তার সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জেনেছি, তাতে তার উদ্বর্ত্তন আর পরাবর্ত্তন—এ-দুটোর কোনোটাই নিঃসংশয়ে ধরা পড়ে না, কেবল এই পর্য্যন্ত বিনা প্রশ্নে মানা যায় যে স্বভাবসিদ্ধ দুর্ব্বলতার প্রতিবিধানকল্পে সমষ্টিবদ্ধ জীবনযাত্রায় পৌঁছেও সে যেহেতু শ্রমবিভাগ ব্যতীত সামাজিক শক্তির অপব্যয় আটকাতে পারে নি, তাই তার বিধিলিপিতে সঙ্কলনের প্রবৃত্তি যত না প্রবল, বিকলনের প্রয়োজন ততোধিক প্রকট।

আমার অনুমানে মানুষের জাতিগত বৈষম্য উক্ত শ্রমবিভাগের ফল; প্রকৃতি-পূজার আধিক্য আমার চোখে হাস্যকর ঠেকলেও, প্রাণিমাত্রেই যেকালে শ্রেয়োবোধের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেয়, তখন শ্রমবিভাগের বৃহত্তম সংস্করণ বোধহয় বহুলাঙ্গ জীবলোকে। এমনকি জড়জগতেও কেউ কেউ শ্রমবিভাগের সন্ধান পেয়েছেন; এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে অভিব্যাপ্ত বস্তুর আদিম অদ্বৈত কেবল আয়তনগুণেই আজ অসংখ্যাত নীহারিকায় বিদীর্ণ। কিন্তু বিচ্ছেদই শ্রমবিভাগের সার কথা নয়, যোগ-বিয়োগের তাৎকাল্যেই তার প্রতিষ্ঠা; এবং বস্তুবিশ্বে আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রতিসাম্য ঘটলেও, তার দুর্নিবার বিস্ফোটন শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক তারাপুঞ্জকেই যেহেতু নিঃসঙ্গ ক'রে তুলবে, তাই জড়ের রাজ্যেও সহযোগপ্রসূত শ্রমবিভাগের সুব্যবস্থা খোঁজা আমার বিবেচনায় পণ্ডশ্রম। কারণ শ্রমবিভাগ আর গৃহবিবাদের মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের ব্যবধান বর্ত্তমান; এবং আদার ব্যাপারীকে জাহাজের খবর আনতে পাঠালে,

অন্ততপক্ষে সময়নষ্ট অবশ্যম্ভাবী ব'লে, সমাজভুক্ত জীব যদিও বিভিন্ন বৃত্তির স্বাতন্ত্র্য মানে, তবু অনধিকার চর্চ্চার লোভ সে সামলায় শুধু এই প্রত্যাশায় যে সে নিজের গতর খাটিয়ে অপরের একটা প্রয়োজন মেটালে, অন্যেরা তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার সকল অসুবিধা ঘোচাবে। অর্থাৎ যথোচিত শ্রমবিভাগে অন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান নেই; এবং কৃষক যেমন মোটর চালাতে না পেরে লাঙল ধরে না, হলচালনায় সে স্বভাবত ব্যুৎপন্ন ভেবেই স্বেচ্ছায় মাটি চষে; তেমনি চীনজাতিও শৌর্য্যের অভাববশত তিতিক্ষার মন্ত্র জপে অন্তঃপ্রেরণার প্ররোচনায় সৌজন্যকে পৈশুন্যের চেয়ে শুভঙ্কর বুঝেই তারা বর্ব্বরদের আস্ফালন যথাসাধ্য সয়। তবে নিরুপায় হলে শিল্পীরাও হিসাব লিখতে বাধ্য, চীনেরা বন্দুক ছুঁড়তে অপারগ নয়; এবং সে-অবস্থায় পৌঁছলে, ডায়ালেক্‌টিক সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত দেখা যায় বটে, কিন্তু সভ্যতা যে প্রাগ্রসর এ-রকম মন্তব্য কানে কেমন বেসুরো বাজে।

ফলত আজকাল অনেকের মনে সন্দেহ জেগেছে যে মার্ক্‌স্ হয়তো হেগেল্-কে ঠিক পায়ের উপরে দাঁড় করাতে পারেন নি, বরং সেই চেষ্টার দরুন নিজেও উল্‌টে পড়েছিলেন; এবং সেইজন্যেই তিনি বোঝেন নি যে সত্যই যদি ডায়ালেক্‌টিক থাকে, তবে তার গতি বিরোধ থেকে সমন্বয়ে অথবা দুই থেকে একে নয়, তার শ্রেঢ়ী অখণ্ড থেকে খণ্ডে, শৃঙ্খলা থেকে সংঘাতে, সদ্ভাব থেকে অভাবে। অর্থাৎ যে-নিয়মে জীবকোষ নিরন্তর বাড়তে পায় না, একটা প্রাক্‌নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় পৌঁছলেই দু ভাগে ভাঙে, সেই বিধির অনুসারেই জাতি তথা ব্যক্তির প্রাথমিক একাগ্রতা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত বুদ্ধির জন্ম দেয়; এবং সেই দ্বন্দ্ব জাতির বেলা যেমন বর্ণাশ্রম বদলায় শ্রেণিসংঘর্ষে, তেমনি ব্যক্তির—বিশেষত শিল্পী ব্যক্তির—ক্ষেত্রে কল্পনা হারায় সঙ্কল্পে। অবশ্য কেন এমন ঘটে, তার নৈয়ায়িক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমার অজ্ঞাত; এবং আমি যখন স্বয়ং হেগেল্-এর অপ্রমেয় প্রত্যয় মানতে অসম্মত, তখন আমার স্বপক্ষে সোরেল্-এর সাক্ষ্য নিশ্চয়ই কেউ শুনতে চাইবেন না। কিন্তু সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে, সুখ-শান্তির প্রলোভনে চোখ বুজে, ধনিকদের চক্রান্তপ্রসূত রামরাজ্যের মায়া কাটিয়ে, রূপকথার নিয়োগে প্রতিনিয়ত মাতিয়ে বেড়ানো শ্রমিকদের কর্ত্তব্য হোক বা না হোক, ক্ষীয়মাণ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার রোগনিদানে সোরেল্-এর মতখণ্ডন খুব সম্ভব অসাধ্য; এবং ষ্টালিন্-ভক্তির আতিশয্যে তা দু-চার জনের সাধ্যে কুলালেও, গত কয়েক বছরের রুষ রাষ্ট্রদ্রোহীদের নাম, সংখ্যা ও স্বীকারোক্তি

দেখার পরে অন্তত বস্তুনিষ্ঠেরা আর বলবেন না যে ত্রিভুজই জীবযাত্রার যথাযথ প্রতিকৃতি,' তার ধর্ম্ম বাদী, ও বিবাদীর বিসংবাদমোচন। কারণ প্রাণপ্রবাহ আসলে একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত, যার কেন্দ্রে অবস্থিত নাস্তি আর পরিপার্শ্বে বর্ত্তমান অহেতু শূন্যতা; এবং চক্রচর সমাজ শুধু অর্দ্ধ পথে গন্তব্যবিমুখ নয়, এমনকি অন্তর্বিক্ষোভের প্রাবল্যে তার খানিকটা ছিট্‌কে গেলেও, সে-ছিন্নাংশ যেহেতু ভ্রমিমূলক, তাই কলামাত্রেই একাধারে আত্মস্থ ও আত্মবিস্মৃত।

সম্ভবত সেইজন্যেই কাথলিক্ ও প্রটেষ্টান্টের প্রাথমিক মতান্তর কালক্রমে ব্যাপকতর ধর্ম্মানুষ্ঠানে সঙ্গত হয় নি, তাদের মনান্তর যুগে যুগে এত বেড়েছে যে ইদানীং তারা পরস্পরের অস্তিত্ব ভুলে নিজ নিজ সম্প্রদায়ে নব নব সংঘাতের সৃষ্টি করছে। সেইজন্যেই ধনতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক আজ বিলুপ্তপ্রায়; এবং সমানাধিকারে উভয়ের সমন্বয় দূরের কথা, সম্প্রতি ধনতন্ত্র যেমন অবাধ প্রতিযোগ ও একচেটিয়া ব্যবসার দোটানায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, তেমনি সমাজতন্ত্র আবার ট্রট্স্কি-ষ্টালিন্-এর দ্বৈরথ যুদ্ধে কণ্ঠাগতপ্রাণ। সেইজন্যেই নাৎসী পাশবিকতা হয়তো চিরদিন টিঁকবে না; অন্ধ বা অসবর্ণ উদারনৈতিকেরা তাকে না বুঝে যতই প্রশ্রয় দিন্, কোনো পুনরুজ্জীবিত রোয়েম্-ই তার সর্ব্বনাশ সাধবে। তার পর আসবে কোনো কনিষ্ঠতর ব্যষ্টির পালা; এবং সে-আপদ চুকতে না চুকতে ঘুণ ধরবে পশ্চাদ্বর্ত্তী পর্য্যায়ের সর্ব্বাঙ্গে। কারণ হয়তো এণ্ট্রাপি-ঘটিত তাপ-মৃত্যুতে সুদ্ধ এ-বৈকল্যের শেষ নয়; এবং সংসারের বিশ্লেষ অব্যবস্থার চরমে পৌঁছেই থামবে না, এমনকি বৌদ্ধ সংবর্ত্তের মহাশূন্যেও ঘুরে বেড়াবে নিরবলম্ব বৃত্তি। ইতিমধ্যে সেই অবশ্যম্ভাবী পরিনির্ব্বাণের অকাল বোধন যাঁদের অনভিপ্রেত তাঁরা প্রগতির প্ররোচনাতেও পরকীয় স্বভাবসংশোধনের প্রয়াস পাবেন না, মানবেন যে জনসাধারণকে এক ছাঁচে ঢেলে সাজালেও যখন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘোচবার নয়, তখন আত্মম্ভরিতার চেয়ে আত্মচিন্তাই নিশ্চয় বেশি লাভজনক এবং প্রতিবেশীর উপরে গায়ের জোর ফলালে তাকে যদিও দাবানো যায়, তবু তার স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতীত আপন স্বায়ত্বশাসনের আশাও বিড়ম্বনা। আমার বিশ্বাস, সাযুজ্য নয়, এই দ্বৈত-বোধের উপরেই সাম্যবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা; এবং যে-মানুষ সত্যই নিজেকে চেনে, তার কাছে যেমন স্বীয় ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সে এ-জ্ঞানেও বঞ্চিত নয় যে জীবমাত্র বৈশেষিক ব'লেই তার বৈশিষ্ট্য অবশ্যস্বীকার্য্য। অর্থাৎ সমগ্র' বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই সম্পূর্ণ একক, আমরা অদ্বিতীয় শুধু নাতিসামান্য ক্ষমতার জোরে; এবং ক্ষমতাবিশেষ যেহেতু বিশেষ অক্ষমতার প্রতিবাদী, তাই সর্ব্বত

সকলের মূল্যই সমান, ব্যষ্টিও আসলে সাধারণ দোষ-গুণের দেশ-কাল-গত সমষ্টি।

অথচ এই আত্মদর্শনের ফলে আত্মধিক্কার জাগে না, বরং আত্মপ্রসাদ ,চোকার সঙ্গে সঙ্গেই যথার্থ আত্মপ্রত্যয়ের উপলক্ষ্য জোটে। কারণ মানুষ যখন দেখে যে তার ইন্দ্রিয়ার্থ আর অন্য সকলের ইন্দ্রিয়ার্থ তুল্যমূল্য, পার্থক্য শুধু অবস্থানে, সে যখন জানে যে তার জন্মসংস্কার আর অন্য সকলের জন্মসংস্কার মুখ্যত অনুরূপ, প্রভেদ কেবল সেই সংস্কারসমূহের পদবিন্যাসে, এবং এই রকম বিশ্লেষণে একটার পর একটা উপসর্গ খসাতে খসাতে সে যখন আপনার মূল ধাতুতে গিয়ে পৌঁছয়, তখন আর তার সন্দেহ থাকে না যে সে এমন একটা অনির্ব্বচনীয় আদিভূতের সম্মুখীন যা তার আয়ত্তের বাইরে, যাকে সে কোনোদিনই মানে নি, অথচ যার বাধা তাকে আজীবন যথেচ্ছাচারে বিরত রেখেছে। অতঃপর তার চোখে প্রকৃতি-পুরুষের একাকার ঘটে, স্বরূপ বিশ্বরূপে বদলায়, এবং সে বোঝে যে এ-দুটোর একটাও যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, প্রত্যেকেই অন্যোন্যনির্ভর, তাই ব্যক্তির পক্ষে অর্জ্জন-বর্জ্জন তো সমান বটেই, এমনকি, শুধু মরমী সাধক কেন, মানুষমাত্রেই ম'রে বাঁচে। কিন্তু এই আত্মবিসর্জ্জনজাত আত্মোপলব্ধি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হ'লে লাভ নেই, তার সমর্থন চাই কায়মনোবাক্যে। নচেৎ সে-ত্যাগ বৃদ্ধের চিত্তবৃত্তিনিরোধের মতোই শোচনীয়, ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতির পরিণাম ম্রিয়মাণ সভ্যতার মতোই লজ্জাকর; এবং ফাশিষ্ট্ রাষ্ট্র একাধারে বহির্জ্জগতের প্রতিপালনসাপেক্ষ ও অন্তর্জ্জগতের দৌর্ব্বল্যসূচক ব'লে, তার সংস্রবে পৃথিবীর বিসংবাদ কমছে না, অনৈক্যই বাড়ছে। পক্ষান্তরে কম্যুনিষ্ট্‌দের প্রভাব অনেক বেশি শান্তিময়; এবং তারা যদিচ নিত্যের মর্য্যাদা দেয় না, মিথ্যা মিথ্যা ভাবে যে নিমিত্তের তারতম্য ঘুচলেই ব্যক্তিত্বের বিষ ফুরোবে, তবু তাদের বিশ্বাস যে সেই স্বভাবারোপিত সাম্যও অবিবেকীর প্রাপ্য নয়, সেটা সামবায়িক সঙ্কল্পের পুরস্কার, নিঃস্বার্থপরতার পারিতোষিক। তবে এইটুকুই যথেষ্ট নয়; সার্ব্বভৌম প্রভুত্বের মায়া কাটিয়ে, স্বাবলম্বনে ব্যক্তি ও জাতির জন্মগত অধিকারস্বীকার না করলে কম্যুনিষ্ট্ দর্শন বোধহয় বিশ্বমানবের মন পাবে না। অপ্রমেয় প্রগতিতে আস্থাস্থাপন হয়তো দোষের নয়, শুধু সেই সঙ্গে মনুষ্য-ধর্ম্মের অমর বাণীও স্মরণে রাখা অবশ্যকর্ত্তব্য যে মানুষের মধ্যে উৎকর্ষ-অপকর্ষ উভবলী এবং একটার বাদে অন্যটার কোনো মানে নেই।

গল্প

নেহাত গল্প নয়

আবুলমনসুর আহমদ

(১)

আদুভাই চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতেন। ঠিক অধ্যয়ন করতেন না বলে অবস্থান করতেন বলাই ভাল।

কারণ ঐ বিশেষ শ্রেণী ব্যতীত আর কোনো শ্রেণীতে তিনি কখনো পড়েছেন কিনা, পড়ে থাকলে ঠিক কবে পড়েছেন, সে কথা ছাত্ররা কেউ জানতো না। শিক্ষকরাও অনেকে জানতেন না বলেই বোধ হতো।

শিক্ষকরাও অনেকে তাঁকে 'আদুভাই' বলে ডাকতেন। কারণ নাকি এই যে, ওঁরাও এককালে আদুভাইর সমপাঠী ছিলেন, এবং সবাই নাকি এক চতুর্থ শ্রেণীতেই আদুভাইর সঙ্গে পড়েছেন।

আমি যখন চতুর্থ শ্রেণীতে আদুভাইর সমপাঠী হলাম, ততদিনে আদুভাই ঐ শ্রেণীর পুরাতন টেবিল ও ব্ল্যাক বোর্ডের মতই নিতান্ত অবিচ্ছেদ্য এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক অঙ্গে পরিণত হয়ে গিয়েছেন।

আদুভাইর এই অসাফল্যে আর যেই হতাশ হোক, আদুভাইকে কেহ সেজন্য কখনো বিষণ্ণ দেখেনি। কিম্বা নম্বর বাড়িয়ে দেবার জন্য তিনি কখনো কোনো শিক্ষক বা পরীক্ষককে অনুরোধ করেন নি। যদি কখনো কোনো বন্ধু বলেছে: "যান না আদুভাই, যে কয় সাবজেক্টে শর্ট আছে, শিক্ষকদের বলে'কয়ে' নম্বরটা নিন না বাড়িয়ে।", তখন গম্ভীরভাবে আদুভাই জবাব দিয়েছেন: সব সাবজেক্টে পাকা হয়ে উঠাই ভাল।

কোন্ কোন্ সাবজেক্টে শর্ট, সুতরাং পাকা হওয়ার প্রয়োজন, আছে তা কেউ জানতো না, আদুভাইও জানতেন না; জানবার জন্য চেষ্টাও কখনো করেন নি; জানবার আগ্রহও যে তাঁর আছে, তাও বোঝবার উপায় ছিল না। বরঞ্চ তিনি যেন মনে করতেন, ও-রকম আগ্রহ প্রকাশ করাই অন্যায় ও অসঙ্গত। তিনি বলতেন: যেদিন তিনি সব সাবজেক্টে পাকা হবেন, প্রমোশন সেদিন

তাঁর কেউ ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবে না। সে শুভ দিন যে একদিন আসবেই, সে বিষয়ে আহ্নভাইর এতটুকু সন্দেহ কেউ কখনো দেখে নি।

কত খারাপ ছাত্র প্রশ্ন-পত্র চুরি করে, অপরের খাতা নকল করে আহ্ন-ভাইর ঘাড়ের উপর দিয়ে প্রমোশন নিয়ে চলে গিয়েছে, এ ধরণের ইঙ্গিত আহ্নভাইর কাছে কেউ করলে তিনি গর্জ্জে উঠে বলতেন: জ্ঞানলাভের জন্যই আমরা স্কুলে পড়ি, প্রমোশন লাভের জন্য পড়ি না।

সেজন্য অনেক সন্দেহবাদী বন্ধু আহ্নভাইকে জিজ্ঞেস করেছে: আহ্নভাই, আপনার কি সত্যই প্রমোশনের আশা আছে?

নিশ্চিত বিজয়-গৌরবে আহ্নভাইর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি তাচ্ছিল্যভরে বলেছেন: আজ হোক, কাল হোক, প্রমোশন আমাকে দিতেই হবে। তবে হাঁ, উন্নতি আস্তে আস্তে হওয়াই ভাল। যে গাছ লক্‌লক্ করে বেড়েছে, সামান্য বাতাসেই তার ডগা ভেঙেছে।

সেজন্য আহ্নভাইকে কেহ কখনো পেছনের বেঞ্চিতে বস্‌তে দেখে নি। সামনের বেঞ্চিতে বসে তিনি শিক্ষকদের প্রত্যেকটী কথা মনোযোগ দিয়ে শুন্‌তেন, হা করে গিল্‌তেন, মাথা নাড়তেন ও প্রয়োজনমত নোট করতেন। খাতার সংখ্যা ও সাইজে আহ্নভাই ছিলেন শ্রেণীর একজন অন্যতম।

শুধু ক্লাসের নয়, স্কুলের মধ্যে তিনি সবার আগে পৌঁছুতেন। এ ব্যাপারে কি শিক্ষক কি ছাত্র কেউ তাঁকে কোনো দিন হারাতে পেরেছে বলে শোনা যায় নি।

স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভায় আহ্নভাইকে আমরা বরাবর দুটো পুরস্কার পেতে দেখেছি। আমরা শুনেছি, আহ্নভাই কোন্ অনাদিকাল থেকে ঐ দুটো পুরস্কার পেয়ে আস্‌ছেন। তার একটী, স্কুল কামাই না করার জন্য; অপরটী, সচ্চরিত্রতার জন্য। শহরতলীর পাড়া-গাঁ থেকে রোজ পাঁচ মাইল রাস্তা তিনি হেঁটে আসতেন বটে, কিন্তু ঝড়-তুফান, অসুখ-বিসুখ কিছুই তাঁর এ কাজে অসুবিধে সৃষ্টি করে উঠ্‌তে পারে নি। চৈত্রের কাল্-বোশেখী বা শ্রাবণের ঝড়-ঝঞ্ঝায় যেদিন পশু-পক্ষীও ঘর থেকে বেরোয় নি, সেদিনও ছাতার নীচে মুড়িসুড়ি হয়ে, বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে আহ্নভাইকে স্কুলের পথে এগোতে দেখা গিয়েছে। মাইনের মমতায় শিক্ষকরা অবশ্য স্কুলে আস্‌তেন। তেমন দুর্য্যোগে ছাত্ররা কেউ আসে নি নিশ্চিত জেনেও নিয়ম রক্ষার জন্য, তাঁরা ক্লাসে একটী উঁকি মারতেন। কিন্তু তেমন দিনেও অন্ধকার কোণ থেকে 'আদাব, সার' বলে যে একটী ছাত্র শিক্ষককে চমকিয়ে দিতেন, তিঁনি ছিলেন

আত্নভাই। আর চরিত্র? আত্নভাইকে কেউ কখনো রাগ কিম্বা অভদ্রতা করতে কিম্বা মিছে কথা বল্‌তে দেখে নি।

স্কুলে ভর্ত্তি হবার পর প্রথম পরীক্ষাতেই আমি ফার্ষ্ট হলাম। সুতরাং আইনতঃ আমি ক্লাসের মধ্যে সব চাইতে ভাল ছাত্র এবং আত্নভাই সবার চাইতে খারাপ ছাত্র ছিলেন। কিন্তু কী জানি কেন, আমাদের দুজনার মধ্যে একটা বন্ধন সৃষ্ট হলো। আত্নভাই প্রথম থেকেই আমাকে যেন নিতান্ত আপনার লোক বলে ধরে নিলেন। আমার উপর যেন তাঁর কতকালের দাবী!

আত্নভাই মনে করতেন, তিনি কবি ও বক্তা। স্কুলের সাপ্তাহিক সভায় তিনি বক্তৃতা ও কবিতা পাঠ করতেন। তাঁর কবিতা ও বক্তৃতা শুনে সবাই হাস্‌তো। সে হাসিতে আত্নভাই লজ্জাবোধ করতেন না, নিরুৎসাহও হতেন না। বরঞ্চ তাকে তিনি প্রশংসা-সূচক হাসিই মনে করতেন। তাঁর উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যেতো।

অন্য সব ব্যাপারে আত্নভাইকে বুদ্ধিমান বলেই মনে হতো। কিন্তু এই একটী ব্যাপারে তাঁর নির্ব্বুদ্ধিতা দেখে আমি দুঃখিত হতাম। তাঁর নির্ব্বুদ্ধিতা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সবাই তামাসা করছেন, অথচ তিনি তা বুঝ্‌তে পারছেন না, দেখে আমার মন আত্নভাইর পক্ষপাতী হয়ে উঠ্‌লো।

গেল এইভাবে চার বছর। আমি ম্যাট্রিকের জন্য টেষ্ট্ পরীক্ষা দিলাম। আত্নভাই কিন্তু সেবারও যথারীতি চতুর্থ শ্রেণীতেই অবস্থিতি করছিলেন।

(২)

ডিসেম্বর মাস।

সব শ্রেণীর পরীক্ষা ও প্রমোশন হয়ে গিয়েছে। প্রথম বিবেচনা, দ্বিতীয় বিবেচনা, তৃতীয় বিবেচনা ও বিশেষ বিবেচনা ইত্যাদি সকল প্রকারের 'বিবেচনা' হয়ে গিয়েছে। 'বিবেচিত' প্রমোশন-প্রাপ্তের সংখ্যা অন্যান্য বারের ন্যায় সেবারও পাশ-করা প্রমোশন-প্রাপ্তের সংখ্যার দ্বিগুণেরও উর্দ্ধে উঠেছে।

কিন্তু আত্নভাই এসব বিবেচনার বাইরে। কাজেই তাঁর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। নির্ব্বাচন-পরীক্ষা দিয়ে আমরা টিউটরিয়েল ক্লাস করছিলাম। ছাত্ররা শুধুশুধি স্কুল-প্রাঙ্গণে জটলা করছিল—প্রমোশন-পাওয়া ছেলেরা নিজেদের

কীর্ত্তি-উজ্জ্বল চেহারা দেখাবার জন্য, না-পাওয়া ছেলেরা প্রমোশনের কোনো প্রকার অতিরিক্ত বিশেষ বিবেচনার দাবী জানাবার জন্য।

এমনি দিনে একটু নিরালা জায়গায় পেয়ে হঠাৎ আতুভাই আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেল্‌লেন। আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। আতুভাইকে আমরা সবাই মুরুব্বি মান্‌তুম, তাই তাঁকে ক্ষিপ্রহস্তে টেনে তুলে প্রতিদানে তাঁর পা ছুঁয়ে বল্‌লাম : কী হয়েছে আতুভাই, অমন পাগ্‌লামো করলেন কেন?

আতুভাই আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁকে অমন বিচলিত জীবনে আর কখনো দেখি নি। তাঁর মুখের সর্ব্বত্র অসহায়ের ভাব!

তাঁর কাঁধে সজোরে ঝাকি দিয়ে বললাম : বলুন, কী হয়েছে?

আতুভাই কম্পিত কণ্ঠে বললেন : প্রমোশন।

আমি বিস্মিত হলুম, বল্‌লুম : প্রমোশন? প্রমোশন কী? আপনি প্রমোশন পেয়েছেন?

—না, আমি প্রমোশন পেতে চাই।

—ও : পেতে চান? সে ত সবাই চায়।

আতুভাই অপরাধীর ন্যায় উদ্বেগ-কম্পিত ও সঙ্কোচ-জড়িত অনেক প্যাচ-মোচড় দিয়ে যা বললেন, তার মর্ম্ম এই যে, প্রমোশনের জন্য এত দিন তিনি কারো কাছে কিছু বলেন নি; কারণ, প্রমোশন জিনিষটাকে যথাসময়ের পূর্ব্বে এগিয়ে আনাটা তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে এবার তাঁকে প্রমোশন পেতেই হবে। সে নির্জ্জনতায়ও তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে সে কারণটী বল্‌লেন। তা এই যে, আতুভাইর ছেলে সেবার চতুর্থ শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছে। নিজের ছেলের প্রতি আতুভাইর কোনো ঈর্ষ্যা নেই। কাজেই ছেলের সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়ায় তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু আতুভাইর স্ত্রীর তাতে গুরুতর আপত্তি আছে। ফলে, হয় আতুভাইকে সেবার প্রমোশন পেতে হবে, নয় ত পড়াশোনো ছেড়ে দিতে হবে। পড়াশোনো ছেড়ে দিয়ে আতুভাই বাঁচবেন কী নিয়ে?

আমি আতুভাইর বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলাম। তাঁর অনুরোধে আমি শিক্ষকদের কাছে সুপারিশ করতে যেতে রাজী হলাম।

প্রথমে পারসী-শিক্ষকের কাছে যাওয়া স্থির করলাম। কারণ তিনি আমাকে খুব ভালবাস্‌তেন। এক পরীক্ষায় তিনি আমাকে মোট একশত নম্বরের মধ্যে একশ পাঁচ নম্বর দিয়েছিলেন। বিস্মিত হেডমাষ্টার তার কারণ জিজ্ঞেস করায়

মৌলবী সাব বলেছিলেন : ছেলে সমস্ত প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দেওয়ায় সে পূর্ণ নম্বর পেয়েছে। পূর্ণ নম্বর পাওয়ার পুরস্কার স্বরূপ আমি খুশী হয়ে তাকে পাঁচ নম্বর বখ্‌শিশ দিয়েছি। অনেক তর্ক করেও হেডমাষ্টার মৌলবী সাবকে এই কার্য্যের অসঙ্গতি বুঝাতে পারেন নি।

মৌলবী সাব আত্নভাইর নাম শুনেই জ্বলে উঠলেন। অমন বেতমিজ ও খোদার নাফরমান বান্দা তিনি কখনো দেখেন নি বলে আস্ফালন করলেন এবং অবশেষে টীনের বাক্স থেকে অনেক খোঁজে আত্নভাইর খাতা বের করে আমার সাম্‌নে ফেলে দিয়ে বল্‌লেন : ছাখো।

আমি দেখলাম, আত্নভাই মোটে তিন নম্বর পেয়েছেন। তবু হতাশ হলাম না। পাশের নম্বর দেওয়ার জন্য তাঁকে চেপে ধরলাম।

বড় দেরী হয়ে গিয়েছে, নম্বর সাবমিট্ করে ফেলেছেন, বিবেচনার স্তর পার হয়ে গিয়েছে, ইত্যাদি সমস্ত যুক্তির আমি সন্তোষজনক জবাব দেবার পর তিনি বললেন, তুমি কার জন্য কী অন্যায় অনুরোধ করছ, খাতাটা খুলেই একবার দেখ না।

আমি মৌলবী সাবকে খুশী করবার জন্য অনিচ্ছা সত্বেও এবং অনাবশ্যক বোধেও খাতাটা খুল্‌লাম। দেখ্‌লাম : পারসীর পরীক্ষা বটে, কিন্তু খাতার কোথাও একটা পারসী অক্ষর নেই। তার বদলে ঠাসাবুনোনো বাঙ্‌লায় অনেক কিছু লেখা আছে। কৌতূহলবশে পড়ে দেখ্‌লাম : এই বঙ্গদেশে পারসী ভাষা আমদানীর অনাবশ্যকতা এবং ছেলেদের উহা শিখোবার চেষ্টার মূর্খতা সম্বন্ধে আত্নভাই যুক্তিপূর্ণ একটী 'থিসিস' লিখে ফেলেছেন।

পড়া শেষ করে মৌলবী সাবের মুখের দিকে চাইতেই তিনি জয়ের ভঙ্গিতে বললেন : দেখেছ বাবা, বেতমিজের কাজ? আমি নিতান্ত ভাল মানুষ বলেই তিনটে নম্বর দিয়েছি, অন্য কেউ হলে রাস্‌টিকেটের সুপারিস করতো।

যাহোক শেষ পর্য্যন্ত মৌলবী সাব আমার অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। খাতার উপর ৩ এর পৃষ্ঠে ৩ বসিয়ে ৩৩ করে দিলেন।

আমি বিপুল আনন্দে অঙ্কের পরীক্ষকের বাড়ী ছুট্‌লুম।

সেখানে দেখ্‌লুম : আত্নভাইর খাতার উপর লাল পেন্সিলের একটী প্রকাণ্ড ভূমণ্ডল আঁকা রয়েছে। ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝেও আমার উদ্দেশ্য বল্‌লাম। অঙ্কের মাষ্টার ত হেসেই খুন। হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি আত্নভাইর খাতা বের করে আমাকে অংশবিশেষ পড়ে শোনালেন। তাতে আত্নভাই

লিখেছেন যে, প্রশ্নকর্ত্তা ভাল ভাল অঙ্কের প্রশ্ন ফেলে কতকগুলো বাজে ও অনাবশ্যক প্রশ্ন করেছেন, সেজন্য এবং প্রশ্নকর্ত্তার ত্রুটী সংশোধনের জন্য আদুভাই নিজেই কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রশ্ন লিখে তার বিশুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন, এইরূপ ভূমিকা করে আদুভাই যে সমস্ত অঙ্ক কষেছেন, শিক্ষকমশায় প্রশ্ন-পত্র ও খাতা মিলিয়ে আমাকে দেখালেন যে, প্রশ্নের সঙ্গে সত্যি আদুভাইর উত্তরের কোনো সংশ্রব নেই।

প্রশ্ন-পত্রের সঙ্গে মিল থাক্ আর নাই থাক্, খাতায়-লেখা অঙ্ক শুদ্ধ হলেই নম্বর পাওয়া উচিৎ বলে আমি শিক্ষকের সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তি করলাম। শিক্ষক মশায়, যাহোক, প্রমাণ করে দিলেন যে, তাও শুদ্ধ হয়নি। সুতরাং আমার অনেক অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও তিনি পাশের নম্বর দিতে রাজী হলেন না। তবে তিনি আমাকে এই আশ্বাস দিলেন যে, অন্য সব সাব্‌জেকটের শিক্ষকদের রাজী করতে পারলে তিনি আদুভাইর প্রমোশনের সুপারিশ করতে প্রস্তুত আছেন।

নিতান্ত বিষণ্ণ মনে অন্যান্য পরীক্ষকদের নিকট গেলাম। সর্ব্বত্র প্রায় একরূপ। ভূগোলের খাতায় তিনি লিখেছেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে এমন গাঁজাখুরী গল্প তিনি বিশ্বাস করেন না। ইতিহাসের খাতায় তিনি লিখেছেন যে, কোন্ রাজা কোন্ সম্রাটের পুত্র এসব কথার কোনো প্রমাণ নেই। ইংরাজীর খাতায় তিনি নবাব সিরাজদ্দৌলা ও লর্ড ক্লাইভের ছবি পাশাপাশি আঁকবার চেষ্টা করেছেন—অবশ্য কে যে সিরাজ, আর কে যে ক্লাইভ নীচে লেখা না থাকলে তা বুঝা যেত না।

হতাশ হয়ে হোষ্টেলে ফিরে এলাম। আদুভাই আগ্রহ-ব্যাকুল প্রাণে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

আমি ফিরে এসে নিষ্ফলতার খবর দিতেই তাঁর মুখটী ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তবে আমার কী হবে ভাই?—বলে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

কিছু একটা করবার জন্য আমার প্রাণও ব্যাকুল হয়ে উঠলো। বল্লাম: তবে কি আদুভাই আমি হেডমাষ্টারের কাছে যাবো?

আদুভাই ক্ষণেক আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বল্লেন: তুমি আমার জন্য যা করেছ, সেজন্য ধন্যবাদ, হেডমাষ্টারের কাছে তোমার গিয়ে কাজ নেই। সেখানে যেতে হয় আমি যাব। হেডমাষ্টারের কাছে জীবনে আমি কিছু চাই নি। এই প্রথম প্রার্থনা তিনি আমার ফেল্‌তে পারবেন না।

—বলেই তিনি হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে গেলেন। আমি একদৃষ্টে দ্রুতগমনশীল আতুভাইর দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি দৃষ্টির আড়াল হলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে নিজের কাজে মন দিলাম।

(৩)

সেদিন বড়দিনের বন্ধ আরম্ভ। শুধু হাজিরা লিখেই স্কুল ছুটী দেওয়া হল।

আমি বাইরে এসে দেখ্‌লাম: স্কুলের গেটের সাম্‌নে একটা পোস্তার উপর একটা উঁচু টুল চেপে তার উপর দাঁড়িয়ে আতুভাই হাত পা নেড়ে বক্তৃতা করছেন। ছাত্ররা ভিড় করে তাঁর বক্তৃতা শুন্‌ছে এবং মাঝে মাঝে করতালি দিচ্ছে।

আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

আতুভাই বল্‌ছিলেন: হাঁ, প্রমোশন আমি মুখ ফুটে কখনো চাই নি। কিন্তু সেজন্যই কি আমাকে প্রমোশন না দেওয়া এঁদেব উচিৎ হয়েছে? মুখ ফুটে না চেয়ে এতদিন আমি এঁদের আক্কেল পরীক্ষা করলাম; এঁদের মধ্যে দানাই বলে কোনো জিনিষ আছে কিনা, আমি তা যাচাই করলাম। দেখ্‌লাম, বিবেচনা বলে কোনো জিনিষ এঁদের মধ্যে নেই। এঁরা নির্ম্মম, হৃদয়হীন। একটা মানুষ যে চোখ বুজে এঁদের বিবেচনার উপর নিজের জীবন ছেড়ে দিয়ে বসে আছে, এঁদের প্রাণ বলে কোনো জিনিষ থাক্‌লে সে কথা কি এঁরা এতদিন ভুলে থাক্‌তে পারতেন?

আতুভাইর চোখ ছলছল্‌ হয়ে উঠ্‌লো। তিনি বাম হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে আবার বল্‌তে লাগলেন: আমি এঁদের কাছে কী আর বিশেষ চেয়েছিলাম? শুধুমাত্র একটা প্রমোশন। তা দিলে কী এমন এঁদের লোক্‌সান হতো? মনে করবেন না, প্রমোশন না দেওয়ায় আমি রেগে গিয়েছি। রাগ আমি করি নি। আমি শুধু ভাবছি, যাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর হাজার হাজার বাপ-মা তাঁদের ছেলেদের জীবনের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁদের আক্কেল কত কম, তাঁদের প্রাণের পরিসর কত অল্প।

একটু দম নিয়ে আতুভাই আবার আরম্ভ করলেন: আমি বহুকাল এই স্কুলে পড়ছি। একদিন এক পয়সা মাইনে কম দেই নি। বছর বছর নতুন নতুন পুস্তক ও খাতা কিন্‌তে আপত্তি করি নি। ভাবুন, আমার কতগুলো টাকা গিয়েছে। আমি যদি প্রমোশনের এতই অযোগ্য ছিলাম, তবে এই দীর্ঘ

দিনের মধ্যে একজন শিক্ষকও আমায় কেন বল্‌লেন না যে : 'আদু মিঞা, তোমার প্রমোশনের কোনো চান্‌স্‌ নেই, তোমার মাইনেটা আমরা নেব না।' মাইনে দেবার সময় কেউ বারণ করলেন না, পুস্তক কিনবার সময় কেউ নিষেধ করলেন না, শুধু প্রমোশনের বেলাতেই তাঁদের যত নিয়ম-কানুনে এসে বাধ্‌লো ? আমি চতুর্থ শ্রেণীতে পাশ করতে পারলুম না বলে তৃতীয় শ্রেণীতেও যে পাশ করতে পারতুম না, একথা এঁদের কে বলেছে ? অনেকে ম্যাট্রিক-আইএতে কোনোমতে পাশ করে বি-এ, এম-এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত আমি অনেক দেখাতে পারি। কোনো কুগ্রহের ফলে আমি চতুর্থ শ্রেণীতে আট্‌কে পড়েছি, একবার কোনো মতে এই শ্রেণীটা ডিঙোতে পারলে আমি ভাল করতে পারতাম, এটা বোঝা মাষ্টার বাবুদের উচিত ছিল। আমাকে একবার তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন দিয়ে আমার লাইফের একটা চান্‌স্‌ এঁরা দিলেন না।

আদুভাইর কণ্ঠরোধ হয়ে এলো। তিনি খানিক থেমে ধুতির খুঁটে নাক-চোখ মুছে নিলেন। দেখ্‌লাম, শ্রোতৃগণের অনেকের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়্‌ছে।

গলা পরিষ্কার করে আদুভাই আবার আরম্ভ করলেন : আমি কখনো এতসব কথা বলতাম না। আজ বল্‌লাম শুধু এই জন্য যে, আমার বড় ছেলে এবার চতুর্থ শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছে। সে-ও এই স্কুলেই পড়তো। এই স্কুলের শিক্ষকদের বিবেচনায় আমার আস্থা নেই বলেই আমি গতবারই আমার ছেলেকে অন্য স্কুলে ট্রান্সফার করে দিয়েছিলাম। যথাসময়ে এই সতর্কতা অবলম্বন না করলে, আজ আমাকে কি অপমানের মুখে পড়তে হতো, তা আপনারাই বিচার করুন।

আদুভাইর শরীর কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল।

এই সময় স্কুলের দারোয়ান এসে সভা ভেঙে দিল। হৈচৈ করতে করতে ছাত্ররা যে যার পথে চলে গেল। আমিও আদুভাইর দৃষ্টি এড়িয়ে চুপে চুপে সরে পড়লাম।

তারপর যেমন হয়ে থাকে—সংসার-সাগরের প্রবল স্রোতে কে কোথায় ভেসে গেলাম, কেউ জান্‌লাম না।

* * * *

আমি সেবার বি-এ পরীক্ষা দিব। খুব মন দিয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ লাল লেপাফার এক পত্র পেলাম। কারো বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র মনে করে খুল্‌লাম।

ঝরঝরে তকতকে সোনালী হরফে ছাপা পত্র। পত্র-লেখক আদুভাই। তিনি লিখেছেন, তিনি সেবার চতুর্থ শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছেন বলে বন্ধুবান্ধবদের জন্য কিছু ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করেছেন।

দেখলাম, তারিখ অনেক আগেই চলে গিয়েছে। বাড়ী ঘুরে এসেছে বলে পত্র দেরীতে পেয়েছি।

ছাপা চিঠির সঙ্গে হাতের-লেখা একটী পত্র। আদুভাইর পুত্র লিখেছে: বাবার খুব অসুখ, আপনাকে দেখ্‌বেন তাঁর শেষ সাধ।

পড়াশোনো ফেলে ছুটে গেলাম আদুভাইকে দেখ্‌তে। এই আট বছর তাঁর কোনো খবর নেই নি বলে লজ্জা-অনুতাপে ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম।

ছেলে কেঁদে বললে: বাবা মারা গিয়েছেন। প্রমোশনের জন্য তিনি এবার দিনরাত এমন পড়া আরম্ভ করেছিলেন যে তিনি শয্যা নিলেন তবু পড়া ছাড়লেন না। আমরা সবাই তাঁর জীবন সম্বন্ধে ভয় পেলাম। পাড়াশুদ্ধ লোক গিয়ে হেডমাষ্টারকে ধরায় তিনি স্বয়ং এসে বাবাকে প্রমোশনের আশ্বাস দিলেন। বাবা অসুখ নিয়েই পাল্কী চড়ে স্কুলে গিয়ে শুয়ে শুয়ে পরীক্ষা দিলেন। আগের কথা মত তাঁকে প্রমোশন দেওয়া হল। তিনি তাঁর প্রমোশন উৎসব উদ্‌যাপন করবার জন্য আমাকে হুকুম দিলেন। কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করতে হবে, তার লিষ্টও তিনি নিজ হাতে করে দিলেন। কিন্তু সেই উৎসবে যাঁরা যোগ দিতে এলেন, তাঁরা সবাই তাঁর জানাজা পড়ে বাড়ী ফিরলেন।

আমি চোখের পানি মুছে কবরের কাছে যেতে চাইলাম। ছেলে আমাকে গোরস্থানে নিয়ে গেল। দেখলাম, আদুভাইর কবরে খোদাই-করা মার্বেল পাথরের টেবলেটে লেখা রয়েছে:

> Here sleeps Adu Mia who was promoted from Class VII to Class VIII.

ছেলে বল্‌লে: বাবার শেষ ইচ্ছেমতই ও-ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইংরাজী সাহিত্য

বর্ত্তমানের ইংরাজী সাহিত্য

যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগের ইংরিজি সাহিত্যের পরিচয় অল্প পরিসরের মধ্যে দেওয়া সম্ভবপর নয়, কারণ নানান দিকে তার বিকাশ এতখানি ছড়িয়ে পড়েছে যে একজন লোকের পক্ষে তার হিসাব রাখাই কঠিন। তারই দু'চারটী ধারার আজ এখানে খানিকটা আলোচনা ক'রব।

যুদ্ধের আগেই ইংরিজি সভ্যতার ভাঙন সুরু হয়েছিল, কিন্তু কেবলমাত্র অল্প কয়েকটি মনীষীর দৃষ্টিতেই তা ধরা পড়ে। ভিক্টোরিয়া যুগ ইংরেজের বৈজয়ন্তীর যুগ, সে বিজয় অভিযানে প্রথম ধাক্কা লাগে বুয়র যুদ্ধের সময়। তার আগে দেশবিদেশে চলেছে ইংরেজের বাণিজ্যের রথ দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য্যসম্ভার এসে লুটিয়েছে ব্রিটিশ লক্ষ্মীর পদতলে। মনোজগতেও সবদিন ইংরেজের জয়জয়কার। স্বাধীনতার সঙ্গে নিয়মতন্ত্রের, রাজার সঙ্গে জনসাধারণের এমন মিলন কোনদিন কোনখানে দেখা যায় নি, সমস্ত পৃথিবীর লোক ইংরেজের শাসনতন্ত্র, ইংরেজের প্রতিষ্ঠান নিজের দেশে দেখবার জন্য সেদিন উন্মুখ। কিপলিং তাই সেদিন ইংরেজের কবি এবং বিদেশী কনরাডের রচনায়ও তারই ছায়া মেলে।

বর্ত্তমান শতকের গোড়াতেই কিন্তু ইংরেজের সে সহজ আত্মবিশ্বাসে নাড়া লাগে। হার্ডির নৈরাশ্যবাদ কোন বিশেষ ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাঁর কবিচিত্ত বিশ্বসৃষ্টির অর্থহীনতা ও অপব্যয়ের ভারে জর্জ্জর, তাই ইংরেজ ইতিহাসের বিজয়ের দিনেও তাঁর বিষাদ ঘুচে নাই। ওয়েলসের রচনায় প্রথম সন্দেহ ও বিদ্রোহের ছায়া পড়ল—টোনো বাঙ্গে কিপস প্রভৃতি বইয়ে যে বিদ্রোহ, তার মধ্যে সমাজসংগঠনের অন্যায় ও অবিচারের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। গলসওয়ার্দির প্রাঞ্জল এবং একটানা বর্ণনার মধ্যেও সমালোচনার আভাস, মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি আঁকতে আঁকতেই তিনি তার প্রতি কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। যুদ্ধের বিভীষিকা রাত্রিও সহজে কাটে নি—ইংরেজের মন শতাব্দির স্বীকৃতি ও আশ্বাসের মধ্যে পালিত, সেখানে এল বিভীষিকার মতন যুদ্ধের আর্ত্তনাদ। অনেক স্বপ্ন লুটিয়ে পড়ল, অনেক আশ্বস্তি ভেঙে গেল, ইংরেজের মন গৃহহারা হয়ে নতুন আশ্রয়ের খোঁজে বেরুল। লরেন্সের প্রেরণার সূত্র তার মধ্যে না মিললেও যুদ্ধের ফলে যে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ধারা বদলে গেল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লরেন্স যুদ্ধে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন, এই অস্বীকৃতির ফলে বিলেতের বাসিন্দা ইংরেজ হয়েও তিনি বিদেশীর চেয়েও বেশী পর হয়ে গেলেন। পরিচিত বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বাস করেও নির্ব্বাসনের যে গ্লানি তার মনে তা গভীর দাগ কেটেছিল—মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিয়ে তাই তাঁর এত ভাবনা। নরনারীর সহজ মিলনের মধ্যে তিনি সমাজের স্বাস্থ্য

লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন, ইয়োরোপের পীড়িত সভ্যতার বেদনাই যে তাঁর চিত্তকে এদিকে আকর্ষণ করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

লরেন্স মুক্তি খুঁজেছিলেন যৌনবোধের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনের মধ্যে। বুদ্ধির পরাজয় তাঁকে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু যুদ্ধ পরবর্ত্তীযুগের অন্ত লেখকের মনে এসেছে বুদ্ধির বিজয়স্বপ্ন। যারা যুদ্ধের নরক থেকে ফিরে এল, তাদের কোন মোহ ছিল না, জীবনের কোন আশা ছিল না। তারা বুদ্ধির প্রখরতার মধ্যে জীবনের ক্লেদ এবং গোঁজামিল ভুলে থাকবার চেষ্টা করল। জয়েস জীবনকে খণ্ড-খণ্ড করে দুঃখসুখকে আকস্মিক করে তুললেন। মুহূর্ত্তের জন্য যার বিকাশ, তাকে নিয়ে ভেবে লাভই বা কি? সেই আকস্মিক জীবনের মধ্যে নিজেকে ভোলা যায়, সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির পরিহাসকে ভুলে থাকা যায়। অলডুস্ হাক্সলি, ভার্জ্জিনিয়া উলফ্ তারই আরো পরিণতি। হাক্সলির জগতে মানুষ বুদ্ধিমান, কিন্তু বুদ্ধিজীবী নয়। যে বুদ্ধির মধ্যে একদিন ওয়েলস এবং তার সমসাময়িক লেখক পৃথিবীকে নতুন করে গড়বার সম্ভাবনা দেখেছিলেন, হাক্সলির মতে সেই বুদ্ধিও কেবলমাত্র বিলাস, বুদ্ধির বিশ্লেষণে যে গলদ ধরা পড়ে, তা দূর করবার শক্তিটুকুও বুদ্ধির নেই। অন্ধপ্রবৃত্তির মধ্যে কখনো বা মুহূর্ত্তের জন্য জীবনের স্বাদ মেলে, কিন্তু তার মধ্যেই বা পরিপূর্ণতা কই? ভার্জ্জিনিয়া উলফের কাছে বুদ্ধিরও ঐক্য টিকল না—সমস্তই মুহূর্ত্তের খেলা, বুদ্ধির গর্ব্বেরও সেখানে তাই কোন স্থান নেই। ব্যক্তিত্ব, অতীত অভিজ্ঞতা সমস্তই বদলে যাচ্ছে, বুদ্ধির নিজের অস্তিত্বই সন্দেহের বিষয়। যুদ্ধের পরে যে ভঙ্গুর জগতে সমস্ত কিছু সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারই ছায়া পড়েছে উলফের রচনায়, তার অর্লেণ্ডোর জীবন ইতিহাসে।

এই পরিবর্ত্তনের মধ্যেও মানুষ স্থৈর্য্য চায়—আঁকড়ে ধরে থাকবার মতন একটুখানি আশ্রয় চায়। তার পরিচয় পাই মুরের প্রশান্ত রচনায়। মুরেরও এককালে বিদ্রোহী জীবন কেটেছে, সমাজ, সংসার, রাজনীতির বিরুদ্ধে, সে বিদ্রোহের অবসানে তিনি শান্তি খুঁজেছিলেন প্রাচীন অথচ চিরন্তন কাহিনীর মধ্যে। জীবনের বৈচিত্র্য ও জটিলতার মধ্যে অশান্তি ও সংঘাত, তাই জীবনকে সহজ ও সরল করে আত্মার শান্তি হয়তো মিলবে। কেবল ক্রক কেরিথ বলে নয়, যে সমস্ত বইয়ে আবেগ ও উন্মাদনার সম্ভাবনা বেশী, তারও মধ্যে তিনি সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতাই খুঁজেছেন। দূর জগতের প্রশান্তি ও ছায়াগভীরতা তাই তাঁর রচনার মধ্যে এসেছে—তারা সব কথাই বলে, মন্দস্বরে একটানা স্রোতে কোন কথাই বাকী রাখতে চায় না, অথচ সেই বহুল উক্তির মধ্যেও বচনাতীতের ইঙ্গিত থেকে যায়। আমাদের দেশের নিদাঘ মধ্যাহ্নে আলো এবং প্রাণের প্রাচুর্য্যের মধ্যেও যেমন বিশ্রান্তি ও অবসাদ, মুরের রচনাও তেমনি সুপ্তির মায়াজালে আচ্ছন্ন। মুর কিন্তু বর্ত্তমান ইংরিজি সাহিত্যে বিদেশী—তাঁর সেই নিস্তরঙ্গ সৌন্দর্য্যপ্রীতি আধুনিক জগতের দ্বন্দ্বসংঘাত, চাঞ্চল্য এবং বিক্ষোভের মধ্যে স্বপ্নদ্বীপের মত, তাই বর্ত্তমানের সাহিত্যে অলডুস্ হাক্সলি এবং উলফকেই প্রতীক বলে ধরতে হয়—লরেন্সের মোহাচ্ছন্ন তীব্রতাও যেন সেখানে অবান্তর। মনোজগতের স্তরের পর স্তরের আজ বিকলন চলেছে—ফকনার প্রভৃতির রচনায় তারও ছায়া পাওয়া যায়।

কাব্যজগতে ও অধুনার সাহিত্যে এ বিক্ষোভ এবং আত্মপ্রত্যাবর্ত্তন ধরা দেয়। যুদ্ধের যুগে ইংরেজের চেতনা আচ্ছন্ন—ইয়েটস যাকে বলেছেন নিষ্ক্রিয় দুঃখভোগ—সেই বেদনা অনুভূতিতেই সে-যুগের ইংরেজ কাব্য ভরপুর। তারপরে এলিয়টের পালা। ইয়োরোপের সভ্যতা ভেঙে পড়ছে, পোড়াজমি অনাবাদী পড়ে ছিল, তারই মধ্যে কাঁটা কাঁকড়ের ছড়াছড়ি। ফসলের সেখানে আভাস নেই, রয়েছে কেবল ফণিমনসার নিষ্ফলতা। বিমূঢ় মানুষ হতাশা ও দিকভ্রান্তির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়—দিশা পায় না, মুক্তি কোথায়? মানুষগুলিরই বা পরিচয় কি? সব ফাঁপা মানুষের দল, কাণা কড়িতে তাদের কারবার, জীবনের হাটে তারা দেউলে। বিদ্রোহের শক্তিও সেখানে নেই, রয়েছে কেবল বিরক্তি ও বিফলতাবোধ। জীবনের নিষ্ফলতার ছায়া হাউসমানের হৃদয়কেও স্পর্শ করেছিল, কিন্তু তাঁর কবিতায় হতাশার মধ্যেও যেটুকু সান্ত্বনা রয়েছে, এলিয়টের মধ্যে তারও আভাস নেই। বুদ্ধির অভিযানে সমাজ-সংসার সব ভেঙে যায়, চারদিকের প্রতিষ্ঠিত জীবনের খণ্ডগুলি কুড়িয়ে নিয়ে আবার সভ্যতা রচনারও উৎসাহ থাকে না। কিন্তু নৈরাশ্যবাদে মানুষের মন টিকে থাকতে পারে না—নৈরাজ্যের পরিণতি হয় স্বৈরতন্ত্রে, নিরাশার মধ্যে মানুষ খোঁজে চরম আশ্বাস। তাই এলিয়টের স্বাভাবিক বিকাশের ফল ধর্ম্মের প্রতি অন্ধ এবং বিবেচনাহীন আগ্রহে, সমস্ত প্রশ্নের নিরসন হয় রোমিয় ধর্ম্মমতের নিষ্প্রশ্ন স্বীকৃতির মধ্যে।

এলিয়ট তো রোমকে স্বীকার করে আত্মার সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন, কিন্তু সকলে তা পারে নি। দ্বন্দ্ব এবং সন্দেহের দোলায় কাব্য জীবন থেকে বিচ্যুৎ হয়ে পড়ল—নতুন কবি যাঁরা এলেন, তাঁরা বল্লেন যে মুহূর্ত্তকে কেন্দ্র করেই আমাদের কাব্য। উলফের উপন্যাসে যেমন ব্যক্তি বিশ্লেষণের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে, আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকের রচনায়ও ঠিক তাই হয়েছে। সংবেদনার মুহূর্ত্তিক যে সত্য এবং তীব্রতা, তারা তারই মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চাইল, কিন্তু সে আশাও যে কেবলমাত্র দুরাশা, তা বুঝতে বেশীক্ষণ লাগে না। সাম্প্রতিক সাহিত্যে তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ জেগেছে—আধুনিকতম কবিরা কেবলমাত্র কল্পলোকে মুহূর্ত্তিক জীবনের মধ্যে বন্দী থাকতে আর রাজী নন। যে জীবন-সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে পড়ে, যেখানে মানুষের সমাজ রূপ নেয়, রূপ বদলে ফেলে, সেই সমাজজীবনের সঙ্গে যোগ রেখেই কবির কাব্য। তাই ইংরেজ কাব্যে নতুন এক রাজনৈতিক প্রেরণা এসেছে, স্বপ্নবিলাসী কবিদের রচনায়ও আজ তাই নতুন বাস্তবপ্রীতি, পৃথিবীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার, তার বাণীকে ধ্বনিত করে তোলবার নতুন প্রয়াস।

নাট্য-সাহিত্যেও এ যুগ পরিবর্ত্তন ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিপ্লব ধরা পড়ে। যুদ্ধের পরে চলেছে কিছুদিন বিশ্বহিতৈষণার যুগ—জার্নিস এণ্ডে সেদিন তাই ইংরেজ তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিল, ভেবেছিল যে খণ্ড খণ্ড পৃথিবীকে জোড়া দিয়ে আবার জগতকে সৃষ্টি করবে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল বুদ্ধির বিদ্রোহ ও নিষ্ফল আক্রোশ। সমাজকে আঘাত করেছে, আঘাত পেয়েছে, তারই পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল নোয়েল কাওয়ার্ডের প্রতিষ্ঠা। এলিয়টের রককেও নতুন প্রেরণার আভাস মেলে, যে প্রেরণায় এলিয়ট কাব্যে অন্ধবিশ্বাস ও স্বীকৃতি ফিরিয়ে এনেছিলেন, তারই ছায়া রয়েছে

তাঁর এ নতুন নাট্য রচনায়। আজো নাট্য-সাহিত্যের গতি স্পষ্ট হয়ে নির্দিষ্ট হয়নি, আজো সমালোচনার ক্ষেত্রে মতবাদের সঙ্গে মতবাদের বিরোধ, অস্বীকৃতি ও স্বীকৃতির দ্বন্দ্ব, এবং সন্দেহ ও সংশয়ের নৈরাজ্য। নতুন সমালোচকেরও অভিযান এসেছে, তাঁরা সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সংগঠনের দিক থেকে সাহিত্যকে বিচার করতে, যাচাই করতে চাচ্ছেন—সব দিকেই চলেছে পরীক্ষা ও প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। এই যুগসন্ধির ক্ষণে তাই ইংরেজের সাহিত্য আমাদের কৌতূহল ও আনন্দ জাগায়, তার ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সন্দেহ ও আশা দুই-ই যুগপৎ জেগে ওঠে।

ভারতীয় সাহিত্য

উর্দ্দু ভাষার উদ্ভব

আমাদের জাতীয়তার যে সমস্যা সে সমস্যার সঙ্গে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষার সমস্যাও অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। যদি ভারতবর্ষে একটি অখণ্ড জাতির উদ্ভবই আমাদের উদ্দেশ্য হয় (বিভিন্ন জাতীয়তার নয়), ভাষা ও কৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও যদি আমরা একই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধিবিধানের মধ্যে থাকতে চাই তবে এমন একটি ভাষা উৎপাদন করা আমাদের কর্ত্তব্য যা আমাদের বংশধরেরা নির্ব্বিবাদে 'ভারতীয় ভাষা' বলে স্বীকার করবে।

সাম্প্রদায়িক মনোভাব গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে গড়ে উঠেছে; সেহেতু প্রায় সকলেই আজকাল উর্দ্দুকে মুসলমানের ও হিন্দীকে হিন্দুদের ভাষা বলে মনে করে। কোলাহলের উত্তাপে অনেকেই উর্দ্দুর উদ্ভবের কথা ভুলে গেছেন, এমন কি মহাত্মা গান্ধীর মত বিচক্ষণ ও জ্ঞানী লোকও উর্দ্দুকে মুসলমানের ভাষা বলে অভিহিত করেছেন, যা কোরাণ শরিফের অক্ষরে লেখা হয়।

উর্দ্দু ভাষায় ফারসী শব্দের বাহুল্য, ফারসী-ঘেঁষা পদবিন্যাস ও সেমিটিক অক্ষর, এ সব সত্ত্বেও উর্দ্দু পশ্চিমা হিন্দীরই ভাষা, যা মিরাট ও দিল্লী অঞ্চলে অনেক শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হয়ে এসেছিলো। উর্দ্দু ভাষা 'সৌরসেনি প্রকৃত'-এরই একটি 'শাখা'। আরম্ভ থেকেই উর্দ্দু ভাষার ব্যাকরণ ও গঠনের যে রূপ তার পরিবর্ত্তন অদ্যাপি হয় নাই, যদিও ভাষায় বহু হিন্দী শব্দ ও ইডিয়ম আছে। এই সব হিন্দী শব্দ ও ইডিয়ম, যা উর্দ্দু ভাষার মধ্যে প্রবেশলাভ করেছে, সংস্কৃতেরই সমগোত্র। উর্দ্দু এবং হিন্দীর উদ্ভব একই মূল থেকে, যা বোঝাবার জন্য আমি কয়েকটা শব্দ নিজের খেয়ালমত চয়ন করেছি।

সংস্কৃত	—	ভাসপা	—	উর্দ্দু
বেরকৃশা	—	পেরখা	—	পারেখ
লক্ষণ	—	লুছমান	—	লুছুন
মাতা	—	মাতা	—	মা
দুঃখণ	—	দুখাণ	—	দুক্কান
পেরসা	—	পেরখা	—	পেরখা
রাক্ষস	—	রাকুস	—	রাকুস
পুরু	—	পুরহা	—	পুরুষ

এই সব শব্দের সংখ্যা ইচ্ছে করলে আরও অনেক বাড়ান যায়। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, হিন্দীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্যই উর্দ্দু উদ্ভূত হয় নাই, হিন্দীর সমগোত্র ভাষা হিসেবেই এর উদ্ভব হয়। এ ভাষা মুসলমানদের সক্রিয় সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল এটা ইতিহাসের

অর্জ্জি। কারণ দিল্লী, যেখানে এ ভাষার প্রচলন ছিল, তখন মুসলিম-ভারতের রাজধানী। দিল্লী বাজারে যে সব ভাষার প্রচলন ছিল সেই সব ভাষার সম্মিলিত অবদানেই উর্দ্দু ভাষার উদ্ভব এবং উর্দ্দু ভাষা, অষ্টাদশ শতাব্দীর এক বৃদ্ধ উর্দ্দু কবির মতে 'is a mongrel pigeon form of speech. দিল্লী বাজারের এই সব বিভিন্ন ভাষা উর্দ্দুকে এমনভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলো যা হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই বুঝতে পারে। (উর্দ্দু তুরস্ক দেশীয় একটি শব্দ যার মানে নিজের অনুচরদের সঙ্গে 'হল্লা' করা) দিল্লী অঞ্চলে যে উর্দ্দু ভাষার প্রচলন ছিল তা পশ্চিমা হিন্দীর অপভ্রংশ এবং পশ্চিমা হিন্দীর উদ্ভব 'প্রকৃত' থেকে আধুনিক হিন্দীতে অনেক দীর্ঘ সংস্কৃত শব্দ ও ইডিয়মটিক গঠন, যা মোটেই সুষ্ঠু নয়, প্রবেশলাভ করেছে। ফারসী-ঘেঁষা শব্দগুলি বাদ দিয়ে আধুনিক হিন্দীতে সংস্কৃত-উদ্ভূত শব্দের বাহুল্য দেখা যাচ্ছে—এ নিয়ম যদি আর কিছুদিন ধরে চলতে থাকে তবে হিন্দী ভাষার কোন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর থাকবে না, সংস্কৃত-উদ্ভূত এক শাখা ভাষা বলেই তখন একে গণ্য করা হবে। হিন্দী এবং উর্দ্দু উভয়েই একই মূল থেকে উদ্ভূত কিন্তু এই দুই ভাষা দুই বিভিন্ন জিনিষ থেকে পেয়েছে, হিন্দী সংস্কৃত থেকে ও উদ্দু তার প্রেরণা পুরাকালের সেই রূপ থেকে যা তাকে নমনীয়তা, লালিত্য, এবং অন্যান্য ভাষা-উদ্ভূত শব্দকে নিজের মধ্যে টেনে নেবার অসামান্য ক্ষমতা দিয়েছিলো। উদ্দু ভাষা যখন সবেমাত্র গড়ে উঠছে তখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু সহযোগিতা উর্দ্দু ভাষায় অজস্র ফারসী শব্দ ঢুকবার সহায়তা করেছিলো। আকবরের সময়ে এটা আরও ব্যাপক রূপ ধারণ করে, যখন তাঁর হিন্দু রাজস্ব-সচিব তোডরমল্ল সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের ফারসী ভাষায় কথা বলতে বাধ্য করেন ও যখন ফারসী ভাষা ভারতবর্ষের সরকারী ভাষা হয় তখন তা উদ্দু ভাষায় ইডিয়ম ও পদবিন্যাসের ওপর যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো। এরকম হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এ্যাংলো স্যক্সনরাও নর্ম্মাণ-আধিপত্যের সময় ঠিক এ রকম অবস্থারই সম্মুখীন হয়। মুসলমান আক্রমণকারীরা যে ফারসী ভাষা সঙ্গে করে ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছিলেন তা শিভালরী, যুদ্ধ ও প্রেম-এর ভাষা ; এবং ধ্বনিময় ও মাধুর্য্যময় শব্দে সে ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল।

একটি জাতির জীবনে এমন একটি সময় মাত্র একবারই আসে যখন সে জাতির কাছে তাদের নিজের ভাষা বিস্ময়কর মনে হয়। বিস্ময়কর মনে হয় শব্দের সজীবতা ও নববলের জন্য, ভাষার প্রাথমিক স্তরে অবস্থানের জন্য, অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনার জন্য। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর উর্দ্দু লেখকগণ ফারসী মহাকাব্য ও পংক্তি কাব্যের মহিমা এবং লালিত্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন, ফলতঃ তাঁরা সরল ও সহজবোধ্য শব্দ-ব্যবহারে অপারগ হন। ফারসী ভাষার মার্জ্জিত শব্দ তাঁদের মোহাচ্ছন্ন করে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্য ও গদ্যের ল্যাটিন-ঘেঁষা লিখনভঙ্গীর অন্তর্নিহিত কারণ উর্দ্দু লেখকদের ফারসী-ঘেঁষা লিখনভঙ্গীর কারণের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত। ইংরেজী সাহিত্যে ল্যাটিনের প্রভাব এবং উর্দ্দু সাহিত্যে ফারসীর প্রভাবের কারণ ভিন্ন নয়।

উর্দ্দু লেখকেরা ফারসী ব্যাকরণ ও পদবিন্যাসের অনুকরণ করেন। Governing এবং governed শব্দের তাঁরা স্থান পরিবর্ত্তন করেন এবং এই সব শব্দ যে বিশেষণ ও

substantive-কে qualify করত' তাদেরও স্থানপরিবর্তন তাঁরা করেন এবং ফারসী বাক্যাংশকে 'বা' preposition-এর সঙ্গে ব্যবহার করেন। এই সব পরিবর্তন সনাতন ব্যাকরণের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। কিন্তু ফারসী ভাষার প্রভাব উর্দ্দু ভাষাকে চলতি ভাষার গোত্র থেকে এক সমৃদ্ধপূর্ণ ও কৃষ্টিমূলক ভাষার গোত্রে উন্নীত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্দু ভাষাকে বিভিন্ন সূক্ষ্ম সঙ্কেত ও বৈচিত্র্য-মূলক জ্ঞান প্রকাশের পক্ষে উপযোগী করে তোলে। ফারসী ভাষার সঙ্গে পর্ত্তুগীজ ও ইংরেজী ভাষা উর্দ্দু শব্দ-ভাণ্ডারের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজরা ভারতবর্ষের প্রধান বন্দরগুলিতে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে এবং তখন প্রাচ্যে তারাই সব চেয়ে অগ্রগামী বণিক-সম্প্রদায় ছিল। 'মিশনারি' হিসেবে পর্ত্তুগীজরা এদেশের লোকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসে, ফলে পর্ত্তুগীজ ভাষা এ দেশের বিভিন্ন ভাষাকে প্রভাবান্বিত করে—যথা আসামী, উড়িয়া, মারহাট্টি এবং দাক্ষিণাত্যে-প্রচলিত উর্দ্দু ভাষা। ঔরংজীবের শাসনকালে সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন ভারত-বর্ষের সরকারী কার্য্যস্থল দাক্ষিণাত্যে স্থানান্তরিত হয় তখন দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সংযোগ স্বভাবতঃই ঘনিষ্ঠতর হয় ও পর্ত্তুগীজ ভাষার কয়েকটি শব্দ খুব বেশী ব্যবহার হেতু ক্রমে ক্রমে দেশীয় ভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশে যায়। নিম্নলিখিত শব্দগুলির উদ্ভব যে পর্ত্তুগীজ ভাষা থেকে তা এখন আর কজন ভাবেন।—

তাম্বাকু চা সাগু বালতি আলমারি বোতুল সাবুন কার্ত্তুজ
(তামাক) (চা) (সাগু) (বালতি) (আলমারি) (বোতল) (সাবান) (কার্ত্তুজ)
ক্যাপ্তান তোয়ালে গির্জ্জা কামিজ ইংরেজ আয়া পাগার
(ক্যাপ্টেন) (তোয়ালে) (গির্জ্জা) (সার্ট) (ইংরেজ) (নার্স, আয়া) (মাহিনা)
কামরা রুপিয়া।
(কামরা) (টাকা)।

উর্দ্দু ভাষায় ইংরেজীর প্রভাব পর্ত্তুগীজের চেয়ে বিস্তৃততর। ইংরেজী খালি উর্দ্দু 'ভাষার' ওপরই প্রভাব বিস্তার করে নাই পরন্তু উর্দ্দু গদ্য, প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা, heroic poem ও নাটকের ওপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। সেক্সপীয়ার ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রভাব উর্দ্দু কবিদের ওপর সমধিক। পাশ্চাত্ত্য-দর্শনের জটিল ভাবসমূহ ও বৈজ্ঞানিক তথ্য ইত্যাদি প্রকাশ করবার শক্তি উর্দ্দু ভাষার যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। প্রমাণস্বরূপ ধরা যেতে পারে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়—যেখানে প্রথম শ্রেণীর কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা উর্দ্দু ভাষার মধ্যস্থাতেই দেওয়া হয়। হায়দ্রাবাদের অনুবাদ-সমিতি বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য দেশের বিজ্ঞান-বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ করে কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে। ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটীর ডিগ্রী অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ ও পাশ্চাত্ত্য দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞান-বিষয়ক শব্দের অভিধান থেকে এ কথাটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে উর্দ্দু তার সনাতন রীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই নানা ভাষা হতে শব্দ আহরণ করেছে—যথা হিন্দী, সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক, ইংরেজী ইত্যাদি। শব্দ আহরণের সময়ে একটা বিষয়ে নজর রাখা হয়। প্রতি শব্দ যেন ঠিক সেই অর্থই অভিব্যক্ত করে যার জন্য সে শব্দকে চয়ন

করা হয়েছে এবং উর্দ্দু ভাষার গঠন-পদ্ধতির খুব বেশী পরিবর্ত্তন যাতে না হয়। কংগ্রেস-শাসিত গভর্মেণ্টসমূহ এমন একটা ভাষা (হিন্দুস্থানী) গড়ে তুলবার পক্ষপাতী যা মার্জ্জিত ফারসী ভাষাও নয় এবং দীর্ঘশব্দ-বিব্রত আধুনিক হিন্দীও নয়। নির্দ্দেশমত ভাষা তৈরী করা যায় এই আদর্শের যথার্থ্য, সময়ই মাত্র স্থির করতে পারে; যদিও এমন একটা ভাষা প্রয়োজনমত গড়ে তোলা হয়ত সম্ভব যে ভাষায় ভারতবর্ষের সকল লোক কথাবার্ত্তা বলতে পারে। কিন্তু উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষা উভয়েই এখন এত বেশী অগ্রসর যে এখন আর এই দুই ভাষা পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক হয়ে যেতে পারে না। উর্দ্দু ও হিন্দীর গতি ও লক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। কিন্তু হিন্দুস্থানী, তা রোমান অক্ষরে বা অন্য যে কোন অক্ষরেই লেখা হোক না কেন, এ দেশের লোকদের সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে কিছুতেই উপযুক্ত হতে পারে না। আর যে ভাষার সাহিত্য নাই সে ভাষা প্রাণহীন হতে বাধ্য। হিন্দুস্থানীর মত কৃত্রিম-ভাবে গড়ে তোলা ভাষায় মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি কদাপি সম্ভব নয়, কারণ যিনি যুগপৎ স্রষ্টা ও শিল্পী তিনি সেক্সপীয়ারের আরমাণ্ডোর মতই হবেন,

> "One when the music of his own vain Tongue
> Doth ravish like enchanting harmony."

ইস্‌রাৎ হোসেন জুবেরী

তামিল গদ্য

যে গদ্য সাহিত্য সৃজনকারী তামিল ভাষায় সে গদ্যের আবির্ভাবের কথা খুব বেশী দিনের নয়। পণ্ডিতরা অবশ্য বলেন, তামিল ভাষায় গদ্যের আবির্ভাব দুহাজার বছরেরও পুরণো কথা—এক দিক দিয়ে তাঁদের এ কথাটা ঠিক। 'শিলাপ্পাধিকরম', এবং 'বারথ ডেন্বা' প্রভৃতি বহু প্রাচীন মহাকাব্যে কাহিনীমূলক পদ্যাংশগুলিকে সংবদ্ধ করতে গদ্যের চলন ছিল। পুরাকালের ভাষ্যকারেরা যে গদ্য ব্যবহার করতেন তা অনেকটা সুসংলগ্ন ছিল ও তাঁদের গদ্য সম্পূর্ণরূপে কাব্য-ঘেঁষা ছিল না। কিন্তু মহাকাব্যের গদ্য-সূত্র বা ভাষ্যকারের গদ্য, এদের কোনটাকেই সাহিত্য সৃজনকারী গদ্য বলে উল্লেখ করা যায় না। প্রায় ৫০০ বৎসর আগে জৈনরাই সর্ব্বপ্রথমে তামিল গদ্যে গল্প লেখেন। তখন থেকেই তামিল-গদ্যের আরম্ভ বলে ধরা যেতে পারে।

পুরাকালের গদ্য-লেখকেরা কাহিনী এবং উপকথা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ ও 'বিরাম মুণিবর'এর কাহিনী-সমষ্টি সে কালের গদ্যের উল্লেখযোগ্য অবদান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রবন্ধ ও উপন্যাসের উদ্ভব হয়। 'প্রতাপ মুদালিয়ার চরিথিরাম' তামিল ভাষায় সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস বলে আমার ধারণা। বইটা চমৎকার, যদিও উপন্যাস বলে একে স্বীকার করতে খুব কম লোকই রাজী হবেন। প্রাচীন লেখকেরা এতদিন ধরে গদ্যকে যে উপেক্ষা করে এসেছেন, এটা লক্ষ্যযোগ্য। সাধারণ কথাবার্ত্তায় গদ্যের প্রচলন অবশ্যি ছিল, যদিও এর পক্ষে কোন স্থির ও নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ নেই। কিন্তু কোন বিশেষ প্রমাণের

প্রয়োজনীয়তাও এ ক্ষেত্রে খুব বেশী নয়। কারণ তামিল ভাষার জটিল পদবিন্যাস সম্বন্ধে সম্যক্ সচেতন হয়ে সাধারণ লোকে কথাবার্ত্তা বলছে, এরকম ধারণা হাস্যোদ্দীপক। তখনকার দিনে যাঁরা তামিল ভাষা শিখেছিলেন, তাঁদের শিক্ষার পদ্ধতিটা একটু বিশিষ্ট ছিল, এবং শিক্ষা-পদ্ধতির এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তাঁদের গদ্যের প্রতি উপেক্ষার কিছুটা কারণ মেলে। এইসব শিক্ষার্থীরা কাব্য-রচনার অতি প্রাবল্য দেখে স্বভাবতঃই এর প্রতি আকৃষ্ট হতেন, এমন কি পদ্য-রচনার বিভিন্ন রূপের নিত্য-নৈমিত্তিক অনুশীলনেও তাঁদের বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হ'ত। সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস পদ্য-রচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু পদ্যের প্রতি তাঁদের এই অনুরাগ কোন উৎকৃষ্ট ধরণের সাহিত্য-রচনায় সার্থকতা লাভ করে নাই। তামিল পদ্য, বিশেষ করে কয়েক শতাব্দীর আগেকার তামিল-পদ্য, অত্যন্ত মামুলি ও কর্কশ ধরণের, তাদের মধ্যে কোন কোন রচনার সাহিত্যিক মূল্য নেই বললেই চলে, তবে সাহিত্যিক কসরত হিসেবে, তারা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। পদ্যের বিভিন্ন কৃত্রিম রূপের নির্ব্বোধ অনুকরণ ও-শ্রেণীর কবিদের রচনায় ভূরি ভূরি দেখা যায় এবং পদ্য-রচনার এই প্রাচুর্য্যই (যদিও ফাঁফা ও অসার্থক) এই সব কবিদের পদ্যের প্রতি অনুরাগের পরিচয় দেয়। সম্ভবতঃ কোন লেখকই সে সময়ে গদ্যকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না এবং গদ্যে সাহিত্য-রচনা করা তাঁদের পক্ষে অভাবনীয় ছিল। ভাষ্যকারকেই 'লেখক' বলে অভিহিত করা তখনকার রীতি ছিল, উঁচুদরের শিল্পীদের আখ্যা ছিল 'কবি'। অতি সাধারণ ভাবাদর্শের অভিব্যক্তির জন্যও গদ্যের বদলে তখন পদ্যের প্রচলন ছিল। এমন কি, খবরও পদ্যে লেখা হ'ত। হয়ত পদ্যের প্রতি এই অদ্ভুত ও বিচিত্র অনুরাগের জন্যই তামিল ভাষায় গদ্যের আবির্ভাব বিলম্বিত হয়েছে, কিন্তু চল্‌তি তামিল-গদ্যের উদ্ভব যে গত শতাব্দীতেই, এটা নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে।

যে গদ্যের ইতিহাস এত সম্প্রতিকালের সে গদ্যে অনেক-কিছু দোষ-ত্রুটি থাকা মোটেই আশ্চর্য্যের নয়। পরন্তু তামিল-গদ্য যাঁদের রচনায় বর্ত্তমান রূপ নিয়েছে তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। এই অল্প-সংখ্যক লেখকদের মধ্যে বারথিই সর্ব্বপ্রধান। পরবর্ত্তী অনেক লেখক এদের অনুকরণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন, ফলে তাঁদের ভাষা হয়েছে কৃত্রিম ও প্রাণহীন। 'উদ্দেশ্যমূলক' প্রবন্ধ বা পদ্ধতিহীন 'প্রবন্ধ' (এ রকম লেখাকে 'প্রবন্ধ' আখ্যা দেওয়া যায় কিনা, সন্দেহ আছে) তা ছাড়া তামিল ভাষায় আজকাল কোন উল্লেখযোগ্য গদ্য-রীতি চোখে পড়ে না ; ছোট গল্প সস্তা নাটকীয়ানায় ভর্ত্তি, বিদ্রূপমূলক রচনা সব অপাঠ্য, নভেলগুলি অসম্ভব রোমান্টিক কাহিনীর সমন্বয়ে হাস্যকর, ভড়ং ও বিরক্তিকর দৈর্ঘ্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তারপরে অবশ্য 'জীবনী'। দক্ষিণ ভারতের যেখানেই যাওয়া যাক সেখানেই এই 'জীবনী'র কলরব। মহৎ লোকদের (অন্য দেশের) জীবনী। অবান্তর তথ্যে ভরা, তারিখ, কীর্ত্তিকাহিনী এবং মহৎ লোকদের গ্রহণযোগ্য গুণাবলীর উদাহরণে জর্জ্জরিত।

এ কালের লেখকেরা এমন কিছু প্রবন্ধ লেখেন না, যা তাঁদের প্রকৃত মনের পরিচয় দেয়। দু'একজন মৃত লেখক প্রবন্ধ লিখবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আধুনিক

লেখকেরা এ সম্বন্ধে উদাসীন। এ উদাসীনতা শক্তিহীনতারই নামান্তর, কারণ প্রবন্ধ লিখবার মত সূক্ষ্ম প্রকাশভঙ্গী এঁদের নেই—এঁদের ভাষা অতিশয়োক্তির দোষে দুষ্ট এবং রচনা-রীতি সম্বন্ধে এঁদের ধারণা খুব বেশী রকমে প্রাথমিক। নাটক সম্বন্ধেও আধুনিক লেখকদের কোন আগ্রহ নেই। গত ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এমন কোন নাটক রচিত হয় নাই যার কিছুটাও সাহিত্যিক মূল্য আছে। 'মননমণি' গ্রন্থটিই নাটক হিসেবে প্রথম ও শেষ, গ্রন্থটি পদ্যে লেখা ও সম্পূর্ণরূপে অপাঠ্য। গভীর ধরণের ছোট গল্পের অভাব তামিল-সাহিত্যের আর একটা বৈশিষ্ট্য, হাল্কা ধরণের সরস ও কৌতুকজনক গল্পের সংখ্যাও এ সাহিত্যে খুব বেশী নয়।

কিন্তু বৈচিত্র্যের অভাবই তামিল-গদ্যের প্রধান অভাব নয়। বাস্তবতার অভাবই এর সব চেয়ে গুরুতর বিচ্যুতি। যে ভাষার পদ্য এমন সমৃদ্ধ, সতেজ ও বাস্তবপন্থী সে ভাষার গদ্য কেন এত নিকৃষ্ট ধরণের, ভাবতে অবাক লাগে। তামিল গদ্য পদ্যের মত নীরস নিয়মকানুনের ভারে ক্ষতবিক্ষত নয়, তবুও বাস্তবতার গন্ধও তামিল-গদ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাব ও নিগূঢ় উত্তেজনা প্রকাশের পক্ষে তামিল ভাষার মত উপযুক্ত ভাষা খুব কমই আছে, তথাপি এ ভাষায় বর্ণনামূলক গদ্যের অস্তিত্ব একেবারেই নেই। বর্ণনামূলক গদ্য লিখবার চেষ্টা কখনও কখনও করা হয়েছে কিন্তু সফলতার সঙ্গে নয়; এরকম গদ্যকে বরং 'বীজ-তালিকা' গদ্য বলেই নির্দ্দেশ করা উচিত। এ শ্রেণীর গদ্য নাম ও বস্তুর পীড়াদায়ক তালিকায় কোণঠেঁষা ও অসম্ভবরকমে রোমান্টিক ও কৃত্রিম। বারথির প্রতিভা বর্ণনামূলক গদ্য-রচনায় নিয়োজিত হয়েছিল কিন্তু তিনিও উপযুক্ত পরিমাণে বাস্তবপন্থী ছিলেন না বা হতে পারেন নাই। বারথির অনুসরণকারী যাঁরা তাঁরা বারথির এই বাস্তবতার অভাবকেই মাত্র সাফল্যের সঙ্গে অনুকরণ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বারথির পক্ষে 'রিয়ালিষ্টিক' প্রকাশভঙ্গীর কোন দরকার ছিল না, যেমন দরকার ছিল না হান্স্ এ্যাণ্ডারসনের পক্ষে। বর্ণনা ও শ্লেষ যে লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্য 'রিয়ালিষ্টিক' প্রকাশভঙ্গী সে বৈশিষ্ট্যকে বরং ব্যাহতই করে। সম্প্রতি অনেকে ব্যস্তবপন্থী হবার চেষ্টা করেছেন, ফলে তাঁদের গদ্য-রচনা অসম্ভবরকমে কাঁচা ও অমার্জ্জিত রূপ নিয়েছে। গেঁয়ো ভাষায় গদ্য-রচনাকেই এ শ্রেণীর লেখকেরা 'রিয়ালিষ্টিক' বলে মনে করেন এবং এ পন্থা অবলম্বন করে বাস্তবতার গোত্রে তামিল-গদ্যকে টেনে আনবার চেষ্টা এঁদের মধ্যে অনেকেই করেছেন। তাঁদের এই চেষ্টা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু সাহিত্য-রচনায় তবুও তাঁরা ব্যর্থকাম হয়েছেন। উৎকৃষ্ট গদ্য-রচনার যে সব বৈশিষ্ট্য, পরিপূর্ণতা, শব্দ-ব্যবহারের নিপুণতা, সংযম ও একপ্রকারের সঙ্কেত সে সব কোনটাই এঁদের রচনায় চোখে পড়ে না। কচিৎ দেখা যায় দুএকটি লেখকের প্রকাশভঙ্গী বেশ সুস্পষ্ট ও সংহত। কিন্তু উপযুক্ত বস্তুর অভাবে তাঁদের সেই প্রকাশভঙ্গী পঙ্গু হয়ে পড়ে—লিখনভঙ্গী খালি শূন্যতার ওপর দাঁড়াতে পারে না। তবে 'নবীন তামিলের' লেখকেরা মনে করেন খালি লিখবার শক্তি থাকলেই বই রচনা করা যায়, বক্তব্য থাকুক বা না থাকুক তাঁদের পরোয়া নেই। এ ধারণার জন্যই তাঁদের রচনা বক্তব্যহীন, নূতনত্ব বর্জ্জিত। এঁদের লেখা অধিকাংশ গল্প ও প্রবন্ধ (?), হয় ছায়াবলম্বনে লেখা, নতুবা অনূদিত। এই অনুবাদ ও 'ছায়াবলম্বনের' জঞ্জালে

লিখনভঙ্গী কেমন করে উন্নত থাকতে পারে? সৃষ্টিমুখী প্রেরণা ছাড়া সাহিত্য রচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র, যাদের চিন্তা ও লিখনভঙ্গী নিজস্ব নয় তারা সাহিত্যিকও নয়। আসল রচনার যথাযথ ও বিশদ বিবরণ দেওয়াতেই অনুবাদ ও 'ছায়াবলম্বন' সাহিত্যের সর্ব্ববৃহৎ সার্থকতা। কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টি একে কেউ বলে না। 'নবীন তামিলের' লেখকদের একমাত্র কৃতিত্ব হল, 'রিয়ালিষ্টিক' গদ্যের এই ফাঁপা হুঙ্কারজনক অনুকরণ।

প্রাচীন কালের পণ্ডিতেরা পদ্য-রচনা করতেন বিদ্বান ও জ্ঞানী লোকদের জন্য, সাধারণের জন্য নয়। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ তাঁদের কাব্য-রচনার এই সীমাবদ্ধতা ও বিদ্যাভিমান। 'নবীন তামিলের' লেখকেরাও একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকদের জন্য লেখেন কিন্তু তাঁদের রচনা এত নিরীহ ধরণের যে বিদ্যাভিমানের দোষ তাঁদের কেউ দিবে না। সমশ্রেণীর লোকদের জন্যই এঁদের রচনা, যে রচনার কোন কোন সরল বাক্যে চলতি ভাষার ছাপ, কয়েকটি বাক্যে বাস্তবতার গন্ধ। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তামিল ভাষায় হাজার হাজার বই ছাপা হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে বেশীরভাগই অপাঠ্য, কেনার যোগ কোনটাই নয়—যদি না পিছন ফিরে কেউ বারথি ও তাঁর সমসাময়িক লেখকদের দিকে তাকায়।

তবে তামিল ভাষার 'পাঠ্য-বইগুলি' উদ্দেশ্যমূলক। অলসতা ও ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার মোহ থেকে এ-বইগুলি অনেকাংশে মুক্ত। কিন্তু তামিল-গদ্য এখনও তার শৈশব অতিক্রম করে নাই, সেহেতু আশা করা যেতে পারে, চলতি ভাষার প্রতি এই মোহ কেটে গেলে তামিল ভাষায় এক নূতন ও উন্নত-ধরণের গদ্যের উদ্ভব হবে।

তামিল ভাষার এমন কিছু গুরুতর বিচ্যুতি নাই, সাহিত্য-রচনার যে কোন ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা সুপ্রচুর। প্রকৃত সৃষ্টিমুখী সাহিত্য-প্রেরণা ও নূতন কিছু বলবার শক্তি নিয়ে যখন লেখকদের আবির্ভাব হবে তামিল-গদ্যের উন্নতি তখন অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানে যাঁরা আছেন, আপাততঃ তাঁদের ওপরই আমাদের ভরসা।

পদ্ম নাথন্

সঙ্গীত

উত্তর ভারতবর্ষে অখিল ভারতীয় সঙ্গীত অধিবেশন অত্যন্ত সাধারণ ও পরিচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন সহরে বছরে দু'তিনটে কনফারেন্স হতে দেখা যায়। জনসাধারণ ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহ না থাকলে এটা সম্ভব হতনা। এককালে যখন বেতার-সঙ্গীতের পত্তন হয় নি, ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা এই সূত্রে বিশেষজ্ঞের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে সাধারণ্যে প্রবাহিত হবার সুযোগ পায়। প্রথমে ওস্তাদী গান প্রীতির চেয়ে ভীতির উদ্রেকই করত বেশী, কিন্তু ক্রমশঃ অভ্যস্ত হওয়ার ফলে আসরে শ্রোতার নিদ্রাকর্ষণ বিরল হয়ে ওঠে। অবশ্য বিরক্তির কারণ এখনও আছে। কারণ অধিবেশনগুলি যে সর্ব্বত্র সুরুচি ও সুবিবেচনার প্রতি দৃষ্টি রাখে এমন নয়। তবু অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও যা বছরের পর বছর নিজের সত্তা বজায় রেখেছে, তার মধ্যে প্রাণশক্তির অস্তিত্ব থাকাই সম্ভব।

প্রথম অধিবেশনগুলির ঠিক মনোরঞ্জন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। বরোদা, দিল্লী, বেনারস এবং লক্ষ্মৌতে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের উদ্যোগে ১৯১৬, ১৯১৮, ১৯১৯ এবং ১৯২৫-এ যে অধিবেশন হয়, তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল রাগ এবং সঙ্গীতশাস্ত্রের মূলসূত্রগুলির আলোচনা করা। প্রচলিত রাগের রূপ বিধিবদ্ধ করা এবং অপ্রচলিত রাগগুলি সম্বন্ধে মতভেদ লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন ছিল। এবং এ সম্বন্ধে যা কিছু কাজ হয়, তার নিদর্শন প্রকাশিত রিপোর্টগুলি। সাঙ্গীতিক নানা প্রবন্ধ এবং খ্যাতিমান গাইয়ে বাজিয়ের সমাবেশে সবদিক থেকেই এ অনুষ্ঠানগুলির খুব বড় একটা সার্থকতা ছিল। ১৯২৫'র পর অধিকাংশ অধিবেশন দাঁড়িয়েছে গান বাজনার মজলিশ এবং ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষাস্থল। সঙ্গীত সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রায় উঠে গিয়েছে বল্লেই হয়।

ইওরোপে সঙ্গীত সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ ও সুগঠিত। সেখানে উচ্চসঙ্গীতের অনুরাগী শ্রোতার অভাব নেই, ছাত্রছাত্রীর জন্য সর্ব্বত্র সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান আছে, খ্যাতনামা গায়ক বাদক সহজেই যে কোন সহরে নিজের সাঙ্গীতিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন এবং সঙ্গীতালোচনার জন্যে পত্রিকারও অভাব নেই। আমাদের দেশে এ কোনটির সুবিধে নেই, সুতরাং অগত্যা কনফারেন্সের সাহায্যে কোনপ্রকারে এগুলি নির্ব্বাহিত হয়। যেদিন সঙ্গীতের সর্ব্বাঙ্গীণ অনুশীলনের সুব্যবস্থা হবে, অধিবেশনের এক মেলামেশা ছাড়া অন্য বিশেষ কোন উপযোগিতা থাকবে না। কিন্তু ভারতবর্ষে সে আগামী কাল দূরাবলম্বী এবং সেহেতু মধ্যবর্ত্তী অনুষ্ঠানগুলি শোভন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে।

প্রথম কথা ওঠে অধিবেশনের সময় নিয়ে। সব সময়ে নিজের ত্রুটিগুলি আমরা দেখতে পাই না। বাইরে থেকে যে মতামত দেওয়া হয় তার এই কারণে একটি বিশেষ মূল্য আছে। বিদেশ থেকে অন্যায় সমালোচনাও হয়, তার প্রতিবাদ হওয়া উচিত কিন্তু সত্যি

কথাও কিছু থাকে। Aldous Huxley সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত, মনে হয় সঙ্গীতেও তাঁর কিছু অধিকার আছে। ১৯২৫'র লক্ষ্ণৌ কনফারেন্সে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সঙ্গীত সংক্রান্ত মন্তব্য তিনি যা তাঁর Jesting Pilate-এ পেশ করেছেন, ভারতীয় সঙ্গীতানুরাগীর সেগুলি ধীরভাবে বিবেচ্য। "At the end of the second day of the All-India Music Conference I declared strike. Accustomed to the ordinary three-hour day of the European concert-goer, I found myself exhausted by the seven or eight hours of daily listening imposed on me by the makers of the Lucknow programme. There was one long concert every morning, another every afternoon, a third at night. It was too much. After the second day I would not go again. Still, before I struck, I had had sixteen hours of Indian music—enough at home, to hear all the symphonies of Beethoven, with a good sprinkling of characteristic specimens of Mozart and Bach thrown in." আমি ভুক্তভোগী, সুতরাং Aldous'র অভিযোগ সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে আমার কোনও দ্বিধা হয় না। সৌন্দর্য্য উপভোগের চারিপাশে একটি অবকাশ থাকা উচিত। ফতেপুরশিক্রি অনেকের অত্যন্ত ভাল লাগে, তার কারণ তার চারিপাশে দিগন্তস্পর্শী প্রান্তরের আবেষ্টন। তাজমহল বা আগ্রা ফোর্ট এ ভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই। সারা মাস অর্দ্ধাশনে থেকে দুদিন ক্রমাগত পোলাও কোর্ম্মা খেয়ে জীবন উপভোগ বা স্বাস্থ্যরক্ষা কোনটাই হয় না। বছরখানেক ভাল গান না শোনার শোধ তুলি তিন বেলা গান-বাজনা শুনে। যে দেশে তিনঘণ্টা ভাল অভিনয় দেখার চেয়ে সারারাত্রি তৃতীয় শ্রেণীর চীৎকার ও গান শোনা রসপ্রিয়তা বিবেচিত হয় সেখানে এর চেয়ে বেশী প্রত্যাশা করা হয়ত অসঙ্গত। সঙ্গীত অধিবেশনে নিকৃষ্ট গান-বাজনার আমদানি কম হয়ে ঘণ্টা তিন প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত শুনতে পাওয়া গেলে শ্রোতার নিদ্রাতুরতা বা ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ কমই ঘটত। কিন্তু কাগজে লিখে প্রতিকারের আশা কম, মার্জ্জিত রুচি উদ্যোক্তা এবং শ্রোতার সহযোগিতার উপরই উন্নতি নির্ভর করে বেশী।

দ্বিতীয় গুরুতর ত্রুটি উচ্চসঙ্গীতে হারমোনিয়মের ব্যবহার। Aldous লিখেছেন, "There were accomplished singers and celebrated players of every Indian instrument—including even the harmonium which, to my astonishment and greater disgust, was permitted to snore and whine in what I was assured was the very sanctuary of Indian music." সঙ্গীত সমালোচক Fox Straugways সাহেব তাঁর গ্রন্থে ও প্রবন্ধে একথা অনেকবার বলেছেন। বাংলা মাসিকপত্রেও এর প্রতিবাদ হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে কোন সুফল হয়েছে বলে মনে হয় না। বিদেশী কাগজপত্রে এবং পুস্তকে এ সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা ও মর্ম্মান্তিক পরিহাস হয়, সত্যকথা নিঃশব্দে হজম করতে হয়। দিন দিন শ্রবণ-সূক্ষ্মতা হারমোনিয়মের কল্যাণে তিরোহিত হচ্ছে, অথচ ভারতীয় তথা প্রাচ্য সঙ্গীতের অমূল্য সম্পদ ও বৈশিষ্ট্য হল সূক্ষ্মান্তর স্বর। মজা এই সাহেবরাই প্রথমে ভারতীয় বিশেষত্বের প্রতি সচেতন হন, তারপর আমরা সারিবেঁধে তাঁদের পশ্চাদ্গমন করি। ব্যাপার এইরকমই দাঁড়িয়েছে যে বিলিতি

সিনেমার যে কোন গায়ক বা গায়িকার কণ্ঠে ভারতীয় অধিকাংশ হারমোনিয়ম-পন্থী ওস্তাদের চেয়ে বিশুদ্ধ স্বর শোনা যায় এবং কিছুদিন পরে এও হয়ত সম্ভব হবে বিলিতি বেতার-সঙ্গীতে ভারতীয় শ্রুতির একমাত্র প্রমাণ আমরা কলকাতায় বসে শুনব। কিন্তু এতটা নিরাশ হবার হয়ত তত কারণ নেই। বরোদা, গোয়ালিয়রে ও লক্ষ্ণৌতে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানে তানপুরো ও সারেঙ্গি উচ্চসঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়। লক্ষ্ণৌ ম্যারিস কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর নবাব আলি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ হারমোনিয়ম-বাদক ছিলেন কিন্তু উচ্চসঙ্গীতে হারমোনিয়মের ব্যবহার কোনদিন তাঁর কাছে অনুমোদন পায় নি। শান্তি-নিকেতনে সঙ্গীতে হারমোনিয়ম ব্যবহার নিষিদ্ধ। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে সঙ্গীত-রতন নাসিরুদ্দিন খাঁ কর্ত্তৃক তানপুরোর সাহায্যে শুদ্ধস্বর বিশদীকৃত হয়েছিল। আব্দুল করিম প্রথমবার যখন কলকাতায় আসেন (১৯২৫ কিম্বা ২৬'এ) দু'টি তানপুরো দুপাশে তাঁর অকৃত্রিম স্বর-বিশুদ্ধতার সহযোগিতা করত। শ্রীমতী কেশর বাই সেদিন তানপুরো নিয়ে সারেঙ্গির সহযোগিতায় রাগরাগিণার বিশুদ্ধ রূপ প্রকাশ করেছিলেন। কেশর বাইয়ের সমতুল্য গায়িকা কিছুদিন পূর্ব্বেও খুব দুর্লভ ছিল না। তার প্রমাণ গহরজান, শ্রীজান, জোহরা বাই প্রভৃতি। কিন্তু এঁরা কেউ তদনীন্তন সঙ্গীত-সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেন নি, কারণ বড় গায়কের সংখ্যা তখন পর্য্যাপ্ত ছিল। মেয়েরা যে পুরুষের ন্যায় কোনদিন গাইবেন না এমন কোন কথাই নেই ; যেখানে সূচনা আছে সেখানে সম্ভাবনাও থাকে। আজ কেশর বাইয়ের সমকক্ষ পুরুষ গায়ক ভারতে খুব সুলভ নয়। অবশ্য তানপুরোই কেশর বাইয়ের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, তাঁর শুদ্ধ রাগবিস্তার, সুমিষ্ট ও দুরূহ তান, রুচির আভিজাত্য তাঁর গানের সম্পদ। হারমোনিয়মের প্রতি আমার অজ্ঞানতাহেতু ঘৃণা বা বিদ্বেষ জন্মায় নি। অতি বাল্যাবস্থায় হারমোনিয়ম শিখে ও দীর্ঘকাল বাজিয়ে এর দোষগুণ ভাল করে পরখ করবার সুযোগ হয়েছে। বর্ত্তমানে ঠুংরি জাতীয় হিন্দি ও বাংলা গানে হারমোনিয়ম চলতে পারে কারণ শুধু তানপুরোয় হাল্কা গান শোভা পায় না। হারমোনিয়মের আর একটি সুবিধে আছে যন্ত্রটি নিজে বাজিয়ে গাওয়া চলে। কিন্তু এটা সাময়িকভাবে নিতে হবে, চাহিদা বাড়লে সারেঙ্গি বাজিয়ের অভাব হবে না। অবিলম্বে ওস্তাদী গান এবং অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত গান তানপুরো ও সারেঙ্গির সহযোগিতায় হবে এইটাই আদর্শ হওয়া উচিত।

ছেলেমেয়েদের পরীক্ষাই সঙ্গীত অধিবেশনে সবচেয়ে বিসদৃশ ঠেকে। কিন্তু ভাল সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা যতদিন না হয় এও থাকবে। তবে একটা কথা মনে রাখা উচিত যে ভারতীয় সঙ্গীতে Prodigy বা বালপ্রতিভার কোন স্থান নেই। আমাদের সঙ্গীতের মূলকথা হ'ল সৃষ্টি, যে মুহূর্ত্তে মনে হয় যে গায়ক বা গায়িকা মুখস্থ কাজ করে চলেছেন, গানের সমস্ত দীপ্তি নিভে যায়। ১৫।১৬ বছরে স্রষ্টাশিল্পী হওয়া যায় না। অথচ অধিবেশনে শ্রেষ্ঠ ওস্তাদদের সঙ্গে বালকবালিকাও সোনার মেডেল পান এবং এমনই এক আসরে একবার দেখেছি যে মুসলমান গায়ক সবচেয়ে ভাল গেয়েছিলেন, স্বর্ণ বা রৌপ্য পদক পাওয়া দূরে থাক, সামান্য প্রশংসাপত্রও তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। পৃথিবীতে Mozart-র মত অল্পবয়সে প্রতিভার স্ফুরণ

অল্প লোকেরই হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধেও সমালোচকরা বলতে কুণ্ঠিত হন নি।
" As Professor Deut observes in his book on Mozart's operas, 'there is nothing remarkable about La Finta Semplice except that it was the work of a boy ' and this applies to all his earliest works . . . . It was not until he reached about his twenty-fifth year that he began to write the music which was to ensure his immortality. This is early enough, no doubt , but certainly not without precedent in the history of art."—Gray.

তারপর আসে সঙ্গীত শাস্ত্রালোচনার কথা। কয়েকটি অধিবেশনে কিছু এবিষয়ে বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থা ভিন্ন দাঁড়িয়েছে। অধুনা গায়কের জীবিকা অর্জ্জন নির্ভর করে মেয়েদের গান সেখার উপর। বাংলাদেশে একটা রীতি আছে সব মেয়ের বিবাহোপযোগী গান শিখতে হবে এবং বরপক্ষের সামনে পরীক্ষা দেওয়ার পরদিন সব ভুলে যেতে হবে। এ প্রকার পটভূমিকায় গায়কদের সাধারণতঃ কি প্রকার গানের অনুশীলন রাখতে হয় তা সহজবোধ্য। তারপর বেনে সভ্যতার ঔদার্য্যে সিনেমায় যে শ্রেণীর গানের পরিবেশন হয় তাতে উচ্চসঙ্গীতের অস্তিত্ব বজায় রাখা সুকঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহজ জনপ্রিয় গান গাইতে কারুর আপত্তি নেই, কিন্তু তাই বলে উচ্চসঙ্গীত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এও কাম্য নয়। এখন যদি গায়করা শাস্ত্র ত দূরের কথা, ভাল করে রাগরাগিণী শেখার যৌক্তিকতা বা সময় খুঁজে না পান, তবে সব দোষ কি বেচারী গায়কের স্কন্ধেই পড়বে? হারমোনিয়ম ব্যবহারের জন্য বেশী দায়ী আমাদের সামাজিক আবেষ্টন, খেলো সস্তা গান দিয়ে যেখানে অন্নসংস্থান ও সাধারণের রুচির পোষকতা করতে হয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজে সাঙ্গীতিক কিছু যে বুঝবার বা ভাববার থাকতে পারে, তার প্রত্যয় করান দুস্কর। ইউরোপে সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষণের ও গবেষণার ব্যবস্থা আছে এমন কি ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বই প্রকাশ ও বিশ্লেষণের যা সুযোগ সেখানে আছে তা ভারতে নেই। সে দেশে সঙ্গীত অধিবেশনে গুটিকয়েক প্রবন্ধ পাঠ গবেষণার প্রহসন রূপে গ্রহণ করতে লোকের বাধে। ভাগ্যক্রমে সাহেবরা আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সঙ্গীত বুঝতে পারেন নি, নইলে তাঁদেরই লেখা বই থেকে আজ ভারতীয় সঙ্গীত শিখতাম এবং তারপর ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সহসা গৌরাবান্বিত বোধ করতাম।

হেমেন্দ্রলাল রায়

সিনেমা

অভিনয়: শ্রীভারতলক্ষ্মী।
দেশের মাটি: নিউ থিয়েটার্স লিঃ।

বিংশ শতাব্দীর রূঢ় আলোক মানুষের মনে বুদ্ধি এবং বিচারের বনিয়াদ পাকা করে তুল্ছে। কিন্তু এখনো বাঙালীর মন রসাভাসে চৈতন্যযুগীয় অচেতনতায় বিমূঢ়। এই মানসিক অসুস্থতা ব্যবহারিক জীবনে যত প্রচ্ছন্নই থাক্ চারুকলার ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে তা উদ্ঘাটিত হবেই। সম্প্রতি ছায়া-চিত্রেও বাঙালীর এই মূর্ত্তিই দেখ্‌তে পাচ্ছি। সস্তা আবেগ বা জোলো ভাবালুতার প্রশ্রয় থাকলে ঘটনার অসম্ভাব্যতা কিম্বা গল্পের দুর্ব্বলতা নির্ব্বিকারচিত্তে বাঙালীদর্শক মার্জ্জনা করে যায়। তার প্রমাণ প্রাচীন 'সোনার সংসার' এবং বর্ত্তমান 'অভিনয়'। অভিনয়ে'র গল্পলেখক বাংলাদেশকে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে নিয়ে গিয়েও বাঙালীর ছিঁচকাদুনে স্বভাবটাকেই লুণ্ঠন করেছেন—দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে বাঙালী জীবনের তার কোন বিবর্ত্তনই ঘটে নি ধরে নিতে হবে। দুর্ব্বল লেখক দর্শক ও প্রযোজকের মনস্তুষ্টি করেছেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু সমালোচকের কাছে তিনি অশ্রদ্ধাই পাবেন। প্রথমতঃ, ছায়াচিত্রের যে একটি সুস্থ ও বলিষ্ঠ দিক হতে পারে রুচি সংস্কারের দিক,—সুযোগ পেয়েও তাকে লেখক উপেক্ষা করলেন; দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে শত-কথিত জীর্ণ সমস্যা পরিবেশন করেছেন তার জন্য পঞ্চাশ বছরের মত সুদীর্ঘ কালের যাত্রা অপেক্ষা করবার প্রয়োজন হয় না—গল্পে তাঁর পঞ্চাশ বছরটা নিতান্তই অবান্তর। এই পঞ্চাশ বছরের সুযোগ অবিশ্যি পরিচালক তাঁর বুদ্ধির অনুপাতেই গ্রহণ করেছেন। তা না হলে 'অভিনয়'-এ মহার্ঘ 'সেট'গুলো দেখতে পাওয়া যেত না। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। তারপর পরিচালকের পরিকল্পনায় পঞ্চাশ বছর পরে বাংলাদেশ আংশিক-ভাবে আমেরিকা হয়ে' গেছে। পরিপূর্ণভাবে হ'তে পারে নি পরিচালকের ভ্রান্তির দরুণ। ১৯৩৮ সনের মডেলে যে তখন ট্রেণ কিম্বা মোটর থাক্‌বে না তাঁর মনে হয়ত সে কথা উদিত হয় নি। অভিনয়ের অভিনয়ে মাত্র তিনটি নাম উল্লেখযোগ্য—শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, যাঁর অভিনয় অতি-অভিনয় ঘেঁষা আর সে জন্যই সাধারণের সাধুবাদ অর্জ্জনে সমর্থ—শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ি যাঁর অভিনয় প্রায় নির্দ্দোষ—শ্রীযুক্তা সাধনা বোস, অভিনয়ে যিনি আড়ষ্টতা মুক্ত হয়েছেন মাত্র, তাতে তিনি অভিনেত্রী হতে পেরেছেন কিন্তু তার উর্দ্ধে চরিত্রশিল্পী হতে পারেন নি। আলোকচিত্র কিম্বা শব্দগ্রহণ অপ্রশংসনীয় নয় কিন্তু সঙ্গীতগুলি শ্রবণেন্দ্রিয়ের তুষ্টিবিধান করে না।

অভিনয়ের গল্পে ত্রুটি যতই থাক্, শেষের দিকে ঘটনার জটিলতায় এবং দ্রুত আরোহণ-অবরোহণে তা ছায়াচিত্রের উপাদান হিসাবে একেবারে অযোগ্য হয় নি। কিন্তু 'দেশের

মাটি'র গল্প ছায়াচিত্রে গ্রহণের অযোগ্য। কোন ঘটনার চূড়ান্ত প্রকাশ তাতে নেই, এমন কি গল্পের স্বাভাবিক পরিণতিও স্থানে স্থানে ব্যাহত। হয়ত পল্লীসংস্কারের প্রচার গল্পের পঙ্গুতার জন্য আংশিকভাবে দায়ী কিন্তু সে প্রচারকার্য্যেরও পূর্ণ এবং নির্দ্দোষ রূপ গল্পে অনুপস্থিত। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বর্জ্জিত এবং দৈবপ্রভাবিত ঘটনাবলীতে চিত্রের যে দুঃস্থ অবস্থা কল্পনা করা যায় নিখুঁতভাবে তা 'দেশের মাটি'তে পরিস্ফুট হয়েছে। বলা বাহুল্য যে এ রকম গল্প পরিচালককে বিভ্রান্ত করবে। গল্পকে বিস্তার করতে গেলে প্রচার আঘাত পায়, প্রচারে মনোনিবেশ করলে গল্পকে হত্যা করতে হয়, তাছাড়া জনপ্রিয়তা অর্জ্জনের নেশা ত আছেই। শেষ পর্য্যন্ত এই বস্তুত্রয়ের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে দেখা গেল জনপ্রিয়তাই উপরস্থ হয়ে' পড়েছে। সঙ্গীত প্রাচুর্য্যে চিত্রখানাকে 'অপেরা' বলে ভ্রম করলে দর্শকদের দোষ দেওয়া যায় না। পরিচালকের পরিচালনার ব্যর্থতা এখানেই অভিব্যক্ত। পরিচালক রাসায়নিক নয়, উদজান এবং অম্লজানের মিশ্রণে তৃতীয় পদার্থ জল তার কাছে কেউ আশা করে না। অথচ এ অপ্রত্যাশিত ভোজবাজি 'দেশের মাটি'র গল্প এবং উদ্দেশ্যকে ম্লানতর করে দিয়েছে। অভিনয়ের ত্রুটির জন্যও দায়ী গতিহীন, নিষ্প্রভ সংলাপ। সুদক্ষ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর জনতাও তাই অভিনয়ের উজ্জ্বলতা দান করতে পারে নি। তবু শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী চন্দ্রাবতীকে সেই ব্যূহ ভেদ করে মাঝে মাঝে বাইরে চলে আসতে দেখা যায়। কিন্তু শ্রীমতী উমাশশী অবরুদ্ধই রয়ে গেছেন। নায়ক সাইগল অচল এবং শ্রীযুক্ত অমর মল্লিক চার্লস্ লাটনের অনুকরণে হাস্যকর। তবে আলোকচিত্র বা শব্দগ্রহণ এবং সঙ্গীতকে নির্দ্দোষ বলা যায়—'দেশের মাটি' চিত্রে এই যা সান্ত্বনা।

সমালোচনা

১

কাদম্বরীর বাংলা তর্জ্জমা

(১)

শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দু ঠাকুর 'কাদম্বরী'র পূর্ব্বভাগের, অর্থাৎ যে অসম্পূর্ণ 'কাদম্বরী' বাণভট্টের রচনা তার একটি বাংলা তর্জ্জমা ক'রে প্রকাশ করেছেন। এই তর্জ্জমা বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে, একাধিক কারণে।

অনুবাদক তাঁর 'নিবেদনে' এবং মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী গ্রন্থের 'ভূমিকায়' বাণভট্টের হয়ে আধুনিক পাঠকসমাজের কাছে একটু জবাবদিহি করেছেন। বাণভট্ট প্রাচীন কালের লেখক; তাঁর সময়কার সাহিত্যিক রীতি ও রুচির একালের সঙ্গে অনেক গরমিল; তাঁর গুণ-দোষের বিচারে সেকালের মাপকাঠি স্মরণ রাখতে হবে; তাঁর লেখার সম্পূর্ণ রস পেতে হলে মনকে বাঁধতে হবে বাণভট্টের কালের বিদগ্ধসমাজের মনের একসুরে—ইত্যাদি। এর কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। সাহিত্যের রচনাভঙ্গীর কালে কালে বদল হয়, ভিন্ন কালের সাহিত্যের রস ঠিক এক রস নয়—এর চেয়ে সুস্পষ্ট কথা আর কি আছে। এক দেশ ও এক কালের কোন দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের লেখার রীতি ও রস এক! সাহিত্যসৃষ্টির এই বৈচিত্র্যই সাহিত্যরসিককে নিত্য নূতন আনন্দের জোগান দেয়। এক অমৃতে তৃপ্ত থাকা হয় ত দেবতাতে সম্ভব, মানুষে নয়। মানুষের সৌভাগ্য যে প্রাচীনকালের সাহিত্য তার নিজের কালের সাহিত্যের মত নয়। যে পাঠকের মন তার সমসাময়িক লেখকদের, প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীবিশেষের লেখকের রচনা ছাড়া আর কোনও লেখায় রস পায় না, পায় কেবল অপরিচয়ের বিমুখতা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তার জন্য নয়—সেকালের কি স্বকালের। গতানুগতিকে অভ্যস্ত এই পাঠকদের কাছে 'কাদম্বরী'র রস বাণভট্টের ভাষায় "অর্করিপোরিবামৃতম্", রাহুর অমৃতপানের মত—হৃদয় না থাকায় গলার নীচে নামে না। দোষ 'কাদম্বরী'র প্রাচীনত্বের নয়, তথাকথিত আধুনিকতা যা আজ গেলে কালই হবে প্রাচীন, তার ক্ষীণদৃষ্টি সঙ্কীর্ণতার। এ তারুণ্য সেই স্থবিরত্বের ছদ্মনাম, অনভ্যস্ত কোনও কিছু যার কাছে বিরস।

(২)

'কাদম্বরী'র প্রকট এবং সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ রূপ হচ্ছে তার সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ। 'কাদম্বরী'র প্রস্তাবনায় বাণভট্ট এই রচনারীতিকে বলেছেন, "নিরন্তরশ্লেষঘনাঃ"—শ্লিষ্ট পদের নিরন্তর প্রয়োগে বাক্য যেখানে ঘনসন্নদ্ধ অর্থাৎ জমাটবাঁধা। এ শ্লেষশব্দের সুকৌশল বিন্যাসে অনেক পদকে যখন একপদ ব'লে মনে হয়, আলংকারিকেরা যার নাম দিয়েছেন 'বৈদর্ভী' শ্লেষ, ভাষার

সে মসৃণত্ব নয়, কারণ সে শ্লেষ সংস্কৃত গদ্য রচনায় একরকম অজ্ঞাত ; এ শ্লেষ হচ্ছে সমাসের আকর্ষণে ও চাপে বহু পদকে প্রকৃতই একপদে জমাট বেঁধে ভাষাকে গাঢ়বন্ধ করা। (১)। সংস্কৃত উচ্চারণের হ্রস্বদীর্ঘ ভেদে এবং অনুস্বার-বিসর্গের টংকার ও দামামা ধ্বনিতে ভাষায় যে বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য্য আনে অর্থের বিলম্ববোধ্যতার ক্ষতি তা কিঞ্চিৎ পূরণ করে ; কিন্তু বাংলাতে এ রচনারীতি একেবারে অচল। সমাসের এই গুরুভার বাংলার ধাতে অসহ্য। সুতরাং 'কাদম্বরী'র বাংলা তর্জ্জমা পাঠ্য করতে হলে বাণভট্টের লেখার এই 'নিরন্তরশ্লেষঘনত্ব' বর্জ্জন করতে হবে।

রচনার এই ভঙ্গীই যদি হ'তো 'কাদম্বরী'র বড় কথা তবে বাংলা ভাষায় তার অনুবাদের চেষ্টাকে বৃথা শ্রম বলতে হ'তো। কিন্তু ভাষার দিক থেকেও এটা 'কাদম্বরী'র বহিরঙ্গ মাত্র। বাণভট্ট ভাষার যে দৃঢ়সম্বদ্ধ মালা গেঁথেছেন তার প্রতিটি পদ নিটোল মুক্তা। সমাসের সুতো সরিয়ে নিলেও তাদের ঔজ্জ্বল্য ও মসৃণত্বের কিছু ক্ষতি হয় না। শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দু ঠাকুর তাঁর তর্জ্জমায় এই সুতো খুলে ফেলেছেন, কিন্তু মুক্তাগুলিকে প্রায় বহাল রেখেছেন, এবং তা দিয়ে এমন মালা তিনি গেঁথেছেন বাংলার কণ্ঠ ও বুকে যা অতিশোভন। তাঁর তর্জ্জমা হয়েছে সুখপাঠ্য ও সুখবোধ্য, কিন্তু বাণভট্টের শব্দ-চয়নে রং ও রূপের যে মোহ তাকে অনেকটা বজায় রেখে। এ সম্ভব হয়েছে বিশেষ এই কারণে যে সমাসের গ্রন্থি কেটে দিলেও তর্জ্জমার ভাষা কিছুমাত্র শিথিলবন্ধ নয়, চমৎকার গাঢ়বন্ধ। বাংলায় অচল সমাসবদ্ধ শ্লেষ ত্যাগ ক'রে অনুবাদক সেই বৈদর্ভী শ্লেষে সিদ্ধিলাভ করেছেন, আলংকারিকেরা সংস্কৃত পদ্যে যার প্রশংসায় মুখর, কিন্তু সংস্কৃত গদ্য যার পথের সন্ধান পায় নি। সংস্কৃত গদ্যে যদি এ শ্লেষ চলতি থাকতো বাণভট্টের মত আর্টিষ্ট 'কাদম্বরী' লিখতেন দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাক্য দিয়ে নয়, এই অনুবাদের ভাষার রচনারীতিতে।

(৩)

তর্জ্জমার দু-একটা নমুনা দেখা যাক।

শবরসৈন্যের মৃগয়া-কোলাহল থেমে এলো ; যে মৃগয়ার ফলে 'কাদম্বরী'র গল্পের বক্তা শুক বৈশম্পায়নের পিতার হ'লো মৃত্যু, আর মুনিকুমার হারীত শুকশিশুটিকে নিয়ে গেলেন পিতা জাবালি মুনির আশ্রমে। 'অচিরাচ্চ প্রশান্তে তস্মিন্ মৃগয়াকলকলে নির্বৃষ্টমূকজলধর-বৃন্দানুকারিণি মথনাবসানোপশান্তবারিণি সাগর ইব স্তিমিততামুপগতে কাননে'—'ক্ষণপরেই কোলাহল শান্ত হয়ে গেল। হঠাৎ নিস্তব্ধ নিথর হল অরণ্য—ক্ষান্তবর্ষণ মেঘের মত মৌন, মন্থনশেষ সমুদ্রের মত ধীর'।

শবরসৈন্য বন থেকে চ'লে গেলেও বিকৃতদর্শন এক বৃদ্ধ শবর রয়ে গেল এবং বহু শুকপক্ষীর আশ্রয় অনেক তালতুঙ্গ শাল্মলী তরুতে অবলীলাক্রমে আরোহণ ক'রে শাখা থেকে শাখান্তরে

(১) ১৩৩৮ সালের কার্ত্তিকের ত্রৈমাসিক 'পরিচয়ে' "রীতি-বিচার-শ্লেষ" প্রবন্ধে এই দু রকম শ্লেষের একটু দীর্ঘ আলোচনা করেছি। কোনও পাঠক যদি দৈবাৎ তা পড়ে থাকেন, সম্ভব সে আলোচনা তাঁর মনে পড়বে।

বনস্পতির ফলের মত শুকশাবকদের গ্রহণ ক'রে তাদের বিগতপ্রাণ ক'রে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলতে লাগলো। তাদের, 'কাংশ্চিদুদ্ভিদ্যমানপক্ষতয়া নলিনসংবর্তিকানুকারিণঃ'—"কারোর পাখা সবে গজিয়েছে, সদ্যফোটা পদ্মের যেন এক একটি পাপড়ি"; 'কাংশ্চিল্লোহিতায়মানচঞ্চু-কোটীন্'—"কারোর চঞ্চুতে সবে দেখা দিয়েছে অরুণ আভা"। বৈশম্পায়নের মা মরেছিলেন বৈশম্পায়নের জন্মকালেই তার প্রসববেদনায়। কিন্তু স্ত্রী-বিয়োগব্যথাকে মনে নিরুদ্ধ রেখে তার পিতাই সন্তানকে একাকী পালন ক'রে আসছিলেন। জরায় তাঁর শরীর কাঁপত। এই সাক্ষাৎ যমকে দেখে 'দ্বিগুণতরোপজাতবেপথুর্মরণভয়াদুদ্ভ্রান্ততরলতারকঃ'—মরণভয়ে তাঁর "অঙ্গ কাঁপতে লাগল দ্বিগুণ; উদ্ভ্রান্ত হল চক্ষুর তরল তারা"। কিন্তু সন্তানের স্নেহবশে তাকে পক্ষপুটে ঢেকে কোলের মধ্যে নিয়ে বসে থাকলেন। 'অসাবপি পাপঃ শাখান্তরৈঃ সংচরমাণঃ কোটরদ্বারমাগত্য জীর্ণাসিতভুজংগভোগভীষণং প্রসার্য্য বিবিধবনবরাহবসাবিস্রগন্ধিকরতলং কোদণ্ডগুণাকর্ষণব্রণাঙ্কিতপ্রকোষ্ঠমণ্ডকদণ্ডানুকারিণং বামবাহুমতিনৃশংসো মুহুর্মুহুর্দত্তচঞ্চুপ্রহার-মুৎকূজন্তমাকৃষ্য তাতং গতাসুমকরোৎ'।

—"তারপর সেই পাপ...এল আমাদের বাসার শাখায়। আমাদের কোটরের মুখটায় দেখা দিল তার জঘন্য হাত।

সে কী হাত! শীর্ণ কৃষ্ণভুজঙ্গের মত ভীষণ। বুনো বরার চর্ব্বিমাখা। দুর্গন্ধ উঠছে। ব্রণ আর বলীতে ভরা। সাক্ষাৎ যমদণ্ড!

সেই বামবাহুর উপর পিতা মুহুর্মুহু চঞ্চু প্রহার করতে লাগলেন। কিন্তু কত ক্ষীণ! পিতাকে মুহূর্তমধ্যেই হত্যা করলে সেই পাপ।"

যদি কারও ধারণা থেকে থাকে যে বাণভট্ট কেবল কোমল ও মধুর পদ ও ভাবের মালাকর, তাঁর নিজের কথায় 'স্ফুরৎকলালাপবিলাসকোমলা'—সেই ধারণানিরসনের জন্য এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করলেম। বৃদ্ধ শবরের প্রসারিত বাঁ হাত যে 'জীর্ণাসিতভুজংগভোগভীষণং', জীর্ণ কৃষ্ণ ভুজংগের দেহের মত ভীষণ—এ উপমার পারিপাট্য মহাকবিতেই সম্ভব। বৃদ্ধ শবরের কৃষ্ণবর্ণ বাহুর কুৎসিত অমসৃণত্ব ও যে-শুকপাখীদের দিকে সে হাত এগিয়ে আসছে তাদের মনের ভয় এক উপমায় নিঃশেষে প্রকাশ হয়েছে। 'মুহুর্মুহুর্দত্তচঞ্চুপ্রহারমুৎকূজন্তম্'—দুর্ব্বল অসহায় পাখীর আত্মরক্ষার নিষ্ফল চেষ্টার একখানা ছবি, যেমন স্বাভাবিক তেমনি করুণ। অনুবাদক 'উৎকূজন্তম্' কথাটা অনুবাদ থেকে বাদ দিয়েছেন কেন জানি না। ওতে বাণভট্টের ছবিটির অঙ্গহানি হয়েছে।

বাণের 'হর্ষচরিত', যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে শুক বৈশম্পায়নের পিতার অপত্যস্নেহের চিত্রে বাণভট্টের আত্মজীবনের একটু ছায়া আছে। বাণভট্টের অতি বাল্যকালেই তাঁর মা রাজ-দেবীর মৃত্যু হলে তাঁর বাপ চিত্রভানু "জাতস্নেহস্তু নিতরাং পিতৈবাস্য মাতৃতাম্ অকরোৎ" —জাতস্নেহ পিতাই মাতার কাজ করেছিলেন।

(৪)

মূল 'কাদম্বরী'র অংশ ও তার অনুবাদ তোলার লোভ সংবরণ করতে হবে। কারণ এ কাজে প্রলোভনের শেষ নেই।

তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখা কঞ্চুকী কৈলাসের অনুগামিনী হ'য়ে প্রথম আসছে রাজকুমার চন্দ্রাপীড়ের কাছে। 'প্রথমে বয়সি বর্ত্তমানয়া…কিংচিদুপারূঢ়যৌবনয়া'—"কিশোরী; যৌবনের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে।" 'রাজকুলসংবাসপ্রগল্‌ভয়াপ্যনুজ্ঝিতবিনয়য়া'—রাজকুলে বাসের ফলে কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভা, কিন্তু বিনয় ত্যাগ করে নি। 'শক্রগোপকালোহিতরাগেণাংশুকেন রচিত-গুণ্ঠনয়া সবালাতপয়েব পূর্বয়া ককুভা'—"শক্রগোপকীটের মত আরক্ত" অংশুকের অবগুণ্ঠন, যেন বালসূর্য্যে উদ্ভাসিত পূর্ব্বদিক। 'বহুলতাম্বুলকৃষ্ণিকান্ধকারিতাধরলেখয়া'—গাঢ় তাম্বুলরাগের কৃষ্ণিমায় অধররেখা অঙ্কিত। 'সমুপবৃত্ততুঙ্গনাসিকয়া'—"গোল হয়ে নেমে এসেছে উচ্চ নাসা, তার মাঝখানের রেখাটি কিছু বঙ্কিম।" 'পর্য্যুষিতধূসরচন্দনরসতিলকালংকৃতললাটপট্টয়া'—পর্য্যুষিত ধূসর চন্দনের তিলকে ঈষৎ বিস্তৃত ললাট চিত্রিত।

এখানে অনুবাদকের বিরুদ্ধে একটু অভিযোগ আছে। পত্রলেখার এই বর্ণনা হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল সেই বর্ণনা যা যে কোনও কিংচিদুপারূঢ়যৌবনা কিশোরীর রূপ নয়, একমাত্র পত্রলেখার ছবি। কবি তাকে চোখে দেখে এঁকেছেন। এই বর্ণনাসংক্ষেপের জন্য অনুবাদে যা বাদ পড়েছে তাতে পত্রলেখা প্রায় হয়ে পড়েছে ঈষদুদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী কিশোরীমাত্র। "তাম্বুলরাগে রক্তিম তার অধরের বাঁধুনি" বললে "বহুলকৃষ্ণিকান্ধকারিতাধরলেখা"র কিছুই বলা হয় না। "ভালে চন্দনের তিলক" এক, আর "বাসি চন্দনের ধূসর তিলক" অন্য জিনিষ। অনুবাদক তাঁর 'নিবেদনে' বলেছেন যে সাধারণ্যে যাকে অনুবাদ বলে তিনি তা করেন নি; 'খেয়ালের খাতায়' বীরবল যাকে তর্জ্জমা বলেছেন তাই করেছেন। বহুস্থানেই তাঁর এই "অক্ষরের উপাসনা-ত্যাগ" সমীচীন হয়েছে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু মনে হয় এ জায়গাটায় ও আরও স্থানে স্থানে অক্ষরকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে একটু বেশী পরিমাণে, যার ফলে "পদাবলী-লীন…রসের অনুবাদেও" ঘাটতি পড়েছে। শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দু ঠাকুর এই তর্জ্জমা গ্রন্থে ক্ষমতার যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে একটু চেষ্টা করলেই যে এ লাঘব নিবারণ করতে পারতেন তাতে সন্দেহ নেই।

এই ঈষৎ চটুলমূর্ত্তি কিশোরীর সঙ্গে তুলনার জন্য মহাশ্বেতার 'শুচিশুভ্র প্রণয়শোকে প্রশান্ত মূর্ত্তিটির পরিচয় দেবার লোভ কষ্টে সম্বরণ করতে হয়। যে দিব্যমূর্ত্তির বয়সের পরিমাণের কথা লক্ষ্যই হয় না, 'দিব্যত্বাদপরিজ্ঞায়মানবয়ঃ পরিমাণাম্।' মনে হয় 'পশুপতিদক্ষিণমুখ-হাসচ্ছবিমিব বহিরাগত্য কৃতাবস্থানম্'—"পশুপতির দক্ষিণ মুখের হাসিখানি যেন বেরিয়ে এসে বসে রয়েছে।" 'লাবণ্যেনাপি কৃতপুণ্যেনেব স্বচ্ছাত্মনা পরিগৃহীতাম্'—লাবণ্য যেন নির্ম্মল চিত্তের সুকৃতির ফলে সে তনুকে লাভ করেছে। 'রূপেণাপি রুচিরলোচনেন বিগতচাপলেনায়তনমৃগেণেব সেবিতাম্'—রূপ যেন বিগতচাপল্য আয়তচক্ষু গৃহহরিণের মত তাকে আশ্রয় করেছে।

কিন্তু আর নয়। পাঠক 'কাদম্বরী'র মূল ও এই অনুবাদ থেকে সে মূর্ত্তির পরিচয় নেবেন। শ্রম বিফল হবে না।

(৫)

'কাদম্বরী'র এই তর্জ্জমার বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে, বিশেষ বাঙ্গালী লেখক-সমাজে, বহুল প্রচার কামনা করি। বাণভট্টের শব্দপ্রয়োগের ঐশ্বর্য্য, তার পদগুলির রূপ রং ও প্রকাশের শক্তি একটা অদ্ভুত ব্যাপার। তার সঙ্গে নিকট পরিচয় হলে বাঙ্গালী লেখকের লেখার উপর ফল ফলবে নিশ্চয়। মূল 'কাদম্বরী' পড়ার আয়াস স্বীকারে যাঁরা রাজী নন, শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দু ঠাকুরের তর্জ্জমা তাঁদের সে ক্ষতি অনেকটা পূরণ করবে। এর এক বাধা তাঁর এই তর্জ্জমা গ্রন্থের দাম। যাঁরা 'কাদম্বরী' পড়লে বাংলা সাহিত্য ও ভাষার উপর তার প্রভাব পড়বে তাঁদের অনেকেরই পাঁচ টাকা দিয়ে এ গ্রন্থ কেনা কষ্টসাধ্য। এই চমৎকার কাগজ-ছাপা-বাঁধাই পুঁথির মূল্য একটাকা করলে শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দুর যে ক্ষতি হবে, বাংলা ভাষার লাভ হবে তার চেয়ে অনেক বেশী। বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের এ পুঁথি বিনামূল্যে উপহার দেবার কথা মনে এসেছিল, কিন্তু কে সাহিত্যিক এবং কে সাহিত্যিক নয় সেই মহাতর্কের নিদারুণ ভয়ে সে পরামর্শ দিতে সাহসী হচ্ছি নে।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

বাংলা কাব্যপরিচয়। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত ও তৎকর্ত্তৃক ভূমিকা সম্বলিত। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র প্রথম সংখ্যা।

বাংলা কাব্যসংগ্রহের একান্ত অভাব। একখণ্ডে স্বয়ং সম্পূর্ণ কাব্যসংগ্রহ এখনও বোধ হয় বেরোয় নি, যা নিজের সম্ভারে পাঠককে সন্তুষ্ট করিতে পারে। একাধিক খণ্ডে সম্পূর্ণ সংগ্রহও বোধ হয় নেই। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেনের 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থদুটি এতই বিরাট যে তাদের বিপুল কলেবর আয়ত্ত করে নিতে অনেক কসরৎ করতে হয়। তবুও খণ্ডদুটি মূল্যবান, দীনেশচন্দ্রের কীর্ত্তিস্তম্ভ। কিন্তু সে দুটিও অসম্পূর্ণ, উনিশ শতকের কিছু দূর এগিয়ে থেমে গিয়েছে, এবং তাতেও পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা স্থান পায় নি, নতুন সংস্করণের অভাবে। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব প্রমুখ কয়েকজন বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে চড়ুই ভাতি করতে করতে এক আধটি কাব্যসংগ্রহ বের করেছিলেন, কিন্তু সেগুলির খুব মূল্য আছে বলে সুধীগণ মনে করেন না। এক কথায়, বাংলা-কাব্যের একটি ভাল সংগ্রহ এপর্য্যন্ত হয় নি। অথচ বাংলাকাব্যের ভাণ্ডার এত বড় হয়ে উঠেছে যে তার কিছু কিছু ছোট হাতায় পরিবেষণ করা দরকার। যে-কোন কাব্যসাহিত্য শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রধান কবির কাব্যসমষ্টি নয়, তার ইতিহাসে গৌণ কবিরাও বেশ খানিকটা স্থান দখল করে থাকেন; কারণ তাঁদের বাদ দিলে সে-সাহিত্যের পৌর্বাপর্য্য রক্ষা করা কঠিন হ'য়ে ওঠে।

এক্ষেত্রে বাংলার তথা ভারতের কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অতি বৃদ্ধবয়সেও যে বাংলাসাহিত্যের একটি কাব্যসংগ্রহ বের করেছেন তাতে প্রত্যেক বাঙ্গালীরই, যাঁর কিছুমাত্রও নিজের দেশের কাব্যের প্রতি টান আছে, গর্ব অনুভব করা উচিত। কারণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের

মত বাংলাকাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আর কার থাকতে পারে! যিনি গত ষাট বছর ধরে বাংলাসাহিত্যকে নিত্যনতুন গৌরবসমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, বাংলাকাব্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর মত ঘনিষ্ঠতা, নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে, আর কারুরই নেই। উপরন্তু তাঁর রুচির অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সকলেই নিঃসংশয়, একথার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র। অতএব তৎসম্পাদিত 'কাব্যপরিচয়'টিকে বাংলাকাব্যের প্রামাণ্য পরিচয় বলে গ্রহণ করতে সাধারণ পাঠক বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করবেন না। এবং বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় যতই ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক হতে থাকবে ততই তিনি এই 'কাব্যপরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথের বাংলাকাব্য-সম্বন্ধে অন্তর্জ্ঞান ও তাঁর সম্পাদনানৈপুণ্যে অভিভূত ও চমৎকৃত হবেন। 'বাংলা কাব্যপরিচয়' বাঙ্গালী-পাঠকের নিজের ভাষার কাব্যজ্ঞানের হবে কষ্টিপাথর (১)।

অবশ্য যে-কোন কাব্যসংগ্রহে পাঠকমাত্রেই কোন না কোন বিষয়ে হতাশ হবেন, একথা অবিসংবাদী। হয়ত এমন কবি বা কবিতা যা পাঠকের মনকে নাড়া দেয় তার কোন উল্লেখই থাকবে না, হয়ত এমন কবিতা ঢুকে যাবে যা অন্যকে বিরক্ত করবে। একথা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ভূমিকাতেই বলেছেন, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

মোটামুটি কয়েকভাবে কাব্যসংকলন করা হয়। কোন ক্ষেত্রে সংকলনের পদ্ধতি হয় কবির গুরুত্বহিসাবে; যাঁর প্রভাব দেশের কাব্যের উপর যত বেশী এই ধরণের কাব্যসংকলনে তিনি তদনুপাতে স্থান অধিকার করেন। সংকলয়িতার উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে প্রতিপত্তিশালী কবির বিভিন্ন ধরণের লেখা ধরে দেখান, যাতে করে পাঠক পরবর্ত্তী বা সমসাময়িক যুগের গৌণ লেখকদের গতিবিধি বুঝতে পারেন ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিয়ে ঐতিহ্যধারাটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কোন সংকলনের উদ্দেশ্য হয় কাব্যসমুদ্র ছেঁচে কয়েকটি মাণিক তোলা; সে সংকলনের মাপকাঠি হয় কাব্যের বিশুদ্ধতা ও উৎকর্ষ; 'ইংরেজি সংকলন গ্রন্থে যেমন মাঝারি শ্রেণীর বিস্তর মাল বোঝাই' (২) থাকে এ-ধরণের সংকলনে সে-ধরণের মাল স্থান না পেয়ে পরিত্যক্তই হয়। (যদিও কোন কাব্য যে বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট সে বিচার করতে গিয়েই যত অনর্থ ও মাথা ফাটাফাটি ঘটে; এবং সে-ধরণের কাব্যবিচার বোধহয় চলেও না)। আর এক ধরণের কাব্যসংকলন হয়, যা নিছক উদ্দেশ্যমূলক; কাব্যসাহিত্যে কোন বিশেষ একটি যুগ বা ধারার আদ্যন্ত দেখানই সে-ধরণের সংগ্রহের উদ্দেশ্য; অথবা কোন বিশেষ শ্রেণীর কাব্যধারার গতি কোন্‌দিকে তাই দেখান। এ-ধরণের সংগ্রহে অবশ্য অনেক মহারথীও বিনাবাক্যব্যয়ে বাদ পড়ে যান, অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপরে পড়ে 'অতি লম্বা ক্ষতচিহ্ন'। আর এক ধরণের কাব্যসংকলন সম্ভব যা সংকলয়িতার ভাল লাগা মন্দ লাগার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর

(১) এই কাব্যের সম্পাদনাসম্বন্ধে সামান্য একটি অনুযোগ আছে। কালানুসারে কবিদের রচনা সাজালে ভাল হতো; অন্ততঃ প্রত্যেক কবির জন্মতারিখ অনুসারে, এবং সূচিতে নামের পাশে জন্মতারিখ থাকলেও ভাল হতো। এই কাব্যসংগ্রহে যেসব বৈষ্ণবপদাবলী উদ্ধৃত হয়েছে, তাদের রচয়িতাদের সম্বন্ধে অধুনা যে মতদ্বৈধ চলছে, দুঃখের বিষয় সে-আলোচনার কোন দাম দেওয়া হয় নি।

(২) 'ভূমিকা'

করে। (হিটলার বা মুসোলিনি তাঁর নিজের দেশের কাব্যের যদি একটি সংকলন বের করতেন তাহ'লে সেটি কেমন হতো, সে-সম্বন্ধে অনেকেরই প্রগাঢ় কৌতূহল আছে)। কোন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক যদি এই পদ্ধতিতে কাব্যসংকলন করেন, তাহ'লে তার দু'হিসাবে মূল্য হয়; সেই সংকলনে কবির মনের আভাষ পাওয়া যায় ও রুচিসম্মত কতকগুলি কবিতা একত্রে পাবার আশা করা যায়। 'বাংলা কাব্যপরিচয়' শেষোক্ত পদ্ধতিতে করা হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

'বাংলা কাব্যপরিচয়'কে এইভাবে দেখলে বইটির অনেক মোটামোটা অসম্পূর্ণতার কৈফিয়ৎ অতি সহজেই বেরোয় (৩)। কৈফিয়ৎটি এই যে সাধারণ পাঠকের চোখে যা অস্পূর্ণ কবিশ্রেষ্ঠের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার মধ্যে পেয়েছে সম্পূর্ণতার সন্ধান। সাধারণের কাছে যা নিতান্তই ছেলেমানুষির পরিচায়ক ও প্রাপ্তবয়স্ক কোন লোকের একেবারে অনুপযুক্ত, কবির চোখে তাই দেখা দেয় বিশ্বলীলার একাংশ হ'য়ে; একের কাছে যা রুচিগর্হিত অপরের কাছে তা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। তাই 'বাংলা কাব্যপরিচয়ে'র প্রথমেই কেন আলাওল স্থান পেলেন, তার বদলে বৌদ্ধদোঁহার দুএকটি কেন দেওয়া হ'ল না; ছড়া যখন দেওয়া হ'ল তখন খনা ও ডাকের বচন কেন বাদ পড়ল; শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের কোন কীর্ত্তনই কেন নেই; কাণা হরিদত্তকে কেন অন্ধের মত খুঁজেও পাওয়া যায় না; মালাধর বসুর গলায় কেন মালা পড়লো না; মুকুন্দরামের উৎকৃষ্ট ও তাঁর শক্তির যথার্থ পরিচায়ক অংশগুলির পরিবর্ত্তে কেন অতি নিকৃষ্ট ও বৈশিষ্ট্যহীন তিনটি ছড়া দেওয়া হল; কৃষ্ণদাস কবিরাজ যিনি সহসা বাংলাকাব্যকে নতুন শক্তি-সমৃদ্ধিভূষিত করেছিলেন তিনি কেন নীরব; বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের কয়েকটি ভাল দেবীবন্দনা কেন বাদ পড়ল; বংশীবদনের বাঁশী কেন একেবারেই শোনা গেল না; মহাকবি ভারতচন্দ্র কেন সভার একটি অতি সংকীর্ণ কোণ দখল করে রইলেন; গুপ্তকবি কেন স্বরূপ গোপন করেই রইলেন; যাঁর কাব্যে 'বাংলাভাষার যন্ত্রে মিল্‌টনীয় মীড়মূর্চ্ছনা' পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় মুগ্ধ হয়েছেন সেই মধুসূদনের মেঘনাদবধের প্রথম সর্গের ভারতী-বন্দনাটি কেন বাদ পড়ল; রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেন পাদ্যঅর্ঘ্য দেওয়া হল না; মানকুমারী বসু, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতিরা মাল্যচন্দন হতে কেন বঞ্চিত হলেন; দীনবন্ধু ও দেশবন্ধুর কেন কোন খোঁজই পাওয়া গেল না; ইত্যাদি প্রশ্ন সাধারণ পাঠককে বিচলিত করতে পারে, এবং প্রায় শতাধিক কবির একটি করে কবিতা দেওয়ার কি মানে হতে পারে এই ভেবে তিনি ক্ষুব্ধ হতে পারেন বটে; তবে আমাদের অনুমান যে বাংলাকাব্য সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি এসব প্রশ্নের সমাধান আপনিই খুঁজে পাবেন। অন্তপক্ষে, কালিদাস রায়, বনফুল, কৃষ্ণধন দে, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, উমা দেবী, অপরাজিতা দেবী, দিলীপ সান্ন্যাল, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ক্ষিতীশ রায় প্রভৃতিরা কেন যে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন, একথা ভেবে সাধারণ

(৩) সম্প্রতি ইয়েটস্ আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের যে কাব্যসংগ্রহ বের করেছেন তাতেও অনেক অসম্পূর্ণতা আছে। তবে তাতে যেসব কবিতা স্থান পেয়েছে সবগুলিই অত্যন্ত রুচিসম্মত ও ইয়েট্‌সের ভূমিকাটি অতি মূল্যবান।

পাঠক কূলকিনারা পান না, মনে মনে ভাবেন মহাকবির কাছে সত্যের চেয়ে চক্ষুলজ্জাই বুঝি বা বেশী হ'য়ে দেখা দিল।

আধশতাব্দীর বেশী হ'য়ে গেল রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীজাতকে শিশুর মত হাতে ধরে চিন্তা-জগতের অলিগলি পাকা সড়কের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে চলেছেন; বাঙ্গালীজাতকে বল্‌তে গেলে একরকম তিনিই ভাবতে শিখিয়েছেন, সমস্যা জুগিয়েছেন, চিন্তার উপকরণ সংগ্রহ করে সামনে ধরে দিয়েছেন। সেইজন্য তাঁর সামান্য একটু গদ্য রচনারও দাম অনেক; আলোচ্যগ্রন্থের ভূমিকাটিও সেই হিসাবে মূল্যবান। তাই ভূমিকাটির কয়েকটি কথা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

"এই সংকলনের থেকে আদিরসের কবিতা বাদ পড়েছে।" আদিরস মানে এখানে বোধ হয় বুঝতে হবে নরনারীর মৌখিক প্রেমালাপ কিংবা প্রিয়াপ্রিয় সম্বন্ধে রচনা। অথচ প্রকৃত আদিরসের কাব্য বোধ হয় তাকেই বলা যাবে যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ভারতচন্দ্রের তথাকথিত অশ্লীল বর্ণনাগুলি। এ সত্ত্বেও কয়েকটি বৈষ্ণব আদিরসাশ্রিত কবিতা বেওজর স্থান পেয়েছে। যাই হোক আদিরসের কবিতা কেন বাদ পড়ল তার কৈফিয়ৎ দুটি। প্রেমের কবিতা কামোদ্দীপক এবং তা প্রকৃত রসবোধকে কুপথে চালিয়ে দেয়; এ-ধরণের উক্তিতে অবশ্য প্রত্যেক পাঠকই সকুণ্ঠ অস্বস্তিবোধ করেন। আর একটি যুক্তি পাঠককে বড় পীড়িত করে: "এ-বই অসংকোচে ও নির্বিচারে সর্বজনের হাতে দেওয়া যেতে পারবে।" এমন পাঠক থাকা খুবই স্বাভাবিক যিনি ২৫ বছর বয়সেও শিক্ষক শ্রেণীর কাছে নাবালকোচিত ব্যবহার পেয়ে লাঞ্ছিত হয়েছেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর বাংলা কাব্যক্ষেত্রে ঢুকতে গিয়ে অনুরূপ লাঞ্ছনা পাওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ কি তবে সংকলনটি সুকুমারচিত্ত প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী শিশুদের জন্যে তৈরী করেছেন! বিখ্যাত সম্পাদক বৌডলারের হাতে শেক্সপীয়রের লাঞ্ছনার কথা বিশ্ববিদিত। বৌডলার নাকি পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, বধূ-জামাতা, পৌত্র-পৌত্রী যাতে একসঙ্গে বসে অসংকোচে শেক্সপীয়রের রসপান করতে পারে সেইভাবে বিশ্বকবির লেখার উপর কাঁচি চালিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সুরসিক অধ্যাপক একবার একটি উপভোগ্য টিপ্পনী কেটেছিলেন—যদি কোথাও একটা খাট থাকে, বৌডলার সেটিও ঘাড়ে করে তুলে নিয়ে যান।

ভূমিকায় আর একটি কথা আমরা পাই "এই সংকলন গ্রন্থে আধুনিক বাংলার গদ্যকাব্য থেকে সংগ্রহ করা হয় নি। সে-কাব্যের ভাণ্ডার অতি সংকীর্ণ, তার থেকে বাছাই করে নেওয়া সহজ নয়।" দ্বিতীয় বাক্যটি আমাদের হতবুদ্ধি করেছে। সাধারণ বুদ্ধিতে অবশ্য এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ভাণ্ডার যতই সংকীর্ণ হবে ততই বাছাই করে নেওয়া সহজ; কারণ—বাছাই করবার জিনিষের অপ্রাচুর্য্য। এবং গদ্যকাব্যলেখক বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায় দুটি কবিকে; রবীন্দ্রনাথ ও সমর সেন। তা ছাড়া এই নিকৃষ্ট সংকলন গ্রন্থের সম্পাদনা কাজটি প্রকৃতই খুব দুরূহ ও আয়াসসাধ্য হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। গদ্যরীতি সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের পথপ্রদর্শক, সে সম্বন্ধে তাঁর বিচারই শিরোধার্য্য করে নিতে হবে। তবু নিশিকান্ত রায়চৌধুরীর 'পণ্ডিচারীর ঈশান কোণে ও দিনেশ দাসের 'মৌমাছি' রচনাটির রীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন

বা দ্বন্দ্ব মনে লেগেই থাকে। সে দুটি যদি ছন্দ হয় তবে গদ্যরীতির প্রতিষ্ঠাতা সমর সেনের রচনা যে আদ্যন্ত পদ্যছন্দোময় সে সম্বন্ধে কারুর কোন সন্দেহ থাকাই উচিত নয়। এবং সে যুক্তি অনুসরণ করলে সমর সেন যে কেন 'কাব্যপরিচয়ে' স্থান পেলেন না সেটা একটা রহস্য।

"উপসংহারে স্বীকার করব অনেক ভাল কবিতা আমার গোচর হয় নি বলেই এ গ্রন্থে তুলতে পারি নি। সে আমার অজ্ঞানকৃত ত্রুটি।"—রবীন্দ্রনাথের এ-ধরণের উক্তি প্রত্যেক পাঠকই ক্ষণিকের জন্যে নিজের প্রশ্নের ধৃষ্টতায় কুণ্ঠিত হবেন। তবুও অবাধ্য প্রশ্ন জাগে: সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেষ্ট্রা' ও 'ক্রন্দসী' নামে দুখানি বিখ্যাত ও মূল্যবান বই ত বেশ কিছুদিন হল বের হয়েছে, তার থেকে বাছাই না হ'য়ে 'তন্বী' নামে বিস্মৃতপ্রায় একটা ছোট বই থেকে দুটি বাজে কবিতার হঠাৎ কেন বরাৎ ফিরে গেল! আর বর্ত্তমান যখন বছর দশেক অতীত হয়ে যাবে তখন বিষ্ণু দের কাব্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিশ্চয়ই প্রথমশ্রেণীর বলে গণ্য হবে; কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর দুখানি বই 'উর্ব্বশী ও আর্টেমিস' ও 'চোরাবালি' প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কাব্যের অভাবে 'কাব্য-পরিচয়ে'র শেষের অংশটি যে নিতান্তই পঙ্গু হয়ে পড়েছে এবিষয়ে আর সন্দেহ কি! বুদ্ধদেব বসুর একদা যুগ প্রবর্ত্তনকারী 'বন্দীর বন্দনা' থেকে 'শাপভ্রষ্ট' কবিতাটির উদ্ধৃতিতে অবশ্য পাঠক মাত্রেই খুসী হবেন।

বইটির আদ্যন্ত চোখ বুলিয়ে গেলে নানান কথা মনে হয় বাংলা কাব্য সম্বন্ধে। ভূমিকার একটি কথা থেকে থেকে প্রায়ই মনকে নাড়া দেয়: "এই সাহিত্য দুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় .....।" বইএর মধ্যেও একটা পৃষ্ঠা অব্যবহৃত রেখে এই বিচ্ছেদের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য কাব্যের ইতিহাসে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারা কেমন করে কোন এক সালের এপিঠ আর ওপিঠে সারা ও সুরু হতে পারে এটা সমস্যা বটে। য়ুরোপীয় প্রভাব বন্যার মত এসে এমন পলিমাটি ফেলে গেছিল যাতে দেদার ফসল ফলতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় বন্যা এসে সরে যাওয়া পর্য্যন্ত কেউই অপেক্ষা করে হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন না, বরং নতুন আমদানীর সঙ্গে পুরাণোর কড়া মিশেল দিতেই ব্যস্ত ছিলেন। এবং এই ঋতুপরিবর্ত্তনের কালে যাঁরা (১৮৪৮—১৮৯০) এইরকম কড়া মিশেল দিতে পেরেছিলেন তাঁদের রচনা আজও উপভোগ্য, যাঁরা নতুন স্রোতে নিঃসংশয়ে গা ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁরা তলিয়ে গেলেন। প্রথম দলের লেখকের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বিদ্যাসাগর, টেকচাঁদ; তাঁদের ছিল যাকে বলা যেতে পারে হিউমর, অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসু মনের নিরপেক্ষতাভিলাষী দৃষ্টিভঙ্গী। এঁরা ছিলেন যাকে বলা যেতে পারে কড়া জান। এঁদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে পড়েন মুকুন্দরাম, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বংশীবদন, ভারতচন্দ্র, আলাওল। এধারা 'কাব্যপরিচয়ের' ৭৩ পৃষ্ঠাতেই হঠাৎ শেষ হয়ে যায় নি, বরং তা' কবিওলা ঈশ্বর গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু, টেকচাঁদ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন লেখায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু কিছু কাব্যে ও বিশেষ করে 'গোরা' ও 'গল্পগুচ্ছে', এসবের মধ্যে দিয়ে, অবশেষে বাংলাসাহিত্যের বিশেষ দুর্ভাগ্য-

বশতঃ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমৃতলাল বসু ও অন্ত্যজ সাহিত্যের ভাঁড়ামিতে ভরাডুবি হয়েছে। অবশেষে এই ধারার পুনরুজ্জীবন দেখে আশ্বস্ত হই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দের কাব্যে। এ কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য ছিল ভাবালুতামোহমুক্ত চিন্তাকাঠিন্য ও আত্মজিজ্ঞাসা। 'বীরবলে'র বীরবল হয়ত সাহিত্যে আরও ভাল কিছু দিতে পারত ('কাব্যপরিচয়ে' প্রমথ চৌধুরীর 'বর্ষা' ও 'কাঁঠালী চাঁপা' কবিতা দুটি উপভোগ্য) যদি না তা শিশুদের সঙ্গে মিথ্যা লড়াই করে শ্রান্ত হয়ে পড়ত। অন্য ধারা, যার তথাকথিত ভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায়, তা নিছক অনুকরণবশে ও অজ্ঞানতা নিবন্ধন কেমন করে দুর্ব্বল হতে দুর্ব্বলতর হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে তা আমরা ভাল রকমে দেখতে পাই এই 'কাব্যপরিচয়ে'র ১৬৫ পৃষ্ঠা থেকে ৩৪৬ পৃষ্ঠার মধ্যে। মোট কথা হয়ত এই যে য়ুরোপীয় অনুপ্রেরণা হয়ত এতই প্রবল যে তা আমাদের কবিদের স্রোতের মুখে কুটার মত ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, ভাবনা চিন্তার অবসর রাখে নি। তাই এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যেও এমন ধরণের নমুনা পাই যা অগোছালো ও অপরিচ্ছন্ন মনের পরিচয় দেয়। য়ুরোপীয় প্রভাব আমাদের দেশে অবশ্য গুটিকতক ইংরেজ বালক-কবির লেখাকেই বোঝায়—যেমন শেলী, কীট্‌স্, বায়রন, ব্রাউনিং ও সুইনবর্ণ। কারণ মধুসূদনের পরের আমলে দেশী সাহিত্যিকদের মধ্যে বিদেশী ভাষা চর্চ্চা ক্রমশঃই অত্যন্ত কমে আসে, এবং কতকগুলি অপরিণত ইংরেজ কবির কাব্যেই অবশেষে আমাদের দেশে য়ুরোপীয় প্রভাব আটকা পড়ে। তার পরে এল বিখ্যাত বাণী 'আর্ট ফর্ আর্ট্‌স্ সেক'; তাতে ফল হল এই যে কাব্যে বিষয় আর বিষয়ীর কোন ভেদাভেদ বজায় রইল না। যাঁদের জীবনে কাব্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে তাঁরা বুড়ো খোকার ছড়া নিয়ে ছেনালি সইতে পারেন না। তাই নিছক ছেলেমানুষি কাব্যের মধ্যে পড়ে না। সেই জন্যে পাঠক এই 'কাব্যপরিচয়ে' 'ঘুমের রাণী' (সতেন্দ্রনাথ দত্ত), 'ডাকহরকরা' (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত), 'দেখব এবার জগৎটাকে' (কাজী নজরুল ইস্‌লাম), 'ভাদুরাণী এসো ঘরে' (কালিদাস রায়), 'উড়ো চিঠি' (কিরণধন চট্টোপাধ্যায়), 'কালাপাহাড়' (মোহিতলাল মজুমদার), 'অগ্নিদূত' (সজনীকান্ত দাস), 'ছাত্রী ও ছাত্র' (বনফুল), 'ধুতুরা ফুলের ব্যথা' (কৃষ্ণধন দে), 'পল্লী মা' ও 'কিশোর' (গোলাম মোস্তাফা), 'ঝরণার গান' (রাধারাণী দেবী), 'ভাইফোঁটা' (অপরাজিতা দেবী), 'মজঃফরপুরে ভূমিকম্প' (রামেন্দু দত্ত), 'হারানো টুপী' (কাজী কাদের নওয়াজ), 'বিচিত্রা ধরণী' (প্যারীমোহন সেনগুপ্ত), 'যৌবন ধর্ম্মী' (আশু চট্টোপাধ্যায়), 'মৌমাছি' (দিনেশ দাস) ইত্যাদি চুষি চোষা ধরণের ব্যাপারে অত্যন্ত লজ্জিত ও ব্যথিত হল। মনে মনে খালি ভাবেন কতকাল কাঁচা থাকব, কবে আমাদের বড় বয়সের জ্ঞানবুদ্ধি হবে! এ সবের চাইতে সুকুমার রায় চৌধুরীর কবিতাত্রয় কত যে বেশী সরস তা কে বলবে! কেননা তিনি প্রাপ্তবয়স্ক লোক ইচ্ছে করে ছেলেমানুষ সাজছেন; কিন্তু উপরোক্তরা সত্যশিবসুন্দরের আরাধনার থলি থেকে এ কী কাদালেপা বেড়াল বের করলেন! 'বাংলাসাহিত্যে কল্পনার এই স্বাভাবিক আবেগ স্রোতে' কালীপ্রসন্ন বর্ণিত জোয়ারের মুখে বিষ্ঠার মত এ কী জঞ্জাল!

ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি বাঙালী নাকি কাব্যপ্রিয় জাত। খুব সম্প্রতি বিশ্বপ্রিয় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের মুখে শুনেছিলেম যে একটুখানি চাঁদের আলো, একটু গলার সুর পেলে বাঙ্গালীর মন অমনি কাব্যসরস হয়ে ওঠে। ভূমিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ কথাই বলেছেন: "কাব্য বা শিল্প রচনায় বাঙালির কল্পনাবৃত্তির স্বাভাবিক আকর্ষণ ও লীলানৈপুণ্য আছে।—একথা বলতেই হবে, রস-রূপ সৃষ্টি করতে মানুষের যে-কল্পনাবৃত্তি আনন্দ পায় বাঙালির তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে।" এ ধরণের আত্মঘোষণা অবশ্য লজ্জাদায়ক গ্লানিতে মলিন; এবং রসঘন আনন্দের পরিবর্ত্তে যখন নিছক ভাবালুতার মুক্তসত্র দেখি তখন মন বিরূপ হয়। উঠন্তি বয়সের ছেলের মধ্যে যে ভাব দেখে বাড়ীর মেয়ে 'কাব্যিপনা' আখ্যা দেন এই 'কাব্যপরিচয়ে' রবীন্দ্র পরবর্ত্তী অধিকাংশ কবির রচনায় সে ভাব দেখে পাঠক ক্ষুণ্ণ হ'ন। এই ধরণের কাব্যিপণা ও উপরোক্ত ছেলেমানুষ কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রচনায় নেই। দেখে শুনে মনে হয় আদিরসের কবিতা বাদ পড়েছে ভালই হয়েছে, তা না হলে আরও অনেক ন্যাকামী ভরা ইনানো বিনানো কথায় পাঠককে ক্লিষ্ট করা হত। কেননা আমাদের সাহিত্যে প্রেমের কবিতার চাইতে প্রেমে-পড়ার কবিতাই আছে বেশী।

সাহিত্যের ইতিহাসে কয়েকজন লেখকের, তাঁদের রচনাসম্পদ ছাড়াও, আরেক ধরণের বিশেষ মূল্য থাকে, তাঁরা ইংরেজি ভাষায় যাকে বলা যায় releasing force. ইংরাজি সাহিত্যে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ যেমন স্পেন্সার, আমাদের সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত, অপেক্ষাকৃত গৌণহিসাবে, রামপ্রসাদ বা (৪) বিহারীলাল। আমাদের সহিত্যে এই ধরণের উৎসারী শক্তির পরিচয় দেন মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন। এই ধরণের শক্তির বিশেষ গুণ এই যে এই ধরণের শক্তিসম্পন্ন লেখকের আওতায় পড়ে তাঁদের পরবর্ত্তী লেখকরা লিখতে শেখেন। অর্থাৎ তাঁদের কাব্যস্রোত শুধু পুরাণো জঞ্জালের ধসেই ফেলেনা, অধিকন্তু পিছনে ভাল পলিমাটী ফেলতে ফেলতে এগোয়; সেই পলিমাটীতে আবার কিছুকাল ভাল ফসল ফলতে থাকে। বাংলাসাহিত্যের বিশেষ দুর্ভাগ্য এই যে রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তি শুধু বিরাট একটি অভ্রভেদী পাহাড় হয়েই উঠেছে, এবং সে পাহাড় বাংলার কাব্যধারার পথ আটকে রেখেছে, সুতরাং সে ধারাকে এখন পাহাড় পরিক্রমণ করে পথ খুঁজতে হচ্ছে। বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ যে releasing force হতে পারেন নি তার কারণই হচ্ছে তাঁর রচনাশৈথিল্য ও কীর্ত্তির বিরাটত্ব, যা অল্প ক্ষমতাপন্ন লেখকের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সেই জন্যেই তাঁর পরেই বাংলাকাব্যপূজারীদের এই শোচনীয় দুর্গতি। কবির কীর্ত্তি বিরাট হলেই যে তাঁকে releasing force হতে হবে তার কোন মানে নেই। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও সমর সেন যে পুনরায় সেই লুপ্তপ্রায় কাব্যধারার পথ বের করে নিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, ও কথঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করেছেন, সেটা প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষেই আশার বিষয়।

(৪) এ সংগ্রহে রামপ্রসাদের পরবর্ত্তী কবিওলাদের কাব্যসংকলনই উৎকৃষ্ট হয়েছে।

আগের একটি কথা আর একটুখানি টেনে যেতে ইচ্ছা করছে। মুকুন্দরাম, কৃষ্ণদাস, ভারতচন্দ্র, কবিওলা ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, টেকচাঁদ, দীনবন্ধু, বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্নের কাব্য ও গদ্য প্রভৃতির মধ্যে যে দৃঢ়তা, যে ভাবকাঠিন্য ও ঋজুতা দেখতে পাই তা কোথায় কবে, কেমন করে হারিয়ে গেল! আর তাঁদের রচনার সামর্থ্য, সংহতি, দৃঢ়বদ্ধতা, হিউমর, চিত্রময়তাও অবিসংবাদি! কিন্তু

কোথায় গেলেন তাঁরা
পাইনে কোন সাড়া!

তার পরিবর্ত্তে যে ভাবালুতা, কাব্যিপণা ও ন্যাকামীর আমদানী হয়েছে তারই বা উৎস কি? সে উৎস কি আমরা তবে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যেই খুঁজব এবং রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু কাব্য রচনায় এত শিথিল সমাধি, শব্দগুণের প্রতি এত ঔদাসীন্য, প্রকৃতিবর্ণনার আড়ালে মনের এত শূন্যতা, পদ্যগদ্যের এত অনবস্থাদোষ এবং রসেটীবর্ণিত 'fundamental brain-work'-এর এত অভাব হঠাৎ বাংলা কাব্যকে এত ঘুনধরা করে দিল কেমন করে। রবীন্দ্রনাথ এত ভেংচানি কেন সহ্য করলেন এবং নিজেকেই বা কেন এত অনুকরণ করলেন!

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবচন মনে পড়ছে, উদ্ধৃত করাই ভাল:

'Poetry ought to be as well written as prose.'

"Poetry" introduces a distinction between good verse and bad verse; but we have no one word to separate bad prose from good prose. As a matter of fact, much bad prose is poetic prose; and only a very small part of bad verse is bad because it is prosaic.'

'Poetry is composed of words.'

'Poetry is characterised by condensed affect এবং 'poetry is gist and pith.' 'Landscape is a passive creature which leads itself to an author's mood. Landscape is fitted too for the purposes of an author who is interested not at all in men's minds, but only in their emotions; and perhaps only in men as vehicles for emotions.'

আত্মশ্রেষ্ঠম্মন্যতা আসলে দুর্ব্বল লোকের হীনবোধেরই নামান্তর। বস্তুতঃ মনে হয় কাব্য সম্বন্ধে এত তো আত্মস্তুতি শুনে এসেছি, কিন্তু আমাদের বাংলাসাহিত্যের যথার্থ সম্পদ কতখানি? অনেক 'ইংরেজি সংকলন মাঝারি শ্রেণীর মালে বোঝাই' একথা ঠিক, কিন্তু 'কাব্যপরিচয়' কি ধরণের মালে বোঝাই! নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কারে আর কতদিন আমরা মত্ত হয়ে থাকব!

'ফাঁটা ডিমে আর তা দিয়ে কি ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবেনা ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবেনা আগাগোড়া।

অশোক মিত্র

চোরাবালি—শ্রীবিষ্ণু দে প্রণীত। প্রকাশক ঃ ভারতী-ভবন, দাম এক টাকা বারো আনা।

"উর্ব্বশী ও আর্টিমিস্" লিখে' বিষ্ণুবাবু বাঙ্‌লা কাব্যে যে উজ্জ্বলতা ও নূতনত্বের আভাস এনেছিলেন, তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "চোরাবালি"তে তা' স্বতন্ত্র সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। যাঁরা আধুনিক কাব্য-বিষয়ে উৎসুক বিষ্ণুবাবুর লেখা পড়ে' তাঁ'র অসামান্য প্রতিভায় নিশ্চয়ই তাঁরা মুগ্ধ হ'য়েছেন এবং তিনি যে আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি, ছন্দের ওপর দখল যে তাঁ'র অসামান্য, তাঁ'র কবিতায় ব্যঙ্গ যে অদ্ভুত শাণিত ও তীব্র এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁ'দের সন্দেহ নেই। অবশ্য বাঙ্‌লা দেশ ও বাঙলা কাব্য চিরকালই হতভাগ্য। ভালো কবিতা লেখার চেয়ে ঘোড়দৌড়ে হঠাৎ টাকা পেলে নাম হয় এখানে বেশী।

এ-বইয়ের প্রকৃত সমালোচনা লেখা আমার পক্ষে একেবারেই সহজ নয়। সে রকম পাণ্ডিত্য তো দূরের কথা, এ'র অনেক কবিতা বুঝ্‌তে পারার মতো লেখাপড়াও আমার নেই। তবে প্রকৃত যা' কাব্য সঙ্গীতের সঙ্গে বোধ করি তা'র তুলনা করা যেতে পারে : যে গানে প্রাণ আছে পাকা ওস্তাদকে তা' যেমন মুগ্ধ কর্‌বে, প্রায় তেমনি করবে অনেক জটিলতা থাকা সত্ত্বেও গান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আনাড়িকে। ভালো কবিতা ও ভালো গান মনের এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অনুভূতির ঝড় তোলে, তা' বোঝার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী বা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে অনেক-পুঁথি-পড়া বিদ্যের প্রয়োজন হয় না। এবং এই ভালো-লাগাটাই কাব্যের মূল কথা : কবিতা যদি ভালো লাগে সেখানেই তা'র চরম সার্থকতা—না-ই বা বোঝা গেল তার অনেক কথার মানে, অনেক ঐতিহাসিক-পৌরাণিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত। অবশ্য সেই সঙ্গে এ কথাটাও ঠিক, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান যদি প্রচুর থাকে তা' হলে পূর্ণ রস আস্বাদন করায় আনন্দের মাত্রাটা আরও বাড়বে—সেটা উপরি পাওনা। তবে একথাও সত্যি যে জ্ঞানের অভাব রসবোধের পথে বিঘ্ন হ'তে পারে না এবং সে কারণে কবিতার মূল আবেদন ব্যর্থ হয় না। এবং আমার মতে সেগুলিই হচ্ছে প্রকৃত ভালো কবিতা, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাক্‌লেও যা' ভালো লাগবার বিঘ্ন ঘটে না।

"চোরাবালি"র ভেতর এরকম কবিতার অভাব নেই, বরঞ্চ প্রাচুর্য্যই দেখ্‌তে পাই। বিষ্ণুবাবুর কবিতা সম্বন্ধে অনেকের মনেই একটা বিভীষিকা আছে। স্বীকার করি তাঁ'র কবিতায় অনেক শক্ত কথা, অনেক সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক-পৌরাণিক ইঙ্গিত, এমন কি বৈজ্ঞানিক মতবাদও আছে ; কিন্তু তা' সত্ত্বেও বেশীর ভাগ কবিতাই মুগ্ধ করে, যেমন এ-বইয়ের প্রথম কবিতা 'ঘোড়সওয়ার' :

> দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী ! বর্শা তোলো।
> কেন ভয় ? কেন বীরের ভরসা ভোলো ?
> নয়নে ঘনায় বারবার ওঠাপড়া ?

চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি ?

হৃদয়ে আমার চড়া ?

চেষ্টা করলে এর ভেতর সাইকলজির ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই পাওয়া যা'বে, কিন্তু তা' না জানলেও এঁর বলশালী দৃপ্ত ভঙ্গি ব্যর্থ হয় না। অন্যান্য কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি :

হৃদয় আমার ঘরছাড়া যে গো ডাকে।

আমি চঞ্চল তাই, তাই সুদূরের পিয়াসী।

আমি তাই তো আকাশে কাণ

পেতে শুনেছি তোমার গান, হে মোনালিসা, হে সাইনারা !

* * *

বহু দূর দেশে জড়তার গ্লানি মেখে সহরের বুকে জরতী সন্ধ্যা নামে।

(কবিকিশোর—৫)

বৈশাখী মেঘ মেদুর হ'য়েছে সুদূর গগন কোণে

* * *

সময়ের খনি শতছিদ্র, বিস্মৃতি-কীট কাটে।

* * *

উষসী আকাশ ধূসর করেছে মরণের আনাগোনা।

(ক্রেসিডা)

এই সমস্ত অটুট ও সুন্দর ছন্দ, অদ্ভুত রূপক পড়্‌তে পড়্‌তে চম্‌কে উঠ্‌তে হয়।

কবিতাকে নদীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যেখান দিয়ে তা' বয়ে যায় সেখানকার আবেষ্টনীর ছায়া তা'তে পড়্‌বেই : কখনও নীল লাল আকাশ আর সোনালী দিগন্ত, মাস্তলের আর ধূমধূলিধূসর পাণ্ডুর সন্ধ্যার কখনও বা। আধুনিক জীবনকে নিরাশা আর ব্যর্থতা হানা দিয়ে যায়, সভ্যতার শুক্‌নো আলোয় তা'র কঙ্কাল ওঠে স্পষ্ট হ'য়ে। বিষ্ণুবাবুর কবিতায় এ সব চিত্র চমৎকার ধরা পড়ে'ছে, রোমান্টিসিজ্‌ম্‌এর সান্ত্বনায় তিনি মুগ্ধ ও অন্ধ ন'ন :

প্রায়োপবেশনে শশকবিষাণ গোণা !

ভঙ্গুর স্নায়ু কণ্টক অগণন।

স্বপ্নেরা হ'ল ফণিমনসার বন।

জন্মে প্রণয়ে মরণে জীবন শেষ।

এই সব উজ্জ্বল লাইন পাশ্চাত্য কবি এলিয়ট্‌কে স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে তিনি বল্‌ছেন : This is the dead-land, This is cactus-land. এবং এ-দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে তাঁ'র বইয়ের নাম 'চোরাবালি' সম্পূর্ণ সার্থক হ'য়েছে।

তাঁ'র ব্যঙ্গ তীর্য্যক ও তীব্র। রবীন্দ্রনাথের অনেক বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ কবিতাকে তিনি তাঁর কার্য্যসিদ্ধির জন্যে অবলম্বন ক'রেছেন। যেমন :

এমনি করে' ফিরেছি পথে পথে
অনেক দূরে ফিটনে পাদরথে।

ভস্ম-অপমান শয্যা ছেড়ে, পুষ্পধনু!
দিকে দিকে ঘুরে বেড়াও ডন জুয়ানের বেশে!

*   *   *

ড্রয়িংরুমে—হে অতনু! বীরতনুতে সাজো

সত্য তো বটে শরীর-ধর্ম্ম লোপাট আজ।
আদিম স্নায়ুর প্রতিক্রিয়ায় মুক্তি নেই।

(নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

প্রেমের সেই আইডিয়্যালিস্টিক্ রূপকে তিনি ব্যঙ্গ ক'রেছেন, মাঝে মাঝে দেখ্তে পাই শুধু প্রেমও যেন ক্লান্তিকর। যেমন :

অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, ভালো তাই তো বাসি,

*   *   *

না হ'লে ঝঞ্ঝা ফেল্‌তো যে সারা জীবন ঘিরে'।

(গার্হস্থ্যাশ্রম—কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স)

কিন্তু মানুষ কেমন করে' যে এই বাঁচে—
মানে, এই প্রেমে কাব্যি করেই সারাটা জীবন কাটিয়ে যে দেয়!

*   *   *

নতুন তো নেই কিছুই! এখন কর্‌ব কি যে!

(মন-দেওয়া-নেওয়া)

অশয়নায়োগ্র ধমনীশিরার পরমতৃষা
নিদ্রাহীনের রজনীতে চায় চরমভোলা
স্নায়ুদাবদাহে যযাতিশিরার প্রবল গানে।

*   *   *

তাই তো হৃদয় নির্দ্দয় লোভে তোমারে মাগে
নাটকীয় সুরে প্রলাপ-কম্প্র তোমার গানে।

(যযাতি)

বিষ্ণুবাবুর কবিতায় পাঠককে যা' সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করে তা' হচ্ছে ছন্দ। এর বৈচিত্র্যে, এর কারুকার্য্যে মুগ্ধ হতেই হয়। কখনও শোনা যায় যেন ঘোড়ার খুরের ধ্বনি, কখনও বা তা' শুদ্ধ ও সমাহিত।

বিষ্ণুবাবু পণ্ডিত লোক, এবং তিনি শক্তিশালী কবি সন্দেহ নেই। নিপুণভাবে নিজের পাণ্ডিত্যকে তিনি কাব্যে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু এক-এক জায়গায় তাঁ'র পাণ্ডিত্য রসবোধের পথে কাঁটার মতো বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; এই ধরণের চেষ্টিত গাম্ভীর্য্যের জন্যে কতগুলি কবিতা এমন দুর্ব্বোধ্য হ'য়ে প'ড়েছে যা'তে তাঁ'র মত পাণ্ডিত্য পাঠকের যদি না থাকে তা'কে নিরাশ হ'তে হ'বে। যে পাণ্ডিত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ, কীট্‌স্‌, শেলীকে বোঝা যায় তা'র সাহায্যে বিষ্ণুবাবুর কবিতা বোঝা কষ্টকর, এমন কি স্থানবিশেষে অসম্ভব। এবং এ' কারণেই তাঁ'র পাণ্ডিত্য কবিযশের পথে হয়তো প্রকাণ্ড একটা অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। আমার তো মনে হয় এ' ধরণের ভূমিকার কিছুমাত্রও প্রয়োজন ছিল না। কবির প্রতিভা তাঁ'র নিজের রচনাতেই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। নিজের স্বাতন্ত্র্যে ও ঔজ্জ্বল্যে এই কবিতাগুলি যখন উজ্জ্বল তখন আর দীর্ঘ ভূমিকার সার্থকতা কী?

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অষ্টাদশী—হুমায়ুন কবির (নওরোজ পাবলিশিং হাউস), দাম এক টাকা।

মানস-বিরহ—শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী (বাগ্‌চী এণ্ড সন্স্‌), দাম আট আনা।

আঠারোটি সনেট নিয়ে "অষ্টাদশী" রচিত। প্রেমবিরহ, আশানিরাশা, আনন্দবেদনা এবং সর্ব্বোপরি কবিরের ভারতপ্রীতি প্রভৃতি ভাবাবেগে এই সনেটগুলি সমৃদ্ধ। যদিচ এই সমস্ত বিভিন্ন ভাবাবেগ কিছুটা মামুলি ধরণের তথাপি কোথাও কবিকে আয়াস অনুকরণ করতে দেখা যায় নি। এই সমস্ত পুরাতন বিষয়বস্তু নিয়ে লিখতে গিয়ে যেখানে সহজেই নাটকীয় ভণিতা এবং উচ্ছ্বাস আসা সম্ভব ছিল, সেখানে কবি যথাসম্ভব নিজেকে বাঁচিয়ে চলেছেন। ফলে সনেটগুলির কাঠামো পুরনো বিষয়বস্তুর আধার হয়েও অত্যন্ত দৃঢ়। এখানে বলা আবশ্যক যে, কবিরের প্রায় অধিকাংশ সনেটই ব্যক্তিগত মানসিক পরিস্থিতির সাক্ষ্য দেয়। কাজেই অধিকাংশ সনেট যদিচ ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে রচিত, তথাপি কবি তাঁর ভ্রমণকালে স্থানকাল ভুলে গিয়ে স্মরণ করেছিলেন ব্যক্তিগত পাত্রটিকে। ফলে হাইডেলবার্গ, গ্যটিঙ্গেন, ম্যুনসেন, প্যারিস ইত্যাদি স্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি যতটা না পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশী পাওয়া যায় তাঁর মানসিক স্মৃতিবিজড়িত জীবনের ইতিবৃত্ত। বলাই বাহুল্য যে, বিদেশ-ভ্রমণ-কালে যে কোনো কবির পক্ষেই এ মনোভাব আসা একেবারে অসম্ভব নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কি এর হাত থেকে একেবারে রেহাই পেয়েছেন? আমার বিবেচনায় কবির এই আত্ম-উপহৃতি কখনো কখনো তাঁর কাব্যে একটা 'obsession' হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে তাঁর

ব্যক্তিগত জীবনের virtue কাব্যে যদিবা কখনো vice-এ পরিণত হতে দেখা যায়, তাতে আর বিস্মিত হবার কোনো কারণ থাকে না। এবং :

ভুলিবারে কয়েছিলে, কে দিয়েছে ফুল।
সে কী সখি ভোলা যায়?—বাতাস আকুল
দোলায়ে ফুলের গুচ্ছ কয়ে যায় কানে
গোপনে কাহার নাম?

কিংবা

দেহের সীমানা টুটি তীব্র তিক্ত তপ্ত অশ্রুজলে
ব্যর্থকাম চিত্ত মম কাঁদিবে তোমার লাগি তবু
—নিবিড় মিলন মাঝে তোমারে যে নাহি পাই কভু।

অথবা

সে যদি থাকিত কাছে! এ দূর প্রবাসদেশে বসি
সকল হৃদয় ভরি একটী নিশ্বাস পড়ে খসি।

ইত্যাদি ধরণের স্মৃতিনিপীড়িত nostalgic লাইন ভাল সনেটের মধ্যে কচিৎ কদাচিৎ হুঁচোট খেতে থাকে। অবশ্য এ ধরণের দুর্বল লাইনের সংখ্যা কম, এবং চেষ্টা করলেই কবির বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে পারতেন, এমন কি নিতান্ত মামুলি বিষয়বস্তু বজায় রেখেও। কবিরের ভাষা সতেজ ও সাবলীল হলেও স্থানে স্থানে দুষ্ট। ইচ্ছে করলেই এগুলি এড়িয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু যে কোনো ছিদ্রান্বেষীর পক্ষেও যে নিম্নোক্ত সনেটটি প্রথম শ্রেণীর বলে মনে হবে সে বিষয়ে কি কারুর সন্দেহ থাকবে?

দক্ষিণে পর্ব্বতখানি ব্যগ্র হয়ে তীক্ষ্ণ নাসা মেলি
সমুদ্রে পড়েছে ঝুঁকে। আদিম কালের অতিকায়
বিস্মৃত সরীসৃপও প্রাণঘাতী বিপুল তৃষায়
উদ্‌গ্রীব আবেগে দিল সিন্ধুজলে আপনারে ফেলি।
মাংসপেশীপুষ্ট দৃঢ় রোমহীন দীর্ঘ গ্রীবাখানি
রেখাসম প্রসারিত স্কন্ধ হতে সবল প্রয়াসে,
সিন্ধুবক্ষ তরঙ্গিত শ্রমশ্রান্ত প্রবল নিশ্বাসে
সফেদ ফেনার রেখা দিক হতে দিগন্তরে টানি।

যুগযুগান্তর পরে সে পশুর নাহি আজি প্রাণ।
সুতীব্র পিয়াসা তবু মেটে নাই সমুদ্রের জলে।
উদ্‌গ্রীব আবেগ তার পর্ব্বতের শীতল কঠিন
প্রস্তররেখার মাঝে জেগে থাকে দীর্ঘ রাত্রি দিন।

তাই আজো অগ্নি-দগ্ধ নিদাঘের দীপ্ত সূর্য্যতলে
পিপাসা শান্তির পথ একমনে করিছে সন্ধান।

ইদানীং "কবিতা"পত্রে হেমবাবুর কবিতা পাঠের পর "মানস-বিরহ" কাব্যগ্রন্থ আমার কাছে কিছুটা আশ্চর্য লাগল। যদিচ এই কবিতাগুলি দশবছর আগে লেখা, তথাপি তাঁর কাব্যের এতটা পার্থক্য সত্যই বিস্ময়কর। বলাই বাহুল্য যে, "কবিতা"পত্রে হেমবাবুর কবিতা পাঠ করবার পর আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলি পাঠককে নিরাশ করবে। যদিও ভাষা ও ছন্দের ওপর হেমবাবুর হাত খুবই দক্ষ, তবুও এই মননহীন স্বাচ্ছন্দ্যই পাঠককে সব চেয়ে বেশী পীড়া দেয়। কবিতাগুলি যে পরিমাণে ভাষা ও ছন্দে নিঁখুত সে পরিমাণে রসাত্মক ব্যঞ্জনাপূর্ণ নয়।

তুমি এসেছিলে কবে লঘুপদে চটুল চঞ্চল
আতাম্র আম্রের বনে মুগ্ধা বাসন্তিকা—
কত সুর-শিহরণ, কতদুর মূর্চ্ছনা উচ্ছল—
সদ্যস্ফুট বকুলের সুস্নিগ্ধ মালিকা।

এ লাইনগুলি কালিদাস রায় বা সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র লিখতে পারতেন, এবং তাতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকত না। এখানে কাব্যের বিষয়বস্তু এতই পুরনো যে, ভাষা ও ছন্দের মাধুর্যও তাকে সজীব করে তুলতে পারে না। অতি সাধারণ মামুলি বিষয় নিয়ে কবির যে পরিমাণে মননের পরিচয় দিয়েছেন সে পরিমাণ মনন হেমবাবুর মধ্যে পাই না। বলাই বাহুল্য যে, আমার এ মত একমাত্র "মানস-বিরহ" সম্বন্ধেই খাটে, হেমবাবুর অন্যান্য কবিতা সম্বন্ধে আমার মত স্বতন্ত্র।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চমী ও অন্যান্য গল্প—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত। প্রকাশক—ভারতী ভবন। দাম পাঁচসিকা।

এই ছোট বইখানিতে সাতটি ছোট গল্প আছে। তার মধ্যে কতকগুলি নিতান্তই ছোট, আরম্ভ হ'তে না হতেই, গল্পের দানা বাঁধতে না বাঁধতেই শেষ হয়ে যায়; আর কতকগুলি রীতিমত উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। এগুলি নানা সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় রচিত বঁলে বেশ বোঝা যায়।

বিমলাপ্রসাদ নিপুণ শিল্পী। তিনি জানেন মনোলোকের চিরবিলাসিনী আফ্রোদিতির জন্মমুহূর্ত্তে তার বরতনুর চারিদিকে কেমন করে' রহস্যের স্বচ্ছ কুয়াশা ঘিরে দিলে তা' আরও কাম্য হ'য়ে উঠে। "দম্পতী" গল্পের অরূপ নায়িকার আকর্ষণ প্রেমের প্রথম ধাপে এসে থেমে গেছে। কবি একটা চপল হাসির হাওয়ায় সাগরাম্বর-বিহারিণীর সকল মোহ উড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু পাঠকের সাধ হয়,—চোখ বুজে সেই অশরীরী বাণী, যাঁর কণ্ঠ থেকে আসছে, তাঁর রূপ কল্পনা করতে। কবি হেসে বলছেন, সবটাই ভুল—নিতান্ত গল্প। ভুলে যখন আনন্দ পাওয়া যায়, তখন সে ভুল কে ভাঙতে চায় ও এই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী বিপুল বিশ্বরচনাও ভুল, মায়ার বিজৃম্ভন, কিন্তু নিতান্ত বৈদান্তিক ছাড়া কে আর এভুল ভাঙতে চায়? শীতকালের প্রত্যূষে সূর্য্য

উঠেছে বলেই যে সুখশয্যার কবোষ্ণ আলিঙ্গন ত্যাগ করতে হবে এমন কিছু নিয়ম আছে কি? "দম্পতী" গল্পটি মনের এমন তারে আঘাত করে যায়, যার আনন্দের রেশ সহজে মিলায় না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ ইহাকে বলতেন ধ্বনিকাব্য। এই গল্পটির আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, এর under plot-এর অশরীরী বান্ধবীর আকর্ষণ ছেড়ে দিলেও যে plot-এর মধ্যে তাকে জড়িয়ে পরিবেষণ করা হয়েছে তার রূপবতী কল্যাণী দেবীও বড় অল্প মনোহারিণী নন।

বইখানির অনেকগুলি স্ত্রী-চরিত্র বড়ই মনোজ্ঞ। "দীপ্তির মোহ" বোধ হয় কবিকে বিশেষ করে' আচ্ছন্ন করে' রেখেছে, তাই তার স্তব গান ক'রে গ্রন্থের অবসান করেছেন। এটি গল্প বেঁধে উঠে নি, একটু মনস্তত্ত্ব দিয়ে সাঁতলান বড় উপাদেয় বস্তু। গল্পগুলি সাজানর মধ্যে একটু রহস্য আছে তা' কবির ইচ্ছাকৃত কিনা তিনিই জানেন। গ্রন্থের সিংহদ্বারে "সূর্য্যি ঠাকরুণের" পরুষ মূর্ত্তি 'দূরমপসর' বলে' ভ্রূকুটিভঙ্গী করে' সম্মার্জ্জনী তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আর গ্রন্থের অন্তঃপুরে তথা স্বামীর অন্তরে বসে লীলাময়ী দীপ্তি চিন্তাশূন্য সরলতার সঙ্গে সানন্দে সংসারের খুঁটিনাটির মধ্যে নিমগ্ন আছে। মাঝে অনেকগুলা মহল পেরিয়ে আসতে হয়। পথটা সমস্তই যে স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন কুসুমসুরভিত তা' বলা যায় না। মুকুলিকা অনিমাকে ছেড়ে আসবার পর "পঞ্চমী"র দর্শন পাওয়া পর্য্যন্ত পথে কোনও সুন্দরী সহযাত্রিণীও মেলে না। "ডাকবাক্সের" কাছে অনেকক্ষণ বৃথা অপেক্ষা করতে হয়, আর "নতুন পাঁচালীর" সুরে আস্তিন গুটিয়ে পাড়াগেঁয়ে বাস্ ঠেলে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়। "পঞ্চমী"র সরস স্নিগ্ধ আতিথেয়তায় কিন্তু সে ক্লান্তি সহজেই কেটে যায়।

গল্পগুলি সযত্নে মক্স করে' পরিপাটি করে' লেখা নয়, একটা সহজ অবহেলার ভাবে লেখা বলে' বোধ হয়,—লেখক যেন পাঠকের কাঁধে হাত দিয়ে ইচ্ছামত অনর্গল গল্প করে' যাচ্ছেন, তাঁর বাহবা পাবার জন্য একটুকুও উৎসুক নন। এই অনায়াস অনর্গল গল্পের মধ্যে যে শিল্পনৈপুণ্য ফুটে উঠেছে, তা' বিমলাপ্রসাদ স্বভাবশিল্পী বলেই ফুটেছে। অনেক স্থলে ভাষাবিদের মার্জ্জিত করবার প্রচুর অবসর আছে, কিন্তু তা'তে অবিরল বলার স্রোত বাধা পাবে মাত্র। শিল্পীর দানকে প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করতে হয়। পাঠকের মনে আনন্দের অনুরণন জাগাতে পেরেছে বলেই তা' সার্থক হ'য়ে উঠেছে।

সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

Published and Printed by K. C. Banerjee at the Modern Art Press,
1/2, Durga Pituri Lane, Calcutta, Edited by Humayun Kabir
and Buddhadeb Bose.

পৌষ,
১৩৪৫

প্রথম বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা

রবীন্দ্র-ছোটগল্পের পরিণতি

নীহাররঞ্জন রায়

বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি বলি চেষ্টা করিয়াছিলাম, অধিকাংশ রবীন্দ্র-ছোটগল্পই একান্তভাবে গীতি-কবিতার ধর্মল করিয়াছে, চিত্তের একটা বিশেষ 'মুড্', একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হইতেই তাঁহ অধিকাংশ গল্প অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। এক কথায় ইহাই বলিয়াছিল যে মনোধর্ম, মনের যে বিশেষ দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের সৃজনী প্রতিভাকে গীতধ করিয়াছে, সেই মনোধর্ম, সেই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁহাকে তাঁহার ছোটগল্পের উৎসের সন্ধা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প তাঁহার গীতিকবিতার আর একটা দিক্; এব আল্‌গা করিয়া বলিতে গেলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গীতি-কবিতারই গদ্যরূপ 'পোষ্টমাষ্টার', 'একরাত্রি', 'মহামায়া', 'অতিথি', 'দুরাশা', 'অপরিচিতা', 'শে রাত্রি', এমন কি 'জীবিত ও মৃত', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে' প্রভৃতি সুবিখ্যা গল্প সমস্তই এই পর্যায়ের।

কিন্তু গীতিমাধুর্য অথবা সুরধর্মই এবং কল্পনার ঐশ্বর্যই রবীন্দ্রনাথে ছোটগল্পগুলির একমাত্র বিশেষত্ব নয়। কতগুলি গল্পের মধ্যে আছে—এব তাহাদের সংখ্যা কম নয়—লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, সহজ অনুভূতি, এবং অপরূ মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয়। মানবহৃদয়ের প্রেমের প্রবাহ যেখানে ফল্গুস গোপন, জীবনযাত্রার বাঁকে বাঁকে জটিল, সামাজিক ও পারিবারিক বিধিনিষে রীতিবন্ধনের মধ্যে যেখানে মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র লীলাগুলি আহত ও সংকুচিত, শঙ্কিত ও বাধাপ্রাপ্ত, সেখানে-ও কবি তাঁহার সহজ সহানুভূতি দিয়া, অন্তর্দৃষ্টি দিয়া, একান্ত আত্মীয়তা বোধের সাহায্যে গল্পের উৎসে সন্ধান পাইয়াছেন, এবং সুনিপুণ মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার সহায়তায় স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র লীলার যথার্থ স্বরূপ ও তাহার বিকাশ আমাদের চোখের

প্রায় সবই প্রকাশ পায় কতগুলি অতিপরিচিত সমাজ-সম্মত সম্বন্ধের মধ্যে, তাহার স্রোত বহিয়া চলে কতকগুলি বাঁধাধরা খাতের ভিতর দিয়া। কিন্তু এই পরিচিত বাঁধাধরার মধ্যেও মাঝে মাঝে এমন একটা সহজ স্বাভাবিক, অথচ অপ্রত্যাশিত সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ জীবনধারা এমনভাবে আন্দোলিত হয়, যে তাহার মধ্যে ছোটগল্পের উৎসের সন্ধান পাওয়া কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নয়।

আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র লীলার মধ্যে, পরিবার ও সমাজের সরল ও জটিল আবেষ্টনে তাহার বিচিত্র পরিচয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও সহজ অনুভূতি অবাধ বিহারের আনন্দলাভ করিয়াছে; নিজের সুকোমল দরদ বোধ দিয়া আমাদের হৃদয়বৃত্তির এই সূক্ষ্ম জটিল লীলাগুলিকে তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার এই সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও মনোবিশ্লেষণ অপূর্ব রসে ও সৌন্দর্যে এই গল্পগুলির মধ্যে সর্বত্র অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। 'দেনাপাওনা', 'ব্যবধান', 'মধ্যবর্তিনী', 'সমাপ্তি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'দিদি', 'দৃষ্টিদান', 'মাল্যদান', 'মাষ্টারমশায়', 'রাসমণির ছেলে', 'ঠাকুর্দা', 'হালদার গোষ্ঠী', 'হৈমন্তী' প্রভৃতি সমস্ত গল্পই এই পর্যায়ের; এবং ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও অপরূপ মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

হৃদয়বৃত্তির যে-লীলাবৈচিত্র্যের কথা বলিলাম, এই বৈচিত্র্যের কোনও সীমা নাই, শেষ নাই। এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে ছোটগল্পগুলির উল্লেখ করিয়াছি তাহার সবগুলির মধ্যেই হৃদয়বৃত্তির যে-লীলাবৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা আমাদের কাছে অল্পবিস্তর পরিচিত, তাহাদের উদ্ভব আমাদের জীবনের মর্মস্থল হইতে, এবং পাঠকের কাছে তাহাদের আবেদন তাহাদের হৃদয়ের সুগভীর রসানুভূতির মধ্যে, তাহাদের চিত্তের সহজ দরদবোধের মধ্যে। 'পোষ্টমাষ্টার', কিংবা 'সমাপ্তি' কিংবা এই ধরণের যত গল্প, এই গল্পগুলি পড়িতে পড়িতে আমাদের সুগভীর অন্তরদেশটি যেন রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, হৃদয়ের ভাঁটায় যেন টান পড়ে, সমগ্র মর্মস্থলটি যেন কাঁপিয়া নড়িয়া উঠে। ইহাদের আবেদন অত্যন্ত স্বচ্ছ, সহজ, সরল। সমস্ত ঘটনা ও সমস্যাকে অতিক্রম করিয়া ইহারা সরাসরি অন্তরের গহন দেশে গিয়া ঢুকিয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের পরিবারের ও সমাজের এই চিরপরিচিত জীবনধারার মধ্যেও হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম বিচিত্রলীলা এক এক সময় এমন এক একটি অপরূপ উপায়ে বিকশিত হইয়া

উঠে, এমন এক একটি অপ্রত্যাশিত পরিণতি লাভ করে যেগুলিকে সামাজিক ও পারিবারিক বিধি-বিধান অনুসারে অন্যায় হয়ত বলিতে পারি, কেহ কেহ হয়ত অধর্মও বলিবেন, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুতেই বলিতে পারি না। আমাদের অন্তরের রসানুভূতির মধ্যে তাহাদের আবেদন সহজ ও সরল নয়, স্বচ্ছ নয়, হয়ত তাহারা আমাদের চিত্তকে রসে ভরিয়া দেয় না, মর্মস্থলটিকে নাড়া দেয় না, কিন্তু আমাদের বুদ্ধির মধ্যে চিন্তার মধ্যে তাহারা জোর করিয়া আসন পাতিয়া বসে, সেখানে কিছুতেই তাহাদের দাবী অস্বীকার করিতে পারি না। চারিদিক বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অন্তরের সূক্ষ্ম অলিগলিগুলির সন্ধান লইলে সেগুলিকে একান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়, এবং আমাদের বুদ্ধি ও চিন্তাবৃত্তি তাহাতে পরিতৃপ্তি লাভ করে। হৃদয়বৃত্তির এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লীলাগুলির সম্বন্ধে বহুদিন আমরা কিছু সচেতন ছিলাম না, রবীন্দ্রনাথও হয়ত ছিলেন না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমাদের কিংবা লেখকের চৈতন্যবোধ থাকিলেও অন্যায় বোধে অসামাজিক বোধে সেখানে আত্মপীড়ন ও সংকুচনের সীমা ছিল না। আজ হৃদয়বৃত্তির এই অজ্ঞাত ও অনাদৃত লীলাগুলির সম্বন্ধে আমরা কমবেশী সচেতন হইয়াছি; আমাদের বুদ্ধি দিয়া, চিন্তা দিয়া সেগুলিকে আমরা নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতেছি, এবং অন্যায় বলিয়া মনে করিলেও কিছুতেই তাহাকে অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে ও উপন্যাসে হৃদয়বৃত্তির এই নূতন আবিষ্কৃত লীলা-জগত খুব বড় একটা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে; কিন্তু তাহাতে বুদ্ধির লীলা ও সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ প্রতিভাই একান্তভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, অন্তরের সুগভীর রসে সর্বত্র তাহা অভিষিক্ত হয় নাই, হৃদয়ের সহজ দরদবোধ তাহাকে সর্বদা আবেগে ও সৌন্দর্যে পরিপ্লুত করিতে পারে নাই। সেইজন্যেই এই ধরণের গল্পে যুক্তির প্রাখর্য, বর্ণনার চাতুর্য যতটা প্রকাশ পাইতেছে, রসের গভীরতা, সহজ সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় ততটা পাওয়া যাইতেছে না। বর্তমান বাংলা কথাসাহিত্যের এই নূতন অধ্যায়ের সূচনা রবীন্দ্রনাথের এক শ্রেণীর ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যেই সর্বপ্রথম দেখা যায়, এবং এই গল্পগুলি সাধারণতঃ পরবর্ত্তী কালের রচনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাংলা কথাসাহিত্যের এই নবধর্মের অগ্রদূত হইলেও শুধু মাত্র বুদ্ধির দীপ্তিতেই তাঁহার এই ধরণের গল্পগুলি আলোকিত হয় নাই, যুক্তির প্রাখর্য ও বর্ণনার চাতুর্যই তাহার মধ্যে কখনও একান্ত হইয়া উঠে নাই; বুদ্ধির দীপ্তির সঙ্গে মিলিয়াছে হৃদয়ের সহজ দরদবোধ, যুক্তির প্রাখর্যের সঙ্গে মিলিয়াছে

অন্তরের সুগভীর রসানুভূতি; সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের সঙ্গে মিলিয়াছে সহজ সৌন্দর্য-বোধ, বর্ণনা-চাতুর্যের সঙ্গে মিলিয়াছে অপূর্ব কলাকৌশল, বাস্তবসত্যের সঙ্গে মিলিয়াছে ভাব এবং কল্পলোকের সত্য ও সৌন্দর্য।

যাহা হউক, এই ধরণের গল্পগুলির প্রথম পরিচয় 'নষ্টনীড়', ১৩০৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে লেখা। 'নষ্টনীড়'-কে ছোটগল্প বলিতে কাহারও কাহারও আপত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু ঘটনার যে স্তরপর্যায়, যে আবর্ত, যে সংক্ষুব্ধ সুগভীর ঘাত-প্রতিঘাত উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, তাহার পরিচয় 'নষ্টনীড়' গল্পে নাই। কাজেই আয়তনে প্রায় ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা সত্বেও 'নষ্টনীড়'-কে ছোটগল্পের পর্যায়ে উল্লেখ করাই সঙ্গত। যাহাই হউক, এই গল্পটিতে মনস্তত্বমূলক একটি সমস্যা অতি সুনিপুণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

যে সুচারু ও সুনিপুণ ঘটনাসংস্থান 'নষ্টনীড়' গল্পের অত্যন্ত সুকুমার অসামাজিক ও অপ্রত্যাশিত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে, যে সুকোমল হৃদয়বৃত্তির বিকাশ এই গল্পটির উপজীব্য তাহার পরিচয় পাওয়া একটু মনোযোগী ও রসিক পাঠকের পক্ষে খুব কঠিন নয়। তবে, এই পরিবেশ ও এই বিকাশের মূলে যে-যুক্তি আছে, তাহা হয়ত খুব সহজে ধরা পড়িতে না-ও পারে। লেখক নিজের সুগভীর সহানুভূতির দ্বারা অন্তরের মধ্যে এই গল্পের যাহা অন্তর্নিহিত সত্য তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও জানেন, অমল ও চারুর মধ্যে যে সুকুমার সম্বন্ধ তিলে তিলে গড়িয়া শেষ পর্যন্ত চারু ও ভূপতির নীড় নষ্ট করিয়া দিল তাহা অসামাজিক, তাহা আমাদের চিরাচরিত সামাজিক সংস্কারকে আহত করে, প্রেমবিকাশের এই পরিবেশ আমাদের সামাজিক বুদ্ধি স্বীকার করে না। ভূপতি যেদিন আবিষ্কার করিল, তাহার নীড় চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেদিন তাহার দুঃখ যে কত গভীর তাহাও লেখক জানেন, কিন্তু এই সত্যকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না যে, যে-ঘটনা-পৌর্বাপর্যের ভিতর দিয়া অমল ও চারুর বৎসরের পর বৎসর কাটিয়াছে, তাহাতে এই প্রেমবিকাশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, শুধু স্বাভাবিক নয়, বাস্তব জীবনে তাহা নিয়তই ঘটিয়া থাকে। এবং লেখক ঘটনার পর ঘটনা, পরিবেশের পর পরিবেশ যেমন করিয়া সাজাইয়াছেন তাহাতে পাঠকের চিত্তেও লেখকের উপলব্ধ সত্য শুধু যে নিকটতর হয় এমন নয়, সে সত্যকে পাঠক স্বীকার না করিয়া পারেন না। কারণ ঘটনা ও পরিবেশ লেখক যেমন করিয়া বিন্যাস করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা শুধু ঘটনা ও পরিবেশ মাত্র থাকে নাই, তাহারা হইয়া উঠিয়াছে একটি সুসম্বদ্ধ যুক্তিমালা। এই দিক্ দিয়া গল্পটির কলা-কৌশলের

যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না; এবং এই ধরণের সমস্যামূলক গল্পে ও উপন্যাসে এই কলাকৌশলই প্রধান বস্তু যাহার বলে সমস্যাগত সত্য সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়। সমস্যাগত সত্যকে তর্ক করিয়া কবি অথবা লেখক যখন পাঠক-চিত্তের নিকটতর করিতে চাহেন তখন তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য; আমাদের সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু ঘটনা ও পরিবেশ এমন সুচারু, সুনিপুণ ভাবে বিন্যাস করা যাইতে পারে যাহার ফলে সমস্যার অন্তর্নিহিত সত্য যুক্তি-শৃঙ্খলায় মীমাংসিত সত্যের রূপ ধরিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, যেমন হইয়াছে 'নষ্টনীড়ে'। তখন আমাদের সমাজবুদ্ধি ও সংস্কার আহত হইলেও সত্যকে আর অস্বীকার করিতে পারি না, চারু অথবা অমল কাহাকেও সমর্থন করিতে না পারিলেও তাহাদের সম্বন্ধকে অস্বাভাবিক বলিতে পারি না, সমাজ স্বীকার না করিলেও মন সমস্তই স্বীকার করিয়া লয়! তখন আমরা চারু অথবা ভূপতি কাহারও দুঃখেই ব্যথিত না হইয়া পারি না, কে কতটুকু দায়ী সে-বিচার তখন একান্তই অবান্তর। এবং সমাজনীতি কতটা পীড়িত হইয়াছে বা হয় নাই, তাহাও অবান্তর।

'নষ্টনীড়' গল্পটি উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথের মনের ক্রমপরিবর্ত্তন-ও লক্ষ্য করিবার। কি কাব্যরচনায়, কি গল্প-উপন্যাস-রচনায়, এ পর্যন্ত সর্বত্রই আমরা দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধি, চিন্তা ও কল্পনা আমাদের চিরাচরিত সংস্কার, শতাব্দী সঞ্চারিত ধ্যান ধারণা, ধর্ম ও সমাজ বোধ, এমন কি প্রচলিত সৌন্দর্য বোধকেও খুব অতিক্রম করিয়া যায় নাই। এসব সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন এপর্যন্ত কবির মনে জাগে নাই। এক কথায়, তিনি আমাদের সংস্কার ও পরিবেশ, ঐতিহ্য ও আবেস্টন, সমাজ ও রাষ্ট্র সব কিছু স্বীকার করিয়া লইয়াই এযাবৎ সাহিত্যসৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এই স্বীকৃতি সজ্ঞান স্বীকৃতি নয়, কার্যকারণ বিচার-লব্ধ নয়, একান্তই সহজ সংস্কারগত। এই সহজ সংস্কারই বহুদিন তাঁহার সৌন্দর্য-সৃষ্টির মূলে প্রেরণা জোগাইয়াছে, বিশেষ করিয়া কাব্যে ও ছোটগল্পে। কিন্তু সহজ প্রেমও সৌন্দর্যতন্ময়, গীতিমাধুর্যময় জীবনে একদিন প্রশ্ন ও সংশয়ের দ্বিধা জাগিল, "কল্পনা" গ্রন্থ হইতেই তাহার সূচনা লক্ষ্য করা যায়; গভীর মহা-জীবনের ইঙ্গিত "নৈবেদ্য—খেয়া" পর্যায়ে সুপরিস্ফুট। একদিকে এই নবজাগ্রত দ্বিধা সংশয় যেমন তাঁহাকে জীবনের গভীরতার দিকে আহ্বান করিতেছে, অন্যদিকে এই দ্বিধা সংশয়ই তাঁহাকে আমাদের সামাজিক সংস্কার ও ঐতিহ্যের কার্যকারণ সম্বন্ধের মূল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত করিতেছে। তাহার প্রথম পরিচয় আমরা পাইলাম

"নষ্টনীড়" গল্পে। এই গল্পেই আমরা প্রথম সুস্পষ্ট আভাস পাইলাম, একান্ত ভাবধর্মী রবীন্দ্র-কবিচিত্তে যুক্তিধর্মের স্পর্শ লাগিয়াছে। কাব্যে এবং ছোট গল্পেও ইহার বিকাশ আমরা দেখিব আরও অনেক পরে, 'বলাকা'-য়, 'পলাতকা'-য়, 'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর', প্রভৃতি গল্পে, 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাসে। এই সব কাব্য, গল্প ও উপন্যাসে লেখকের যে সমাজবোধ ও বুদ্ধি আমরা প্রত্যক্ষ করি, সমাজ-সত্বা সম্বন্ধে যে চেতনা লেখকের এই সাহিত্য সৃষ্টিকে নূতন ভঙি ও দৃষ্টি দান করিল, বাংলা সাহিত্যে এই সামাজিক চৈতন্য, কার্যকারণজ্ঞানলব্ধ সমাজবোধ ও বুদ্ধি আমরা এতকাল লক্ষ্য করি নাই। এই নূতন ভঙি ও দৃষ্টিই রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক জগতের সীমার মধ্যে আনিয়া পৌঁছাইয়াছে, এবং ইহার বলেই তিনি আধুনিক সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সামাজিক চৈতন্য, কার্যকারণজ্ঞানলব্ধ সমাজবোধ রবীন্দ্রনাথের মনে হঠাৎ জাগে নাই।

বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকের শেষাশেষি হইতেই বাঙ্‌লা দেশে একটা নবজীবনের সাড়া জাগিতেছিল; বাঙালী জীবনে শতাব্দী ধরিয়া যে গ্লানি ও অপমান, যে দুঃসহ বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল তাহা একদিন বঙ্গচ্ছেদের নির্মম আদেশকে উপলক্ষ্য করিয়া দেশের উপর ভাঙিয়া পড়িল—এক মুহূর্তে দেশের মূর্তি বদলাইয়া গেল। শিক্ষা, সমাজ রাষ্ট্র সর্ববিষয়ে দেশ যেন সচেতন হইয়া উঠিল, একটা প্রবল ভাবোন্মাদনায় দেশ মাতিয়া উঠিল, এবং সে উন্মাদনা ভাষা পাইল রবীন্দ্রনাথের গানে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়। বাঙ্‌লা দেশের সেই কয়বৎসরের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই একথা বলিবেন, রবীন্দ্রনাথই ছিলেন এই স্বদেশী যজ্ঞের উদ্গাতা। এই সময়কার রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদির বিষয় হইতেছে আমাদের শিক্ষা, আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম, আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের জীবনাদর্শ। অর্থাৎ আমাদের স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধ জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি একেবারে তাহাদের মর্মমূলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন, এবং তাহা হইতেই জাগিল প্রশ্ন, সংশয়; লাভ হইল কার্যকারণবিচার-সাপেক্ষ জ্ঞান। অথচ আশ্চর্য এই, সঙ্গে সঙ্গে তখন লিখিতেছেন "খেয়া" গ্রন্থের কবিতা।

"খেয়া"র কবি তাঁহার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিলেন "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"-তে। ইতিমধ্যে য়ুরোপে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়া গেল, কবি

নোবেল পুরস্কার পাইলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হইল, মহাযুদ্ধ-পরবর্তী য়ুরোপের নূতন সামাজিক চৈতন্য তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন এবং তাহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। বাহিরের জগতে ও জীবনে একটা মহাপরিবর্তন এই কয়বৎসরের মধ্যে সাধিত হইয়া গেল; কবিচিত্তে কি তাহার স্পর্শ লাগিল না? বোধ হয় ভাল করিয়াই লাগিল, গভীর ভাবেই লাগিল। তাহার ফলেই ত আমরা পাইলাম 'বলাকা', 'পলাতকা', পাইলাম 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে', পাইলাম 'স্ত্রীর পত্র', 'পাত্র ও পাত্রী', 'পয়লা নম্বর' প্রভৃতি গল্প।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি পত্রাকারেই লিখিত, স্বামীর নিকট স্ত্রীর পত্র। আমাদের সমাজে নারীর কোনও মূল্য ছিলনা একথা বলা চলে না, কিন্তু সে মূল্য ছিল কন্যা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে, মা হিসাবে; নারীর প্রতি একটা রোমান্টিক দৃষ্টি ও তজ্জনিত প্রীতি ও শ্রদ্ধা-ও ছিল, কিন্তু পারিবারিক-সম্পর্ক নিরপেক্ষ নারী হিসাবে নারীর মূল্য কিছু ছিল না, শুধু আমাদের দেশে নয়, কোনও দেশেই ছিল না। এই নারীর মূল্য অপেক্ষাকৃত বর্তমান যুগের আবিষ্কার, আর্থিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফল। য়ুরোপে এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে এই ফল, এই আবিষ্কারের সুচনা দেখা দিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই, কিন্তু তাহার প্রকাশ দেখা গেল সে-শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে এবং পূর্ণতর বিকাশ আমরা দেখিলাম মহাযুদ্ধের পর। সে ঢেউ যে আমাদের নিস্তরঙ্গ সমুদ্রতটে আসিয়া লাগিল তাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল 'স্ত্রীর পত্রে'।

'স্ত্রীর পত্র' প্রকাশিত হইয়াছিল "সবুজপত্র" মাসিক-পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩২১)। আমাদের পুরাতন জীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে "বলাকা"-র কবিতায় যে বিদ্রোহ ধ্বনিত হইতেছিল, তাহারই সুর ধরা পড়িল এই গল্পেও। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের আভাস 'হৈমন্তী' গল্পেও আছে কিন্তু 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে স্বামীচরণতলাশ্রয়ছিন্ন মৃণাল স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিল, "আমি তোমাদের মেজ-বৌ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জান্‌তে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। * * * [বিন্দুর] ভালবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটা স্বরূপ দেখ্‌লুম, যা আমি জীবনে আর কোনও দিন দেখিনি। সেই আমার মুক্তস্বরূপ। * * * আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কি তা' আমি পেয়েচি। আমার আর দরকার নেই। * * * [বিন্দুর] উপরে

তোমাদের যত জোরই থাকুনা কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হত্যভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্—সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালী ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভাইয়ের বোন্ নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত। * * * তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র। আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ। তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়াছিল। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখ্‌বার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভাল লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখ্‌ছেন। এইবার মরেছে মেজবৌ। * * * আমিও বাঁচবো, আমি বাঁচলুম।"

কোথায় গেল সেই সুকুমার গীতিমাধুর্য, ভাবধর্মের লীলা যাহা ছিল রবীন্দ্র-ছোটগল্পের প্রাণ? এ যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ জর্জ্জরিত জীবন-সমস্যা, এ যে তীব্র কণ্টকিত আঘাত, এ যে চিন্তাবৃন্তের মূল ধরিয়া টান, সমাজ-ব্যবস্থার মূল সম্বন্ধে শুধু প্রশ্নমাত্র নয়, তাহাকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা। 'নষ্টনীড়' গল্পের কলাকৌশলের নিপুণতা 'স্ত্রীর পত্রে' নাই; মৃণালের বক্তব্য একপক্ষীয়, যুক্তি-শৃঙ্খলাও তেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই। কিন্তু যুক্তি-শৃঙ্খলার অভাব পূরণ করিয়াছে বক্তব্য বিষয়ের ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা, ভাবগভীরতার অভাব পূরণ করিয়াছে জীবন-সমস্যার সত্য, এবং মৃণালের নারী-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শের বিকাশ যে ভাবে হইয়াছে তাহাতে ঢাকা পড়িয়াছে গল্পটির আদর্শ-প্রচার-ভঙ্গিমা।

'স্ত্রীর পত্রের' বিদ্রূপবাণ ব্যর্থ যায় নাই। প্রমাণ, "নারায়ণ" মাসিক পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের 'মৃণালের পত্র' এবং ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'স্বামীর পত্র' নামক দুই প্রতিবাদ। প্রমাণ, পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর বিদ্রোহবাণী।

"স্ত্রীর পত্র"-গল্পে মৃণাল নারীত্বের যে মহিমা ঘোষণা করিল তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনি "পলাতকা"-র 'মুক্তি' নামক কবিতায় যেখানে বাইশ

বৎসর বিবাহিত জীবন যাপনের পর দীর্ঘ অসুখের ছল্ম করিয়া মৃত্যু যখন একটি অবহেলিত মেয়ের জীবনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, তখন সেই মেয়েটির হেলাফেলার জীবনে প্রথম বসন্ত দেখা দিল, নারীত্বের পরিপূর্ণ মহিমার অভাস যেন সে পাইল। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পেও এই একই কথা। মৃণাল নারীত্বের পূর্ণ মহিমা উপলব্ধি করিল বিন্দুর লাঞ্ছিত অবজ্ঞাত বঞ্চিত জীবন ও মৃত্যুর ভিতর দিয়া, আর 'মুক্তি'-কবিতার মেয়েটি সেই মহিমাকে জানিল নিজেরই বঞ্চিত জীবনের শেষ অধ্যায়ে মৃত্যু দূতের আহ্বান পাইয়া। নারীত্বের প্রতি আমাদের রোমান্টিক প্রেম ও শ্রদ্ধার অন্তরালে যে কত বড় বঞ্চনা লাঞ্ছনা আত্মগোপন করিয়া আছে, 'স্ত্রীর পত্র' গল্প ও 'মুক্তি' কবিতা আমাদের এই সামাজিক প্রবঞ্চনাকে গোপনতা হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছে।

'পয়লা নম্বর' (১৩২৪) গল্পটি আপাতদৃষ্টিতে দাম্পত্য-সম্বন্ধের বিশ্লেষণ-চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু ইহার আর একটি গভীরতার দিক্ আছে, সেটি ইহার সামাজিক চেতনার দিক্। অদ্বৈতচরণ একাগ্র জ্ঞানান্বেষী, চিন্তাবিলাসী যুবক, সংসারানভিজ্ঞ অন্যমনস্ক চিত্ত। সে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর নিজের বন্ধুমণ্ডলীর পরিবেশের মধ্যে জ্ঞানানুশীলনে ব্যাপৃত। সে-জগতের মধ্যে তাহার স্ত্রী অনিলার কোনও স্থান ছিল না, এবং অদ্বৈতচরণও নিশ্চিন্ত ছিল এই ভাবিয়া যে পুরোহিতের কাছ হইতে যখন একজনকে স্ত্রী বলিয়া পাওয়া গিয়াছে তখন সে নিশ্চয়ই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। এর চেয়ে স্ত্রী সম্বন্ধে বেশী কিছু ভাবিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু অনিলার হৃদয় ছিল, এবং সে হৃদয় সজীব পদার্থ। এই সজীব পদার্থটির জগত ক্ষুদ্র হইলেও সেখানে ঘাত-প্রতিঘাতের অভাব ছিল না, এবং সেই ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া একটি ক্ষুব্ধ নারীহৃদয় বিদ্রোহে ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল। অদ্বৈতচরণ তাহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই; বুঝিবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই। এমন সময় সিতাংশু মৌলির আবির্ভাব যে সিতাংশুর হৃদয়াবেগের প্রাচুর্য তাহার সাংসারিক ঐশ্বর্যের চেয়ে কম নয়। অদ্বৈতচরণ যাহা কখনও দেখে নাই, বুঝে নাই, সিতাংশু তাহা দেখিল এবং বুঝিল, সে দেখিল অন্তরের দিক হইতে অনিলার, বেদনা কত বড়, কত গভীর। সিতাংশুর সমস্ত হৃদয় নিংড়াইয়া এই কথা উচ্চারিত হইল—

"আমি তোমাকে দেখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্ছি দেখ্‌বার মত দেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে প্রথম ঘট্‌লো। চোখের

উপর ঘুমের পর্দা টানা ছিল, তুমি সোনার কাঠি ছুঁয়ে দিয়েছ। আজ আমি নব জাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখ্‌লুম, যে-তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার আমি তা' পেয়েছি, আর কিছু চাইনে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই।"

এই স্তব শুনাইয়া অনিলার চিত্ত সে জয় করিল; অনিলার নিকট হইতে কোনও সাড়া সে পাইল না; কিন্তু তাহার বিদ্রোহধূমায়িত হৃদয়ে আগুন ধরাইয়া তাহাকে সে গৃহছাড়া করিল। অনিলা অদ্বৈতর গৃহ ছাড়িল, সিতাংশুর গৃহেও গেল না। জ্ঞানগর্বিত অদ্বৈতচরণ প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইবার পর ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে দেখিতে চেষ্টা করিল। 'যুগ যুগান্তরের জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করে টিঁকে রয়েছে এমন সব জিনিসকে আমি কি চিন্‌তে শিখিনি?'

"কিন্তু হঠাৎ দেখ্‌লুম এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্য কালের জ্ঞানীটা মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লো, আর কোন্ আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াতে লাগ্‌লো।"

এ যেন "চতুরঙ্গ" গ্রন্থের সেই 'আদিম জন্তুটা'। তারপর রেশমের লাল ফিতায় বাঁধা সিতাংশুর লেখা চিঠির তাড়া যখন পড়া শেষ হইল তখন সে নিজকে এই বলিয়া প্রবোধ দিল—

"সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেছে আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখ্‌লুম। আমার চোখের ঘুমের পর্দা কত মোটা পর্দা না জানি। পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি চেয়েছিলুম, কিন্তু তার বিমাতার হাত থেকে হাত গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিই নি। আমি আমার দ্বৈতদলকে এবং নব্যন্যায়কে তার চেয়ে অনেক বড় করে দেখেছি। সুতরাং যাকে আমি কোনও দিনই দেখি নি, এক নিমিষের জন্যও পাই নি, তাকে আর কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে এতে কি ব'লে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ করবো?"

কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যায়, সেই আদিকালের প্রাণীটা এই প্রবোধে সান্ত্বনা মানিল কি? লেখকের রচনায় কার্যকারণবিচারলব্ধ জ্ঞান জয়ী হইয়াছে, যুক্তি-শৃঙ্খলা অনুসরণ করিয়া পাঠক অদ্বৈতচরণের আত্ম-প্রবোধকে স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। কিন্তু আদিকালের প্রাণীটার ক্ষুধা নিবৃত্তি লাভ করিবে কি?

গল্প হিসাবে 'পাত্র ও পাত্রী' (১৩২৪) খুব সার্থক রচনা নয়। আমাদের সমাজে বিবাহ ব্যাপারে পুরুষ নারীর প্রতি কিরূপ নির্মম ও অপৌরুষেয় ব্যবহার

করিয়া থাকে, মানবতার দাবী ও যুক্তিকে কি নির্মমভাবে পীড়িত করিয়া থাকে তারই কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তে গল্পটি গাঁথা। তাহাদের মধ্যে রস ও রূপ বন্ধনের কোনও নিবিড় ঐক্য নাই। কিন্তু কলাকৌশলের কথা ছাড়িয়া দিলে গল্পটির মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যে-সমস্ত সুগভীর মন্তব্য আছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যে-দীপ্তি আছে, যে-সামাজিক চেতনার পরিচয় আছে তাহা কোনও পাঠকেরই দৃষ্টি এড়াইতে পারে না।

আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দুঃখ ও ত্যাগের, বিপদ ও লাঞ্ছনার, কলহ-কোলাহলের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের কত যে ফাঁকি, কত যে আত্মবঞ্চনা, কত যে ক্ষুদ্র মন প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহার খানিক পরিচয় আছে 'নামঞ্জুর গল্পে' (১৩৩২)। অমিয়ার দেশসেবার মধ্যে প্রচ্ছন্ন খ্যাতির লোভ এবং দশজনের সকাম প্রশংস-দৃষ্টির মোহ তাহাকে গৃহে সত্যকার ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক পীড়িত ভাইয়ের সেবার কথা ভুলাইয়া তাহাকে টানিয়া লইয়াছে জনসংঘের মাদকতার মধ্যে, অসহায় নারীত্বের কর্তৃত্বের আত্মতৃপ্তির মধ্যে। গৃহে রুগ্ন ভ্রাতা, বাহিরে সে অসংখ্য দেশভ্রাতার মধ্যে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে মত্ত; গৃহে যে নিঃসহায় ভীরু নারী ভীত কম্পিত হৃদয় লইয়া পীড়িত ভ্রাতার সেবায় উন্মুখ তাহার প্রতি সে ঈর্ষ্যান্বিত, বাহিরে সে অসহায় নারীর জন্য আশ্রম পরিকল্পনায় ব্যস্ত। যে স্বদেশ-সমাজ-কর্মবিলাসী অনিল অমিয়ার সহকর্মী সে অমিয়ার প্রেমানুরাগী এবং তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু যখনই সে শুনিল অমিয়ার জন্মবৃত্তান্ত তখন কোথায় গেল তার প্রেম, কোথায় তাহার স্বদেশ ও সমাজ-ধর্ম! এসবের মধ্যে যে ফাঁকি, যে বিরাট আত্মপ্রবঞ্চনা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহা কলকোলাহলের মধ্যে সহজে আমাদের চোখে পড়ে না, হৃদয়কে স্পর্শ ও বুদ্ধিকে জাগ্রত করে না। কিন্তু লেখক আমাদের হৃদয়কে আবেগে পীড়িত না করিয়াও তাঁহার বুদ্ধির ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতায় ঘটনাপর্যায় এমন সুনিপুণভাবে বিন্যাস করিয়াছেন, চরিত্রগুলি এমন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে ঘটনা ও চরিত্র মিলিয়া হইয়া উঠিয়াছে একটা যুক্তিশৃঙ্খলা। এবং তাহার ফলে হৃদয়কে স্পর্শ না করিয়াও 'নামঞ্জুর গল্প' আমাদের বুদ্ধিকে চেতনা দান করে।

রবীন্দ্রনাথ ইহার পর আর কোনও উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প রচনা করেন নাই। এবং করেন নাই বলিয়া দুঃখ করিবার কিছু নাই। যে প্রসার ও বৈচিত্র্য আমরা তাঁহার ছোটগল্পের মধ্যে দেখিয়াছি তাহার তুলনা নাই। আমাদের পুরাতন সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা, তাহাদের আবেষ্টন ও পরিবেশের মধ্যে যাহা কিছু রূপ, রস ও গন্ধ তাহা তিনি সর্ব অঙ্গে মনে গ্রহণ করিয়াছেন এবং

তাহার সমস্ত রসমাধুর্য নিঃশেষে তাঁহার বিচিত্র গল্পরাজির মধ্যে পরিবেশন করিয়াছেন। বাঙ্‌লা দেশের পুরাতন প্রচলিত জীবনধারার যত কিছু দুঃখ ও বেদনা, যত কিছু সৌন্দর্য মাধুর্য সমস্তই তাঁহার স্বচ্ছ সহজ দৃষ্টি ও অনুভূতির মধ্যে ধরা দিয়াছে, এবং অপূর্ব সহৃদয়তায় তিনি তাহা রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু সেইখানেই তাঁহার সৃষ্টিপ্রচেষ্টা নিঃশেষ হইয়া যায় নাই।

যে নূতন জীবনধারা, যে নূতন ভাব ও চিন্তা জগৎ আমাদের প্রাচীন জীবনধারা, প্রাচীন ভাব ও চিন্তা জগতের তটে আসিয়া আঘাত করিতেছে এবং যে অভিনব ভাব ও চিন্তাসম্পদের সৃষ্টি করিতেছে রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সের ক্ষীয়মান শক্তির মধ্যেও তাহা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অনুভূতিকে তাহা স্পর্শ করিয়াছে, এবং সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে। একান্ত ভাবধর্মী বাঙ্‌লা সাহিত্য যে আজ যুক্তি ও চিন্তাধর্মের সঙ্গে সমন্বয় অন্বেষণ করিতেছে, তাহার ইঙ্গিত ত রবীন্দ্রনাথই আমাদের দিয়া গিয়াছেন, এবং সেই ইঙ্গিত তাঁহার ছোটগল্পের মধ্যেও সুস্পষ্ট। তিনি কবির সত্যদৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন, এই নূতন ভাবসম্পদকে আশ্রয় করিয়া, এই নূতন সমাজ-চেতনা ও জীবনসমস্যাকে ঘিরিয়াই নবযুগের নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে, আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করিবে; বুদ্ধির স্তরের ভিতর দিয়া দুর্গম যাত্রা অতিক্রম করিয়া ইহারাই একদিন অন্তরের মাধুর্যরসের সন্ধান লাভ করিবে। এই সব নূতন ভাবসম্পদ, নূতন সমাজ-চেতনা, নূতন জীবনসমস্যা ইহারাই একদিন বাঙ্‌লা ছোটগল্প ও উপন্যাসের উপজীব্য হইবে, রবীন্দ্রনাথই সে আভাস আমাদের দিয়াছেন।

আজিকার বাঙ্‌লা সাহিত্যে ছোটগল্পে ও উপন্যাসে সে আভাস স্পষ্টতর হইতেছে, সুখের কথা সন্দেহ নাই। না হওয়াই অস্বাভাবিক। সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ সুনিবিড়। বাঙ্‌লাদেশে সেই জীবনের তটে আজ বিশ্বজীবনের উত্তালতরঙ্গ আসিয়া নিরন্তর আঘাত করিতেছে। বাঙালী জীবনে ভারতীয় জীবনে কর্মধারা চিন্তাধারার মধ্যে বিপুল আবর্তন পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবেই। রবীন্দ্রনাথ নূতন সাহিত্যের নূতন জীবনের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, অঙ্কুরোদগম আমরা দেখিতেছি, কিন্তু সেই অঙ্কুর কবে বৃক্ষে পরিণত হইবে, এবং সেই বৃক্ষে কবে আমরা পরিণত ফল প্রত্যক্ষ করিব তাহা নির্ভর করিতেছে আধুনিক সাহিত্যস্রষ্টাদের বুদ্ধির উপর, সমাজ-চৈতন্যের উপর, সত্যদৃষ্টি ও সৃজন-প্রতিভার উপর।

কবিতা

নজরুল ইস্‌লাম

জাগো অমৃত-পিয়াসী চিত
আত্মা অনিরুদ্ধ
কল্যাণ-প্রবুদ্ধ ।
জাগো শুভ্র জ্ঞান পরম
নব প্রভাত পুষ্প সম
আলোক-স্নান-শুদ্ধ ॥

সকল পাপ কলুষ তাপ
দুঃখ গ্লানি ভোলো.
পুণ্য প্রাণ-প্রদীপ-শিখা
স্বর্গপানে তোলো ।
বাহিরে আলো ডাকিছে জাগো
তিমির-কারারুদ্ধ ॥

ফুলের সম অলোর সম
ফুটিয়া ওঠ হৃদয় মম
রূপ রস গন্ধে
অনায়াস আনন্দে
জাগো মায়া-বিমুগ্ধ ॥

ক্রিস্‌মাস্‌

সমর সেন

সাজানো বাগানে শবাহারী শৃগাল,
খাপছাড়া ঘুমে দূরে শুনি জোয়ারের জল,
কিসের কল্লোল !
বাঁধ ভেঙে বন্যার জল।

শূন্য মাঠে কোটরহীন চোখের মতো গ্যাসের আলো ঝোলে ;
কার্নিভাল সুরু হোলো, রেসখেলা শেষ,
কঙ্কালবর্ণ কুয়াশায় দেখো ছেয়েছে নগর।
এখনো আলো ছায়া দোলে কারো কারো চোখে,
নির্জন দ্বীপ শ্যামল শরীরে মেলে,
শীতের দিনে অনেক দূরের পাহাড় যেন কাছে সরে আসে।

দ্বিতীয় আবির্ভাব

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

রণচণ্ডীর জয়গাথা গাহি,
রক্তবীজের কোটি মৃত্যুর বুকে।
মধু-কৈটভ অপহৃত মহাপাশে।
শুম্ভ ও শিবের ক্লীব সৈন্যেরা
মহাপ্রস্থান খুঁজে নেয় মহাভয়ে।

দুরন্ত পার্ব্বত্যছাগ লম্ফমান দূরে
প্রতি মিনিটের শুভ্র তুষারের চূড়া,
পার হয় একে একে ছাগরূপী কাল,
প্রতি শ্রান্ত, পাশবিক, কঠিন মিনিট।

আজ ত শ্যেনের মেঘ ছেয়েছে আকাশ,
গৃহস্থ কপোত কাঁপে পাতার আড়ালে,

ফেরোকংক্রিট্ নীড়ে স্নায়বিক ভয়।
তত্ত্ব-পিষ্ট জীবনের পলাশ পালায়,—
উত্তপ্ত হাওয়ায় ছিন্ন রক্তাক্ত পলাশ
বোস এণ্ড সন্স্ বেচে প্রতিটি টাকায়
এক গুচ্ছ। শিশুপ্রাজ্ঞ নচিকেতা ঘোরে
পূতিশূন্য যাদুঘর-শবাধার পাশে।

এই লঘু জীবনের স্টিমার কেবিন
মানে না সময়—
কবে কোন ঘাটে ভেড়ে, কোন 'কোলাঘাটে'
যুবতীর মত।
যৌবনের রক্তযুগ আজ যদি হয়
প্রাগৈতিহাসিক,
তবু এই ভেসে যাওয়া স্টিমার কেবিন, আব,
খালাসীর গান,
এনে দেবে যৌবনের নব পরিভাষা।
তাই বুঝি আজ—

আকাশেতে দেখি নীল মেঘ নাই,
ইন্দ্রধনুর বর্ণ ভুলেছে মন।
নিয়নের নীল আলোয় মুগ্ধ রাত।
মানুষের আয় আয়ুর কবলে ফেরে।
মরণোত্তর অধিকার তাই শেষ ভিক্ষার ঝুলি।

শ্যেনের পক্ষ ফেলে দুরন্ত ছায়া।
তীক্ষ্ণ হীরক চক্ষুতে গুনে নেয়,
ভাবী শবেদের কায়া।
আজ যারা শূন্য পায়ে ফেরে,
শূন্য পাকস্থলী,
তাহাদের জীবনের রৌদ্র-কুণ্ডে নামে
প্রচণ্ড নিমেষ।

জনপদে ঢেউ লাগে ; রক্তের প্লাবনে
শুভেনের প্রেম যায় ভেসে।
পিত্ত-পীত জীবনের শ্রম-কুণ্ডে নামে
চটুল নিমেষ।

ভারি বুট পায়ে, মহাকাল চলে, পাথরের পথ।
কলের ধোঁয়ার মুঠি মুঠি মেঘ দুহাতে ছোঁড়ে।
আকাশের মেঘ মরে গেছে কোন প্রত্নাগারে।
শুভেনের মত যারা প্রেম করে, তারা পলাতক
ভ্রূকুটির নীচে—দূরে পলাতক। মধ্য রাতের
মনোরথে দেয় কামুকের মত পর্দা টেনে।

খাদ্যশিকারী মনের ধারালো পথে
কবি সুকুমার হল ক্ষত বিক্ষত।
চন্দ্রালোকের ঝড়ে ঘুরে মরে তাই
ছিন্ন ভিন্ন অযথা গানের খাতা।

চূড়ামণি যোগে,
জীবনের পীত সৈকতে ভিড় স্নানার্থীদের।
শ্যেনের পক্ষ ফেলে দুরন্ত ছায়া।
তীক্ষ্ণ হীরক চক্ষুতে গুনে নেয়,
ভাবী শবেদের কায়া॥

মরুভূমির ঝড়

হরপ্রসাদ মিত্র

মরুঝড় ওঠে থমকাও কেন যাত্রীদল ?
আকাশে বালুর কী সমারোহ !
উটের বল্‌গা আল্‌গা ক'রেই ধরো

মরুঝড় ওঠে, মাতাল বাতাস
—বিঘূর্ণিত ;
বালুপাহাড়,—
এবার শেষ।
উটের বল্‌গা আলগা ক'রেই ধরো ॥
দূর দিগন্ত ঝাপ্‌সা হ'লো-যে দেখ,
লোনাবালি ঢেকে
সাগরের ঢেউ আসে কি ?
প্রত্নতত্ত্বে বন্দী 'ফসিল্‌' ফিরেছে ?
জীবনের গান আবার শুনতে পাও ?

ইতিহাসে নেই ঠিকানা।
যুগান্তরের নিশানা—
বালুপাহাড়ের মৃত সঞ্চয়
মরুঝড়ে ঘুম ভেঙেছে।
নতুন আকাশে আদিম আলো কি নেমেছে ?
মরুঝড় ওঠে, কেন থমকাও যাত্রীদল,
বালুবলিরেখা সাবানের ফেনা নিভেছে !
মশকের জল ফেলো ভাই,
খেজুরের লোভ রেখো-না।
দ্বীপান্তরের শ্রম-সঞ্চিত প্রবালে
ঘুমসি-তে আজও বেঁধো-না ॥

মরুঝড় ওঠে, মাতাল বাতাস
—বিঘূর্ণিত ;
বালুপাহাড়,
এবার শেষ।
নিরুদ্দেশ।
মিছে থমকাও, পণ্যের মায়া মিছেই করো
উটের বল্‌গা আল্‌গা করেই ধরো ॥

ধানকাটা মাঠ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আমার এ ছোট ঘরে অস্পষ্ট ছায়ারা
কোলাহল করে।   রাত্রে শুনি কুকুরের ডাক।
ফিস্‌ফিসে দেয়ালের কানে ক্লান্তির প্রলাপ।

দিন শেষ হয়ে গেছে।
আমার জীবনে আর-একটি দিন আর বেশী নেই,
রেখারা গভীর হল।
সেই কথা ছায়ারা কি চুপি চুপি বলে
দেয়ালের কানে ?
ক্লান্তির প্রলাপে ?

প্রতি রোমকূপে
সময় দিয়েছে তার হাত,
হিম-ছুরিময়।

হেমন্তের নিভন্ত বিকেলে
ধানকাটা মাঠ
চকিত হঠাৎ চোখে পড়েছিল।
কর্কশ খড়ের ঝুঁটি রুগ্ন মাঠে শুধু ফুটেছিল ;
আমার এক-একটি দিন আর সব রাত
হেমন্তের বিকেলের ধানকাটা মাঠ।

আমার এ দিনগুলি রক্ত পিষে নিয়ে
দেবতাকে করছে সুন্দর,
ছায়াময় এই রাত হিম হাত দিয়ে
আমাকে করেছে প্রস্তর।
অস্পষ্ট ছায়ারা সব তন্দ্রার ভিতরে দুঃস্বপ্ন আনে,
সেই কথা শুনিয়াছি ক্লান্তির প্রলাপে আজ দেয়ালের কানে।

রাত্রির এ অন্ধকারে মানুষের খাদ্য হতে দলে-দলে
গরু-ভেড়া চলে,
কালকের ডিনার-টেবিলে
তন্দ্রায় মন্থর সেই অস্পষ্ট খুরের শব্দ
কখনো কি আর মনে পড়ে ?

প্রতিপলে রক্ত দিয়ে সৃষ্টিকে ঐশ্বর্য্যময়
করেছি আমরা,
আমার এ গান হোক বিধাতার খেয়ালি হিসাবে বিদ্রোহ দুর্জ্জয়।
দুঃসহ যৌবনগুলি দুঃস্বপ্নের ভারে ম'রে যায়
মানুষের ছিন্ন রুটিখানি, তাও হায় দেবতাই পায়।
আমরা চলেছি দলে দলে সময়ের এ সুড়ঙ্গ পথে
সৃষ্টিকে বাঁচাতে শুধু, দেবতার খাদ্য শুধু হতে !

হেমন্তের বিকালের ক্লান্ত কুয়াশায়
নিভন্ত দিনের শেষে রুগ্ন অসহায়
এক-একটি ধানকাটা মাঠ।
আমাদের ফসলেতে বণিকেরা ফুলে ফেঁপে ওঠে,
আমাদের বুকে শুধু পিপাসিত ঝড় ফুটে ওঠে।

সেই কথা শুনিয়াছি আজ রাতে ছায়াদের গানে
সেই কথা জাগিয়াছে ফিস্‌ফিসে দেয়ালের কানে।

যাত্রা

হুমায়ুন কবির

কারাভাঁর যাত্রা হ'ল সুরু।
শঙ্কিল সংকীর্ণ পথে গোধূলির অস্পষ্ট আলোকে
কোন দূরদিগন্তের অপ্রকাশ আহ্বানের টানে
অবেলায় অসময়ে কারাভাঁর যাত্রা হ'ল সুরু ?

পিছনে রহিল পড়ি পরিচিত প্রাচীন জগত।
স্বপ্নপুরী-সম তার সুপ্তিময় গৃহ,
ইষ্টকের খণ্ডে খণ্ডে স্মৃতির পশরা,
কঙ্কালের অস্থিচূর্ণ মৃত্তিকার কণায় কণায়,
আশা আশঙ্কার গন্ধে উন্মন বাতাস,
সমাধির অচঞ্চল স্থৈর্য্য শান্তিময়
অবসাদ ছড়াইছে আকাশে আকাশে,
পরিপূর্ণতার ভারে আড়ষ্ট নিশ্চল প্রাণধারা,
যৌবনবিস্মৃত পাণ্ডু পক্কতায় মৃত্যুর আভাস।

শ্মশানের শান্তি সেথা,—
সুপ্তির আহ্বানে ডাকে মৃত্যু ছদ্মবেশী।
বিধ্বস্ত মুমূর্ষু প্রাণ বহি' সংগোপনে
দ্বিধায়, আশঙ্কাভরে, আশা নিরাশায়
অজানিত ভবিষ্যের পানে
স্মৃতির কঙ্কাল টানি' কারাভাঁর যাত্রা হ'ল সুরু।

মরুভূমি তরুলতাহীন
নিষ্ঠুর আকাশতলে দিগন্তে বিলীন,
অনিশ্চিত কম্প্র আলো, অস্পষ্ট মলিন চক্রবাল,
পথের ইঙ্গিত নাহি, মহাকাল বাধাবন্ধহারা
আদিম অনন্ত শূন্য রেখেছে বিছায়ে।
ঊর্ম্মিল বন্ধুর ভূমি বালুস্তূপময়
চঞ্চল আবর্ত্তসম পরিচয়হীন
স্মৃতির সমাধি রচি' ক্ষুধিত রাক্ষসী যেন জাগে।
দিশাহীন ছেদহীন লক্ষ্যহীন সে অসীম ভেদি'
মৃত্যুর আহ্বান ঠেলি' কারাভাঁর যাত্রা হ'ল সুরু।

মরুভূমি গোধূলির অনিশ্চয় অসীমে হারালো?
অকস্মাৎ বিভীষিকা সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে
মূর্চ্ছাহত বালুকণা জাগালো কি মৃত্যুর আহ্বান?

অন্ধকারে প্রেতদল পথপাশে অট্টহাসি হাসে ?
কঙ্কালের শ্বেত নগ্ন অস্থি-র গহ্বরে
প্রাণঘাতী বীভৎস রাগিণী ?
মৃত্যু, শঙ্কা, মূর্চ্ছা, গ্লানি আচ্ছন্ন গগন
মানুষের দুরাশার অভিযানে টানি দিল ছেদ ?
অদৃশ্য আলোর দীপ্তি অজানিত কোন নভোতলে
সহসা চমকি' উঠে উদ্ভাসিয়া অন্তরের ছায়া ?
মরুভূমি পরপারে কোথা স্বর্ণ দ্বীপ
প্রলোভন সম রক্তে ছন্দ দেয় আনি
তারি পানে উন্মীলিয়া সকল হৃদয়
গোধূলির অন্ধকারে তিমির রাত্রির বক্ষ ভেদি'
পথহীন প্রান্তরের নামহীন বিপদ উত্তরি'
অজ্ঞাত উষার পানে কারাভাঁর যাত্রা হ'ল সুরু ?

গণতন্ত্রের সঙ্কট

সুশোভন সরকার

সাম্যবাদীরা যে-সময় রাশিয়ায় কর্তৃত্বস্থাপনে ব্যস্ত, তখন ইটালিতে ফাশিজ্‌ম্ নামে এক নূতন প্রচেষ্টার উদ্ভব হয়। পরে এই ফাশিষ্ট্ মতই সকলপ্রকার সমাজতন্ত্রবাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ইউরোপের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে; মার্ক্স্‌পন্থার প্রতিক্রিয়াই তার মূল প্রেরণা। এতে করে যে-আদর্শ ও চিন্তাধারার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তার পিছনে বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্ঘাত সূচিত হচ্ছে, উত্তরসামরিক ইতিহাসের প্রধান বিষয়-বস্তু তারই বিবরণ। প্রতিক্রিয়ার প্রথম অবস্থাতে মুসোলীনির দেশে তার নামকরণ হয় ইল্ ফাশিস্‌মো। প্রাচীন রোমে একসঙ্গে বাঁধা কতকগুলি দণ্ডকে রাজশক্তির চিহ্নরূপে ব্যবহার করা হ'ত, তার লাটিন্ নাম থেকেই ফাশিস্‌মো কথাটার উৎপত্তি। এই প্রতীক থেকে নূতন আন্দোলনের ছুটি মূলসূত্র আবিষ্কার করা যায়—রাষ্ট্রশক্তির প্রতিভূ নেতাদের কর্তৃত্ব স্বীকার এবং সকলের সম্মেলন রূপ বন্ধনের মধ্য দিয়ে জাতির অখণ্ড ঐক্য-কামনা।

এই প্রতিক্রিয়ার ইটালিতে প্রথম উদয় হবার কারণ অবশ্য সে-দেশের বিশেষ অবস্থা। উনিশ শতকের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে ইটালিতে এল ঐক্য আর মুক্তি, ১৮৭০ পর্য্যন্ত তার সাফল্য দেশকে উদ্দীপিত করে' রেখেছিলো। তার পরের অর্দ্ধশতাব্দীতে কিন্তু ইটালীয়দের ভাগ্যে জুটল অবসাদ ও আশাভঙ্গ। এর প্রকৃত কারণ বোধ হয় ইটালির আর্থিক ও তার ফলে রাষ্ট্রিক তুর্ব্বলতা এবং অনুন্নত অবস্থা; মহাশক্তি হ'লেও নব্য ইটালি সামর্থ্য ও পরিণতিতে অন্যদের অনেক পিছনে রইল। আফ্রিকায় এইসময় সাম্রাজ্য-স্থাপনের চেষ্টায় আশানুরূপ সাফল্যের অভাব এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। মহাযুদ্ধের আগেই তাই ইটালিতে অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে এ-ব্যর্থতার জন্য দায়ী তুর্ব্বল নেতৃত্ব এবং তারও মূলে রয়েছে ইংরাজ ও ফরাসীদের অনুকরণে গঠিত পার্লামেণ্টীয় শাসনপদ্ধতি। অসন্তোষ এইরূপে ক্রমে ক্রমে দেশের মধ্যে জমে উঠছিল। আর বস্তুতঃই এ-যুগে ইটালির গণতান্ত্রিক শাসকেরা কোন দিকে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। রাজনীতি কতকগুলি লোকের ব্যবসা কিংবা খেলা হয়ে উঠেছিল। গোঁড়া ক্যাথলিক্ ও সাধারণ লোকের বিরোধে দেশ তখনও বিভক্ত, তার উপর প্রাদেশিক মনোভাবের জন্য আর সমাজতন্ত্রের আন্দোলনের ফলে ঐক্য হ'ল

আরও সুদূর পরাহত। লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছিল—অথচ নিজেদের উপনিবেশের অভাবে বিস্তর লোক বিদেশে বসতি করে' বিদেশীদের মধ্যে মিশে যাচ্ছিল। আর্থিক উদ্যমের অভাবে অন্যদের তুলনায় ইটালি দরিদ্র থেকে যায় আর সেইজন্য রাষ্ট্রমহলে তার বিশেষ প্রতিপত্তিও ছিল না। সাম্রাজ্য গড়তে গিয়ে আবিসিনিয়ায় হ'ল দারুণ পরাজয় (১৮৯৬)—সম্প্রতি তার প্রতিশোধ নেবার উত্তেজনাই মুসোলীনির আফ্রিকা-অভিযানকে জনপ্রিয় করতে পেরেছিল। এরও আগে, ইটালির মুখের গ্রাস টিউনিস্ ফ্রান্স্ হঠাৎ নিজে দখল করে' বসে (১৮৮১) এবং অনেকটা সেইজন্যই ইটালি তখন জার্মানির দলে যোগ দেয়। সেখানেও বিশেষ সুবিধা না হওয়াতে ইটালি স্বেচ্ছাবিহার আরম্ভ করে। কিন্তু তুরস্কের কাছ থেকে ট্রিপোলি (লিবিয়া) অধিকার (১৯১১) জার্মানদের কাছে প্রীতিপ্রদ হয় নি। খানিকটা ভাসতে ভাসতে শেষে মহাযুদ্ধের সময় ইটালি মিত্রপক্ষে যোগ দেয় (১৯১৫), তার কারণ অবশ্য লণ্ডনের গুপ্ত চুক্তিতে লাভের আশ্বাস।

মহাযুদ্ধের আগে এই ছিল ইটালির অবস্থা। দেশের মধ্যে বহুদিন একমাত্র প্রাণবান প্রচেষ্টা ছিল সোশ্যালিষ্ট্ আন্দোলন কিন্তু সে-মতবাদে দেশ অপেক্ষা শ্রেণী-স্বার্থের উপরেই বেশী জোর পড়ত। এ-অবস্থায় মুসোলীনির আগেও কতকগুলি ছোট ছোট দল নবজাগরণের অগ্রদূত হিসাবে দেখা দিল। মারিনেত্তির ফিউচারিষ্ট্ মণ্ডলী এক অভিনব ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখ্‌ল যেখানে অতীতের আবর্জ্জনা দূর এবং গণতন্ত্রের স্থানাভাব হবে; যুদ্ধবৃত্তিকে মারিনেত্তি বলেছিলেন জগতের স্বাস্থ্য রক্ষার উপায়। জেন্টিলের আদর্শবাদ চিন্তাশীল লোকদের বোঝাতে লাগল যে ষ্টেটের একটা নৈতিক সত্ত্বা আছে, রাষ্ট্রশক্তি উদারনীতির শান্তিরক্ষক কিংবা মার্ক্স্-কথিত নিষ্পেষক নয়। কোরাডিনি লিবিয়াতে যুদ্ধবিগ্রহের সময় এক জাতীয়-দল গঠন করলেন—যার মূলমন্ত্র হ'ল দেশের জন্য আত্মত্যাগ; তিনি বল্লেন যে ইটালি দরিদ্র ব'লেই তাকে সাম্রাজ্যতন্ত্রে ব্রতী হ'তে হবে আর সে-উদ্যমে গণতন্ত্রের দ্বারা কোন কাজ হবে না। জনৈক শ্রমিক নেতা রসোনি এক জাতীয়-শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ করলেন—শ্রমিক-স্বার্থের সঙ্গে অন্যদের স্বার্থের অভিন্নতা প্রচার করে' তিনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন যে বঞ্চিত শ্রেণীর থেকে বেশী সত্য হ'ল বঞ্চিত জাতি, আর ইটালির স্থান তাদেরই মধ্যে। সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রসার ইটালীয়দের মনে যে-ঝঙ্কার তুল্‌ছিল, মুসোলীনির অগ্রগামীরা অবশ্য এইভাবে তার প্রকাশেরই চেষ্টা করেছিলেন।

মুসোলীনি তখন চরমপন্থী সোশ্যালিষ্ট্। তারপরে তাঁর অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে কিন্তু নির্ভীক সক্রিয় স্বভাবে আগেকার সঙ্গে এখনকার মুসোলীনির

সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ইটালি অবশ্য নিরপেক্ষ ছিল কিন্তু তখনই মুসোলীনির মনে হয় যে অগ্নিস্নানের মধ্য দিয়েই দেশের পুনর্জ্জীবন লাভ এবং সমাজের পুনর্গঠন সম্ভবপর হবে। অনেকখানি তাঁরই আন্দোলনে জনমত শাসকদের যুদ্ধে পাঠাল। কিন্তু সমরকালীন অভিজ্ঞতা তাঁকে আরও উত্তেজিত করে। তিনি দেখলেন কর্ত্তৃপক্ষের রণচালনায় ও শাসনকার্য্যে অকর্ম্মণ্যতা আর দেশের মধ্যে খণ্ড স্বার্থের সন্ধান ইটালিকে দুর্ব্বল করে'ই রাখল। প্যারিস্ শান্তিসভায় ইটালি তার ন্যায্য পাওনা পেল না বলে' দেশে এবার তুমুল হুলুস্থুল পড়ে গেল। প্রেসিডেন্ট্ উইলসন্ কিছুতেই ফিউম্ নগরী ইটালির রাজ্যভুক্ত করতে দেননি। যুদ্ধান্তের নির্দ্দেশ অমান্য করার পথ প্রথম দেখালেন ইটালির কবি দানুন্‌ৎসিও—একদল স্বেচ্ছা-সৈনিক নিয়ে তিনি ফিউম্ দখল করে' বস্‌লেন। সমরশেষের উত্তেজনার সময় মুসোলীনি তাঁর প্রথম ক্ষুদ্র দল গড়লেন—এই সময় ও এরও আগে ১৯১৫-তে মুসোলীনির অনুচরদের ফাশিষ্ট্ নাম ব্যবহার আরম্ভ হয়। তাঁর সঙ্গে সোশ্যালিষ্ট্‌দের পার্থক্য এর আগেই তাঁকে সে-দলছাড়া করেছিল।

১৯১৯-এ কিন্তু ইটালিয়ান্ সোশ্যালিষ্ট্‌দেরই ছিল প্রবল প্রতিপত্তি—তাদের দ্রুত দলবৃদ্ধি হচ্ছিল এবং রুষবিপ্লবও তখন শ্রমিক মহলে নূতন আশার সঞ্চার করে। নির্ব্বাচনেও তাদের প্রভূত সাফল্য হয়েছিল (১৯১৯)। এমন কি এক সময় (১৯২০) ফাক্টরি ও বড় জমিদারীগুলি প্রায় শ্রমিক সঙ্ঘগুলির আয়ত্তে এসে পড়ে। কিন্তু জার্মানির মতন এখানেও সোশ্যালিষ্টেরা আস্ফালন করলেও বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল না—রাষ্ট্রশক্তি তাদের মুষ্টির মধ্যে এসেও তাই হস্তচ্যুত হ'ল। সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি আর সাহসের অভাবে তারা ইতস্ততঃ করে' সুযোগ হারাল। তার পর ১৯২১ থেকে পরস্পরের নিন্দায় রত নানা দলে তারা বিভক্ত হ'য়ে পড়ে। সুযোগ থাকলেই যে রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পন্ন হয় না, যুদ্ধের অব্যবহিত পরে জার্মানি ও ইটালির অভিজ্ঞতা তার পরিচয় দেয়।

এই সুযোগ শেষ হবার পর এল প্রতিপক্ষীয় ফাশিষ্ট্‌দের অভিযান। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নানা নেতার কর্ত্তৃত্বে ফাশিষ্ট্‌দলগুলি নিকটবর্ত্তী সোশ্যালিষ্ট্‌দের সবলে দমন করতে আরম্ভ করল। ১৯২০র আতঙ্কের প্রতিশোধ আর ভবিষ্যতে কণ্টকোদ্ধারের জন্যও, ফাশিষ্টেরা নিজেদের ইচ্ছামত সমাজতন্ত্রীদের শিক্ষা দিতে লাগ্‌ল। একদল কর্ত্তৃক অন্যদলের এই নিপীড়নে ইটালির দুর্ব্বল শাসকেরা কোন বাধা দিলেন না, পক্ষান্তরে ধনিকদের অবশ্য সম্পূর্ণ সহানুভূতি পায় এই ফাশিষ্ট্‌মণ্ডলীগুলি। স্থানীয় নেতা থাক্‌লেও সারাদেশে ফাশিষ্ট্ কর্ত্তা হিসাবে

মুসোলীনি অভিনন্দিত হলেন। ধনতন্ত্রী ষ্টেট্ যেখানে দুর্ব্বল সেখানে দল গঠন করে' প্রহারের সাহায্যে শ্রমিকদের শান্ত করার উপায় মুসোলীনি ও তাঁর পার্শ্বচরেরা উদ্ভাবন করেন। মুখে ফাশিষ্টেরা যাই বলুক, কার্য্যতঃ এতে ধনিকদেরই প্রভুত্ব সুরক্ষিত হ'ল।

এর পরও কিছুদিন দেশে অরাজকতা চল্‌ল। অন্য রাষ্ট্রিক দলগুলি এবং পলিটিক্স্ ব্যবসায়ী শাসকেরা পদে পদে অকর্ম্মণ্যতা দেখাতে লাগ্‌লেন। অন্যদিকে ১৯২১ থেকে মুসোলীনি ফাশিষ্ট্‌দের একটা সুসম্বদ্ধ দলে পরিণত করেছিলেন। ১৯২২এর অক্টোবরে চারিদিক থেকে ফাশিষ্ট্ দলবল রাজধানী রোমে সমবেত হ'ল—ইটালীর রাজা তখন শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কায় মুসোলীনিকেই প্রধান মন্ত্রীর পদাভিষিক্ত করলেন। এই ভাবে ফাশিষ্ট্ দলের হাতে রাজ্যভার আসে। অবশ্য এর আগে থাকতেই সোশ্যালিষ্ট্ দমনের ফলে ফাশিষ্ট্‌মণ্ডলীগুলিই বহু অঞ্চলে সর্ব্বেসর্ব্বা হ'য়ে উঠেছিল। ১৯২২ থেকে ইটালির নবযুগ আরম্ভ।

প্রথম কিছুকাল রাষ্ট্র-শাসনে ফাশিষ্ট্‌দের সঙ্গে অন্য কয়েকটি দলও সহযোগিতা করেছিল, তাদের ফাশিষ্ট্-মিত্র আখ্যা দেওয়া হয়। মুসোলীনির কর্তৃত্ব তাই প্রথমদিকে বল্‌শেভিক্‌দের আধিপত্যের মতন সম্পূর্ণ ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইটালিতেও প্রকৃত একনায়কত্ব আসে। ক্যাথলিক্ রাষ্ট্রনেতা ডন্ ষ্টুর্‌জো ১৯২৩ সালে সম্ভবতঃ পোপের নির্দ্দেশে সরে' দাঁড়ালেন। ১৯২৪এ সোশ্যালিষ্ট্ নেতা মাটিয়টি নিহত হ'ন; এই হত্যাকাণ্ডে ফাশিষ্ট্ নেতাদের কেউ কেউ লিপ্ত থাকায় প্রথমে মুসোলীনির প্রতিপত্তির কিছু ক্ষতি হয় কিন্তু পরবৎসর থেকে ফাশিষ্টেরা খোলাখুলি ভাবে নিজেদের বিপ্লবী বলে' পরিচয় দিতে আরম্ভ করল—নূতন ইটালি গড়বার রবও তখন থেকে আরম্ভ হয়। আরও কিছুকাল পরে নূতন শাসন পদ্ধতির উদ্ভব হয় এবং কর্‌পোরেটিভ্ রাষ্ট্রের আদর্শে ইটালির পুনর্গঠন সেই থেকে ফাশিস্‌মোর লক্ষ্য বলে' গণ্য হ'য়ে আস্‌ছে।

ফাশিজ্‌ম্ প্রথম থেকেই একটা বিশিষ্ট কর্ম্ম-পদ্ধতির রূপ নেয় কিন্তু তার পিছনে সাম্যবাদের মত কোন নির্দ্দিষ্ট মতবাদ ছিল না। মুসোলীনি নিজেই থিওরির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে' বলেছিলেন যে তাঁর আন্দোলন কর্ম্ম-প্রধান ও সজীব; তার মধ্যে বাঁধা মতবাদের সন্ধান বৃথা। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল যে মুসোলীনির কর্ম্মপদ্ধতি অন্যত্রও সঞ্চারিত হ'ল আর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর ঝোঁক দেওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের ফাশিষ্ট্‌দের মধ্যে একটা আন্তরিক মিলও আছে। আজকের দিনে তাই একটা সাধারণ ফাশিষ্ট্ দৃষ্টিভঙ্গীর অস্তিত্ব সর্ব্বসম্মত। ফাশিষ্ট্ রাষ্ট্রগুলির

পারস্পরিক সমর্থনও ক্রমশঃ একটা মতবাদের বিজ্ঞাপন হ'য়ে পড়ছে। নাৎসি বিপ্লবের পর অবশ্য মুসোলীনি তাঁর তথাকথিত নেপোলিয়ান্‌সদৃশ ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও পিছিয়ে পড়ছেন। হিট্‌লারি আন্দোলনই এখন বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করবার বৈধ কারণ আছে—ইটালির থেকে জার্মানির স্বাভাবিক শক্তিসামর্থ্য অনেক বেশী। তবুও ফাশিষ্ট্‌ মতবাদে মুসোলীনি পথপ্রদর্শকের আসন দাবী করতে পারেন।

ফাশিস্‌মোর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য—সোশ্যালিজ্‌মের বিরুদ্ধাচরণ। এই-খানেই সকলজাতীয় ফাশিষ্ট্‌দলের ঐক্য। ইটালি ও পরে জার্মানিতে উদীয়মান ফাশিষ্ট্‌দের শ্রমিক দমন ও ধনিকদের কাছে থেকে অর্থ-সাহায্য আকস্মিক নয়। শুধু মার্ক্সীয় ডায়ালেক্‌টিক্‌ নয়, মার্ক্সের প্রধান বিশ্বাস সবগুলিই ফাশিষ্টেরা সগর্ব্বে ত্যাগ করেছে। শ্রেণীপ্রত্যয়ের প্রভাব, শ্রেণীসংঘর্ষে বিশ্বাস, শ্রেণীবিহীন সমাজের আদর্শ, ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা, আর্থিক-শোষণের ধারণা, ষ্টেটের প্রকৃতি সম্বন্ধে মত—এক কথায় মার্ক্স্‌বাদের সকল অঙ্গই ফাশিষ্ট্‌দের কাছে ভ্রান্তি ও প্রমাদ মাত্র। নিরীহ সোশ্যাল্‌ ডেমক্রাট্‌দের সম্বন্ধেও ফাশিষ্ট্‌দের কোন আস্থা নেই, কারণ সমাজতন্ত্রের সকল শাখার মূলগত ঐক্য অর্থাৎ সাধারণ স্বত্বের ভিত্তির উপর ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের আদর্শ ফাশিষ্ট্‌দের পরিত্যজ্য—ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ফাশিজ্‌ম্‌ কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ স্বীকার করে' নিয়েছে। এপর্য্যন্ত সুতরাং ধনতন্ত্রের পুরাতন সমর্থকদের থেকে ফাশিষ্টেরা বিভিন্ন নয় এবং তাদের নূতন সমাজ গঠনের কথা বলার সার্থকতা নেই। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মাঝামাঝি কোন অবস্থা কল্পনা করাও সহজ নয়। কিন্তু ফাশিজ্‌মের মধ্যেও নূতনত্ব আছে। সেই নূতন ভাব উদারনীতি ও গণতন্ত্রের বর্জ্জনে দেখা যায়। ধনতন্ত্রের জয়যাত্রার সময় উদার গণতন্ত্রের দিগ্বিজয় হয়েছিল—ধনিক-প্রভুত্ব প্রচারের সঙ্গেই ডেমক্রাটিক্‌ আদর্শ সর্ব্বত্র স্থাপিত হয়—তাই জন্য ধনতন্ত্রের সংকোচন ও সাম্রাজ্যবাদের চাপে আসন্ন বিপদের দিনে ডিমক্রাসির বাধা প্রাপ্তি আশ্চর্য্য নয়। ফাশিষ্ট্‌ থিওরিতে প্রথমতঃ মার্ক্সের শ্রেণী সম্বন্ধে ধারণাকে ধ্বংস করবার জন্য জাতীয় ঐক্যের আরাধনা করা হয়; শ্রমিকদের সাম্যবাদ থেকে রক্ষা করবার জন্য রেস্‌ বা নেশনের মাহাত্ম্যের উপর জোর পড়ে; দেশমধ্যে আর্থিক চাপ এড়াবার নিমিত্ত সাম্রাজ্য গঠন, রাজ্য বিস্তার ও যুদ্ধের গুণ গান ওঠে। দ্বিতীয়তঃ ফাশিষ্ট্‌দের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে গণতন্ত্রের ফলেই বিপ্লবের আশঙ্কা সর্ব্বত্র মাথা তুল্‌তে পেরেছে। অতএব ডিমক্রাসি বর্জ্জনীয়—রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব রাখা ভুল, ব্যক্তিস্বাধীনতারও সীমা থাকা উচিত। তাই তখন শোনা যায় সমগ্রগ্রাসী ষ্টেটের বন্দনা, রাষ্ট্রের নৈতিক

রূপ কল্পনা আর কর্ণধার নেতার প্রয়োজন ব্যাখ্যা। ফ্যাশিস্‌মোর এই প্রকৃত স্বরূপ হ'লে বোঝা সহজ কিসের জন্য ইটালি ও জার্মানির মত যেখানে ধনতন্ত্র বিপন্ন হ'য়ে পড়ে সেখানেই ফাশিষ্ট্‌দের অভ্যুদয় হয়েছিল।

*

মুসোলীনির শাসনে হয়ত ইটালির খানিকটা ভাগ্য ফিরেছে। প্রথমেই দেশের মধ্যে শান্তি ফিরে আসে, ফাশিষ্ট্‌ আমলে ইটালির বাহ্যিক উন্নতি বিদেশী পর্য্যটক-মাত্রই লক্ষ্য করেছেন। শাসনযন্ত্র আগের চাইতে কর্ম্মকুশল হয়েছে আর দেশমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে একটা আত্মনির্ভরতার ভাব। ফাশিষ্ট্‌দের প্রবল উৎসাহ অনেক দুঃসাধ্যসাধনে ব্রতী হয়েছে; অনেকেরই তাই মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে পরিণাম যা-ই হোক না কেন, ইটালির এই সাময়িক লাভ-ই যথেষ্ট। আর্থিক উদ্যমের অভাব আর আগের মতন ইটালিতে দেখা যায় না—কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর প্রয়োগ, নদীস্রোতের থেকে বৈদ্যুতিক শক্তিসঞ্চারের বিস্তার এর উদাহরণ। শ্রমিকদের অধিকার বিধিবদ্ধ করে' এক লিপি-পত্রিকা প্রস্তুত হয়েছে। ধর্ম্মঘট নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শ্রমিক-ধনিকের দ্বন্দ্বনিষ্পত্তির জন্য বিচারালয় স্থাপন এই পত্রিকার অন্যতম ব্যবস্থা। কর্ম্মক্লান্ত শ্রমজীবিদের আনন্দ ও শিক্ষার আয়োজন হ'ল। বিভিন্ন ব্যবসায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করে' দেশের আর্থিক জীবনকে সমর্থ ও সুগঠিত রূপ দেবার সংকল্প হয়েছে আর ইটালির নূতন শাসন-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা থাকবে না কি এই আর্থিক সংগঠনের উপর। মুসোলীনি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য দেশনায়ক কিন্তু জাতির পরিচালনার জন্য নেতৃস্থানীয় সুসম্বদ্ধ দলের প্রয়োজন-- সে-অভাব ফাশিষ্ট্‌দল পূরণ করছে। নানা দেশে এইরূপ সর্ব্বব্যাপী দলের উদ্ভব যুদ্ধান্তের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে। ফাশিষ্টেরা ষ্টেট্‌-উপাসক, অবশ্য শুধু যতক্ষণ সে-ষ্টেট্‌ নিজেদের আয়ত্তে থাকে। কিন্তু ইটালিতে প্রচলিত ক্যাথলিক্‌ ধর্ম্মের সঙ্গে ফাশিষ্টেরা মোটের উপর সদ্ভাব রেখে চলেছে। পোপের সঙ্গে ফাশিষ্ট্‌ ইটালির ১৯২৯ সালের বন্দোবস্ত উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মগুরু পোপের রাজ্য কেড়ে নেওয়ার অপরাধে ষাট বছর ধরে' ইটালি গোঁড়া ক্যাথলিক্‌দের বিরাগভাজন হয়েছিল; এখন পোপের নিবাস ভ্যাটিকান্‌ অঞ্চল তাঁরই রাজ্য স্বীকার করে' নিয়ে মুসোলীনি একটা অশান্তি দূর করে' দিলেন।

ইটালিতে ফাশিজ্‌ম্‌ এইভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হ'তে থাকলে তার একটা বিশিষ্ট মতবাদও দেখা দিল। ফাশিজ্‌মের প্রকৃত স্বরূপ অবশ্য সোশ্যালিজ্‌মের বিরুদ্ধাচরণ এবং যেখানে ধনতন্ত্র দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে সেখানে গণতান্ত্রিক উদারনীতি পরিত্যাগ

করে' সবলে ধনিককর্ত্তৃত্বের, সংরক্ষণ। কিন্তু চিন্তার রাজ্যে এই আন্দোলনকে স্বভাবতঃই একটা আকর্ষক রূপ দেবার চেষ্টা হয়। তাই প্রচার হ'তে লাগ্‌ল যে ফরাসী-বিপ্লবের পর থেকে জগৎ ভুল পথে চলেছে—কারণ তখন যে-উদার গণতন্ত্রের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে তারই বিষময় ফল না কি সমাজতন্ত্রের হিংসাদ্বেষ। গণতন্ত্র ও সোশ্যালিজ্‌ম্ উভয়েই না কি আসলে ব্যক্তিত্ববোধের প্রকাশ মাত্র, কিন্তু মানুষের প্রকৃত আদর্শ হওয়া উচিত সমষ্টির স্বার্থ। সমগ্রগ্রাসী রাষ্ট্রের কল্পনা এর থেকেই আসে অবশ্য। শ্রেণীবিভাগ থাকবেই কিন্তু ফাশিষ্ট্ মতবাদে শ্রেণীদের উচিত, জাতির মিলিত স্বার্থে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন। আর্থিক ব্যবস্থায় উৎপাদন-সামগ্রীতে ব্যক্তি-বিশেষের অধিকার থাকবে, কিন্তু ধনতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ করে' রাখতে হবে নিম্নতন স্তরের মঙ্গলের জন্য। রাষ্ট্রিক ব্যাপারে জনগণের কর্ত্তৃত্ব অথবা সমানাধিকার অর্থহীন, প্রয়োজন হচ্ছে শ্রেষ্ঠলোকদের শাসন মেনে নেওয়া ; দেশে নেতা হচ্ছেন সেই সত্যিকারের আভিজাত্যের প্রতীক। এই আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের একটা নৈতিক সত্ত্বা আছে আর তার অনুজ্ঞাপালন চরিত্রগঠনেরই সহায়ক। জাতিগৌরব শ্লাঘার কথা, জাতিভক্তিই প্রকৃত ধর্ম্ম। প্রসার জীবনীশক্তির লক্ষণ, জাতিবাদের পরিণতি সাম্রাজ্যে। এর জন্য যুদ্ধ অগৌরবের কথা নয়, সঙ্ঘর্ষই প্রকৃতির বিধান।

আপাতমধুর শোনালেও কিন্তু ফাশিজ্‌মের প্রকোপে অধিকাংশের পক্ষে নির্য্যাতন আসাই অনিবার্য্য। এর ফলে দেশের মধ্যে রাষ্ট্রব্যাপারে জনসাধারণ শুধু অর্দ্ধদাস হয়ে থাকবে তা নয়, অধিক সংখ্যকের আর্থিক ক্লেশ শুধু মন্ত্রবলে অন্তর্দ্ধান হ'তে পারে না। ফাশিষ্টদের মুখে জাতির স্বার্থ শুধু তাদের মিত্রদের স্বার্থে পরিণত হয়। ধনতন্ত্রকে শৃঙ্খলিত রাখা শুধু মুখের কথা, ইটালি বা জার্মানিতে ফাশিষ্ট্ আমলে তার স্বাভাবিক গতি বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়েছে কিনা সন্দেহ, বরং শ্রমিক-সমিতিরূপ কণ্টকোদ্ধারে ধনিকদেরই লাভ হয়েছে। সোভিয়েট্ রাশিয়ায় হয়ত অত্যাচার কিছু কম হয়নি, কিন্তু তার পিছনে ভবিষ্যতের একটা বিপুল আশা আছে ফাশিষ্টেরা যার অনুসরণ ত্যাগ করেছে বলা যায়। ইতিহাসের একটা স্বাভাবিক গতি থাকলে কালে ধনতন্ত্রের বিরাট পরিবর্ত্তন হওয়া বিচিত্র না। সর্ব্বপ্রকার সমাজতন্ত্রের মুখ সেদিকে, কিন্তু ফাশিজ্‌ম্এর আর্থিক আদর্শ কিছু থাকলে তা' লুপ্ত অতীতের অনুসন্ধান মাত্র আর বস্তুতঃ তার আচরণ প্রচলিত ব্যবস্থার রক্ষণ-চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। দেশের বাইরে ফাশিজ্‌ম্ আরও অমঙ্গলের উৎস। ইটালি, জার্মানি, জাপান—ফাশিষ্ট্ ভাবাপন্ন এই তিন মহাশক্তিই গত কয়েক বছর বারবার শান্তিভঙ্গের উপক্রম

করেছে। আর্থিক তাড়না এর জন্যে দায়ী হ'লেও মনে রাখা উচিত যে নূতন সমাজ গঠনের মধ্যে দুরবস্থার সমাধান হয় কিনা সে-চেষ্টা এ-দেশবাসীরা করে' দেখেনি। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা সমৃদ্ধ আর এরা বঞ্চিত, এই কথা সর্ব্বত্র শোনা যায়। প্রথমতঃ, এ নিতান্ত আপেক্ষিক বিচার মাত্র, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ণ সমতা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, বাহুবলে এ-অসাম্য দূর করতে গেলে, এই ভাষাতেই বল্‌তে হবে যে এক অন্যায়ের স্থান নিচ্ছে অন্য অন্যায়। তাছাড়া বঞ্চিত কারা? জার্মান্ বা জাপানী ধনিকপ্রবরদের দাবী মেটাতে গেলে কথা ওঠে যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা অনুন্নত জাতিদের কি কোন অধিকার নেই? এদের উপর কর্তৃত্ব নিয়েই ত' বিবাদের সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব যুগের অবাধ-ধনতন্ত্র যেমন এককর্তৃত্বাভিলাষী সাম্রাজ্য-তন্ত্রে পরিণত হয়েছিল, ফাশিজ্‌ম্‌ও তেমনি সাম্রাজ্য-তন্ত্রের অধুনাতম প্রকাশমাত্র, মূল প্রকৃতিতে উভয়ের বিশেষ পার্থক্য নেই।

রাষ্ট্রের মর্য্যাদা ও আর্থিক ক্ষমতা এই উভয়েরই বিকাশ মুসোলীনির বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য; আর এপথে সাফল্যের প্রয়োজন ফাশিষ্ট্ রাষ্ট্রের পক্ষেই সমধিক। মুসোলীনি ফিউম্ এবং ডোডোকানিস্ দ্বীপমালা ইটালির মুষ্টিচ্যুত হ'তে দিলেন না। কর্ফু দ্বীপের ব্যাপারে, রাষ্ট্রসঙ্ঘকে উপেক্ষার পথ তিনিই প্রথম দেখান। টিরানা চুক্তিতে (১৯২৬) আল্‌বানিয়া ইটালির আশ্রিত রাজ্য হ'য়ে পড়্‌ল। আরব উপকূলে ইমেন্ অঞ্চলে ইটালির প্রভাব মাথা তুলতে লাগল। ফ্রান্সের সঙ্গে জলপথে সমবল হবার অধিকার ১৯২২এর চুক্তিতে আসে। ইটালির শক্তিবৃদ্ধির ফলে ব্রিটেন্ বা ফ্রান্স্ তাকে আর উপেক্ষা করতে সাহস পায়না। ১৯৩৪এ অষ্ট্রিয়া পর্য্যন্ত অনেকখানি ইটালির ছায়ায় এসে পড়েছিল। কিন্তু এসব কিছুতেই ইটালির যথেষ্ট লাভ হয় নি। সম্প্রতি তাই আবিসিনিয়া ও স্পেন্‌কে ইটালির প্রকোপ সইতে হয়েছে।

ইটালির প্রসার-চেষ্টা কয়েকটি বিশেষ দিকে হওয়াই স্বাভাবিক। মধ্য ইউরোপে তার প্রভাব জার্মানিকে ছাড়িয়ে যাওয়া দুষ্কর, কিন্তু ফ্রান্স্ ও ইংল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও আফ্রিকায় সাম্রাজ্য গঠনে ইটালির কিছু সুবিধা আছে। আফ্রিকা অঞ্চলে প্রাচীন রোমসাম্রাজ্যের গৌরব ফিরিয়ে আনার আদর্শও ইটালিতে জনপ্রিয় হ'তে বাধ্য। উনিশ শতকের শেষ থেকে আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে এরিট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ড্ নামে দু'টি প্রদেশ ইটালির উপনিবেশরূপে গণ্য হয়েছে আর উত্তর উপকূলে লিবিয়া ১৯১১ সালে বিজিত হয়। প্রথমোক্ত দেশ দুটির মাঝখানে আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া রাজ্য আফ্রিকার শেষ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে খ্যাত;

কারণ পশ্চিম উপকূলে লিবেরিয়া নামে স্বাধীন হ'লেও কার্য্যতঃ আমেরিকার ছায়াশ্রিত। ইথিওপিয়ায় ফিউডাল্ সামন্ত্র-তন্ত্র বিদ্যমান ছিল, দেশবাসীরাও বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মে বিভক্ত। নানা অঞ্চলের সর্দ্দারদের উপর অবশ্য আবিসিনিয়ার রাজারা রাজচক্রবর্ত্তীর অধিকার দাবী করতেন। গত শতাব্দীর শেষে সম্রাট মেনেলেক্ শক্তিশালী হ'য়ে ওঠেন এবং ১৮৯৬ সালে ইটালির আক্রমণ একেবারে বিধ্বস্ত হয়। দুর্গম পর্ব্বতমালা আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা বহুশতাব্দী রক্ষা করে' এসেছে, যদিও ১৮৬৮ সালে ইংরাজ সেনাপতি নেপিয়ারের অভিযান দেখিয়েছিল যে যন্ত্রযুগে অনুন্নত জাতিদের আত্মরক্ষা কত দুঃসাধ্য। বিংশ শতাব্দীতে বহুদিন মনে হ'ল যে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স্ ও ইটালির পৃথক স্বার্থ ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে—ইথিওপিয়ার বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে সভ্যপদ তারই নিদর্শন রূপে গণ্য হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের তাড়নায় কিন্তু ইটালিকে শেষ পর্য্যন্ত এ-অঞ্চলে বেশী সচেষ্ট হ'তে হ'ল—ফ্রান্স্ বা ইংল্যাণ্ডের মত তার বিস্তৃত সাম্রাজ্য কিংবা অন্যত্র প্রসারের সুবিধা ছিল না। বিনাযুদ্ধে প্রভাব বিস্তারে ইটালির বিশেষ আপত্তি না থাকলেও সম্রাট হাইলে সেলাসির তাতে উৎসাহ না থাকারই কথা। ব্রিটিশ্ স্বার্থ ও রাষ্ট্র-সঙ্ঘের অস্তিত্ব ইটালিকে আটকাতে পারবে, এই আশায় সম্রাট ইটালির প্রতিপত্তি বাড়াবার চেষ্টায় বাধা দিতে লাগলেন। এইজন্যই ইটালীয়রা তাঁর বিরুদ্ধে তাদের অধিকার খর্ব্ব-প্রচেষ্টার অভিযোগ আনে। ওয়াল্-ওয়ালের শান্তিভঙ্গের দোষ ইটালীয়দের কিন্তু সে ঘটনা উপলক্ষ্যমাত্র, সঙ্ঘর্ষের প্রকৃত কারণ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত তাড়নায় ইটালির প্রসার-কামনা। ১৯৩৫-এ আবিসিনিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। হাইলে সেলাসি অনেকখানি বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভর করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে হতাশ হ'তে হ'ল। দেশের মধ্যেও সকল অঞ্চলে তিনি সম্পূর্ণ সহায়তা পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। প্রাচীন সামন্ত্র-তন্ত্রের দুর্ব্বলতা আবার প্রকাশ পেল; অভিনব যুদ্ধ ব্যবস্থার কল্যাণে ইটালির সেনাপতি বাদোলিও রাজধানী আডিস্ আবেবা দখল করলেন (১৯৩৬)। ইথিওপিয়ার সম্রাট আজ পলাতক, যদিও শোনা যায় যে কয়েকটি অঞ্চলে আজ পর্য্যন্ত খণ্ডযুদ্ধের বিরাম হয়নি। আবিসিনিয়ার এত দ্রুত পরাজয় খানিকটা অপ্রত্যাশিত—বিষাক্ত গ্যাস্, বিমান-বহর ও মোটর যানে সৈন্য ও কামান চালানোর সাহায্যে এই বিস্তৃত ভূখণ্ড ইটালির রাজ্যভুক্ত হ'ল। ইটালির রাজা সম্রাট আখ্যাতে ভূষিত হয়েছেন, আফ্রিকার শৃঙ্গাকৃতি উত্তর-পূর্ব্ব কোণ এখন প্রায় ইটালির আয়ত্তে। এখান থেকে লোহিত সাগর ও ভারত-মহাসাগরে ইটালির প্রতাপ ছড়িয়ে পড়তে পারে। পর পারে আরব উপকূলে

ইটালীয়দের দৃষ্টি আছে এবং এ অঞ্চলে তাদের নৌবলের কেন্দ্র গড়ে' তোলার জল্পনার কথাও এখন শোনা যাচ্ছে।

বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক সভ্যকে আক্রমণ করে' অন্য সভ্যের যুদ্ধ চালনার পথ দেখায় জাপান (১৯৩১); ১৯৩৫-এ ইটালি তার অনুসরণ করল। মাঞ্চুরিয়ার বেলায় লীগ্‌কে নিষ্ক্রিয় করে' রাখেন ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষেরা ; তার মূলে আমেরিকা ও রাশিয়ার সুবিধাবিধানে যে-অনিচ্ছা ছিল সাম্রাজ্যবাদী নীতির স্বাভাবিক বৈশিষ্টাই তাই। আবিসিনিয়া সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের হঠাৎ পরিবর্তন দেখা গেল ; ইংরাজ নেতৃত্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইটালিকে দোষী সাব্যস্ত করে' কভেনান্টের ষোল ধারা অনুসারে আর্থিক চাপে আততায়ীকে নিরস্ত করতে চাইল। ইংল্যাণ্ডের এই আকস্মিক উৎসাহের কারণ সহজেই অনুমেয়। উত্তর আবিসিনিয়াস্থিত টানা হ্রদ থেকে জলপ্রবাহই নীলনদে সঞ্চালিত হ'য়ে ইজিপ্টের উর্ব্বরতা বাড়ায়—ইটালির কর্তৃত্বে সে-প্রবাহে কোন বাধা সৃষ্টি হ'লে দারুণ ক্ষতির সম্ভাবনা। কিন্তু স্বার্থপ্রণোদিত হ'লেও ইংরাজ-নেতৃত্বে ঠিক এই মুহূর্ত্তে জগতের মঙ্গলের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বাধা আবার এল সাম্রাজ্য-তন্ত্রের ব্যবস্থার মধ্যে। জাপান আগেই লীগ্ ত্যাগ করেছিল, জার্মানিও তখন সরে' দাঁড়িয়েছে ; ফাশিষ্ট্ ভাবাপন্ন উভয় দেশই তাছাড়া ইটালির জন্য সমবেদনা অনুভব করে। আমেরিকা সুদূর আবিসিনিয়ার ব্যাপারে উদাসীন রইল। ফ্রান্স্‌ও এই সময় ইংরাজদের পূর্ণ সমর্থন করে নি। ইংরাজ-ফরাসির অনৈক্য ইথিওপিয়ার পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। কিছুদিন থেকে ইংল্যাণ্ড্ হিট্‌লারকে বিধিমত প্রশ্রয় দিয়ে আসছিল ; এতে উদ্বিগ্ন হ'য়ে ফরাসীরা ইটালিকে হাতে রাখতে চায় ; তাই মুসোলীনির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত হয়েছিল (জানুয়ারী, ১৯৩৫) যার মধ্যে সম্ভবতঃ একটা গুপ্ত সর্ত্ত থাকে যে আবিসিনিয়ায় ইটালির কর্তৃত্ব-বিস্তারে ফ্রান্স্ আপত্তি করবে না। মুসোলীনি তারপর তাঁর অভিযানে প্রবৃত্ত হ'ন ; ইংরাজেরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্য দিয়ে তাঁকে আটকাতে উদ্যত হ'লে ফ্রান্স্ তখনও ইংরাজদের পূর্ণ সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ শুধু একটি প্রতিশ্রুতি চায়। কিন্তু হিট্‌লার্ যে-কোন দেশ আক্রমণ করা মাত্র তাঁকে আটকাবার জন্য ইংল্যাণ্ড্ তৎক্ষণাৎ ফ্রান্স্‌কে সাহায্য করবে, এই অঙ্গীকারে ইংরাজ মন্ত্রীরা রাজী হ'লেন না (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)। এর পর ফ্রান্সের পূর্ণ সহায়তা পাওয়া শক্ত হ'ল। তখন ইটালিকে নিরস্ত করার চেষ্টা শুধু ভয় প্রদর্শনেই পর্য্যবসিত হয়। আর্থিক চাপ সফল হতে হ'লে, সকল দেশ থেকে ইটালিতে পেট্রল্ চালান বন্ধ করার প্রয়োজন ছিল। ইটালির

স্বদেশজাত পেট্রলের অভাবে তখন যুদ্ধ অসম্ভব হ'য়ে উঠত কিন্তু তার আগে ইটালি নিশ্চয়ই একবার অন্যদের আক্রমণ করে' জিতবার শেষ চেষ্টা দেখত। সে-অবস্থায় তাকে সবলে বাধা দেবার দায়িত্ব ইংল্যাণ্ড্ একা নিতে চায় নি, আর মহাশক্তি ছাড়া অন্যদের সে-সামর্থ্যও ছিল না। পেট্রল্-চালান তাই বন্ধ হ'ল না, এবং তাই কিছুদিনের মধ্যেই ইটালির বিজয়ে আর বাধা থাকে নি (১৯৩৬)।

আবিসিনিয়ার স্বাতন্ত্র্যলোপের সাথে সাথে স্পেনের দুর্দ্দিন ঘনিয়ে এল। স্পেনের রাষ্ট্র ও সমাজে ফিউডাল্ প্রভাব প্রায় আজ পর্য্যন্ত চলে এসেছে—অভিজাত ভূস্বামীদের বিস্তীর্ণ অধিকার, ক্যাথলিক্ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের বিশাল প্রতিপত্তি, প্রাচীন-পন্থী সৈন্যদলের প্রচণ্ড প্রতাপ এর নিদর্শন। ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ের গোড়ার দিকে স্পেন্ পিছিয়ে পড়ে, ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলে যেমন মধ্য-শ্রেণীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়, এখানে তার অভাব হ'ল। তার আনুষঙ্গিক উদারনীতি তাই স্পেনে বহুদিন মাথা তুলতে পারে নি কিন্তু যন্ত্র-শিল্পের দ্রুতবিস্তারের পর, পূর্ব্ব থেকে প্রস্তুত না থাকলেও সব দেশকে বর্ত্তমান ধনিকতন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। স্পেনে তাই একদিকে ফিউডাল্ প্রভাব এখন পর্য্যন্ত বিরাজ করলেও অন্যদিকে শক্তিশালী শ্রমিক সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয়েছিল। শেষ বুর্বন্ রাজ আল্ফন্সোর অক্ষমতার জন্য ১৯২৩এ সেনাধ্যক্ষ প্রিমো দে রিভেরা স্পেনের প্রকৃত শাসক হ'য়ে পড়েন কিন্তু পুঞ্জীভূত অসন্তোষের ফলে ডিকটেটরের পতন হ'ল (১৯৩০)। ১৯৩১এর এপ্রিলে সহসা আল্ফন্সোকে বিতাড়িত করে' জনগণের আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে স্পেনে রেপাব্লিক্ স্থাপিত হয়েছিল। এর পর শাসনকার্য্য আসলে মধ্যপন্থীয় দলগুলির হাতে থাকলেও দক্ষিণমার্গীয়দের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে স্পেন বলশেভিজ্‌মের রসাতলে ডুবতে চলেছে ; ১৯৩১এর বিপ্লব ঠেকাতে না পারলেও তারা তখন প্রাচীন সমাজ সংরক্ষণে কৃতসংকল্প হয়। নূতন আমলে স্পেনে এতদিনকার নিরুদ্ধ সংস্কারকামনা প্রবল হয়ে ওঠাতে দক্ষিণ পন্থায় বিশ্বাস প্রতি-বিপ্লবের চেষ্টার আকার নিল। ১৯৩৬এ বিদ্রোহ আরম্ভ হয় সৈন্যসমষ্টির মধ্য থেকে—সেনাপতি ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে উচ্চতন প্রায় সকল সেনানী বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। দেশে ফ্রাঙ্কোর প্রধান সহায় ছিল জমিদারবর্গ এবং ক্যাথলিক্ পুরোহিত সম্প্রদায় এবং এই জন্যই এই দুই শ্রেণীর লোকেরা বিপন্ন গণতন্ত্রের সমর্থকদের হাতে বিস্তর নির্য্যাতন ভোগ করে। ক্যাথলিক্ ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সকল সংস্কারের ঘোর প্রতিবন্ধক ; সুতরাং বিপ্লবের পর সে-মত প্রচারের স্বাধীনতায় কিছু হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল। মধ্যমার্গীয় শাসকেরা পর্য্যন্ত জেসুইট্ সঙ্ঘকে ভেঙ্গে দেবার আদেশ

'দেন এবং ক্যাথলিক্ সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়গুলিকে' অবৈধ ঘোষণা করা হয়। জমিদারদের ত্রাসের কারণ জমি পুনর্বণ্টনের প্রস্তাব। গিল রব্‌লেসের নেতৃত্বে ক্যাথলিক্ আকসিয়ন্ পপুলার্ দল প্রথমে সাধারণতন্ত্রকে নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত করে' তোলে। ফ্রাঙ্কো-বিদ্রোহের আগে রেপাব্লিকের পাঁচ বৎসর জীবনের প্রথমার্দ্ধ এই ভাবে কাটে—এ হ'ল সেনর আজানার যুগ, তখন মধ্যপন্থীয় শাসকেরাও বামমার্গীয় সোশ্যালিষ্ট্‌দের উপর খানিকটা নির্ভর করে' চলেছিল। দ্বিতীয়ার্দ্ধে রেপাব্লিক্ টিকে থাকলেও দক্ষিণপন্থীয়দের কর্টেস্ বা জাতীয় মহাপরিষদে প্রাবল্য থাকায়, মন্ত্রীরা অনেকখানি এদের দ্বারা চালিত হ'ল—এই সময়টা সেনর লেরুর যুগ। তখনকার নির্য্যাতনের ফলে আষ্টুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রমিক-বিদ্রোহ হয় এবং শ্রমিকদের তখন সবলে দমন করাও হয়েছিল। ১৯৩৬-এর প্রথমে সাধারণ নির্ব্বাচনে উন্নতিকামী সকল দলগুলি এক জোট হয়, তার ফলে ভোট সংখ্যায় দক্ষিণমার্গীয়দের হ'ল সমূহ পরাজয়। সংখ্যাগণনায় পরাস্ত হবার কিছুদিন পর ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ আরম্ভ হ'ল। নামে বলশেভিজ্‌ম্‌এর বিরুদ্ধে অভিযান হ'লেও, নির্ব্বাচনফলকে অগ্রাহ্য করার নিমিত্ত ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ বস্তুতঃপক্ষে গণতন্ত্র ও উদারনীতিকে অস্বীকারের সামিল। জন-সাধারণের সম্মেলন আদর্শে, তাই সোশ্যালিষ্টেরা রেপাব্লিক্‌কে রক্ষা করতে উদ্যত হ'ল। স্পেনের অন্তর্বিরোধের স্বরূপ এই।

এ-অবস্থায় বিদেশ থেকে অন্তর্যুদ্ধে হস্তক্ষেপ নিতান্ত অসঙ্গত। কিন্তু প্রথম থেকেই ফ্রাঙ্কো ইটালির সাহায্য পেলেন, এমন কি বিদ্রোহের পূর্ব্বেও এ-সাহায্যের বন্দোবস্ত হ'য়ে থাকা বিচিত্র নয়। স্পেন্ ইটালি বা জার্মানির তুলনায় অনুন্নত, স্পেনে ফাসিষ্ট্ দলও তাই জনসাধারণের চাইতে জমিদার, পুরোহিত ও সেনানীদের উপর বেশী নির্ভর করে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য সোশ্যালিজ্‌মের বিরুদ্ধাচরণ, সর্ব্বত্রই এক। রাশিয়ার সঙ্গে স্পেনের অবস্থার সাদৃশ্য লেনিনের চোখে পড়েছিল। স্পেনে বামপন্থার প্রসাররোধই তাই ফ্রাঙ্কোর লক্ষ্য হ'ল। ইটালি বা জার্মানির সে-উদ্যমে পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তা ছাড়া স্পেনের মত দুর্ব্বল দেশে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সুযোগও আসে। ভূমধ্যসাগরকে ইটালীয়রা বলে আমাদের সমুদ্র; এখানে কর্ত্তৃত্বে নূতন রোমান্ সাম্রাজ্যের সঙ্গে ইটালির যোগ নিরাপদ হবে, আর সেই সঙ্গে বিপন্ন করে' তোলা যাবে ইংল্যাণ্ডের থেকে প্রাচ্যে যাতায়াত ও ফ্রান্সের সঙ্গে তার আফ্রিকাস্থিত সাম্রাজ্যের যোগাযোগ। ব্যালেরিক্ দ্বীপমালার উপর তাই ইটালির চোখ আছে। স্পেনে ফাশিষ্ট্ রাজ্য স্থাপিত হ'লে সে-দেশ বাধ্য হ'য়ে ইটালির অনুগত হ'য়ে পড়বে। ইটালির অভিযানের মূল এই সব জল্পনায়। জার্মানিরও স্পেনে কিছু স্বার্থ আছে।

উত্তর স্পেনের খনিজপদার্থ অতি মূল্যবান ; মরক্কো অঞ্চলে জার্মানির পূর্ব্বপ্রভাবের পুনরুদ্ধার বাঞ্ছনীয় ; কেনারি দ্বীপমালায় জার্মান্ সাবমেরিন্ বা বিমান স্থাপনের ব্যবস্থা যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ্ বাণিজ্যকে বিপদসঙ্কুল করে' ফেল্‌বে ; গোলযোগের সৃষ্টি হ'লে ইংল্যাণ্ড্ শান্তিরক্ষার খাতিরে কিছু উপনিবেশ ফিরিয়ে দিতেও পারে। স্পেনে তাই বিদ্রোহীদের সাফল্য প্রধানতঃ ইটালী ও জার্মানির সহায়তায় হয়েছে। বিদেশ থেকে এই সাহায্যগ্রহণে নিঃসন্দেহে ফ্রাঙ্কোর দলই ছিল অগ্রণী। অন্য দিকে শ্রমিক-প্রগতির খাতিরে রাশিয়া এবং অন্ততঃ নিজের দক্ষিণ সীমান্তেও ফাশিষ্ট্ বিপদ এড়াবার বাসনায় ফ্রান্স্ পরে স্পেনে রেপাব্লিককে কিছু সাহায্য করেছে। সারা জগতের দক্ষিণ ও বাম পন্থার বিরোধ তাই স্পেনের অন্তর্বিরোধে মূর্ত্তি নিল আর উভয় পক্ষকে সাহায্যের ছলে ফাশিষ্ট্ ও ফাশিষ্ট্‌বিরোধী শক্তিরা খানিকটা পরস্পরের সম্মুখীন হয়। এখানেও ইংল্যাণ্ডের পরিপূর্ণ সহায়তা থাকলে ফ্রান্স্ ও রাশিয়া স্পেনের রেপাব্লিককে সহজে বাঁচাতে পারত ; এমন কি যদি বিদেশ থেকে কোন পক্ষকেই সাহায্য নিতে না দেওয়া হ'ত তা হ'লেও ফ্রাঙ্কোর পরাজয় নিঃসন্দেহ ছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বৈদেশিক নীতির সুবিদিত সুবিধাবাদ এক্ষেত্রেও সে-আশা ব্যর্থ করেছে। পূর্ব্ব পরাজয়ের ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘও এত দিনে গতাসুপ্রায়।

* * *

লক্ষ্য এক থাকলেও অন্যের উপর কর্ত্তৃত্বের লোভ ছাড়া সহজ নয়। সোশ্যালিষ্ট্‌দের আটকে রাখার কাজে নাৎসিদলের সাফল্যের সম্ভাবনা বহু-স্বীকৃত হ'লেও তাই প্রেসিডেন্ট্ হিণ্ডেন্‌বুর্গের পার্শ্বচরেরা সহজে হিট্‌লারকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দিতে রাজী হ'ন নি এবং হিট্‌লার্ চান্সেলার হবার পরও হুগেন্‌বার্গ প্রভৃতি ন্যাশনালিষ্ট্ নেতারা ভেবেছিলেন যে তাঁকে হাতে রাখতে পারবেন। কিন্তু হিট্‌লারের পিছনে তখন প্রভূত শক্তি—নাৎসিদের অগ্রগতি তখন অপ্রতিহত। অন্তর্বিভক্ত নিশ্চেষ্ট জার্মান্ শ্রমিক-সমাজ কর্ত্তব্য স্থির করবার আগেই ক্ষমতা হিট্‌লারিদলের হাতে সম্পূর্ণভাবে এসে পড়ল। নূতন আভ্যন্তরিক সচিব নাৎসি-নেতা ডক্টর্ ফ্রিক্ শাসনযন্ত্রের সর্ব্ববিভাগে নাৎসি কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করলেন। গোয়রিং প্রাশিয়ার অধ্যক্ষ হ'য়ে পুলিশ-বিভাগকে নিজেদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে' রাখেন। নাৎসি ঝঞ্ঝাবাহিনী সরকারী সৈন্যদলের পদমর্য্যাদা ও অধিকার লাভ করল ; সমাজতন্ত্রী কাগজগুলির প্রকাশ নানা অছিলায় বন্ধ হ'য়ে গেল। অনেক শ্রমিক-নেতা বিনা বিচারে আটক হলেন। মার্চ্চে সাধারণ নির্ব্বাচনের ঠিক আগে (১৯৩৩) ব্যবস্থাসভা রাইশ্‌ষ্টাকের বাড়ী হঠাৎ ভস্মীভূত হয়। রব উঠল যে এর কারণ

সাম্যবাদী চক্রান্ত—সে-উত্তেজনায় হিট্‌লারের দল লক্ষ লক্ষ ভোট সংগ্রহ করে' নূতন পরিষদে নিজেদের সংখ্যাধিক্য জোগাড় করতে পারল। রাইশ্‌ষ্টাক্‌-ধ্বংস ইতিহাসে ইংল্যাণ্ডের ১৯২৪-এর নির্ব্বাচনে জিনোভিয়েভ্‌-এর জাল চিঠির প্রভাবে শ্রমিকদলের পরাজয়ের সমান আসন নেবে। বিচারে এক অর্দ্ধোন্মাদ লোকের আগুন লাগাবার অপরাধে প্রাণদণ্ড হ'লেও, সাম্যবাদীদলের দায়িত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। বিদেশী জনমত উত্তেজিত হওয়ায় লাইপ্‌জিগে প্রকাশ্য বিচার করতে হয়েছিল—আদালতে অভিযুক্ত সাম্যবাদীরা ডিমিট্রভের নেতৃত্বে সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; এমন কি শেষ পর্য্যন্ত অগ্নিকাণ্ডটা নাৎসিদলেরই গুপ্তকীর্ত্তি এ-সন্দেহ অন্ততঃ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ততদিনে নাৎসিদের অভিষ্ট সিদ্ধ হয়েছিল। ষড়যন্ত্রের অপরাধে সাম্যবাদীদল বে-আইনি ঘোষিত হয়, জার্মানির প্রতি অঞ্চলে এক একজন নাৎসি অভিভাবকের পূর্ণকর্ত্তৃত্বও সেই সঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল। মার্চ্চের শেষে নূতন রাইশ্‌ষ্টাক্‌ চার বৎসরের জন্য শাসন কার্য্যের সমস্ত অধিকার হিট্‌লারের হাতে সমর্পণ করে' অবসর গ্রহণ করল। জার্মানির গণতান্ত্রিক প্রতিনিধি সভার এইভাবে নির্ব্বাণ লাভ হয়—বলা বাহুল্য যে তার পর হিট্‌লারি কর্ত্তৃত্বের মেয়াদ বিনা বাক্যব্যয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

নাৎসি কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের ইতিহাস হ'ল এই। এর পরবর্ত্তী নাৎসি-শাসনের কথাও বোধ হয় সুবিদিত। সাম্যবাদীদের উচ্ছেদ সাধনের পর নিরীহ সোশ্যাল্‌ ডিমক্রাসিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল। এদের এতদিনকার নিয়মানুগত্য ও বিপ্লবে পরাঙ্মুখতা ধনতন্ত্রীদের কাছে কোন পুরস্কার পায় নি। বিশাল শ্রমিকসঙ্ঘগুলি সোশ্যাল্‌ ডেমক্রাটদের আয়ত্তে থাকা সত্ত্বেও এরা নিশ্চেষ্টভাবে নাৎসি-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হ'তে দিয়েছিল। এখন সঙ্ঘগুলি সব ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল। মার্ক্সের মতবাদ তাঁর স্বদেশে এইভাবে দণ্ডনীয় হ'য়ে পড়ে, কোন মার্ক্সীয় মণ্ডলীর প্রকাশ্য অস্তিত্ব আজ সেখানে অসম্ভব। শ্রমিক-বিপ্লবের ধারণা পর্য্যন্ত দমন করা জার্মান ফাশিজ্‌ম্‌-এর প্রধান কীর্ত্তি। শক্তিশালী সশস্ত্রদলের সাহায্যে শাসনযন্ত্রে পূর্ণকর্ত্তৃত্ব স্থাপন, সেই ক্ষমতার ব্যবহারে বিরোধীদের উচ্ছেদ সাধন, দেশব্যাপী প্রোপাগাণ্ডার উত্তেজনায় জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণ—নাৎসি-বিপ্লবের স্বরূপ হ'ল এই। এর পর যে-উগ্র বৈদেশিক নীতি অবলম্বিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য খানিকটা জনপ্রিয়তার অর্জ্জন আর বাকী, বিস্তারের মধ্য দিয়ে আর্থিক দুরবস্থা কাটিয়ে ধনিকদের লাভের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। নাৎসি-অভিযানের মূল রূপকে আবৃত করে' রেখেছে অনেক অবান্তর উত্তেজনা; জার্মানির মতন দেশের শ্রমিকদের

দাঁড়িয়ে রাখা কষ্টসাধ্য বলে'ই সেখানে ডক্টর্ গোয়েবল্‌স্-এর একনিষ্ঠ প্রোপাগাণ্ডার এত প্রয়োজন। নূতন জার্মানির বৈদেশিক নীতিতে তাই এত ন্যায়ধর্ম্ম, আত্ম-সম্মান ও জাতিপ্রীতির ছড়াছড়ি। ভের্সায়ির অবিচার আজ প্রায় অতীতের কথা হ'য়ে দাঁড়ালেও আজও তাই নিয়ে অভিযোগ ও আস্ফালন চলেছে। দেশের মধ্যে য়িহুদিবিদ্বেষ মধ্যযুগ থেকে লোক ক্ষেপাবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হ'য়ে এসেছে; জনসাধারণের মজ্জাগত সেই বিদ্বেষে আহুতি দিয়ে প্রচারিত হ'ল যে মার্ক্স্‌বাদ আসলে শ্রমিকদের ঠকাবার জন্য য়িহুদি ষড়যন্ত্র মাত্র। নাৎসিদের মতামতই না কি খাঁটি সোশ্যালিজ্‌ম্—যদিও মূলসূত্রে ধরলে দুয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্র মিল নেই। কয়েকটি য়িহুদি ধনিক ও ততধিক য়িহুদি দোকানদারদের নির্য্যাতিত করতে পারলেই প্রমাণ হ'ল যে নাৎসি আমল ধনিকতন্ত্র নয়। আর্য্যামির অহঙ্কার য়িহুদিবিদ্বেষ-বুদ্ধির অপর দিক। নগণ্য জনসাধারণ পর্য্যন্ত যে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই স্তোকবাক্য হিসাবেই নাৎসি মতবাদে নর্ডিক্ মাহাত্ম্যকীর্ত্তনের সার্থকতা। ইটালি ও জাপান নর্ডিক নয়—তবে ফাশিষ্ট্‌দের গৌরব করবার উপলক্ষ্যের অভাব সহজে হবে না; ইটালির আছে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য, জাপানের আছে মধ্যযুগের ক্ষত্রিয় গুণাবলী। অনুরূপ অবস্থায় সকল দেশেই ফাশিষ্ট্‌দের সুবিধার জন্য অতীত গৌরববাহিনী অথবা বর্ত্তমান বৈশিষ্ট্যপ্রচারিণী অহঙ্কারের আশ্রয় পাওয়া যাবে।

মুসোলীনির ইটালির মতন হিট্‌লারের আমলে জার্মানিরও অনেক বাহ্যিক উন্নতি হয়েছে। পরাজিতের যে-মনোভাব যুদ্ধান্তে জার্মান্‌দের পেয়ে বসেছিল আজ তার সম্পূর্ণ তিরোধান ঘটেছে। কাইজারের যুগে যে-দলাদলি দেশকে অভিভূত করেছিল তার বদলে এসেছে নূতন আশা, জাতীয় ঐক্যের আদর্শ, ভবিষ্যতের ভরসা। মহাশক্তিদের মধ্যে জার্মানি আবার প্রবল হয়েছে; অস্ত্রবল সম্ভবতঃ তারই আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আত্মরক্ষা, রাজ্যবিস্তার ও অন্যদের উপর অত্যাচার করার ক্ষমতা-ও আবার ফিরে এসেছে। কর্ম্মহীন শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে' ফাশিষ্ট্‌দের দরকারী কাজে লাগানো ও সমস্ত জাতির কর্ম্মকুশলের বৃদ্ধিসাধন—এ-সকলই শক্তির পরিচায়ক। কিন্তু এ সমস্তই সাময়িক বিচার, ইতিহাসে তার চেয়েও ব্যাপক একটা বিচারের প্রয়োজন এসে পড়ে যদিও সে-বিচারে সর্ব্বস্বীকৃত মাপকাঠির অভাব আছে। বর্ত্তমান আর্থিক বিধিব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন থাকলে স্বীকার করতেই হবে যে জার্মানিতে সমস্যা-সমাধানের কোন চেষ্টাই হয় নি, ইটালির কর্পোরেটিভ্ রাষ্ট্রের মতন নাৎসি আমলে জার্মান রাইশের তথাকথিত তৃতীয় অবস্থায় ভবিষ্যতের কোন স্থায়ী আশার চিহ্ন মাত্র নেই। তখন প্রশ্ন ওঠে যে জার্মান জাতির নাৎসি

প্রভুত্ব সহ্য করবার সার্থকতা কি? অথচ ইউরোপ্ ও সারা জগতের পক্ষে হিট্‌লারি জার্মানি যে অনেকটা ভয়ের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সে-কথাও এ প্রসঙ্গে মনে পড়তে বাধ্য।

শ্রমিক দলন ছাড়াও হিট্‌লারের জার্মানিতে অন্য ব্যাপার চোখে পড়ে। উৎপীড়নের ফলে জার্মানির জগদ্বিখ্যাত সংস্কৃতিরও সমূহ ক্ষতি হ'ল—বহু বিখ্যাত লোককে দেশত্যাগী হ'তে হয়। শত শত সাধারণ লোক এখন পর্য্যন্ত বিনাবিচারে আটক রয়েছে। সর্ব্বগ্রাসী ষ্টেটের বন্দনা ও নেতার আনুগত্যের আধ্যাত্মিক মূল্য-কীর্ত্তন এখন প্রবলতর হয়েছে। ইটালির মতন সমস্ত জার্মান জাতির একধর্ম্ম না থাকায় ফাশিষ্ট্ ষ্টেট্ ও বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের দ্বন্দ্ব জার্মানিতে দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। একদিকে জার্মান ক্যাথলিক্ জনসাধারণ খাঁটি নাৎসিদের মতন অতখানি ষ্টেট্-উপাসক হ'তে পারে নি—অন্যদিকে প্রটেষ্টাণ্ট্ যাজকদের মধ্যেও একটা অপ্রত্যাশিত স্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা দেখা গেছে। তার উত্তরে ফাশিষ্ট্ নেতারা কেউ কেউ এক নূতন ধর্ম্মের প্রশ্রয় দিচ্ছেন—প্রাচীন টিউটন্ ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে এত শতাব্দীর পরে তার যোগের চেষ্টা অবশ্য নিতান্তই হাস্যাস্পদ। কিন্তু হিট্‌লারি আমলে নূতন নূতন সাফল্য ও বিজয়ের নেশা জার্মানিকে পেয়ে বসেছে—ঐতিহাসিকের চোখে তাই প্রাক্‌সামরিক জার্মানির উদ্ধত চিত্র আজ আবার সজীব হ'য়ে উঠেছে মনে হয়। সেই সঙ্গেই মনে পড়া স্বাভাবিক যে সাম্রাজ্যবাদের পরিচালনায় জার্মানির অদৃষ্টে সেবার দুর্গতিই জুটেছিল। এই নেশায় জার্মান্ জাতি হিট্‌লার্‌কে এখন পর্য্যন্ত পূর্ণসমর্থন করছে। হিট্‌লার্ তাই মাঝে মাঝে ভোট নিয়ে জগতকে তাঁর্ ক্ষমতার প্রভাব দেখান। এই জনপ্রিয়তার জন্য হিট্‌লার্ ও তাঁর অনুচরদের প্রতাপ হ'য়ে উঠেছে অপ্রতিহত। পুরাতন ন্যাশনালিষ্ট্‌দের অবস্থা এখন খানিকটা হঠাৎ-নবাবদের গরীব আত্মীয়দের মতন। হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর হিট্‌লার্ প্রেসিডেণ্ট্ ও চান্সলার্ উভয় পদ নিজে রেখে রাষ্ট্রনেতা আখ্যায় পরিচিত হন। ফন্ পাপেন্ নূতন শাসকদের অনুগত ভৃত্য। কিন্তু প্রভুত্ব যেই করুক, ধনিকতন্ত্র অব্যাহত থাকছে—এবং ধনিকপ্রবর, জমিদারগোষ্ঠী ও রাইশওয়েরের সেনানীবৃন্দের প্রকৃত কোন স্বার্থহানির লক্ষণ এখনও দেখা যায় নি। ১৯৩৪-এর জুনে যে-আকস্মিক হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, তার কোনও প্রকৃত মূল্য থাকলে সংস্কারচেষ্টা দমনের মধ্যেই তাকে খুঁজতে হবে। রোয়েম্, আর্নষ্ট্, হাইনস্ প্রভৃতি নিহত নেতারা ঝঞ্ঝাবাহিনীর মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কারক হিসাবেই গণ্য হতেন—তাঁদের কেউ কেউ হয়ত ভাবছিলেন যে নাৎসি আমলে কোন প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন হচ্ছে না। ষ্ট্রেসার ১৯৩২-এর আগে

পর্য্যন্ত নাৎসিদলকে ঘোর সংস্কারক বলে' বরাবর বর্ণনা করতেন ; এখন তাঁর হত্যায় সংস্কার-সঙ্কল্প শক্তি হারাল। হিট্‌লার্ যখন তাঁর কোন কোন সঙ্গীকে এমন নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করেন, তখনকার গণ্ডগোলের সুবিধা নিয়ে হয়ত ব্যক্তিগত কারণেও কারো কারো প্রাণনাশ হয়। সেনাপতি শ্লাইশারের অপঘাত মৃত্যুতে হিট্‌লারের এক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর লোপ হ'ল। সম্প্রতি রাইশওয়েরের কোন কোন নেতার পদচ্যুতি হিট্‌লারের ব্যক্তিগত প্রতাপের পরিচয় হ'লেও তার ফ'লে নাৎসি-শাসনের প্রকৃতির কোন বদল হয়েছে মনে করবার বৈধ কারণ নেই।

হিট্‌লারের আত্মসাধনার স্বরচিত বিবরণের সম্পূর্ণ ভাষান্তর বিদেশে পাওয়া দুর্লভ—সমগ্র গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদের প্রচলন পর্য্যন্ত জার্মান্ সরকার বন্ধ করবার চেষ্টা করেন। অথচ এই বই জার্মানিতে এখন শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ। হিট্‌লারের মতে জার্মানির প্রধান কর্ত্তব্য সকলের চাইতে বেশী সামরিক শক্তি অর্জ্জন, অস্ত্রবলে সমকক্ষ কারো অস্তিত্ব জার্মানির সহ্য করা উচিত নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী বিনাশের প্রধান উপায় যুদ্ধ আর যুদ্ধ কিছু অমঙ্গলের আকর না। রাজ্যবিস্তার জার্মানির ধর্ম্ম, কিন্তু লক্ষ্য শুধু ১৯১৪ সালের সীমান্ত ফিরিয়ে পাওয়া নয়। প্রসারের উদ্দেশ্য এমন কি শুধু সকল জার্মান্‌ভাষীদের একত্র করাও নয়, উদ্দেশ্য জার্মান্ জাতির আর্থিক ও রাষ্ট্রিক পূর্ণপরিণতি সম্ভব করে' তোলা। মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে বিস্তার লাভ না কি জার্মানির ভাগ্যলিপি ও বিধাতার বিধান। রাশিয়ার কাছ থেকে এ-অঞ্চলে ভূখণ্ড কেড়ে নেওয়া তাই অবশ্যম্ভাবী। এর জন্য আবশ্যক ফ্রান্স্‌কে একক অবস্থায় দুর্ব্বল করে' রাখা- অতএব ইটালি ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সখ্য বন্ধন প্রয়োজন। কিন্তু এ-অবস্থাও সাময়িক—পরিণামে সারা জগতে শ্রেষ্ঠ-জাতি হিসাবে জার্মান্ প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়াই স্বাভাবিক। এই প্রত্যেকটী মত হিট্‌লারের গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে এবং হিট্‌লার্ নিজে এখন পর্য্যন্ত এর কোনটি প্রকাশ্যে প্রতিহার করেন নি। ফেডার্ বলেছিলেন যে বিদেশে প্রত্যেক জার্মানকে জার্মানির প্রজা করতে হবে—সেই সঙ্গে যে সহস্র সহস্র বিদেশী জার্মানির পদানত হ'য়ে পড়বে সে কথা তুচ্ছ ভেবেই তিনি উল্লেখযোগ্য মনে করেন নি। রোজেনবার্গের মতে নর্ডিক্‌দের ভোগের জন্য নিকৃষ্ট জাতির জমি ছেড়ে দিতেই হবে।

এই দুর্দ্দম প্রসার-প্রবৃত্তির পিছনে সাম্রাজ্যতন্ত্রের চালকশক্তিই রয়েছে মনে হয়—তারও প্রকৃতি কূল ছাপিয়ে পড়া। নাৎসি বৈদেশিক-নীতি সে-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে' চলেছে আর এক্ষেত্রেও ইংরাজ মন্ত্রীরা অনাগত ভবিষ্যৎকে অবজ্ঞা করে' শুধু মুহূর্ত্তের সুবিধা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। শুভাদৃষ্টে বিশ্বাস ইংরাজদের বোধ হয়

মজ্জাগত। তাই অধ্যাপক কেন্‌স্ পর্য্যন্ত লিখেছেন যে, কোনও ক্রমে এখন যুদ্ধের আশঙ্কা এড়াতে পারলেই হ'ল—অর্থাৎ ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতেই ভাববে। শান্তিবাদীদের আবার এক স্থির নীতি, কোনক্রমেই যুদ্ধ করা উচিত না। অতএব ইটালির উপর আর্থিক চাপ দেওয়া অন্যায় হয়েছিল, জার্মানি যা চায় তাই তাকে ছেড়ে দিলেই গোল চোকে। কয়েক বৎসর ধরে ইংল্যাণ্ডের এই চমৎকার যুক্তি সঙ্কটকে শুধু বাড়িয়েই চলেছে। সম্মিলিত চেষ্টায় শান্তিরক্ষার সকল ব্যবস্থা আজ ধূলিসাৎ আর এতে করে' শান্তির সম্ভাবনা বেড়েছে এ বিশ্বাসের সমর্থক এত প্রচণ্ড শুভবাদী কেউ নেই।

ইংল্যাণ্ডে শাসকশ্রেণীর মধ্যে, এমনকি ফ্রান্সেও, লাভাল্, টার্ডিও, প্রভৃতি নেতাদের এবং ফরাসী ফাশিষ্ট্‌গণের মনে হিট্‌লারি আন্দোলনের সঙ্গে একটা গোপন সহানুভূতিই নাৎসি-অগ্রনীতির সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। সে-অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত উল্লেখই শুধু এখানে সম্ভব। কিন্তু তার স্বরূপ বোঝার পক্ষে সেই বিবরণটুকুই যথেষ্ট। নাৎসি-আমলের আগেই জার্মানি অস্ত্রবর্জ্জনের সভাত্যাগ করেছিল, হিট্‌লারের হাতে রাজ্যভার আসা মাত্র জার্মানির সমরসজ্জার বিস্তৃত আয়োজন আরম্ভ হ'ল। তারপর জাপানের অনুকরণে জার্মানিও বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে পদত্যাগ স্থির করে (১৯৩৬)। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জার্মানির যুদ্ধান্তে বিস্তর অসদ্ভাবের কারণ ঘটে কিন্তু পোল্যাণ্ডে প্রবীণ নেতা পিলসুডস্কির কল্যাণে এক অর্দ্ধফাশিষ্ট্ শাসকসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। এই ঝোঁক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের উপর আগের মত নির্ভর করার চাইতে জার্মানির সঙ্গে একটা আপোষে নিষ্পত্তির ইচ্ছার উদয় হয়। হিট্‌লার্ পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করলেন (জানুয়ারী, ১৯৩৪) যদিও পোলেরা বুদ্ধিমান বলে' এখনও সম্পূর্ণ ধরা দেয় নি। পূর্ব্ববৈরীদের এই মিলন অবশ্যই সাধারণ শত্রু রাশিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত। ১৯৩৪-এর জুলাই মাসে নাৎসিরা চেষ্টা করল অষ্ট্রিয়া দখলের। এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিতে সোশ্যালিষ্ট্ প্রাধান্য সম্ভবপর হওয়াতে ফাশিষ্ট্ প্রতিক্রিয়ার উদয় হয়। তখন নেতা বাওয়ারের সুবিদিত সোশ্যাল্ ডেমক্রাটিক্ কার্য্যপদ্ধতি দক্ষিণ-পন্থীদের বিনা বাধায় শক্তিবৃদ্ধি করতে দিল। ক্রমে খর্ব্বাকৃতি ডক্টর ডল্‌ফুস্ একনায়কত্ব স্থাপন করলেন (মার্চ্চ, ১৯৩৩)। পর বৎসর (ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪) শেষ পর্য্যন্ত সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়; সোশ্যালিষ্টেরা তখন বিধ্বস্ত ও ভিয়েনার নূতন বিখ্যাত শ্রমিকনিবাসগুলি গোলাবর্ষণে ধ্বংস প্রাপ্ত হ'ল। কিন্তু দক্ষিণ-পন্থীদের মধ্যেও বিবাদ ছিল—বিদেশী অর্থাৎ জার্মান্ নাৎসিদের বিরুদ্ধে স্বদেশী পিতৃভূমি দল গড়ে

ওঠে। ডলফুস্ এই সঙ্ঘর্ষে নাৎসিদের হাতে প্রাণ হারান (জুলাই, ১৯৩৪) কিন্তু ইটালির সাহায্য প্রতিশ্রুতি পেয়ে তাঁর বন্ধু শুস্‌নিগ্ তখন অষ্ট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন। নাৎসিদের পরবর্ত্তী কীর্ত্তি হ'ল, পূর্ব্ব-ইউরোপে লোকার্ণোর অনুযায়ী শান্তিরক্ষার চুক্তিতে যোগ দিতে অস্বীকার করা (১৯৩৪)। হিট্‌লার্ বল্লেন (মে, ১৯৩৫) যে যুদ্ধকে ছড়াতে দেওয়া উচিত না, অতএব পরস্পরকে সাহায্যের অঙ্গীকার না করাই মঙ্গল। এর প্রকৃত অর্থ অবশ্য সহজেই বোঝা যায়। এই বৎসরের প্রথমে সার্ অঞ্চল পনের বছর পর, জনগণের মত গ্রহণের ফলে, জার্মানির সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়। ১৯৩৫-এর মার্চ্চে হিট্‌লার্ ভের্সায়ির সন্ধি অগ্রাহ্য করে' উপযুক্ত বয়স্ক সকল জার্মান্‌কে অস্ত্রশিক্ষা নিতে বাধ্য করলেন। সন্ধি-ভঙ্গের সাফাই হিসাবে মাঝে মাঝে বলা হয় যে ভের্সায়ির ব্যবস্থা জার্মানি স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নি। কিন্তু এ-যুক্তি অবান্তর, কারণ পরাজিত পক্ষ কখনই স্বেচ্ছায় সন্ধি স্বাক্ষর করে না। ষ্ট্রেসার বৈঠকে জার্মানির এ-আচরণ অন্য শক্তিদের নিন্দিত হবার পরেই কিন্তু ইংরাজ মন্ত্রীরা জার্মানিকে প্রকারান্তরে উৎসাহ দিলেন। নৌবল নির্দ্ধারণের এক ইংরাজ-জার্মান্ চুক্তিতে (জুন, ১৯৩৫) ইংল্যাণ্ড স্বীকার করে যে জার্মানি ইংরাজ নৌবহরের শতকরা ৩৫ ভাগ পর্য্যন্ত রণতরী রাখতে পারবে। এই চুক্তিও এক হিসাবে ভের্সায়ির ব্যবস্থা ভঙ্গের বন্দোবস্ত—সুতরাং ইংরাজদের এ-আচরণ নাৎসিদের প্রশ্রয় দেওয়া বলা চলে। ফরাসীরা এতে উদ্বিগ্ন হ'য়ে আবিসিনিয়ার ব্যাপারে ইংরাজদের পূর্ণ সহায়তা করল না, অন্যদিকে ইংল্যাণ্ড্ও কোনও দেশ জার্মান্‌দের দ্বারা আক্রান্ত হ'লে তৎক্ষণাৎ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করে।

১৯৩৬-এর মার্চ্চে জার্মানি লোকার্ণো চুক্তি অগ্রাহ্য করে' রাইনল্যাণ্ডে সৈন্যস্থাপন করল। লোকার্ণো সন্ধি অবশ্য স্বেচ্ছায় স্বাক্ষরিত হয়েছিল, কিন্তু এতদিনে সন্ধি-ভঙ্গ জার্মানির একটা অভ্যাসে পরিণত হ'য়ে পড়ে। এই সময় হিট্‌লার্ এক শান্তির প্রস্তাব আনেন। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে জার্মানি, পশ্চিমে কোন দেশ আক্রান্ত হ'লে তার সাহায্যে প্রস্তুত থাকলেও, পূর্ব্বের দেশগুলির বেলায় (অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, লিথুয়াণিয়া ইত্যাদি) সে অঙ্গীকার দিতে রাজি নয়। এই পার্থক্য মনে সন্দেহই আনে, তাছাড়া নাৎসি জার্মানির পক্ষে কোনও সন্ধির সর্ত্তপালন ক্রমে দুরাশায় পরিণত হচ্ছে। ১৯৩৬-এর শেষের দিক থেকে জার্মানি স্পেনে ফ্রাঙ্কোর সাহায্যে প্রবৃত্ত হয়েছে, আর সেখানে অল্প দোষে গণতান্ত্রিক দলের উপর চণ্ডনীতির প্রয়োগ জার্মান্‌দের সুনাম বাড়ায় নি।

এরপর জার্মানি ও ইটালির মধ্যে সখ্যস্থাপন হয়েছে। বার্লিন্ ও রোমের এই সদ্ভাবকে এখন বিশ্বরাষ্ট্রলীলার মেরুদণ্ড হিসাবে কল্পনা করা হচ্ছে। স্পেনে এ-সখ্য ফ্রাঙ্কোকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে সাম্যবাদের বিরোধী দল সংগঠনের প্রয়াস হিসাবে জাপানের সঙ্গেও অন্য দু'টির মৈত্রীস্থাপন হয়েছে। পৃথিবীর এই তিনটী ফাশিষ্ট্ ভাবাপন্ন মহাশক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব আন্তর্জাতিক শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাস্থল, কারণ তিনরাজ্যই প্রসারোন্মুখ। তারপর হিট্লার্ ও মুসোলীনির সহযোগে অষ্ট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য লোপ হ'ল। অষ্ট্রিয়াতে সোশ্যাল্ ডেমক্রাট্ ও সাম্যবাদীদলের মিলনের পরই তার বিরোধী নাৎসি প্রভাবও বাড়তে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত শুস্নিগ্‌কে সরিয়ে অষ্ট্রিয়াকে জার্মান রাজ্যভুক্ত করা সহজেই সম্পন্ন হ'ল (১৯৩৮)। তার পর থেকে নাৎসিরা চেকোস্লোভাকিয়ার উপর দৃষ্টি দিয়েছে—এ রাজ্যের সুদেৎ প্রদেশে অনেক জার্মানের বাস। চেক রাজ্য আজ তাই সমূহ বিপন্ন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিতব্য "উত্তর সামরিক ইয়োরোপের" একটি অধ্যায়। লেখার তারিখ: জুন, ১৯৩৮।

অসমাপ্ত

আবু নাসের

প্রথম যৌবনের অমৃতক্ষণে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। হিমালয়ের কোলে তার জন্ম, হিমালয়ের উদার মুক্তির মধ্যেই তার শৈশব কেটেছে। প্রকৃতির শিশুর দেহে এবং মনে উদাস গিরিপ্রকৃতি তার নিঃসঙ্গ নিস্পৃহতার যে স্পর্শ রেখে গিয়েছে, প্রথম দৃষ্টিতেই আজও তা চোখে পড়ে। তাই তার সকল কথায় সকল চলা ফেরায় একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ, বুদ্ধির আভায় উজ্জ্বল শ্যামল মুখখানি, চোখদুটী করুণায় স্নিগ্ধ, কুঁদে তৈরী করা চিবুকখানি ছোট হ'লেও দৃঢ়তায় ভরা। ঋজু লম্বা গড়ন, রঙ্ তার শ্যামল—এ বাংলা দেশের লোকের চোখে তাকে হয়তো সুন্দরই লাগবে না। চলনও তার আশ্চর্য্য রকমের ঢিলে—অপ্রয়াস স্বাচ্ছন্দ্যে তার সে পথ চলায় সাধারণ বাঙালী মেয়ের আড়ষ্ট এবং কষ্ট কঠিন গতির কোন আভাস নেই।

শৈশব থেকেই যদি কেউ একলা বিরাট প্রকৃতির কোলে মানুষ হ'য়ে উঠে, তবে বোধ হয় জীবনে কোনদিন তার মনের সে সুদূর নিঃসঙ্গতা কাটে না, সারাজীবনই সে নিজের চারিপাশে খানিকটা মুক্ত আকাশ রচনা করে' নেয়। বন্ধুও তাদের বড় বেশী জোটে না—জ্যোতিষ্ক তারার আকর্ষণ মহাশূন্য পেরিয়ে তাই দিগদিগন্তে বন্ধু খুঁজে বেড়ায়। আমাকে সে লিখেছিল, "এ জীবনে বন্ধুর অভাব বড় অনুভব করেছি। মেয়েদের মধ্যে তেমন কাউকে পাইনি, আর ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আমাদের দেশে কোথায় ঘটে? তোমার সঙ্গে আমার প্রথম যখন পরিচয় হ'ল, তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছি যে তুমি আমার জীবনে এতখানি আলো এনে দেবে?"

আমিই কি ভাবতে পেরেছি যে জীবনে কেউ এসে এমন করে' আমার কাছে ধরা দেবে? মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ চিরদিনই বিস্ময়ে বেদনায় আমাকে ব্যাকুল করে' তোলে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন যতই নিবিড় হোক না কেন, তবু তার মধ্যে যে বিচ্ছেদের দূরত্ব সর্ব্বদাই থাকে, সে দূরত্ব আমাকে ব্যথা দেয়। আমারো শৈশব সঙ্গীহীন কেটেছে, বেদুইনের মতন সারা বাংলাদেশময় ঘুরেছি—কোথাও কোনদিন বেশীদিনের জন্য ডেরা পড়েনি। মনের সাথী কোনদিন পাইনি,

বইয়ের পাতায় দেশবিদেশের কল্প কাহিনী আমার কাছে সত্যের মত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ত, বাস্তবজগতের অন্তরালে কল্পনা দিয়ে আপনার মানসপৃথিবী রচনা করে' এমনি ভাবে আমার দিন কাটছিল। বাংলার পল্লীর ছেলে আমি আমারই পৃথিবীতে একলা চলেছিলাম, আমারি পাশে এসে দাঁড়াবে হিমালয়ের গিরিকুমারী, একথা কি কখনো স্বপ্নেও ভেবেছি ?

যৌবন বোধ হয় তখন আমার সকল দেহমনে বুভুক্ষু হ'য়ে উঠেছিল। বৈচিত্র্যহীন ঘটনায় দিনের পর দিন কেটে যায়। সকালবেলা পড়ালেখার ভঙ্গী, চায়ের টেবিলে দুনিয়ার গল্প, সারাদিন কলেজের রুটীনের মধ্যে বাঁধা। সন্ধ্যাবেলা বন্দী মন যেন ছাড়া পেতো, ময়দানের মুক্তির মধ্যে সমস্ত দিনের বঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা উদ্বেল হ'য়ে সরব হ'য়ে উঠ্‌ত। রাস্তায় মোটরের ছুটাছুটি, দোকানগুলির কাঁচের জানালায় রঙের খেলা। কতশত নরনারী, কত বিচিত্র তাদের বেশ, আদিম অন্তহীন জনস্রোতে নগরীর জীবন ভেসে চলেছে, সমস্ত সন্ধ্যাকে রহস্যময় করে অস্থির আলোকের চঞ্চল গতিলীলা।

সূর্য্য তখন অস্ত যায়, লাটপ্রাসাদের গাছগুলির মাথা অন্ধকারের পশ্চাদপটে আঁকা, লক্ষ মানুষের দুঃখ বেদনা পরিশ্রমের পশ্চাদপটে ভাগ্যবানের মুক্তি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার ছবি। মেঘগুলির গায়ে লালের আভাস, সন্ধ্যার শান্ত স্তব্ধ আকাশ নীরবে নগরীর দিকে চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে। তারি উদাস গাম্ভীর্য্যের মধ্যে ছায়ায় আলোয় মেশানো অন্ধকারে মনুমেন্ট যেন কোন স্বপ্নপুরীর মিনার। আকাশে অন্ধকার, পৃথিবীর পায়ের কাছে আলোর ত্রস্ত চকিৎ খেলা।

আমারো সমস্ত মন উদাস হ'য়ে উঠ্‌ত। কী যে চাইত, সে-কথা কি নিজেই স্পষ্ট করে' জানতাম ? বন্ধুর হাত ধরে বন্ধু গভীর আলোচনায় আমাকে লক্ষ্য না করে' আমারি পাশ দিয়ে চলে যেতো। পরস্পরের চেতনায় মগ্ন তরুণ তরুণী গাছের ছায়ায় আলো-আঁধারের জালগাঁথা পথে মৃদুগুঞ্জনে আলাপ করতে করতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তো, হঠাৎ আমার নিজেকে মনে হ'ত বড় নিঃসঙ্গ। ময়দানের অন্ধকারের অন্তরালে বসে থাকাই ছিল আমার জীবনের ছবি, আপনার মনে স্বপ্ন রচনা করে' এমনি ভাবে দিন কাটানোই ছিল আমার নিয়তির লেখা।

রাত্রি গভীর হ'য়ে আসত। কৃষ্ণপক্ষের রক্তপাণ্ডুর চাঁদ কখন অলক্ষ্যে এসে নীরবে নক্ষত্র সভায় যোগ দিত, সেদিকে কোন লক্ষ্যই থাকত না। ভবিষ্যতের অনেক স্বপ্ন, অনেক সাধনা মনের মধ্যে নীহারিকার মতন জ্বলত নিভত, রাত্রির অন্ধকারের স্বপ্ন দিনের রূঢ় আলোকে মিলিয়ে যেতো। আপনার খেয়ালে খেয়ালী

এমনি করেই অস্পষ্ট চাওয়া এবং না চাওয়ার ব্যর্থতায়ই হয়তো আমার জীবন কেটে যেতো, কিন্তু এমনি সময়ে সে এলো আমার জীবনে।

দুই

প্রথম যেদিন তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ, সেদিনের কথা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। চৈত্র তখন শেষ হ'য়ে এসেছে, আসন্ন বর্ষশেষের সম্ভাবনায় আকাশ বাতাসে গম্ভীর বেদনাবোধ। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রতাপে অবসন্ন পৃথিবী তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন। পথে লোকজনের চলাচল বন্ধ, সমস্ত নগরীর উচ্ছল কলকাকলী নিস্তব্ধ। আকাশের নিষ্ঠুর নীলিমায় কোথাও মেঘছায়ার আভাসটুকু নেই, সমস্ত আকাশ পৃথিবী ছাপিয়ে উগ্রমদের মতন তপ্ত রৌদ্র। গাছের ছায়ায়ও রৌদ্রের স্বাদ, কোথাও যেন এতটুকু আবরণ, এতটুকু ঢাকা নেই, বিশ্বপ্রকৃতির এমনি রুদ্র ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে আকস্মিকভাবে তার সঙ্গে আমার দেখা।

কৈশোরের অবসানে যৌবনে তার তনু মঞ্জুরিত, কিন্তু সেদিন তার চোখদুটী ছাড়া আর কিছুই আমি লক্ষ্য করিনি। দীপ্ত উজ্জ্বল তার নয়নের দৃষ্টি, কিন্তু সে দীপ্তির মধ্যে তীক্ষ্ণতা নেই। বুদ্ধির ভাস্বর স্মৃতি মনের কোণে আলো আনে, হঠাৎ মনে হয় যে মানুষের চোখের দৃষ্টিতে এত কথা কেমন করে' জমা হ'য়ে ছিল ?

সেদিন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি, পরিচয়ের প্রয়োজনও মনে আসেনি। কৌতূহলী আমার স্বভাব কোনদিন নয়, তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নও আমার মনে জাগেনি। সহজে, বিনা আয়োজনে আমার জীবনে তার আবির্ভাব আমি সহজেই মেনে নিয়েছিলাম, পরিচয় অপরিচয়ের কোন দ্বিধা বা সন্দেহ করিনি। জানিনা মনের এ কী অদ্ভুত ধর্ম্ম যে যার সঙ্গে পরিচয় নেই, যার কথা কিছুই জানিনে, তার চোখের দৃষ্টি মনের মধ্যে এমন করে' গেঁথে গেল, তার সঙ্গে একবার সাক্ষাতে আমার মনের সকল শূন্যতা পূর্ণ হ'য়ে উঠ্ল।

একলা শিলংয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেবার শিলংয়ে আমার মোটেই একলা লাগেনি। আকাশের নীলবুকে সাদা স্বচ্ছ মেঘ সমুদ্রবুকে হাঁসের মত ডানা মেলে উড়ে চলে যেতো, রাত্রিদিন পাইনবনে, বিরহী হাওয়ার অশ্রান্ত মাতামাতি। মুগ্ধচোখে পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের সম্ভার দেখেছি, কিন্তু ক্ষণে অক্ষণে তার শ্যাম উজ্জ্বল মুখে দীপ্ত চোখের স্মৃতি আমার চেতনার তলে স্বপ্নের মত জেগে থাকত।

তখন শুক্লপক্ষ পড়েছে। নিদ্রামগ্ন ক্ষুদ্র নগরীকে ছাপিয়ে জ্যোৎস্নার রূপোলী হাসি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত। দূরান্তরের আকাশ পৃথিবী জ্যোৎস্নায় ছাওয়া অর্দ্ধ অস্পষ্ট, কেঞ্চিসট্রেসের বাঁকা পথের বাঁকে বাঁকে গাছের ছায়া দীর্ঘতর হ'য়ে পড়ত, ওপারে শিলং পীক কৌতূহলী মনে নীরব হাসিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকত। চাঁদের আলো মদের মতন রক্তে চলে যায়, পথে পথে যখন ঘুরে বেড়াতাম, তখনো আমার সঙ্গে সেই একনিমেষের দেখা দীপ্তনয়না বন্ধুর ছায়াস্মৃতি।

কত যে অদ্ভুত কল্পনা সেদিন মনের মধ্যে খেলেছে। ভেবেছি যে যুগে যুগে মানুষের মন সঙ্গী খুঁজে ফিরে। যে অন্তরের সঙ্গী, তার জন্য হৃদয় জন্ম-জন্মান্তর থেকে প্রতীক্ষা করে' থাকে, কল্পনার অতীত তারালোকে তাকে খুঁজে বেড়ায়। সহস্র মানুষের চঞ্চল চলার মধ্যেও তাকে একবার পথে দেখতে পেলে বন্ধু বলে', সাথী বলে' তাকে বরণ করে' নেয়। তা নইলে একবারমাত্র তাকে দেখে আমার মন এত অসংশয়ে তাকে আপনার ব'লে বরণ ক'রে নিল কেন? জীবনে কবে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে তার কোন ঠিকানা নেই। নতুন নতুন কর্ম্মপ্রবাহ সেদিন হৃদয়কে টানছে, কিন্তু সকল ব্যগ্রতা সকল চঞ্চলতার অন্তরালে তার কথা মনের কোণে প্রচ্ছন্ন কাঁটার মতন দিনরাত বাজছিল কেন?

মনে কিন্তু তবু জেনেছিলাম যে মন আমার ভুল করে নাই। তাকে দেখেই চিনেছিলাম, মনের সত্যদৃষ্টিই তাকে চিনিয়ে দিয়েছিল। বুদ্ধি নানা প্রশ্ন তোলে, বুদ্ধি বলে যে জীবনে হয়তো পরস্পরের কাছে আমরা অজানাই থেকে যাব। পথচলায় যার সঙ্গে দেখা, পথ চলায়ই আবার সে কোথায় পথের বাঁকে হারিয়ে যাবে! মন তবু সে কথা মানেনি। মন বলেছে যে মিলন আমাদের যদি না-ই হয়, তবু মিলন হ'লে সেটাই হ'ত সত্য, সে বিচ্ছেদ মানুষের জীবনের সহস্র ভুলের মতই আর একটী ভুল থেকে যাবে। সমুদ্রপথের জাহাজে পাখী এসে একনিমেষের জন্য বসে, সে পাখী আর কোনদিনই হয়তো ফেরে না, তবু তারি সঙ্গে যদি কারু সুখদুঃখ জড়িয়ে পড়ে, তার জীবনে সে পাখীর আসা চিরদিনের মত স্মরণীয় হ'য়ে থাকে।

ব্রাউনিং পড়তে পড়তে যখন এভেলীন হোপের নিরাশ প্রেমিকের মুখে অসীম আশা ও আশ্বাসের বাণী শুনেছি, তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছি যে এমনি করে' আমারই জীবনে তার সত্য যাচাই হবে? সেদিন আমার মন ব্রাউনিংয়ের কথা বিশ্বাস করতে চাইলেও বুদ্ধি তাকে কবিকল্পনা বলে' উড়িয়ে দিয়েছে, এমন

অসম্ভব কথা বিশ্বাস করতে চায় বলে' হৃদয়কে উপহাস করেছে। সেদিনের উপহাস যে আজ এমনি করে' আমারি মাথায় ফিরে আসবে, সে কথা কি তখন ভেবেছি? আজ সকল হৃদয় মন আকাঙ্ক্ষা করছে, দেহের প্রতিটী অণুপরমাণু চাইছে যে ব্রাউনিংয়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হোক, এ পৃথিবীতে না হয়, মৃত্যুর পরপারে সকল জীবন সকল পৃথিবী পার হ'য়েও যেন সে এসে হাতে হাত রেখে পাশে দাঁড়ায়। বুদ্ধি প্রথমে হাসতে চেয়েছিল, কাব্য বলে' উপহাস করতে চেয়েছিল, কিন্তু বুদ্ধিকেও শেষে স্বীকার করতে হ'ল যে এ তীব্র চাওয়া জীবনের মতনই সত্য, তাকে অস্বীকার করা যায় না, তাকে এড়াবার কোন উপায় নেই।

তিন

পরিচয় তার সঙ্গে হ'ল—পরিচয় না হ'য়ে যেখানে উপায় ছিল না, সেখানে পরিচয় না হবেই বা কেন? কেমন করে' পরিচয় হ'ল সে কথা জেনেও কারু কোন লাভ নেই, কিন্তু যখন পরিচয় হ'ল, এত সহজে পরিচয় হ'য়ে গেল যে সে-কথা ভাবতে নিজেরই আশ্চর্য্য লাগে। স্বপ্নপুরীর স্বপ্নবিলাসে আমার দিন কাটছিল, সে এসে যখন জীবনে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন একই সাথে স্বপ্ন হ'ল সফল আর স্বপ্নও গেল তার ঘুচে। সত্যের ধর্ম্মই বোধ হয় তাই। সত্য যেমন স্বপ্নের চেয়েও আশ্চর্য্য, তেমনি আবার প্রতিদিনের জীবনের গতানুগতিক প্রথার সঙ্গেও তার আশ্চর্য্য মিল। দর্শনের তর্কে এ কথায় ভুল বেরোতে পারে, কিন্তু বাস্তব প্রতিপদে দর্শনের রীতিকে লঙ্ঘন করে, দর্শনই তখন নতুন সূত্র দিয়ে জীবনকে বাঁধবার চেষ্টা নতুন করে' সুরু করে।

দিনের পর দিন কত কথায় কত আলোচনায় কত তর্কবিতর্কে পরস্পরের কাছে আমরা আত্মপ্রকাশ করেছি। চৈতী হাওয়ায় আগুন যেমন দীপ্ত হ'য়ে জ্বলে উঠে, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের স্পর্শে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা তেমনি করে' জ্বলে উঠ্‌ত। ছোট ছোট কথা, তবু তারা মনের কোণে চিরদিনের জন্য গেঁথে রয়েছে।

একদিন সে বলেছিল, আচ্ছা মেয়েদের মন এত ছোট হয় কি করে'? যারা মা, মানুষকে জীবন দেওয়া যাদের ধর্ম্ম, তারা কেমন করে' মানুষকে আঘাত করবার কথা ভাবে?

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার কথার মানে ঠিক বুঝতে পারছি নে, কী তুমি বলতে চাও?

দীপ্ত চোখ দুটী আমার মুখে রেখে সে বল্‌ল, নিজের চারিদিকে গণ্ডী টেনে মানুষ নিজের অপমান করে। তারই ফলে জমে বাধা, এবং সেই বাধা আনে সংঘাত। তারই বিষে আজ সমস্ত পৃথিবী জর্জ্জর, আমাদের দেশে তার গ্লানি কানায় কানায় ভরে উঠেছে। সে গণ্ডী ভাঙতে পারে কে? দেশের মেয়েরা, কারণ তারাই দেশের মা! অথচ তাদের মধ্যে যে সংকীর্ণতা, তাদের মধ্যে যে গোঁড়ামি, তার তুলনা তো পুরুষের মধ্যে নেই।

আমি বলেছিলাম, তাতে আশ্চর্য্য হবার কী আছে? মেয়েদের জীবন সংকীর্ণ, নিজের পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে তারা বদ্ধ। শিক্ষার অভাব এবং পারি-পার্শ্বিক জগতের সংকীর্ণতা—এ রকম মণিকাঞ্চন যোগেও যদি মেয়েদের এ দশা না হবে তবে তারা সবাই ফেরেস্তা হয়ে যেতো। পুরুষ বাইরে বেরোয়, জগতের পরিসর তার খানিকটা বেশী, হাজার রকম মানুষের সঙ্গে মিশে তার চরিত্রের কোণগুলো খেয়ে যায়, মনের সংকীর্ণতা না ঘুচলেও ব্যবহারের সংকীর্ণতা খানিকটা ঘুচে।

সে বলেছিল, ভুল, এ তোমাদের পুরুষের ভুল। তোমরা ভাবো যে সমস্ত পৃথিবীময় ছুটোছুটী ক'রে না বেড়ালে অভিজ্ঞতা আসে না, জীবনের পরিসর বাড়ে না। তার মতন ভুল নেই। নইলে জাহাজের যে খালাসী সে হ'ত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দার্শনিক। মেয়েদের নিজেদের জীবনের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা, জীবনসৃষ্টি ও জীবন পালবার যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, তাতে যদি মেয়েদের মনের গণ্ডী না ঘোচে, তবে কেবলমাত্র বাইরের বাধা ঘুচিয়ে কিছু হবে না।

আমি সে কথা মানি নি। বলেছি, খালাসী হয়তো দার্শনিক হয় না, কিন্তু তবু গাঁয়ের তারই পাড়াপড়শী ভাই বেরাদরের চেয়ে তার মন খোলা, সংস্কার তাদের তুলনায় তার কম। জীবনসৃষ্টির অভিজ্ঞতা মেয়েদের আছে, তাতে চিত্তের গভীরতা ও অন্তরমুখিনতা বাড়তে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি মিলত জীবনের প্রসার, তবেই তারা নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ সৃষ্টির ক্ষমতা পেতো। আজ তারা জীবনসৃষ্টি করছে কেবলমাত্র বাস্তবের স্তরে, সেদিন তারা সৃষ্টি করবে জীবনের নতুন সত্য।

তখন সন্ধ্যা। কলকাতার বাইরে আমরা গিয়েছিলাম। লাল মাটী আর কাঁকরের পথ দিগন্তবিস্তৃত মাঠের বুকের মধ্য দিয়ে দূরে চলে গেছে। যতদূর দেখা যায়, কোথাও তৃণ-পল্লব-তরুলতার চিহ্নটুকু নেই। কেবলমাত্র যেখানে পশ্চিম দিগন্তে আকাশ এসে নত হ'য়ে পৃথিবীকে ছুঁয়েছে, আকাশের মেঘের সোনার

সঙ্গে ধরণীর ধূলির লালিমায় সমস্ত পৃথিবী রক্তাভ আলোকে উজ্জ্বল, সেখানে অন্ধকারের নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ তালগাছের সারি।

জীবন মৃত্যু আশা আকাঙ্ক্ষার অনেক কথাই আমাদের মনে আসছিল। এক একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, অস্তায়মান সূর্য্যের রক্তরশ্মিতে দীপ্ত মুখখানি কোন স্বপ্নের আলোকে উজ্জ্বল। বিপুল প্রকৃতির জনমানবহীন অসীমতার মধ্যে আমরা দুটী প্রাণী। পিছনে অন্ধকার জমাট হ'য়ে আসছে, সামনে দূরদিগন্তসীমায় এখনো আলোকের একটু আভাস, সেই কোন দূর জগতের আলোকের রেখা পড়েছে তারই মুখে। এমনি করে' মানুষ আমরা যুগযুগান্ত ধরে চলেছি। এমনি করে' সৃষ্টির অনাদি অন্ধকার গুহার গহ্বর থেকে কোন প্রভাতে যাত্রা সুরু হয়েছিল, কোন আশার আশ্বাসে বুক বেঁধে দিকচক্ররেখার পরপারের কোন স্বপ্ন-স্বর্গের সাধনায় যুগযুগান্ত আমরা চলেছি।

তর্ক ক্লান্ত হ'য়ে গিয়েছিল। প্রকৃতির এ অনন্ত গাম্ভীর্য্যের সামনে মন আপনি নত হ'য়ে আসে, ব্যক্তিত্বের সীমারেখা লজ্জায় মুছে যেতে চায়, জীবনের সকল প্রয়াস, সকল বিক্ষোভ, সকল দ্বন্দ্ব বড় তুচ্ছ, বড় ক্ষুদ্র মনে হয়। একান্ত আপনার ব্যক্তিজীবনের ঘনিষ্ঠ কথা ছাড়া আর কোন কথা যেন সেখানে সাজে না। অসীমতার মধ্যে ঘরের কোণের জন্য মন ক্ষুদিত হ'য়ে উঠে, বড় কথা নিজেরই কানে উপহাসের মতন শোনায়। বিপুলতার উপলব্ধিতে সমস্ত আত্মা যখন মাতালের মতন টলতে থাকে, তখন সীমা রেখার বন্ধন, আশ্রয়কুঞ্জের ছায়াঘন বিশ্রামের জন্য মন কাঁদে।

তাই অনেক কথা মনে আসলেও একান্ত আপনার কথা ছাড়া আর কোন কথা মুখে আসছিল না। অনন্ত আকাশের তলে ঘনায়মান রাত্রির অন্ধকার পক্ষছায়ায় আমরা দুজনে চলেছি, আর যেন কেউ কোথাও নাই, সমস্ত পৃথিবী ধুয়ে মুছে একাকার হ'য়ে গিয়েছে, অসীম শূন্যতার মধ্য হ'তে কোন অসীম জীবনের পানে আমাদের অভিযান। ব্যক্তিত্বের গণ্ডী আমাদের মধ্যে যেন নেই, একই আশা একই আকাঙ্ক্ষা একই সাধনায় আমাদের স্বাতন্ত্র্য অবলুপ্ত।

তারই মধ্যে সে আমাকে তার জীবনের কাহিনী বলল। সুখদুঃখ দিয়ে আমাদের জীবনের জাল কোন অদৃশ্য অদৃষ্ট বসে বসে দিবারাত্রি গাঁথে, জানিনে। কারু ভাগে সুখের ভাগ বেশী, কারু ভাগ্যে দুঃখের বোঝা-ই দুঃসহ হ'য়ে উঠে। সেও জীবনে দুঃখ অনেক পেয়েছিল। হয়তো অনেক দুঃখই তুচ্ছ, কিন্তু দুঃখ যার লাগে, সে তাকে তুচ্ছ ভাববে কেমন করে'? শৈশবের দুঃখ কৈশোরে লোভনীয়

হ'য়ে উঠে, কৈশোরের দুঃখের কথা মনে করে' বৃদ্ধ ভাবে কী সুখেই দিন কেটেছে। দূর পশ্চিমে হিমালয়ের কোলে সে জন্মেছিল, কিন্তু শৈশব কেটেছে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে যাযাবরের মতন অনিশ্চিত জীবনে। ভবঘুরের জীবনও কারু কারু ভাল লাগে, কিন্তু যার মন একটু বিশ্রাম, একটু শান্তি চায়, এ যাযাবর জীবনের চেয়ে বড় শাস্তি তার পক্ষে বোধ হয় আর কিছুই নেই। এক একটা নতুন জায়গায় যায়, ধীরে ধীরে দুয়েকটী বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়, আর অমনি সেখানকার পালা হয় শেষ, নতুন জায়গায় অপরিচিতদের মধ্যে নতুন করে' জীবন হয় সুরু।

শৈশবে মাতৃহারা—আত্মীয়ের ঘরে তার জীবন কেটেছে। নিজের মায়ের যে দরদ, সহস্র ছোট কথায়, ছোট কাজে নিবিড় আত্ম-অনুভূতি, তার প্রকাশ সে দেখেছে কিন্তু নিজের জীবনে তার পরিচয় পায়নি। শৈশব থেকেই তাই সে নিঃসঙ্গ, কিন্তু সেই নিঃসঙ্গতাই দিয়েছে তার জীবনে গভীরতা, এনেছে তার চরিত্রে দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়। অন্যায়ও তাকে সইতে হয়েছে অনেক সময়, ছোট ছোট অন্যায় কিন্তু তবু তারা মনের কোণে কাঁটার মত বিঁধে থাকে। নিজের দাবী সঙ্কোচ করতে শিখেছিল সে সহজেই। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যেখানে সংস্পর্শ, সেখানেই সে আঘাতের সম্ভাবনা দেখেছে, তাই নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে বাইরের দাবীর সংখ্যা কমিয়ে কমিয়ে সে আত্মস্থ হ'য়ে স্বস্তি পেয়েছিল।

ছোট ছোট ঘটনা কিন্তু মনের আকাশে তারা রঙ ধরিয়ে দেয়। কিছু না বলে' তা'র হাত আমার হাতে টেনে নিলাম—কথা বলবার আর প্রয়োজনও রইল না। আবার নীরবে দুজনে পথ চলেছি। তখন পশ্চিম আকাশে আলোকের শেষ রক্ত রেখাটুকু মুছে গেছে অস্বচ্ছ অন্ধকারের ধূসর জালে পৃথিবী ছেয়ে আসছে, আকাশে দুয়েকটী করে' তারার বাতি জ্বালিয়ে অসীম অন্ধকারে কারা যেন হারানো আলোর কণা খুঁজে বেড়াচ্ছে। চারিদিকের নীরবতা যেন আরো গভীর হ'য়ে জমাট বাঁধল, সে নীরবতার অন্তস্থল থেকে আকাশ বাতাস ব্যাপ্ত করে' গম্ভীর স্তব্ধধ্বনি।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম গোধূলির অন্ধকারে তার দীপ্ত আনন গোধূলি কেশের মধ্যে হারিয়ে গেছে। রহস্যবসনা রহস্যময়ীর মতন আমার সাথে যেন ছায়ামূর্ত্তি চলেছে—চকিতে শিলংয়ের কথা আমার মনে পড়ল। তাকে বল্লাম, কারু সঙ্গে পরিচিত হবার আগেও যে পরিচয় হ'তে পারে, সে কথা তুমি বিশ্বাস কর?

কিছু না বলে' সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি আবার বল্লাম, যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম, সেদিনকার কথা তোমার মনে আছে? তখনো তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি, চোখে চোখ পড়্তেই তুমি মুখ নামিয়ে নিলে, আমিও চোখ ফিরিয়ে নিলাম, কিন্তু তবু আমার সমস্ত দেহ সমস্ত মন দিয়ে সেদিন তোমাকে দেখেছিলাম।

অন্ধকারেও বুঝতে পারলাম তার মুখে হাসির রেখা, তবু কোন কথা সে বল্ল না। কেবল আয়ত নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আবার আমি বল্লাম, আমার সঙ্গে পরিচয়ে তোমাকে দুঃখ পেতে হয়েছে, কিন্তু সে দুঃখ আমি ইচ্ছা করে' দিইনি।

উত্তরে সে বল্ল, ইচ্ছে করে' দিলে কি আমাদের এ বন্ধুত্ব টি'কত?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেবল বন্ধুত্ব? আর কিছু কি সেখানে মেলে না?

চাপা হাসিতে তার কণ্ঠ উচ্ছল হ'য়ে উঠ্‌ল, কেবল বল্ল, প্রশ্ন করে' যার উত্তর জানতে হয়, সে প্রশ্নের উত্তর আমি দিইনে।

চার

অবশেষে আমাদের এ বন্ধুত্বে জাগল নতুন আবেগ এবং তীব্রতা। সহজে যে জিনিষটা বেড়ে উঠে, তার বাড় আমরা বড় একটা লক্ষ্য করি না। সহজে প্রথম দেখায় তাকে ভালবেসেছিলাম বলেই ভালবাসার কথা আমার মনে ওঠেনি। এবার আমাদের কথাবার্ত্তা, আমাদের সম্বন্ধ, আমাদের ব্যবহারের সহজ প্রকাশ হ'ল ব্যহত, নিরন্তর দোটানায় মন হ'য়ে উঠ্‌ল ক্ষুব্ধ। নিজের নিজের মনে যে কথা আমরা জানতাম, দুজনের মধ্যেও তা হ'য়ে গেল জানাজানি, সঙ্গে সঙ্গে উঠ্‌ল নতুন প্রশ্ন, উঠ্‌ল নতুন সন্দেহ, নতুন দ্বিধা।

একদিন তাকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করলাম, এমন করে' আমাদের আর কতদিন চল্‌বে?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি তো শীগ্‌গীরই বিদেশ যাচ্ছ?

আমি বল্লাম, বিদেশ যাচ্ছি সে কথা তুমি জান, এবং যাচ্ছি বলেই তার আগে তোমার কাছে জান্‌তে চাই কি তুমি করবে?

সে ক্লান্ত সুরে বল্ল, ক'রব আবার কি? কী আছে করবার?

হঠাৎ এক ঝলক রাগে আমার মন বিষিয়ে উঠ্‌ল। তীক্ষ্ণতার সঙ্গেই বল্লাম, তোমার এ খেলা আর আমি সহ্য ক'রব না। করবার কী রয়েছে জানো না? আমাদের এতদিনের এত কথা, এত আবেগ কি সবই খেলা?

তার মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, তবু শান্তকণ্ঠে বল্‌ল, তোমার বন্ধুত্বে এতদিন আনন্দ পেয়েছি। এবার তুমি চলে যাচ্ছ বিদেশে, হয়তো চলে যাচ্ছ আমার জীবনের বাইরে, আমি কি বল্‌ব ?

আমার রাগে খেদের রেখা পড়ল, তার কথায় ছিল ভারি একটা হতাশার ভঙ্গি। বল্লাম, তোমার জীবনের বাইরে যেতে চাই, এই কি তুমি ভাব ?

সে বল্ল, কেবল ভাবনার কথা নয়, কিন্তু তাছাড়া উপায়ই বা কী ? তুমি যা চাও, তা হ'তে পারে না।

তখন ফাল্গুন শেষ হ'য়ে চৈত্র পড়েছে। কলকাতার গলিতে গলিতেও বসন্তের উষ্ণ মাদকতার ছোঁওয়া। একটা বাগানওয়ালা বাড়ীর দালান ও গাছ-গুলির উপর দিয়ে দূরে একটা গির্জ্জার চূড়া আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। জানালায় লোহার শিকগুলোর মধ্য দিয়ে অপরাহ্নের রৌদ্র ঘর ভরে ফেলেছে—বহু দূর পর্য্যন্ত আকাশের নীলোজ্জ্বল রৌদ্রপ্লাবন।

তার কথার প্রতিধ্বনি করে' আমি বল্লাম, আমি যা চাই, তাই তো সহজ তাই স্বাভাবিক। আমরা মানুষ—দেহ এবং মন নিয়ে আমাদের কারবার।

সে হতাশভাবে বল্ল, সে কথা তুমি বুঝবে না। দেহ এবং মন নিয়ে কারবার বলেই তো বিপদ। মনের গতি কে রুধবে ? কিন্তু দেহকে বাধা দেয় সমাজ, দেহকে আটকে রাখে অভ্যাসের শৃঙ্খল। রক্তের কণায় কণায় জমে থাকে জন্মজন্মান্তরের সংস্কার, সংস্কারকে যত আঘাত করি, মনের মধ্যে ততই তা গেঁথে যায়, চেতনার অন্তরালে অবচেতনায় গিয়ে জীবনকে বিষিয়ে তোলে।

আমি বল্লাম, সংস্কারকে ভাঙবে না ? নিজের জীবনে যদি তাকে অস্বীকার না করি, তবে তার প্রভাব তার শক্তি ভাঙবে কেমন করে' ?

সে বল্ল, অনেক ভেবেছি আমি। আমার রক্তের মধ্যে বিদ্রোহ, আমার অন্তরাত্মা নিজেই দ্বিভক্ত। সংস্কারকে ভাঙতে হবে, কিন্তু নিজের জীবনে যদি তাকে ভাঙতে চাই, তবে মুহূর্ত্তের কামনায় তা নুয়ে যায়, ঝড়ের ঝাপটায় যেমন করে' গাছ নুয়ে পড়ে' আত্মরক্ষা করে। ঝাপটা চলে যায়, গাছ আবার মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে। সংস্কারকে ভাঙতে হবে তার সমূল উৎপাটন করে'।

আমি বল্লাম, তোমার তর্কই মানছি, কিন্তু ঝড়েও তো গাছ শেকড়শুদ্ধ উপড়ে আসে। সংস্কারকে তেমনি করে' মারো—রক্তে লাগুক ঝড়ের দোলা, জীবনে আসুক সর্ব্বব্যাপী বিদ্রোহ।

সে মাথা নাড়ল, বল্ল—সে হয় না বন্ধু। ব্যক্তির শক্তি আমরা বড় বেশী করে' দেখি বলেই এ কথা বলছ। যে ঝড়ে সংস্কারের গোড়া উপরে আসে, সে ঝড় ব্যক্তির জীবনে আসে না, ব্যক্তি তাকে জাগাতে পারে না। সমাজের শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে সে বিপ্লব যদি আসে, সেদিন আমাকে ফিরে পাবে। সে বিপ্লব আনবার সব চেয়ে বড় বাধা আমাদের দেশে মেয়েদের স্থাবর নিশ্চলতা। মেয়েদের মধ্যে প্রাণের গতি আনবার জন্য আমাকে মুক্তি দাও।

আমি তবু আর একবার বল্লাম, কাজের শক্তি মনের মধ্যে কোথায় পাবে? নিজের জীবন যাদের কানায় কানায় ভরা, তারাই নিজেকে ঢেলে দিতে পারে। তুমি কেবল নিজেকে পঙ্গু করছ না, আমারো কাজের শক্তি কমিয়ে দিলে।

বিষণ্ণ হাসিতে তার মুখ ভরে উঠ্‌ল। বল্ল, জীবনে যা অসম্পূর্ণ থাকে, তারি সাধনায় মানুষ দেশদেশান্তরে যুগে যুগান্তরে খুঁজে ফেরে। আনন্দের ভরা যদি পূর্ণ হ'য়ে উঠে, তবে আর কাজের আগ্রহ থাকবে কেন?

তর্কে কোন লাভ নেই জেনেও বল্লাম, তাই বলে' হতাশার শূন্যে হৃদয় ভরেই কি কাজের প্রেরণা পাবে?

স্থিরদৃষ্টি তাকিয়ে সে বল্ল, বেশী আশা করলে সেটা না পেলে বড় দুঃখ লাগে বলে' আশা করাই ছেড়ে দিয়েছি—হতাশা আসবে কোত্থেকে!

সে চোখ ফিরিয়ে নিল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে' দেখলাম দূরে এক ঝাড় দেবদারু কতগুলি দালানের পেছন থেকে উঁকি মারছে, আকাশের বুকে কী যেন একটা পাখী নিথর নিস্পন্দভাবে ভাসছে। নগরীর সহস্র কর্ম্ম-কোলাহল মিশে দূর থেকে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনের ধ্বনি।

আলোচনা স্তব্ধ হ'য়ে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে কত কি কথা মনে আসছিল। কবে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে, কিংবা জীবনের স্রোতে কে কোথায় ভেসে যাব, তার ঠিকানা কি?

হঠাৎ তার কথায় আমার ঘোর কেটে গেল, শুনলাম সে বলছে, এবার তোমাকে যেতে হবে না?

চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হাতে হাত রেখে ধীরে তাকে বুকে টেনে নিলাম, সেও তেমনি ধীরে সরে গিয়ে বল্ল, যাবার সময় পেছনে বাঁধন রেখে যেতে নেই, নয় কি?

আমি বল্লাম, নিজে যে বাঁধন টেনে নেওয়া যায়, তাকে তো বাঁধন বলা চলে না।

ক্ষীণ হাসির সঙ্গে সে বল্ল, কে জানে?......

ধনিকের আবির্ভাব

কার্ল্ মার্ক্স্

['ক্যাপিটালের' প্রথম খণ্ড ৩৩শ পরিচ্ছেদটী প্রথম কয়েক লাইন বাদ দিয়ে অনুবাদ করে দেওয়া গেল। প্রথম খণ্ডের শেষ কয়েক পরিচ্ছেদে অর্থবান্‌দের মূলধন কি ভাবে বেড়ে এসেছে, তার এক বিশদ বিবরণ মার্ক্স্ দিয়েছেন। নির্ম্মম ঘটনাসন্নিবেশের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা খুবই কম মেলে। বিদেশ লুণ্ঠন করে আর দাসব্যবসায় চালিয়ে ইয়োরোপের ধনিকরা কি ভাবে পুঁজি বাড়িয়েছে, তার পরিচয় এই পরিচ্ছেদে বিশেষ করে পাওয়া যায়। পিউরিটানদের মত যাঁরা ধনসম্পদকে ভক্তের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ মনে করে থাকেন, তাঁদের পক্ষে এ পরিচ্ছেদ পড়াই শক্ত হতে পারে। কিন্তু ধনিকতন্ত্রের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে মার্ক্সের এই বর্ণনা অপরিহার্য্য—অনুবাদক।]

মধ্যযুগ থেকে আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি দুই আলাদা ধরণের মূলধন—সুদখোরের আর সওদাগরের মূলধন। বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক আবেষ্টনে এদের পুষ্টি হয়ে থাকে বটে; কিন্তু শিল্পোৎপাদনে ধনিক-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে এদেরই মূলধন বলে ধরে নেওয়া চলে।

"বর্ত্তমানে সমাজের সমস্ত সম্পদই প্রথমে মূলধনীর কবলে যাচ্ছে। ...জমিদারের খাজনা, মজুরের মজুরী আর টেক্স-দারোগার দাবী মিটিয়ে বছরের যা ফসল তার অধিকাংশই সে নিজের জন্য রাখে। কোন আইন তাকে এই সম্পত্তির অধিকার না দিলেও সে হচ্ছে সমাজের ঐশ্বর্য্যের প্রধান মালিক। ...এই পরিবর্ত্তন ঘটেছে পুঁজির উপর সুদ আদায় করার ব্যবস্থার ফলে। ...আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইয়োরোপের সকল স্মৃতিশাস্ত্রকারই আইন করে সুদ বন্ধ করে এ ব্যবস্থাকে আটকাবার চেষ্টা করেছেন।...দেশের সমস্ত সম্পদের উপর মূলধনীর ক্ষমতার অর্থ হচ্ছে সম্পত্তি বিধানের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন, কিন্তু কোন্ আইনে বা কোন্ আইনপরম্পরায় এ পরিবর্ত্তন বাহাল হয়েছে ?" [১] লেখকের অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে আইন করে কখনও বিপ্লব আনা যায় না।

১ "দি ন্যাচ্‌রল অ্যাণ্ড্ আর্টিফিশ্যল্ রাইট্‌স্ অফ প্রপার্টি কন্‌ট্রাষ্টেড্" (লণ্ডন, ১৮৩২), পৃঃ ৯৮-৯৯ ; "দেন্ হজ্‌স্‌কিনের" অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার।

সুদ আর সওদাগরীর ফলে যে মূলধন জম্‌ছিল, তা গ্রামে জায়গীরদারী ব্যবস্থা আর শহরে বণিক্‌সঙ্ঘের নিয়মকানুনের চাপে শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে নি।[২] জায়গীরদারী ব্যবস্থার যখন পতন হল, দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে অনেকেরই যখন বাসোচ্ছেদ হল, জমি বেদখল হল, তখন শিল্পোৎপাদনের পথে যে বাধা ছিল, তাও দূর হল। নতুন কারখানা খোলা হতে লাগ্‌ল, হয় বন্দরে নয় দেশের মধ্যে এমন যায়গায় যেখানে পুরোণো মিউনিসিপ্যালিটী আর বণিক্‌সঙ্ঘের প্রভুত্ব খাটত না। তাই ইংলণ্ডে পুরোণো শহরের সঙ্গে নতুন শিল্পপ্রধান যায়গাগুলির বহুদিন ধরে বিষম ঝগড়া চলেছিল।

আমেরিকায় সোনারূপার আবিষ্কার, আদিম অধিবাসীদের উচ্ছেদ, বশীকরণ আর খনিগর্ভে জীবন্ত সমাধি, ভারতবিজয় ও লুণ্ঠনের আরম্ভ, ব্যবসার জন্য কৃষ্ণকায়দের শীকার উদ্দেশ্যে আফ্রিকাকে একরকম ইজারা নেওয়া—এ সবই ছিল ধনিক শিল্পোৎপাদন যুগের গোলাপী উষার পূর্ব্বাভাষ। এই সব মনোরম ব্যাপার ছিল প্রাথমিক ধনসঞ্চয়ের প্রধান প্ররোচক। এর পরই সমস্ত পৃথিবীকে রঙ্গভূমি করে নানা ইয়োরোপীয় জাতির মধ্যে বাণিজ্যযুদ্ধ লেগে যায়। যুদ্ধ আরম্ভ হয় স্পেনের বিরুদ্ধে ওলন্দাজদের বিদ্রোহে; তারই বিরাট বিস্তার দেখা যায় ফরাসী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সংগ্রামে; আজও জোর করে চীনকে আফিম আমদানী করানোর জন্য যে যুদ্ধ চলছে, তাতে তার চিহ্ন রয়েছে।

স্পেন, পর্ত্তুগাল, হলাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে প্রাথমিক ধনসঞ্চয়ের বিভিন্ন প্রেরণার চিহ্ন মোটের উপর কালানুক্রমিকভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে তার একটা সুব্যবস্থিত রূপ দেখা যায়; সে রূপের উপাদান হচ্ছে উপনিবেশ, সরকারী দেনা, আধুনিক রাজস্বব্যবস্থা, শিল্পসংরক্ষণনীতি। এই সব ব্যাপার—যেমন ধরা যাক্‌, উপনিবেশব্যবস্থা—আংশিকভাবে নির্ভর করে পশুবলের উপর। কিন্তু সর্ব্বদাই রাষ্ট্রশক্তিকে বা সমাজের কেন্দ্রীভূত ও সুবিন্যস্ত শক্তিকে হাপোরের মত ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যথাসম্ভব অল্প সময়ে শিল্পোৎপাদনের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ধনিকব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। প্রাচীন সমাজ যখন নতুন সমাজকে জন্ম দেয়, তখন শক্তি হয় ধাত্রী। এ শক্তিই অর্থনৈতিক।

---

২ এমন কি, ১৭৯৪ সালেও লীড্‌সের কাপড়ওয়ালারা পার্লামেন্টে দরখাস্ত করেছিল, যাতে সওদাগররা কারখানা বসাতে না পারে।

খ্রীষ্টানদের উপনিবেশব্যবস্থা সম্বন্ধে খ্রীষ্টধর্ম্মবিশারদ উইলিয়ম হাউইট্ বলেন : "পৃথিবীর সর্ব্বত্র, পরাজিত জাতিদের উপর তথাকথিত খ্রীষ্টানরা যে নৃশংস ও প্রচণ্ড অত্যাচার করেছে, কোন যুগে, কোন হিংস্র, অশিক্ষিত, নির্ম্মম, নির্লজ্জ জাতিও তা করে নি।"[৩] সপ্তদশ শতকে হলাণ্ড ছিল সম্পন্ন জনপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর হলাণ্ডের ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস হচ্ছে "প্রতারণা, ঘুষ, নরহত্যা আর নীচতার এক অদ্ভুত বিবরণ।"[৪] জাভায় ক্রীতদাস সরবরাহ করার জন্য মানুষ চুরি করা ছিল তাদের এক প্রধান বিশেষত্ব। এই উদ্দেশ্যে মানুষ-চোরদের ভাল করে শিক্ষা দেওয়া হত। এ ব্যবসায় মাতব্বর ছিল চোর, দো-ভাষী আর বিক্রেতা ; সেখানকার উপরাজারা ছিল প্রধান বিক্রেতা। দাসবাহী জাহাজ তৈরী হওয়া পর্য্যন্ত সেলীব্স্ দ্বীপের গুপ্ত কারাগৃহে চুরি-করে-আনা যুবকদের আটকে রাখা হত। এক সরকারী বিবরণে দেখা যায় : "এই ম্যাকাসার শহরে অনেক গোপন কারাগার আছে, প্রত্যেকটিই অতি ভয়ঙ্কর ; বহু হতভাগাকে সেখানে পোরা হয়েছে, লোভ আর অত্যাচারপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য তারা হয়েছে বলি. জোর করে তাদের বাড়ী থেকে কেড়ে এনে শিকল বেঁধে রাখা হয়েছে।" মালাক্কা অধিকার করার জন্য ওলন্দাজরা সেখানকার পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তাকে ঘুষের আশা দিয়ে বশ করেছিল ; সে তাদের শহর ছেড়ে দেওয়া মাত্র তারা তাকে বাড়ী চড়াও হয়ে খুন করে, উদ্দেশ্য ছিল তার কৃতঘ্নতার মূল্য ২১,৮৭৫ পাউণ্ড না দেওয়া ! তারা যেখানেই পদার্পণ করেছে, সেখানে দেশ উজাড় হয়েছে, জনশূন্য হয়েছে। ১৭৫০ সালে জাভার এক প্রদেশ বাঞ্জুওয়াঙ্গির লোকসংখ্যা ছিল ৮০০০০এর বেশী ; ১৮১১ সালে মাত্র ১৮০০০এ দাঁড়িয়েছিল। মধুর বাণিজ্য !

সকলেই জানে যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা ছাড়া চায়ের কারবার, চীনের সঙ্গে ব্যবসা আর ইয়োরোপ থেকে মাল আমদানী রপ্তানীর একচেটে অধিকার যোগাড় করেছিল। কিন্তু দেশের মধ্যে আর ভারতবর্ষের বন্দর ও কাছাকাছি দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে ব্যবসার একচেটে অধিকার ছিল কোম্পানীর

৩ "কলোনাইজেশন অ্যাণ্ড ক্রিশ্চ্যানিটি", লণ্ডন, ১৮৩৮, পৃঃ ৯। ক্রীতদাসদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে শার্ল্ কঁৎ, "ত্রেতে দ্য লা লেজিস্লাসিয়ঁ," তৃতীয় সংস্করণ, ব্রুসেল, ১৮৩৭, প্রণিধানযোগ্য।

৪ টমাস্ ষ্ট্যাম্ফর্ড র্যাফ্ল্স্ (জাভার পূর্ব্বতন ছোটলাট), "হিষ্ট্রি অফ জাভা অ্যাণ্ড ইট্স ডিপেণ্ডেন্সিজ্।" লণ্ডন, ১৮১৭।

বড় বড় কর্ম্মচারীদের। লবণ, আফিম, সুপারি ও অন্যান্য পণ্যের একচেটে কারবার ছিল একরকম সোনার খনি। কর্ম্মচারীরা নিজেরাই দাম স্থির করত আর ইচ্ছা-মত দুর্ভাগ্য ভারতীয়দের সম্পত্তি লুণ্ঠন করত। স্বয়ং বড়লাট এই গোপন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকতেন। তাঁর প্রিয়পাত্রেরা এমন সব কণ্ট্র্যাক্ট যোগাড় করত, যার দৌলতে তারা যেন ভোজবাজিতে ধূলোকে সোনা করতে পারত। ব্যাঙের ছাতার মত রাতারাতি বড় বড় সম্পত্তি গজিয়ে উঠ্‌ত; একটা শিলিং পর্য্যন্ত না খাটিয়ে পুঁজি বেড়ে যেত। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিচারকালে এরকম ঝুড়ি ঝুড়ি ঘটনার খোঁজ পাওয়া গেছ্‌ল। একটা নমুনা নেওয়া যাক্‌। সালিভান নামে কে একজন আফিমের কণ্ট্র্যাক্ট পেয়েছিল; পাবার পর সে দেশের এমন এক যায়গায় বদ্‌লি হয় যেখান থেকে আফিম যে সব জেলায় উৎপন্ন হত, তা বহু দূর। তাই বুদ্ধিমান্‌ সালিভান বিন্‌-নামা এক ইংরেজকে ৪০০০০ পাউণ্ডে নিজের স্বত্ব বেচে দেয়; সেই দিনই বিন্‌ ৬০০০০ পাউণ্ডে আর একজনকে তা বেচে, আর শেষ পর্য্যন্ত হাত বদ্‌লে যে ক্রেতা কণ্ট্র্যাক্ট সরবরাহ করেছিল, সেও প্রচুর লাভ করেছিল। পার্লামেণ্টে যে-সব তালিকা পেশ করা হয়েছিল, তার একটা থেকে জানা যায় যে ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ সালের মধ্যে কোম্পানী আর কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা ভারতীয়দের কাছ থেকে উপহার হিসাবে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পেয়েছিল। ১৭৬৯ আর ১৭৭০ সালে ইংরেজরা সমস্ত চাল কিনে রেখে অসম্ভব দামে বেচ্‌তে চেয়ে এক দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছিল।[৫]

আদিম অধিবাসীদের উপর দারুণ অত্যাচার হয়েছিল প্রধানত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মত উপনিবেশে, যেখানে রপ্তানীর জন্য আবাদের ব্যবস্থা হচ্ছিল, আর মেক্সিকো ও ভারতবর্ষের মত সমৃদ্ধ ও জনাকীর্ণ দেশে, যেখানে মহোল্লাসে লুণ্ঠন সুরু হয়ে গেছ্‌ল। কিন্তু "আসল" উপনিবেশগুলিতেও প্রাথমিক ধনসঞ্চয়ের খ্রীষ্টীয় প্রকৃতি সুস্পষ্ট দেখা যায়। ১৭০৩ সালে ইংলণ্ডের পিউরিটানরা—যাঁরা ছিলেন প্রটেষ্টাণ্টবাদের মিতাচারী ধর্ম্মধুরন্ধর—আইন করেছিলেন যে কোন রেড ইণ্ডিয়ানের মাথার চামড়া আনলে বা তাকে পাকড়াও করে আনতে পারলে ৪০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে; ১৭২০ সালে পুরস্কারের বহর বাড়িয়ে ১০০ পাউণ্ড করা হয়; ১৭৪৪ এ "মাসাশুসেট্‌স্‌-বে" থেকে এক জাতিকে বিদ্রোহী ঘোষণা করার পর

৫ ১৮৬৬ সালে শুধু উড়িষ্যাতেই দশ লক্ষের অধিক লোক ক্ষুধার জ্বালায় মরতে বাধ্য হয় তবুও চড়া দামে খাদ্যদ্রব্য বেচে সরকারী ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল।

দরের হার এই রকম স্থির হয় : বারো বছর বা তার বেশী বয়সী রেড্ ইণ্ডিয়ানের মাথার চামড়ার জন্য ১০০ পাউণ্ড, পুরুষ বন্দীর জন্য ১০৫ পাউণ্ড, স্ত্রীলোক ও শিশু বন্দীর জন্য ৫০ পাউণ্ড, স্ত্রীলোক বা শিশুর মাথার চামড়ার জন্য ৫০ পাউণ্ড। কিছুকাল পরে যখন ধর্ম্মাত্মা 'পিল্‌গ্রিম্ ফাদার্সের' বংশধররা রাজদ্রোহী হয়ে উঠেছিল, তখন উপনিবেশব্যবস্থা তাদেরই উপর প্রতিহিংসা নেয়। ইংরেজের টাকা ও প্ররোচনায় রেড্ ইণ্ডিয়ানরা তখন তাদের অনেককে কুঠার দিয়ে হত্যা করেছিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ঘোষণা করেছিল যে ডালকুত্তা লাগানো আর মাথার চামড়া উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে বিদ্রোহদমনের "ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট ও স্বাভাবিক উপায়"!

উষ্ণগৃহের মত উপনিবেশব্যবস্থার আশ্রয়ে ব্যবসা ও জাহাজী বাণিজ্য বাড়তে লাগ্‌ল। বিকাশোন্মুখ শিল্পের পক্ষে প্রয়োজন ছিল বাজার; উপনিবেশব্যবস্থার ফলে সে বাজার মিল্‌ল, আর একচেটে বাজার জোটার পর ব্যবসায়ীর পুঁজি বেড়ে চল্‌ল। সোজাসুজি লুটতরাজ আর খুনখারাপী আর মানুষকে ক্রীতদাস করে ইয়োরোপের বাইরে যে ধনরত্ন অপহরণ করা হল, তা দেশে ফিরে মূলধনে পরিণত হল। উপনিবেশব্যাপারে হলাণ্ড দেশই প্রথম অগ্রসর হয়; ১৬৪৮এ হলাণ্ডের বাণিজ্যসম্পদের পরাকাষ্ঠা হয়েছিল। "ভারতবর্ষের বাণিজ্য আর ইয়োরোপের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণ থেকে উত্তরপশ্চিম পর্য্যন্ত ব্যবসার একচেটে অধিকার ওলন্দাজদের ছিল। মৎস্য-ব্যবসায়ে, জাহাজী-বাণিজ্যে, শিল্পোৎপাদনে হলাণ্ড ছিল সব দেশের সেরা। ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্রের মোট মূলধন বোধ হয় অবশিষ্ট ইয়োরোপের মূলধনের চেয়ে বেশী ছিল।" একথা যিনি বলেছেন, সেই গুলিখ সাহেব কিন্তু বলেন নি যে ১৬৪৮এ ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় হলাণ্ডের সাধারণ লোক বেশী খাটতে বাধ্য হত, বেশী গরীব অবস্থায় থাকত, আর বেশী অত্যাচার সহ্য করত।

আজকাল শিল্পপ্রাধান্যের অর্থই হচ্ছে ব্যবসায় প্রাধান্য। কিন্তু শিল্পনির্ম্মাণের যুগে ব্যবসায় প্রাধান্যের ফলেই শিল্পপ্রাধান্য পাওয়া যেত। এই কারণেই সেই সময় উপনিবেশব্যবস্থার অতিরিক্ত গুরুত্ব ছিল। ঐ ব্যবস্থাই এক "বিচিত্র দেবতা" সেজে ইয়োরোপের প্রাচীন দেবতাদের সঙ্গে বেদীর উপর গালে গাল দিয়ে বসেছিল, আর এক শুভদিনে তাদের সকলকে ধাক্কা আর লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল। নতুন দেবতা তখন ঘোষণা করল যে মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মোটা মুনফা যোগাড় করা।

সর্ব্বসাধারণের ধার বা সরকারী দেনার ("National Debt") বন্দোবস্ত মধ্যযুগে প্রথম জেনোয়া ও ভিনিসে আরম্ভ হয়, শিল্পনির্ম্মাণের যুগে সমস্ত ইয়োরোপে

ছড়িয়ে পড়ে। নৌবাণিজ্য আর বাণিজ্যযুদ্ধ নিয়ে উপনিবেশব্যবস্থা তাকে তাড়াতাড়ি বাড়াতে থাকে। তাই হলাণ্ডে সরকারী দেনার যথার্থ গোড়াপত্তন হয়। রাষ্ট্র যেরূপই হোক্, স্বৈরতন্ত্র, নিয়মতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র নির্বিশেষে সরকারী দেনা হল ধনিকযুগের লক্ষণ। বর্ত্তমান যুগে জাতীয় সম্পদের মধ্যে একমাত্র সরকারী দেনা জাতির সমষ্টিগত অধিকারে এসেছে।[৬] তাই আধুনিক কালে নিয়ম হয়েছে যে, যে জাতির দেনা বেশী, সে জাতির সমৃদ্ধিও বেশী। ধনিকের মূলমন্ত্র হল সাধারণের নামে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা সৃষ্টি। সরকারী দেনা যতই বাড়তে লাগল, ততই সরকারী দেনায় অবিশ্বাস অমার্জ্জনীয় হয়ে দাঁড়াল, পরমপুরুষে অবিশ্বাসের সামিল হল।

পুঁজি সঞ্চয় ব্যাপারে সরকারী দেনা হয়েছিল একটা প্রধান সহায়। অনুর্ব্বর মুদ্রা যেন ঐন্দ্রজালিকের মোহন যষ্টি স্পর্শে সন্তানপ্রজননের শক্তি পেল, শিল্পে বা ধারে টাকা খাটাতে গেলে যে অসুবিধা ও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাকে এড়িয়ে মূলধনে পরিণত হল। যারা ঋণদাতা, আসলে তারা কিছুই দিল না, কারণ ধার-দেওয়া টাকা তারা 'কোম্পানীর কাগজে' ফিরে পেল, সে কাগজ সহজে ভাঙানো চলে, নগদ টাকার সঙ্গে তার তফাৎ কিছু নেই। কিন্তু এ ছাড়া এর ফলে বার্ষিক বৃত্তিভোগী এক শ্রেণীর অলস অর্থবানের সৃষ্টি হল, হরেক-রকমের দালাল রোজগারের পথ পেল, যৌথ কারবারের পত্তন হল, হুণ্ডির ব্যবসা সুরু হল, টাকার বাজারে জুয়াখেলার ব্যবস্থা হল, আর এখনকার কালে ব্যাঙ্কের রাজত্ব আরম্ভ হল।

দেশের নাম নিয়ে যখন বড় বড় ব্যাঙ্কের জন্ম হয়, তখন তারা ছিল শুধু ধড়িবাজ ব্যবসায়ীদের সমিতি। তারা প্রায় সরকারের সমপর্য্যায়ে উঠল, আর নিজেদের বিশেষ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠ করে সরকারকে টাকা ধার দিতে পারল। ১৬৯৪ সালে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড স্থাপনের সময় থেকে শ্রেষ্ঠীকুলের প্রভাব বেড়ে আসছে। সরকারী দেনা যত বাড়ে, ব্যাঙ্কের অবস্থা আর খাতির ততই বাড়তে থাকে। ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড প্রথমে শতকরা আট টাকা হারে সরকারকে ধার দিয়েছিল; তখনই পার্লামেণ্ট ব্যাঙ্ককে নোট প্রচার করবার অধিকার দেয়। হুণ্ডির উপর বা মাল খরিদের জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়া ও সোনারূপা কেনা প্রভৃতির জন্য

৬ উইলিয়ম কবেট বলেন যে ইংলণ্ডে সমস্ত সাধারণ প্রতিষ্ঠানের আখ্যা হচ্ছে "রাজকীয়" (Royal); ক্ষতিপূরণের জন্যই বোধ হয় "জাতীয়" (National) দেনার ব্যবস্থা আছে।

এই নোটগুলি কাজে লাগে। শীঘ্রই ব্যাঙ্কের এই নোটেই সরকারকে টাকা ধার দেওয়া হয়, ঐ নোটেই সরকারী দেনার সুদ ফেরৎ পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক যে কেবল এক হাতে কিছু দিয়ে অন্য হাতে অনেক বেশী ফেরৎ নিল তা নয়, চিরকালের জন্য দেশের মহাজন হয়ে রইল। ক্রমে ব্যাঙ্কেই দেশের সোনারূপা জমা হল, ব্যবসায়ীদের পরস্পর বিশ্বাস বজায় রাখার কেন্দ্রস্থল হল ব্যাঙ্ক। সমসাময়িকরা ব্যাঙ্কওয়ালা, মহাজন, দালাল, ঠিকাদার-দলের আকস্মিক আবির্ভাবকে কি চোখে দেখেছিল তা বোলিংব্রোক প্রভৃতির লেখা থেকে প্রমাণ হয়।[৭]

সরকারী দেনার সঙ্গে সঙ্গে মূলধনসঞ্চয়ের আর এক উৎস, আন্তর্জাতিক ঋণব্যবস্থার উদ্ভব হয়। হলাণ্ডের ধনসম্পদের এক গোপন কারণ ছিল ভিনিসের চৌর্যাপদ্ধতি; ভিনিসের অবনতির যুগে সেখান থেকে হলাণ্ডে বহু টাকা ধার যায়। হলাণ্ড আর ইংলণ্ডের বেলাতেও ঐ ব্যাপার ঘটে। অষ্টাদশ শতকের প্রথমে ওলন্দাজ শিল্পকাররা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়েছিল। বাণিজ্য ও শিল্পে হলাণ্ড আর প্রধান জনপদ রইল না। তাই ১৭০১ থেকে ১৭৭৬ পর্য্যন্ত হলাণ্ডের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইংলণ্ড বহু টাকা ঋণ পায়। আজ আবার ইংলণ্ড আর আমেরিকার মধ্যে ঐ ঘটনাপরম্পরা চলেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আজ যে মূলধন খাটছে, তার জন্ম সম্বন্ধে প্রমাণ দাখিল করা হয় না; কিন্তু কাল তা ছিল ইংলণ্ডের শিশুদের রক্তে তৈরী টাকা।

সরকারী দেনার সুদ দেশের রাজস্ব থেকে দিতে হয়; তাই আধুনিক রাজস্বব্যবস্থা ঐ দেনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সরকার যখন বিশেষ খরচ মেটাবার জন্য টাকা ধার করে, করদাতারা তখনই তার বোঝা বোঝে না বটে, কিন্তু ধার নেওয়ার ফলে করবৃদ্ধি দরকার হয়ে পড়ে। অন্যদিকে দেনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর বেড়ে যায় বলে সরকারকে সর্ব্বদাই অপ্রত্যাশিত খরচের জন্য নতুন দেনা করতে হয়। তাই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর টেক্স বসে, জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যায়। রাজস্বব্যবস্থার স্বভাবই এমন যে টেক্সের হার আপনা-আপনিই বাড়তে বাধ্য। এই ব্যবস্থার প্রথম পত্তন হয় হলাণ্ডে; সেখানকার এক প্রধান দেশভক্ত নেতা ডি উইট, তাঁর "নীতিকথা" পুস্তকে বলেন যে শ্রমিকদের

৭ "আজ যদি তাতাররা ইয়োরোপ ভাসিয়ে দেয়, তাহলে তাদের পক্ষে দরকার হবে আমাদের শোনানো যে আমাদের মধ্যে শুধু এক নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছে।"—মন্তেস্কিয়্য, "এস্প্রি দ্য লোয়া," তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৩, লণ্ডন, ১৭৬৯।

সহজবাধ্য, মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী রাখতে হলে এ ব্যবস্থা সব চেয়ে ভাল। এর ফলে শ্রমিকদের অবস্থা যে হীন হয়ে পড়ে, আর চাষী, মজুর ও নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণী যে অধিকারভ্রষ্ট হয়, সেকথা এখন বলার প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্‌রা একমত। শিল্পসংরক্ষণনীতির দরুণ এ ব্যবস্থা আরও গুরুতর হয়ে পড়ে, গরীবের দুর্দ্দশা বাড়ে।

সরকারী দেনা আর রাজস্বব্যবস্থার ফলে জাতির সম্পদ কয়েকজন অর্থবানের মূলধনে পরিণত হয়েছে আর জনসাধারণের স্বত্ব নষ্ট হয়েছে। কিন্তু কবেট, ডব্‌ল্‌ডে প্রভৃতি এই ব্যাপারে যে এ-যুগে জনসাধারণের দুর্গতির মূলকারণ দেখেছেন, তা যথার্থ নয়।

শিল্পসৃষ্টি, স্বাধীন শ্রমিকের স্বত্বচ্যুতি, জাতীয় সম্পদকে কয়েকজনের মূলধনে পরিণত করা, মধ্যযুগের উৎপাদনব্যবস্থা থেকে আধুনিক ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তনকে জোর করে সংক্ষিপ্ত করার এক কৃত্রিম উপায় হচ্ছে সংরক্ষণনীতি। এই আবিষ্কার নিয়ে ইউরোপের নানা জাতি নিজেদের ছিন্নভিন্ন করেছে; মোটা মুনফা-ওয়ালাদের কাজে একবার এসে লাগবার পর শুধু যে স্বদেশের লোক আমদানী কমা আর রপ্তানী বাড়ার দরুন ভুগেছে তা নয়; ইংরেজ যেমন আয়ার্লণ্ডে পশম শিল্প তুলে দিয়েছিল, তেমনি সকল পরাধীন দেশে শিল্পকে জোর করে উৎপাটিত করা হয়েছিল। ইউরোপে কলবার্টের দৃষ্টান্তের পর ব্যাপারটা আরও সহজ হয়ে যায়। তখন সরকারী তোষাখানা থেকে শিল্পীর মূলধন আংশিকভাবে আসতে থাকে। মিরাবোর একটা কথা এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যায়: "যুদ্ধের পূর্ব্বে স্যাক্সনির শিল্পপ্রাধান্যের কারণ খোঁজার জন্য বেশী দূর যাবার প্রয়োজন নেই; কারণ হচ্ছে ১৮ কোটী মুদ্রার রাজঋণ!" [৮]

আধুনিক শিল্পের শৈশবকালে উপনিবেশব্যবস্থা, সরকারী দেনা, দুর্ব্বহ রাজস্ব, সংরক্ষণনীতি, বাণিজ্যযুদ্ধ প্রভৃতি প্রচণ্ডভাবে বেড়ে উঠে। এক বিরাট নির্দ্দোষসংহার হয় আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত। রাজকীয় নৌবাহিনীর নাবিকদের মত কারখানায় মজুরদের জোর করে পাকড়াও করে এনে কাজে লাগানো হয়। এবিষয়ে সার এফ, এম, ঈড্‌নের মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পঞ্চদশশতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে তাঁর নিজের যুগ পর্য্যন্ত চাষীদের বেদখল করার বিভীষিকা সম্বন্ধে তিনি নির্ব্বিকার ছিলেন; ঐ ব্যাপারকে তিনি কৃষিকর্ম্মে ধনিকব্যবস্থা প্রবর্ত্তন এবং

৮ "দ্য লা মনার্কি প্রুসিয়ান," লণ্ডন, ১৭৮৮, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১০১।

"কৃষিভূমি ও পশুচারণ ভূমির মধ্যে ন্যায্য অনুপাত" রক্ষার পক্ষে "একান্ত প্রয়োজন" মনে করতেন; কিন্তু ধনিক ও শ্রমিকের "প্রকৃত সম্পর্ক" স্থাপন এবং অর্থলোভে কারখানার জন্য শিশু-অপহরণ ও শিশু-দাস্য সমর্থন করার মত অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি তিনি দেখাতে পারেন নি। তিনি বলেছেন: "ব্যবসায় সাফল্যের জন্য গরীব ঘরের শিশু লুঠ করে আনা; পালা করে সারা রাত তাদের কারখানায় খাটানো; যে বিশ্রাম সকলের পক্ষে, আর বিশেষত শিশুদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, সে বিশ্রাম কেড়ে নেওয়া; যে অবস্থায় থাকলে কুদৃষ্টান্তে লাম্পট্য ও ব্যভিচার বাড়তে বাধ্য, সেইভাবে বিভিন্ন বয়সের ও স্বভাবের বালক বালিকাকে একত্র রাখা—এই সব ব্যাপারে ব্যক্তিগত বা সামাজিক কল্যাণ ঘটবে কি না, তা সাধারণের বিবেচনা করা উচিত।"[৯]

জন ফীল্‌ডেনের কথা এখানে উদ্ধৃত করা যায়: "ডার্ব্বি, নটিংহাম, আর বিশেষত ল্যাঙ্কাশায়ার জেলায়, যেখানে জল তুলিবার চাকা চালানো যায় এমন নদীর ধারে, বড় বড় কারখানায় নতুন কলকব্জা বসানো হয়। শহর থেকে দূরে এই সমস্ত জায়গায় হঠাৎ হাজার হাজার মজুর দরকার পড়ে। ল্যাঙ্কাশায়ারের লোকসংখ্যা পূর্ব্বে খুব কম ছিল ও জমি অনুর্ব্বর ছিল বলে তখন সেখানে লোক-বৃদ্ধি খুব প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। ছোট ছেলেদের হালকা আঙুলে কাজ ভালো হয় বলে তখনই লণ্ডন, বার্মিংহাম ও অন্যান্য যায়গার অনাথশালা থেকে "শিক্ষানবিশ" যোগাড় করার প্রথা আরম্ভ হয়। সাত থেকে তের চোদ্দ বছরের হাজার হাজার দুর্ভাগ্য বালককে এইভাবে উত্তরে পাঠানো হয়। মালিক তার শিক্ষানবিশদের জামাকাপড় দিত আর কারখানার কাছে এক বাড়ীতে তাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করত। তাদের তদারক করার জন্য যে সব কর্ম্মচারী ছিল, তারা তাদের যথাসম্ভব খাটিয়ে নিত; জোর করে যতটা কাজ তারা করাতে পারত, সেই অনুপাতে তারা বেতন পেত। এর ফল অবশ্য হত নিষ্ঠুর ব্যবহার।...... শিল্পপ্রধান জেলাগুলিতে আর বিশেষত আমার নিজের জেলা, অপরাধী ল্যাঙ্কাশায়ারে নির্দ্দোষ, নির্ব্বান্ধব বালকদের উপর হৃদয়বিদারক, নৃশংস ব্যবহার করা হত। অতিরিক্ত খাটিয়ে তাদের একেবারে মরণের কিনারা পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হত। তাদের যন্ত্রণা দেওয়া হত নানা ভাবে, চাবুক মেরে, হাতে পায়ে বেড়ী লাগিয়ে। চাবুক মেরে খাটাতে গিয়ে অনেক সময় তাদের না খাইয়ে অস্থিচর্ম্মসার করা হত।

৯ প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪২১।

এক একবার তারা অত্যাচারের জ্বালায় আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করেছে। ডার্ব্বিশায়ার, নটিংহামশায়ার, ল্যাঙ্কাশায়ারের অদ্ভুত সুন্দর উপত্যকাগুলি লোকচক্ষু থেকে দূরে আছে বটে; কিন্তু কত নিঃসঙ্গ হতভাগা সেখানে নির্য্যাতিত হয়েছে, কত নরহত্যা পর্য্যন্ত সেখানে ঘটেছে! প্রচুর লাভ সত্ত্বেও মালিকদের বুভুক্ষা তুষ্ট না হয়ে উত্তেজিতই হয়েছিল। কি উপায়ে অজস্র লাভ হতে পারে, সেই চেষ্টায় রাত্রিতে কাজের ব্যবস্থা হয় অর্থাৎ একদলকে সারাদিন খাটিয়ে আর এক দলকে সারারাত খাটানো হয়। দুদলেরই বিছানা ছিল এক; রাত্রির দল যে বিছানা ছেড়েছে, সেই বিছানায় দিনের দলকে শুতে হত, তেমনি দিনের দল বিছানা ছাড়লে রাত্রির দল ঢুকত। ল্যাঙ্কাশায়ারে একটা কিম্বদন্তি ছিল যে ঐ বিছানাগুলি কখনও ঠাণ্ডা হতে পারত না।" [১০]

শিল্পোৎপাদনে ধনিকব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের জনমত একেবারে নির্লজ্জ ও বিবেকবর্জ্জিত হয়ে পড়ে। ইয়োরোপীয় জাতিরা কর্ত্তব্য বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে ধনিকের অর্থবৃদ্ধির ঘৃণিত অপচেষ্টা নিয়েই গর্ব্ব করতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গুটালক্ষার এ, অ্যাণ্ডারসনের অকপট "অ্যানাল্‌স্ অফ কমার্স" পাঠ করা যেতে পারে। এই বইয়ে ইংরেজদের রাষ্ট্রকৌশলের জয়জয়কার প্রমাণ করার জন্য সগর্ব্বে দেখানো হয়েছে যে ১৭১৫ সালে য়ুট্রেখ্‌টের সন্ধিতে ইংলণ্ড স্পেনের কাছ থেকে আফ্রিকা হতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও দক্ষিণ আমেরিকায় কাফ্রি ক্রীতদাস

---

১০ পৃঃ ৫, ৬। কারখানা ব্যবস্থার পূর্ব্বতন কলঙ্ক সম্বন্ধে ডক্টর একিনের পুস্তক (১৭৯৫) পৃঃ ২১৯, গিস্‌র্ণ, "এন্‌কোয়ারি ইন্‌টু দি ডিউটিজ্ অফ ম্যান" (১৭৯৫), দ্বিতীয় খণ্ড, দ্রষ্টব্য। বাষ্পযন্ত্রের কল্যাণে যখন ঝরণা, নদীতট প্রভৃতির বদলে শহরের মধ্যেই কারখানা খোলা সম্ভব হল, তখন "মিতাচারী" মুনফা-ভক্তদের আর অনাথশালা থেকে "শিক্ষানবিশ" পাকড়াও করার দরকার রইল না। ১৮১৫ সালে পার্লামেন্টে শিশুদের মঙ্গল উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত আইন আলোচনার সময় অর্থনীতিবিদ্ রিকার্ডোর বিশেষ বন্ধু ফ্রান্সিস্ হর্ণার বলেন: "এক দেউলিয়ার সম্পত্তির মধ্যে একদল ছেলে বিক্রয়ের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়েছিল, তা এখন প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েছে। দু' বছর আগে আদালতে এক মামলায় দেখা গেছল যে অনেকগুলি ছেলেকে এক মালিক আর এক মালিকের কাছে বিক্রয় করেছিল; কয়েকজন দয়ালু ভদ্রলোক দেখেছিলেন যে ছেলেগুলি একেবারে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতের মত। কয়েক বছর আগে লণ্ডনের এক অনাথশালার কর্তৃপক্ষ ল্যাঙ্কাশায়ারের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে চুক্তি করেছিল যে প্রতি কুড়িজন প্রকৃতিস্থ বালকের সঙ্গে অন্তত একজন হাবাগোবা ধরণের ছেলে পাঠাতে হবে!"

চালান দেবার ব্যবসা কেড়ে নেয়। এর ফলে ইংলণ্ড ১৭৪৩ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর দক্ষিণ আমেরিকায় ৪৮০০ কাফ্রি ক্রীতদাস সরবরাহ করার অধিকার পায়। ইংরেজদের এই চৌর্য্য-ব্যবসার উপর এই ভাবে সরকারী ঢাকনা দেওয়া হয়। দাসব্যবসায়ে লিভারপুলের সমৃদ্ধি বাড়তে থাকে। এই ছিল লিভারপুলের প্রাথমিক ধনসঞ্চয়ের উপায়। এখনও লিভারপুলের "সম্ভ্রান্ত" ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে একিনের পূর্ব্বোদ্ধৃত লেখা থেকে বলা যায় যে "একই সময় দাসব্যবসায় ও লিভারপুলের ব্যবসায়ীদের নির্ভয় সাহস একত্রিত হয়ে তাদের বর্ত্তমান সম্পদ এনে দিয়েছে; এর ফলে জাহাজীদের কাজ বেড়েছে, দেশের শিল্পের চাহিদা খুব বেড়ে গেছে" (৩৩৯ পৃঃ)। ১৭৩০ সালে লিভারপুলে দাসব্যবসায়ের জন্য ৩০ খানি জাহাজ চল্‌ত; ১৭৬০ সালে ৭৪ খানি; ১৭৭০ সালে ৯৬; ১৭৯২ সালে ছিল ১৩২।

কার্পাস শিল্প ইংলণ্ডে শিশু-দাস্য প্রবর্ত্তন করেছিল, আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রাচীন কুলপতিশাসিত দাসপ্রথার বদলে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নির্ম্মম শোষণ-ব্যবস্থা স্থাপনে প্ররোচনা দিয়েছিল। সত্যই ইয়োরোপে মজুরদের ছদ্মবেশী দাসত্বের পাদাধার রূপে আমেরিকায় অমিশ্র দাসত্বের প্রয়োজন ছিল।[১১]

এ সমস্ত ব্যাপার ঘটেছিল যাতে শিল্পোৎপাদনে ধনিকতন্ত্রের "শাশ্বত প্রকৃতিগত ব্যবস্থা" স্থাপন হতে পারে, যাতে মজুরীর বন্দোবস্তের উপর মজুরের কোন হাত না থাকে, যাতে সমাজের একপ্রান্তে উৎপাদন ও জীবিকার্জ্জনের সামাজিক উপকরণকে মূলধনে, আর অন্য প্রান্তে জনসাধারণকে আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার কৃত্রিম কীর্ত্তি, "স্বাধীন গরীব মজুরে" পরিণত করা যায়।[১২]

১১ ১৭৯০ সালে ইংরেজশাসিত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে একজন স্বাধীন প্রজা থাকলে দশজন দাস থাক্‌ত, ফরাসী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ছিল একজন স্বাধীন থাকলে চোদ্দজন দাস, ওলন্দাজ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ছিল একজন স্বাধীন থাক্‌লে তেইশজন দাস। (হেনরি ব্রুহম, "এনকোয়ারি ইনটু দি কলোনিয়াল পলিসি অফ দি ইয়োরোপীয়ান পাওয়ার্স," এডিন্‌, ১৮০৮, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৪)।

১২ বেতনভোগী শ্রমিকের উদ্ভবের সময় থেকে "গরীব মজুর" এই কথাটী ইংলণ্ডের আইনে দেখা যায়। ভিক্ষুক প্রভৃতি "অলস গরীব", আর পাখা-না-ছেঁড়া পায়রার মত যাদের কিছু জমি বা উপার্জ্জনের উপায় ছিল, তাদের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য দেখবার জন্য ঐ কথা ব্যবহার হত। আইন-বই থেকে ক্রমে তা আডাম স্মিথ, ঈডন্‌ প্রভৃতি অর্থনীতিবিদের লেখায় প্রবেশ করে। যে "জঘন্য রাজনৈতিক বুজরুকিওয়ালা" এডমণ্ড বার্ক "গরীব মজুর" কথাটীকে "জঘন্য রাজনৈতিক বুজরুকি" বলেছিলেন, তাঁর সততার বিচার সহজেই করা যায়। ইংরেজ অভিজাতদের অর্থপুষ্ট

ওজিয়ের বলেছিলেন যে টাকা যখন পৃথিবীতে আসে, তখন তার এক গালে জন্ম থেকেই রক্ত চিহ্ন থাকে।[১৩] আমরা বলতে পারি যে মূলধনের যখন আবির্ভাব হয়, তখন তার আপাদ মস্তক, প্রতি লোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরতে থাকে।[১৪] (অনূদিত)

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এই চাটুকার ফরাসী বিপ্লবের সময় যে অভিনয় করেছিলেন, আমেরিকায় গোলযোগের সময় ঔপনিবেশিকদের টাকা খেয়ে তার বিপরীত চেহারাই দেখিয়েছিলেন। বার্ক হচ্ছেন ইতর বুর্জোয়ার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। "বাণিজ্যের বিধান হচ্ছে প্রকৃতির রীতি, ঈশ্বরের নিদেশ।" বার্ক যে ঈশ্বর আর প্রকৃতির নিদেশ অনুসারে সব চেয়ে ভাল বাজারে নিজেকে বেচতেন, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। 'টোরি' পাদরী হলেও টাকার তাঁর লেখায় বার্কের চরিত্র সুন্দর ভাবে এঁকেছেন।

১৩ মারি ওজিয়ের, "দ্যু ক্রেদি প্যুব্লিক্". প্যারিস, ১৮৪২।

১৪ যথেষ্ট লাভের আশা থাকলে মূলধন হয় অকুতোভয়। শতকরা দশটাকা হারে যে কোন যায়গায় মূলধন খাটানো যাবে; কুড়িটাকা হলে খাটানোর জন্য রীতিমত ঔৎসুক্য থাকবে; পঞ্চাশ হলে কথাই নেই; শতকরা একশো হলে মানুষের কোন আইনকে পদদলিত করতে মূলধন ইতস্তত করবে না; তিনশো পেলে এমন কোন অপরাধ নেই, এমন কোন বিপদ নেই, এমন কি মূলধনীর প্রাণদণ্ড ভয় সত্ত্বেও টাকার খেলা চলবে। লাভের জন্য যদি লড়াই ও অন্যান্য হাঙ্গামার দরকার হয় তো মূলধনীরা সে ব্যাপারে উৎসাহ দেবে। এখানে যা বলা হল তার প্রমাণ মিলবে মাশুলচুরি আর দাসব্যবসায়ের ইতিহাসে।" (পি, জে, ডানিং, পৃঃ ৩৫)।

হতাশা

বুদ্ধদেব বসু

—কী, শুয়ে পড়লে যে বড়ো? আপিসে যাবে না আজ?

—আহা, এই খেয়ে উঠলুম, একটু জিরোতে দাও না। আর-একটা পান দাও।

সুরমা পানের ডিবেটা নিয়ে স্বামীর শিয়রের কাছে রাখলো। অনুপম একটা পান মুখে দিয়ে খবরের কাগজের ছবির পৃষ্ঠাটা চোখের সামনে খুলে ধ'রে বললে—বিলিতি মেয়েগুলো কী অসভ্যই হচ্ছে দিন-দিন! ঐটুকু কাপড় গায়ে না রাখলেই বা কী! দেখেছো?

কিন্তু পাশ ফিরে তাকিয়ে সুরমাকে সেখানে দেখতে পেলো না। কোথায় সে? অনুপম হাঁক দিলে—সুরমা!

সুরমা পাশের ঘর থেকে বললে—যাই। কোন্ জুতোটা পরবে আজ?

—গেছে আবার জুতো বুরুশ করতে! বেশ একটু বিরক্তির সুরেই বললে অনুপম।

একটু পরে সুরমা একজোড়া চকোলেট রঙের জুতো হাতে ক'রে ঢুকলো। ঝকঝক করছে আয়নার মতো। জুতোটা নামিয়ে রেখে বললে—ওঠো এখন।

অনুপম খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ওল্টালো; কথাটা তার কানে গেছে কিনা বোঝা গেলো না। সুরমা টেবিলের কাছে স'রে এসে বললে—বারোটা বাজে যে।

অনুপম তবু চুপ। এত গভীর মন দিয়ে খবরের কাগজে কী পড়ছে সে-ই জানে। চেয়ারের পিঠের উপর তার পাৎলুন, কোট, নেকটাই সব সাজানো, সেগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া ক'রে সুরমা আবার বললে—ওঠো না!

এবার অনুপম জবাব দিলে—কী যে বিরক্ত করো! আপিসের বাঁধা কাজ তো নয় যে দশটা বাজতেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হবে।

—কাল তো দশটা না-বাজতেই বাড়ি মাথায় ক'রে তুলেছিলে। একটু ঝাঁঝালো স্বরেই বললে সুরমা। ঝাঁঝের কারণ ছিলো। কাল আপিসে বেরোবার আগে অনুপমের নতুন নেকটাই খুঁজে পাওয়া যায়নি—তাই নিয়ে

কী কাণ্ড! সুরমা একাই নয়, তার শাশুড়ি, তার ইস্কুলগামী ছোটো ননদ সকলকেই হাঁকে-ডাকে বিপর্যস্ত ক'রে অনুপম শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলো যে এমন বিশৃঙ্খল বাড়িতে মানুষের বসবাস অসম্ভব। স্বয়ং শ্বশুরমশাই আপিসে বেরোবার মুখে বলেছিলেন—কী বিশ্রী মেজাজ হয়েছে ছেলেটার। তা তোমরাও তো আগে থেকেই ওর কাপড়চোপড়গুলো একটু···

লজ্জায় সুরমা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি। স্বামীর তুচ্ছতম সুখ-সুবিধের জন্য সে তো প্রাণপণ করে, তবে মানুষ যদি এমন হয় যে পুরোনো চিঠিপত্রের দেরাজে নতুন নেকটাই ঢুকিয়ে রেখে তারপর বাড়িসুদ্ধ লোকের উপর মেজাজ ফলিয়ে বেড়ায়···

সেইজন্যে আজ সকালবেলাই সে কাপড়চোপড় সব ঠিক ক'রে রেখেছে, কিন্তু আজ অনুপমের তাড়া নেই। একটু পরে বললে—আজ কি তাহ'লে বেরোবেই না?

অনুপম গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে বললে—উঠছি। কিন্তু তার ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না।

টেবিলের উপর কয়েকটা জিনিস নিয়ে অকারণে নাড়াচাড়া করতে-করতে সুরমা বললে—কাজে এ-রকম গাফিলি করা কি ভালো? মাসের শেষে ওরাই মাইনে দেবে তো!

—ওঃ, তা দিলেই বা। আমাদের তো আর দশটার সময় আপিসে হাজিরা দিতে হয় না। আমাদের হ'লো ফীল্ড-ওয়ার্ক। নিজের ইচ্ছে-মতো কাজ।

—তা হোক, বিছানায় শুয়ে থাকলে কোনো কাজই তো চলবে না।

অনুপম হঠাৎ চ'টে উঠে বললে—আমার ইচ্ছে শুয়ে থাকবো। আমার শোয়া বসাও তোমার হুকুমে হবে নাকি?

—আমার হুকুমে হবে কেন? সমস্ত সংসারটাই হুকুমে চলছে। ইচ্ছে মতো শোয়া বসা কার আছে?

—ওঃ, ভারি তো একশো পঁচিশ টাকার চাকরি—ছেড়ে দিলেই বা কী?

এবার সুরমার মুখে সত্যি-সত্যি আশঙ্কার ছায়া পড়লো।—বলো কী, এমন ভালো চাকরিটা ছেড়ে দেবে! ভালো ক'রে কাজ তো আরম্ভই করলে না এখনো।

অনুপম যেমন হঠাৎ চ'টে উঠেছিলো, তেমনি হঠাৎ নরম হ'য়ে বললে, না, না, ছাড়বো কী! উঠি এবার। ব'লে সে সত্যি-সত্যি উঠে বসলো।

সুরমা আশ্বস্ত বোধ করলে, তবু বললে—ছাখো, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ ছেড়ে-টেড়ে দিয়ো না কিন্তু। শ্বশুরমশাই তাহ'লে মনে বড়ো কষ্ট পাবেন।

আর্-কোনো কথা সুরমা বলতে পারলে না; তার নিজের দিকটা মনে এলো না তার, অনুপমের দিকটাও নয়, শ্বশুরের কথাই মনে হ'লো। বয়েসের চাইতে বেশি বুড়ো হয়েছেন। সরকারি চাকরিতে পেন্সন নেবার হু'চার বছর বাকি। হু'চার বছর পরে দেড়শো টাকাতে পেন্সন নেবেন—তখন এই বৃহৎ সংসার চলবে কেমন ক'রে? সারাজীবনের সঞ্চয় নিঃশেষ ক'রে টালিগঞ্জে এই ছোট্ট বাড়িটি করেছেন। তার উপর বিস্তর দেনা। আশ্রিত, অতিথি, নিঃসম্বল আত্মীয়ের অভাব নেই। নিজের পড়ুয়া-ছেলে, অবিবাহিত মেয়ে আছে এখনো। অনুপম বড়ো ছেলে। বছর চারেক আগে বি-এ পাশ করেছে। বিয়ে হয়েছে বছর-খানেক। বিবাহটা মা-বাপের কর্তব্য সম্পাদন। সুরমা খুব সুখে আছে শ্বশুরবাড়িতে। শ্বশুর-শাশুড়ি অত্যন্ত স্নেহ করেন। এত স্নেহ করেন ব'লেই শ্বশুরের জন্য তার এত কষ্ট হয়। উপার্জন একজনের, দাবি দশজনের। বুড়ো ভদ্রলোক একটা সার্ট ছিঁড়ে গেলে সহজে আর-একটা কেনেন না। অথচ পুত্রবধূর জন্যে ঘন-ঘন সাড়ি কেনা হচ্ছে—পাছে ছেলের মনে কষ্ট হয়। সুরমার ভারি লজ্জা করে।

অনুপমই একমাত্র আশা। কিন্তু···আজকালকার দিনের সাধারণ বি-এ পাশ ছেলে, কতটুকু আশা তার, কতটুকু মূল্য? সেরা পাশিয়েরা খাবি খাচ্ছে। তাই ব'লে অনুপমের কোনো উৎকণ্ঠাও নেই। সে দিব্যি খায়-দায় ঘুমোয়, বিকেলে হাওয়া খেতে বেরোয়, সিনেমাও ছাখে। এই পরম নিশ্চিন্ত ভাবটা সুরমার ভালো লাগে না। আজকালকার দিনে কি নিজের উপর মমতা করলে চলে! জীবন পণ ক'রে খাটতে হবে···অমনি ক'রেই কিছু হ'য়ে যাবে। কী আর হবে? কতটুকু হবে? যেটুকুই হোক্, বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা হবে তো। তাছাড়া, শুয়ে-ব'সে কি আর পুরুষমানুষের দিন কাটে? না কি সেটা ভালোই দেখায়?

তবে কিছুদিন থেকে অনুপমের ভাবটা যেন বদলেছে। বাড়ি থেকে সে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যায় সাড়ে-দশটা বাজতেই, ফিরে যখন আসে তখন প্রায় সন্ধে। তার রোদে-পোড়া ক্লান্ত মুখ দেখে সুরমার ভারি কষ্ট হয়। কিন্তু এই তো পুরুষের জীবন···মনে-মনে তার কেমন একটা আনন্দে-মেশা গর্বও হয়। সে নিজে···সে তো হুপুরবেলা ঠাণ্ডা পাটিতে প'ড়ে ঘুমিয়েছে, কিন্তু এ ছাড়া

আর কী করবে সে ? সে তো অতি সাধারণ স্ত্রীলোক···তাকে দিয়ে সংসারের যা-যা কাজ হ'তে পারে, তাতে সে কখনো ত্রুটি করে না। অনুপম ফিরে এসেই চা তৈরি পায়, স্নান করতে যাবার সময় কাপড়ের জন্যে হাৎড়াতে হয় না, বাথ-রুমের আলনায় সব সাজানো আছে। এর বেশি সুরমার সাধ্য নেই, সাবেকি পরিবারের আড়ালে-আবডালে সে মানুষ হয়েছে, বৃহৎ পুরুষ-পৃথিবীর কোনো ব্যাপারই সে জানে না, সে গেঞ্জি কেচে দিয়ে ধোপার খরচ বাঁচাতে পারে, দশবার ঘর ঝাঁট দিয়ে স্বামীর মেজাজ ভালো রাখতে পারে, দিতে পারে জুতো বুরুশ ক'রে, দরকার হ'লে সুখাদ্য রেঁধে খাওয়াতে পারে—এই পর্যন্ত। সুরমার বাপের বাড়ি বড়োলোক নয়, টানাটানির সংসারকে নিজের বুদ্ধি আর পরিশ্রম দিয়েই সুশ্রী ক'রে তুলতে সে তার মাকে দেখেছে। সে-ও কি তা পারবে না ?

রাত্রে সে স্বামীকে জিজ্ঞেস করে—কোথায় থাকো সারাদিন ?

অনুপম গম্ভীরভাবে শুধু একটি কথা বলে—কাজ। এর চাইতে মহৎ কথা আজকালকার ভাষায় নেই।

—সুবিধে হচ্ছে কিছু ?

—চেষ্টা তো করছি। দেখি কী হয়। অনুপম তার কথায় বেশ একটা রহস্যের ভাব বজায় রাখে, সুরমা আর প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। আর সত্যি অনুপম যখন পর-পর পাঁচ-সাতদিন সাড়ে দশটায় বেরিয়ে গিয়ে নিতান্তই ক্লান্ত চেহারা ক'রে সন্ধেবেলা ফিরে আসতে লাগলো, তখন আর সন্দেহ করবার কোনো উপায় থাকলো না যে সে সত্যি-সত্যি এবার কর্মক্ষেত্রে নেমেছে।

তারপর একদিন সে তার স্ত্রীকে চুপি-চুপি বললে—কাউকে বোলো না এখন, একটা চাকরি পেয়েছি।

—পেয়েছো সত্যি ?

অনুপম একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানির নাম করলে। সেখানে, জানা গেলো, তাকে একটা চাকরি নেবার জন্যে সাধাসাধি করছে অনেকদিন থেকে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে বনিবনা হচ্ছিলো না। এবারে রফা হয়েছে—বেশি কিছু নয়, একশো পঁচিশ দেবে গোড়াতে। ছ' মাস পরে কাজকর্ম দেখে বাড়িয়ে দেবার কথা। তাছাড়া কমিশন। মোটর য়্যালাউয়েন্স গোটা পঞ্চাশ দিতেও রাজি আছে, তবে গাড়ি তো···

এখানে বাধা দিয়ে সুরমা বলেছিলো—বলো কী! সত্যি ?

অনুপম অবিচলিতভাবে বললে—নেহাৎ মন্দ নয়, কী বলো ? আমি অনেক ভেবে-চিন্তে আজ রাজি হ'য়ে এসেছি।

—রাজি হবে না ! সুরমা এবার রীতিমতো উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। যে দিনকাল পড়েছে, কত সব ভালো-ভালো এম-এ পাশ ছেলে পঞ্চাশ টাকার জন্যে ঘুরে মরছে—আর এ তো চমৎকার ! ক'টা লোক আজকাল একশো টাকা রোজগার করে ! তার উপর আবার কমিশনও দেবে, য়্যাঁ ?

অনুপম বললে—এম্-এ পাশ হ'লেই তো হ'লো না, কাজের লোক হওয়া চাই। ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি বিদ্যা বোঝে না, কাজ বোঝে।

—তা কাজটা কী করতে হবে ?

—ওঃ, কাজ ! কাজ বিশেষ-কিছু নয়। আমার অধীনে সব এজেন্ট থাকবে, তারা বিজনেস জোগাড় করবে, তাদের একটু দেখাশোনা করতে হবে, এই আর কি। ভাবছি ছ'মাস পরে ছোটো একটা গাড়ি কিনেই ফেলবো। বাইরে ঘোরাঘুরি আছে কিছু।

মাইনে ভালো, অথচ কাজ কিছু নেই ! সুরমার ঠিক যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না। আর এমন একটা সুখের কাজ বাংলাদেশের এত ছেলেকে এড়িয়ে তার স্বামীর হাতে কেমন ক'রে এলো ভাবতে সে রীতিমতো অবাক হ'লো। তা অবাক হ'য়ে আর কী হবে—মানুষের কপাল যখন ফেরে, তখন এই রকমই।

—কাউকে বলতে বারণ করলে কেন ?—সুরমা নিজের সৌভাগ্য একা-একা সহ্য করতে পারছিলো না—হ'য়েই তো গেছে।

—হ'য়ে গেলোই বা। কাজকর্মের ব্যাপার—বাইরে বেশি বলাবলি না-করাই ভালো।

—আহা, বাইরে আমি কাকে আর ঢাক পিটিয়ে বেড়াবো ! শ্বশুরমশাইকে বলেছো ?

—না, বলিনি এখনো। বাবার ইচ্ছে ছিলো আমি গবর্মেণ্টের চাকরিতে ঢুকি, হয়তো তিনি খুব খুসি হবেন না। হাজার হোক্, সামান্য কোম্পানির চাকরি বই তো নয়।

—কী যে বলো ! সামান্য হ'লো কিসে ! আর গবর্মেণ্টের চাকরি চাইলেই যে পাওয়া যাচ্ছে তা তো নয়। শ্বশুরমশাই খুবই খুসি হবেন, দেখো।

হ'লেনও। অনুপমের এ-কাজে বিলিতি কাপড়চোপড় না হ'লে চলবে না, ও-সব করাতে গোটা পঞ্চাশ টাকা খরচ হ'য়ে গেলো। হেমবাবু ধার ক'রে এনে

দিলেন টাকাটা। তারপর কয়েকদিন সেই শ্বেতাঙ্গ বেশে অনুপম নিয়মিত যাতায়াত করলে—ইতিমধ্যে গোটা দুই নতুন টাই কেনা হ'য়ে গেলো। সুরমা বিছানার তলায় পাৎলুন ভাঁজ ক'রে রাখে, টাই মোজা রুমালের হিসেব রাখে, আর বাড়ির মধ্যে সারাদিন অকারণে অফুরন্ত কাজ ক'রে বেড়ায়।

আজ তাই স্বামীকে খাওয়ার পর শুয়ে পড়তে দেখে সে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছিলো। রোজ এক-সময়ে আপিসে না গেলেও হয়তো চলে, কিন্তু একেবারে শুয়ে থাকলে চলে কি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুপম উঠলো, উঠে একটা পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে বললে—চললুম।

—আজ স্যুট পরবে না?

—না, যা গরম।

স্বামীর ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে সুরমার একটু কষ্ট হ'লো। ভাদ্রমাসের রোদ্দুর সমস্ত গায়ে পিন ফুটিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে বেরুনো! তাই সে বললে—আজ না-বেরোলেও চলে নাকি?

—বেরোলেও হয়, না বেরোলেও হয়। শরীরটা আজ মোটে ভালো লাগছে না।

—তাহ'লে আজ আর না বেরোলে। একটা ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দাও।

অনুপম হেসে বললে—আমাদের ছুটির জন্যে দরখাস্ত পাঠাতে হয় না, যতদিন খুসি না গেলে কেউ কিছু বলবার নেই।

—বলো কী! যতদিন খুসি না গেলেও চলে?

—তা চলে বইকি। ওদের কাজ পাওয়া দিয়েই কথা।

—কাজটা তাহ'লে ওরা কেমন ক'রে পাবে?

—তুমি তা বুঝবে না।

সুরমা আর কিছু বললে না। সত্যি, কাজটা যে কী রকম তা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। অনুপমও আর কথা না ব'লে পাঞ্জাবিটা খুলে রেখে এসে শুয়ে পড়লো, এবং খানিক পরেই ঘুমিয়ে পড়লো। উঠলো যখন, তখন পাঁচটা বেজে গেছে। সুরমা চা ক'রে এনে দিল। চা খেয়ে ধোপদুরস্ত জামাকাপড় প'রে অনুপম বেরিয়ে গেলো বোধ হয় কোনো বন্ধুর বাড়িতে।

তার পরের দুটো দিন এইভাবেই কাটালো সে। সুরমা মাঝে-মাঝে দু'একবার তাড়া দিলে, কিন্তু অনুপম নিতান্ত নিশ্চিন্তভাবে বললে—তুমি তো দেখছি ভারি ছেলেমানুষ! এজেন্টরাই সব কাজ করে যে। আমার বেরোবার কী দরকার। এই তো আজ বিকেলেই দু'জনের আসবার কথা আছে আমার কাছে।

সত্যিও সেদিন বিকেলে ছুটি ছেলে এলো তার কাছে। অনুপম তাদের সঙ্গে ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ কথা বললে। সুরমা চা পাঠালে, খাবার পাঠালে, পান পাঠালে। ভারি খুসি হ'লো সে মনে-মনে।

পরের দিন সকালে ন'টা না বাজতেই অনুপমের বেরোবার তাড়া লেগে গেলো। আজ তাকে যেতে হবে ভাটপাড়া, সেখানে একজন বড়োদরের মক্কেলের খোঁজ পাওয়া গেছে। অসম্ভব তাড়াহুড়ো ক'রে, কোনো রকমে ছুটো গরমভাত আর মাছের ঝোল গলাধঃকরণ ক'রে, পোষাক প'রে, মা-র কাছ থেকে ছুটো টাকা নিয়ে সে বেরিয়ে গেলো। তার কিছুই খাওয়া হয়নি ভাবতে পেরে সুরমাও ভালো ক'রে খেতে পারলে না—তিনটে না বাজতেই উঠে স্টোভ ধরিয়ে নানারকম খাবার তৈরি করতে বসলো।

এদিকে অনুপম আপিসে গিয়ে খবর পেলো ভাটপাড়ার ভদ্রলোককে অন্য কোম্পানির লোক পাকড়ে ফেলেছে। ব'সে-ব'সে আড্ডা দিলো ঘণ্টা তিনেক, তারপর আর-একজনের সঙ্গে বেরিয়ে ড্যালহৌসি স্কোয়ার, ক্লাইভ স্ট্রিটে এ-আপিস ও-আপিস ঘুরে বেড়ালো যেখানে যত চেনা লোক আছে। কোথাও একপেয়ালা চা, কোথাও পান, নানারকম লাখ-বেলাখের গল্প, সময়টা কাটলো মন্দ না। কিন্তু রোদ্দুরে ঘুরতে আর ভালো লাগে না, যা-ই বলো।

বিকেলে বাড়ি ফিরে যখন চা খাচ্ছে, সুরমা জিজ্ঞেস করলে—কেসটা পেলে?

—কোন্‌··· ?

—ভাটপাড়ায় গেলে যে?

অনুপম বলতে পারলে না যে ভাটপাড়ায় সে যায়নি। সংক্ষেপে বললে—আর-একদিন যেতে হবে।

—কবে যাবে? কাল?

—এত খবর দিয়ে তোমার দরকার কী? আমার কাজ আমি ভালো বুঝি।

পরের দিনও সে যথাসময়ে রাজবেশ প'রে বেরুলো, যথাসময়ে ফিরে এলো। তারপর একদিন সে সুরমাকে বললে—আর-একটা অফার পেয়েছি, এর চেয়ে ভালো।

—কী রকম?

—এক ভদ্রলোক একটা বিজনেস করবেন, আমাকে পার্টনার ক'রে নিতে চান। লায়ন্স রেঞ্জে আপিসের ঘর খোঁজা হচ্ছে। এখন অবশ্য মাত্র হাজার

দশেক নিয়ে আরম্ভ হবে—তবে ভদ্রলোক কুড়ি হাজার পর্যন্ত ফেলতে রাজি। তাঁর নিজের আরো অনেক কাজ আছে—আমাকেই ম্যানেজার হ'তে হবে। আপিসে আলাদা ঘরে বসবো, টেলিফোন থাকবে, বাড়িতেও একটা রাখতে হবে। তুমি যখন-তখন দরকার হ'লে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে। বেশ ভালো—কী বলো?

সুরমা জিজ্ঞেস করলে—ব্যবসাটা কিসের

—সে নানারকম আছে। ঐ ভদ্রলোকের দশরকম ব্যবসা আছে কলকাতায়—কাগজ, কাঠ, কয়লা, তা ছাড়া, একটা জুয়েলারি দোকানও আছে। মস্ত বড়োলোক। পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেলতেও ওর আটকাবে না। আমাকে গোড়াতে দু'শো দেবে, আস্তে আস্তে পাঁচশো পর্যন্ত উঠবে। লাভের উপর আমার টু পার্সেণ্ট শেয়ারও থাকবে, তাইতে বা কোন্ না দু-চার হাজার হবে বছরে। আর আপিসের গাড়িটা অবিশ্যি আমার জন্যেই থাকবে। আমাদের কয়েকজন কেরানি দরকার—আছে নাকি তোমার জানাশোনা কোনো ছেলে-ছোকরা?

সুরমা খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে—তুমি তাহ'লে ইনশিয়োরেন্সের কাজটা ছেড়ে দেবে?

—ছেড়ে দেবো না তো কী! ঐ মাইনেতে কোনো ভদ্রলোকের কি চলে! আর যা খাটনি! রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে হায়রান।

—তা যেখানেই যাও ব'সে-ব'সে তো তোমাকে কেউ খাওয়াচ্ছে না।

—তুমি কিছু বোঝো না। এটা কত ভালো। আপিসটাই আমার। সবই আমার ইচ্ছেমত হবে। আমার পার্টনার নিজে বিশেষ-কিছু দেখতে শুনতে পারবেন না, আমি রাজি হয়েছি বলেই তিনি ব্যবসাটা ফাঁদবেন।

—অত বড়ো একটা ব্যবসা চালাতে তুমি পারবে তো? ব্যবসাতে তো খাটুনি সব চেয়ে বেশি শুনি।

—ওঃ, সে ঠিক হ'য়ে যাবে দু'দিনেই। দু'চারখানা বইপত্র দেখে নিলেই হবে। তাছাড়া, আমার নিজের তো বিশেষ-কিছু করতে হবে না, নিচে তো সব কেরানিরাই থাকবে। শিগগিরই আমরা আরম্ভ ক'রে দেব—আপিসের একটা ভালো ঘর পেলেই হয়।

হঠাৎ সুরমার কী-রকম একটা সন্দেহ হ'লো। জিজ্ঞেস করলে—ইনশিয়োরেন্সের কাজটা এক্ষুনি ছেড়ে দাওনি তো?

অনুপম মুচকি হেসে বললে—তা একরকম ছেড়েই দিয়েছি বলতে পারো।

সুরমার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। ক্ষীণস্বরে বললে—একেবারে ছেড়েই দিলে! ওটার তো এখনো কিছুই ঠিক নেই। শ্বশুরমশাইকে একবার জিজ্ঞেসও করলে না!

—ওঃ, বাবাকে আবার জিজ্ঞেস করবো কী। এ-সব ব্যাপারের উনি বোঝেনই ভারি। তাছাড়া, কিছু ঠিক নেই বলছো কেন? কোম্পানি শিগগিরই রেজিস্টর্ড হবে। আরে ভাবছো কেন—বাবার দুঃখ এতদিনে দূর হ'লো। বাবাকে আর একবছরের বেশি চাকরি করতে দেব নাকি ভেবেছো!

কথাটা শুনে সুরমা রোমাঞ্চিত হ'লো, কিন্তু ছোট্ট একটু সন্দেহ তার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছিলো না। তাই সে বললে—কিন্তু ব্যবসা তো, তার নিশ্চয়তা কী? বাঁধা একটা চাকরি হুট ক'রে ছেড়ে দিলে!

—ভারি তো বাঁধা চাকরি। ব্যাটারা ভারি পাজি, ছোটোলোক, কথা দিয়ে কথা রাখে না, টাকাপয়সা কিছু দিতে চায় না!

সুরমা অবাক হ'য়ে বললে—বলো কী! চাকরিতে কখনো মাইনে না দিয়ে পারে! মাস পুরলে নিশ্চয়ই দেবে। তুমি ওদের সঙ্গে খামকা ঝগড়া করোনি তো?

এবারে অনুপম বেশ উত্তেজিত স্বরেই বললে—ওদের যা ব্যবহার, তাতে ঝগড়া না ক'রে পারা যায় না। আছে, ভিতরে অনেক ব্যাপার আছে। মান-সম্মান নিয়ে ওদের কাজ করা যায় না। দিয়েছি আজ খুব দু'কথা শুনিয়ে।

সুরমা হতাশ স্বরে বললে—তাহ'লে ছেড়েই দিয়েছো!

অনুপম একটু হেসে বললে—আহা, তুমিও যেমন! এমন একটা ভাব করছো যেন কত বড়ো একটা লোকসান। ও-রকম চাকরি পথে-ঘাটে অনেক ছড়িয়ে থাকে।

কথাটা আসলে সত্য, কেননা বীমার দালালি আজকাল চাইলেই পাওয়া যায়। কিন্তু যতখানি কাজ করতে পারলে তা থেকে মাসে পঞ্চাশটা টাকা আয় করা যায়, অনুপমের পক্ষে তা অসম্ভব। অবশ্য আসল কথাটা জানে না ব'লেই সুরমা চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে বললে—বলো কী! আজকালকার দিনের পক্ষে ও তো চমৎকার চাকুরি ছিলো। আমি তো মনে করি ও-রকম একটা কাজ পাওয়া ভাগ্যের কথা।

অনুপম তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—তুমি ভাবতে পারো সৌভাগ্য, আমি ভাবিনে। তাছাড়া, কত একটা বড়ো কাজে যাচ্ছি। ছাখো না, দু' পাঁচ

বছরে কী হয়। ছাখো, ভদ্রলোক বলছেন আমাকেও কিছু টাকা ফেলতে! বেশি নয়, হাজার পাঁচেক। তাহ'লে-লাভের টেন পার্সেণ্ট দিতে রাজি। টেন পার্সেণ্ট মানে জানো? বছরে হাজার কুড়ি তো বটেই। বলবো নাকি বাবাকে একবার?

সুরমা ঠাণ্ডা গলায় বললে—দেখতে পারো ব'লে।

একটু যেন দ্বিধা ক'রে অনুপম বললে—আচ্ছা, তোমার বাবা কি কিছু দিতে পারেন না?

সুরমা ম্লান হ'য়ে গিয়ে বললে—আমার বাবা গরিব মানুষ, তিনি অত টাকা কোথায় পাবেন?

একটু যেন লজ্জিতভাবেই অনুপম বললে—আচ্ছা, থাক, থাক। এমনি একটা কথার কথা বলছিলাম। তুমি কিছু ভেবো না। এ-ব্যবসায় লাভ আমাদের হবেই। অবশ্য রিস্‌ক্ যে কিছু নেই তা নয়—রিস্‌ক্ সব ব্যবসাতেই আছে—তা একটু রিস্‌ক্ না নিলে জীবনে কি বড়ো হওয়া যায়! তুমিই বলো!

সুরমা আবার জিজ্ঞেস করলে—ব্যবসাটা কিসের?

অনুপম আবার জবাব দিলে—আছে নানারকম।

—ইনশিয়োরেন্সের কাজটা এ-ক'দিন ক'রেই ছেড়ে দিয়ে ভালো করলে কিনা কে জানে। কিছুদিন করলে হয়তো ভালো লাগতো। মোটে তো ভালো ক'রে করলেই না।

— আরে ছি-ছি, এ-কাজ কি ভদ্রলোকে করতে পারে! হু'দিনেই আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। বললুম না তোমাকে, ওরা অত্যন্ত বদ লোক—কথায়-কথায় অপমান করে।

—তা এ-ক'দিনের মাইনে দিয়ে দিয়েছে তো?

—তা দিলেও তো বুঝতুম। কিছু না, এক পয়সাও না।

—বলো কী, এ-ক'দিন খাটিয়ে নিলে, তার মজুরি দিলে না! একি সম্ভব নাকি?

—ওদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

—বাঃ, এমন কথা তো কোনোদিন শুনিনি। আইন আছে কী করতে? একটা উকিলের চিঠি দাও—বাপ-বাপ ক'রে টাকা দিয়ে দেবে।

—ব'য়ে গেছে এখন আমার সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে অত হাঙ্গামা করতে। বিজনেস-এর জন্য এখন ভয়ানক খাটতে হবে কিছুদিন! অত সময় কোথায় আমার?

—তাই ব'লে তুমি চুপ ক'রে এ-ও সহ্য করবে।

—খুব দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে চ'লে এসেছি—আবার কী? আমাদের ব্যবসাটা জাঁকিয়ে উঠুক, তখন ঐ পচা কোম্পানির ম্যানেজারকে কেরানি রাখবো।

এর পর কয়েকদিন অনুপমকে সত্যি খুব ব্যস্ত দেখা গেলো। দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার সে বেরোয় আর বাড়ি ফেরে। অদ্ভুত সময়ে ও অদ্ভুত জায়গায় তার সব এনগেজমেণ্ট থাকে। টেলিফোন ছাড়া কাজের বড্ড অসুবিধে হচ্ছে, সামনের মাসের গোড়ার দিকেই একটা আনিয়ে ফেলবে। কিছুদিন তার পকেটে কিছু টাকা-পয়সাও দেখা যেতে লাগলো। তাছাড়া, পকেটে তার প্রায়ই সচিত্র পুস্তিকা দেখা যায়—মোটর গাড়ির ক্যাটালগ। আপিসের গাড়ি কেনা হবে— সে-ভারও তারই উপর পড়েছে।

দিন পনেরো এইভাবে কাটলো। ততদিনে সুরমারও প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়ে এসেছে যে বাণিজ্যেই বসতে লক্ষ্মী। এখন ভালোরকম সব চললেই হয়।

রাত্তিরে শোবার সময় ছাড়া অনুপম আজকাল প্রায় বাইরে-বাইরেই থাকে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর পাছে ভেঙে যায়, সে ভাবনায় তার মা অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে থাকেন। কিন্তু অনুপমের সে-সব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই তার। তার নামে সব বড়ো-বড়ো খামে টাইপ-করা চিঠিপত্র আসে। নানারকমের লোক আসে বাড়িতে। হ্যাঁ—এ না হ'লে আর ব্যবসা কী! সুরমা ভাবে, এতদিনে তার স্বামী নিজের প্রকৃত পথ খুঁজে পেয়েছেন, একদিন সত্যি-সত্যি বিরাট কিছু হ'য়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। কার মধ্যে কী থাকে বলা তো যায় না।

আরো কিছুদিন গেলো। তারপর একরাত্রে শুয়ে-শুয়ে অনুপম বললে— ছাখো, কলেজ স্কোয়ারের কাছে পাঁচশো টাকায় একটা চায়ের দোকান বিক্রি হচ্ছে। ভাবছি বাবাকে ব'লে সেটা কিনে ফেলি। পাঁচশো টাকা তিনি নিশ্চয়ই দিতে পারবেন।

সুরমা অবাক হ'য়ে বললে—কেন, চায়ের দোকান কিনে তুমি কী করবে?

—কী আবার করবো? চালাবো। মাসে দু'শো টাকা নেট-প্রফিট।

—বলো কী! মাসে দু'শো টাকা যাতে লাভ সে-দোকান পাঁচশো টাকায় ছেড়ে দিচ্ছে! লোকটা কি পাগল?

সঙ্গে-সঙ্গে সুর নামিয়ে অনুপম বললে—না, ঠিক দুশো হয়তো হবে না। দেড়শো—হ্যাঁ, একশো তো হবেই। ব'লে-ক'য়ে পাঁচশোতেই রাজি করাতে

পারবো বোধ হয়। লোকটার ব্যামো হয়েছে—পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে চ'লে যেতে চায়।

—তোমার হাতে সেই কোম্পানি রয়েছে—এত বড়ো ব্যবসা—

—হ্যাঁ, বিজনেসটা রয়েছে বটে। তা চায়ের দোকানটাও থাক্ না। গোটা কুড়ি টাকা মাইনে দিয়ে একটা লোক রেখে দিলেই হবে। আমি তো আর নিজে গিয়ে দোকানে বসতে পারবো না। বুঝলে না—চার-পাঁচটা কলেজের কাছে কিনা, ছাত্রদের ভিড় খুব হয়। বেশ লাভ।

—নিজে না দেখলে দোকান চলে না।

—হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে গিয়ে দেখে আসবো বইকি। কালই বলবো বাবাকে। আস্তে-আস্তে বাড়িয়ে একটা ফ্যাশনেবল রেস্তোরাঁও ক'রে তোলা যায়। তাহ'লে অবশ্য চৌরঙ্গি পাড়ায় তুলে আনতে হয়।

হঠাৎ সুরমার মনে পড়লো সেই ব্যবসার কথা স্বামীর মুখে কিছুদিন শোনা যাচ্ছে না। কেমন একটা ভয়ের ভাব এলো তার মনে, খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলে—তোমাদের ব্যবসা কবে থেকে আরম্ভ হবে ?

—জোগাড়যন্ত্র চলেছে। এ-প্রসঙ্গে অনুপমের বিশেষ উৎসাহ দেখা গেলো না।

—এ-মাসের প্রথমেই আরম্ভ করবার কথা ছিলো না ?

কথাটা যেন শুনতেই পায়নি এইভাবে অনুপম বললে—চায়ের দোকানটাই কিনে নেব। আমাদের কালীপদ বেশ বিশ্বাসী লোক, তাকেই বসিয়ে দেয়া যাবে। ও তো বাড়িতে আট টাকা মোটে মাইনে পাচ্ছে, আমি কুড়ি টাকা দেব—আচ্ছা না-হয় পঁচিশই দেয়া যাবে। ওর পক্ষে কত বড়ো একটা লিফ্‌ট্ ভাবো তো!

বোধ হয় সেই কথাই ভাবতে-ভাবতে অনুপম খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়লো।

আরো কয়েকমাস কাটলো। অনুপম যেদিন খুসি হয় বাড়িতে প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমোয়, যেদিন খুসি হয় পোষাক প'রে বেরোয়। কোথায় যায় ? একটি মন্থলি টিকিট নিয়ে সহরের এমন জায়গা নেই যেখানে সে না যায়। বড়োবাজারে তার আনাগোনা, ড্যালহৌসি স্কোয়ারে বহু আপিসে তার ঘন-ঘন আবির্ভাব। কিছু কাজ নেই, সুতরাং সে সব চেয়ে ব্যস্ত। তার পাশ দিয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকার স্রোত ব'য়ে চলেছে, সেই ঘূর্ণির মারপ্যাঁচে ঢোকবার যতবারই চেষ্টা করে, ততবারই ফিরে আসে ধাক্কা খেয়ে। ঘর্মাক্ত ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরে এসে বলে—উঃ, এত ভয়ানক পরিশ্রম আর সয় না।

সত্যি, অকারণে নিরুদ্দেশে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে ঘুরে বেড়ানো—কতদিন মানুষ তা সইতে পারে? কতদিন, আর কতদিন?

এটাও মানতে হবে যে সে এখন বিজনেসম্যান। অবশ্য সেই কুড়িহাজারি কোম্পানিটা শেষ পর্যন্ত হ'লো না, সমস্ত ঠিকঠাক হবার পরে যে-লোকটি টাকা দেবে, সে-ই শেষ মুহূর্তে পেছ-পা হ'লো—লোকটাকে শূকরসন্তান বললে কিছুমাত্র অন্যায় বলা হয় না। পৃথিবীর সব লোকই এইরকম—ইতর, অশিক্ষিত, ধূর্ত, স্বার্থপর ও প্রতারক—এতগুলো খারাপ লোকের মধ্যে একমাত্র ভালো লোক অনুপমের উপায় কী? তা সেও একটা বিজনেস চালাচ্ছে, ক্লাইভ রোতে এক বন্ধুর অপিসে একটা চেয়ারে গিয়ে মাঝে মাঝে দু' তিনঘণ্টা ব'সে থাকে। বিজনেসটা কী, সেটা সুরমা এখনো জানে না, যখন বেশ ফেঁপে উঠবে তখন জানতে পারবে। তবে সেটা চায়ের দোকান নয়। দোকানদারি করাটা ঠিক ভদ্রলোকের কাজ কি? 'দোকানে যাচ্ছি', বলতেই কেমন বিশ্রী লাগে না? 'আপিসে যাচ্ছি', কথাটাই বেশ। তাও নিজের আপিস। অনুপম এখন নিজের আপিসে যাচ্ছে।

এইভাবেই আরো এক বছর কাটলো। হেমবাবু মলিন জিনের কোট প'রে আপিসে যান, আপিস থেকে ফিরে খালি গায়ে চিৎ হ'য়ে শুয়ে থাকেন; মাসের পয়লা তারিখে প্রচুর ধার শোধ করেন ও সাত তারিখে আবার ধার করতে ছোটেন। বড়ো ছেলের সঙ্গে বিশেষ দেখাশোনা হয় না তাঁর। একদিন, সন্ধেবেলায় অনুপম বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, বাইরের ঘরে বাপের মুখোমুখি প'ড়ে গেলো। সে এড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, হেমবাবু তাঁকে ডাকলেন। একটুখানি কেশে, অত্যন্ত যেন লজ্জিতভাবে বললেন—

শোন্—আমাদের আপিসে একটা চাকরি খালি হয়েছে।

অনুপম চুপ ক'রে রইলো, যেন এ ব্যাপারে তার কিছুই এসে যায় না।

—আমি তোর কথা সায়েবকে বলেছি, তবে যা দিনকাল—

—কী চাকরি?

—মন্দ নয় খুব। পঞ্চাশ টাকা থেকে আরম্ভ—

—ওঃ, পঞ্চাশ টাকা! অনুপম খুব মৃদুস্বরে বললে কথাটা, অসম্ভব আজগুবি কিছু শুনে যেন সে প্রায় হতবাক হ'য়ে গেছে।

—পঞ্চাশ থেকে সওয়াশ', তারপর ডিপার্টমেণ্টল পরীক্ষায় উৎরোলে হয়তো তিনশো পর্যন্ত যাওয়া যাবে। গবর্মেণ্টের বাঁধা স্কেলে আস্তে-আস্তে উঠে যাবি—বেশ ভালোই তো।

অনুপম বললে—পঞ্চাশ টাকায় আমার কী হবে!

খুব কুণ্ঠিতস্বরে বললেন হেমবাবু—আপাতত আর কিছু যখন হচ্ছে না—। আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন টাইপ করিয়ে রেখেছি—কাল সেটা দিতে হবে।

অনুপম বাপের মুখের উপর আর-কিছু বললে না, পরের দিন দরখাস্ত সই ক'রে দিলে। স্ত্রীকে বললে—দুঃখেকষ্টে বাবার মাথা-খারাপ হ'য়ে গেছে। আমাকে পঞ্চাশ টাকার কেরানিগিরি করতে বলছেন।

সুরমা বললে—ঐ পেলেই কত লোক আজকাল কৃতার্থ।

কত লোক হ'তে পারে, আমার কথা আলাদা। বিজনেস্-এর লাইন আমি ছাড়বো না। আমার একটা স্কীম আছে—সেটা হ'য়ে গেলে তো আর কথাই নেই। দস্তুরমতো গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ি জাঁকিয়ে থাকতে পারবো।

স্কীমটা কী, সুরমা তা শুনতে চাইলো না। শুনেই বা কী হবে, সে সামান্য মেয়েমানুষ, ও-সব বড়ো-বড়ো ব্যাপার বুঝবে না।

অনুপমই আবার বললে—কলকাতার সহরে একটু বুদ্ধি থাকলে মাসে শো পাঁচেক আয় করা তো কিছুই না। দ্যাখো না সব মাড়োয়ারিদের—না জানে লেখাপড়া, না পারে ভদ্রলোকের মতো একটা কথা বলতে। একজন মাড়োয়ারির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তার কাছ থেকে সব ফন্দি-ফিকির শিখে নিচ্ছি। দেখবে আর দু'দিন পরে।—হ্যাঁ, আমাকে একটা টাকা দাও তো।

সুরমা বললে—একটা টাকা?

—একটা টাকাও নেই তোমার কাছে?

—আমার কাছে টাকা থাকবে কোত্থেকে?

—কেন, বাজার-খরচ তো তোমার হাতেই আজকাল। আচ্ছা, এক টাকা না পারো আট আনা দাও।

—এক টাকাই দিচ্ছি। নিজের জমানো দুটি আধুলি সুরমা বার ক'রে দিলে।

মাঝে মাঝে এমন দেয়। তার হাতে দু'চার আনা পয়সা যা আসে সব সে সযত্নে জমিয়ে রাখে, যে কোন দিন স্বামীর দরকার হ'তে পারে।

পরের দিন হেমবাবু আপিস থেকে খানকয়েক বই নিয়ে এলেন। অনুপমকে ডেকে বললেন—এগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখিস তো একটু—ইন্টারভিয়ুর জন্যে ডাকতে পারে।

—পঞ্চাশ টাকার চাকরি, তার আবার ইন্টারভিয়ু!

—ইনকম-ট্যাক্সের আইনগুলো একটু দেখে-নিস। কিছু জিজ্ঞেস করলে দু'একটা কথা বলতে পারলেই হ'লো।

—বাবার একদম মাথা-খারাপ হয়েছে, স্ত্রীর কাছে গিয়ে অনুপম বললে। আমাকে বলছেন ইনকম-ট্যাক্সের বই পড়তে। এখনো যেন আমার পরীক্ষা পাশ করবার বয়েস আছে। হো-হো ক'রে হেসে উঠলো সে, হাসিটা অত্যন্তই উচ্চ।

—ভালোই তো। বছরে একখানা বই তো ছুঁয়ে ছাখো না। তবু একটু পড়াশুনোর চর্চা হবে।

—ওঃ, পড়াশুনোর এই তোমার ধারণা! ইনকম-ট্যাক্সের আইন! অনুপম আরো জোরে হেসে উঠলো।

বইগুলো সে একবার ছুঁয়েও দেখলো না। সন্ধেবেলা আপিস থেকে ফিরে নাকের নিচে চশমা নামিয়ে হেমবাবুই সেগুলো পড়তে বসলেন। রোজই এ-রকম হ'তে লাগলো; যখনই সময় পান, হেমবাবু ব'সে ব'সে ইনকম-ট্যাক্সের আইনের সমস্ত মারপ্যাঁচ আয়ত্ত করেন। অনুপম তাঁকে একদিন দেখে ফেললো। হাসতে-হাসতে সুরমাকে বললে—দেখেছো বাবার কাণ্ড! তিনি বই পড়লে কি আমার বিদ্যে হবে!

সুরমা শান্তভাবে বললে—ও, সেটা তাহ'লে বোঝো!

—আমাকে দিয়ে ও-সব রাবিশ চাকরি পোষাবে না তা তো আমি ব'লেই দিয়েছি।

তারপর, একদিন আপিসে সায়েবের কাছে তার ডাক পড়লো। না গেলে বাবা নেহাৎই দুঃখিত হবেন, শুধু সেই কারণেই সাজগোজ ক'রে গেলো সে। ফিরে এসে বললে—সায়েব আমাকে বললে, তুমি আমাদের হেমবাবুর ছেলে, তোমাকে নিতে পারলে তো ভালোই হয়। তা আপাতত এটা নিলে কেমন হয়, বলো তো? বিজনেসটা একটু ফেঁপে উঠলে ছেড়ে দিলেই হবে। হাত-খরচটার জন্য আর কি—বুঝলে না?

সুরমা বললে—আপাতত হাতখরচ ছাড়া আর কোনো খরচও তো নেই তোমার।

—আহা, কোনরকমে দিন কাটলেই কি হ'লো! বাবার অবস্থা দেখছো তো! সেই, মাড়োয়ারিটা যা বলে তাতে তো মনে হয় ছ' মাসের মধ্যেই খুব সুবিধে হ'য়ে যাবে।

কয়েকদিন পরে অনুপম বাড়ি ফিরে দেখে সুরমার মুখ ভারি গম্ভীর। জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে তোমার ?

—তোমার চাকরির খবর এসেছে।

—কী খবর ? অনুপম খুব তাচ্ছিল্যের সুরেই জিজ্ঞেস করলে, তবু তার গলাটা একটু কেঁপে গেলো।

—হয়নি। শ্বশুরমশাই ভারি ভেঙে পড়েছেন।

মুহূর্তের জন্য ম্লান হ'য়ে গেলো অনুপমের মুখ। কিন্তু তক্ষুনি আবার বললে—ওঃ, বাঁচলাম। হ'লে মুস্কিলই হ'তো—বাবার জন্য না নিয়েও তো পারতাম না। আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি এখন থেকে শেয়ার মার্কেটেই মন দেবো। এ ছাড়া আর কিছুতে পয়সা নেই। গোড়াতে হয়তো মাসে দু'শো আড়াইশোর বেশি হবে না—ক্যাপিট্যাল না থাকার তো এই মুস্কিল। তবে বছরখানেকের মধ্যে পাঁচশো মত সহজেই হ'য়ে যাবে। আমাদের এ-বাড়িটা ভারি ছোটো—এটা ভাড়া দিয়ে তখন বড়ো বাড়িতে যাবো, কী বলো ?

ইংরাজি সাহিত্য

আমার বিবেচনায় এ দুঃসময়ে মুখর কবির নীরব হওয়াই ভালো, কারণ সত্য বল্‌তে কি রাষ্ট্রকর্তাদের সংশোধনের দিব্যশক্তি আমাদের নেই; যদি খুসি করতে পারি কোনো নবীনাকে তার যৌবনের আবেশে বা শীতের রাত্রে বৃদ্ধকে, তো সেইটুক্ পোদ্দারিই যথেষ্ট।

কথাটা বিশবছর আগে মহামতি ইএটস্ বলেছিলেন। জীবিত কবিকুলে এ বিষয়ে তাঁরই কথা প্রামাণ্য। কারণ আইরিশ্ হওয়ার সুযোগ যেমন তাঁকে বিধাতাপুরুষ দেন, তেমনি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন তিনি নিজে। এবং মার্কিষ্ট্ মতে চৈতন্যের অখণ্ডতা মানতে যেহেতু আমরা বাধ্য, সে হেতু মান্‌তে হবে যে একহাতে কবিতা ও আর একহাতে বন্দুক বা কোঅপারেটিভ্ কেন্দ্র বা শ্রমিকআন্দোলন না নিয়ে স্বদেশী রূপকথা ও লোকসাহিত্য এবং নাট্যপ্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করে' ইএটস্ নিজের শুদ্ধস্বভাবের পরিচয়ই আসলে দিয়েছেন।

অবশ্য একথা স্বীকার্য যে ইংরেজ কবিদের ভাগ্য খারাপ। ক্রমওএলের পরে ইংলণ্ডে কিছু নাটকীয় করাই কঠিন। এই সেদিনও তো অষ্টম এডোআর্ডের ব্যাপারে কিরকম সবই লঘুক্রিয়ার পরিণতি পেল। ফ্রান্সে তবু ড্রেফুস্ ছিল, এখন প্যারিসের কাউণ্ট আছে। ফলে ইংলণ্ডে বাইরনকে যেতে হয় গ্রীসে, অডেন্‌কে আইস্‌ল্যাণ্ডের জয়রাইডের আগে স্পেনটা সারতে হয়, স্পেণ্ডরকে যেতে হয় ফ্রাঙ্কোর বিপক্ষদলে, জুলিআন্ বেল্, কর্নফোর্ড, কড্‌ওএল্, চেঙ্গিস্ খাঁর ভক্ত রালফ্ ফক্‌স্ তো স্পেনে অকালেই মারা যান।

স্পেনের শোচনীয় কাণ্ডের গুরুত্বই নিঃসন্দেহে এঁদের সমাধি বিচলিত করেছে। স্পানিশ্ ককপিটে সভ্যতার খাবি খাওয়ার দৃশ্যে যে শুধু মাল্‌রোই বিচলিত, তা নয়, মারিতাঁ বা বেরনানোর মতো ক্যাথলিকেরাও শঙ্কিত, রোমাঁার মতো স্থিতপ্রজ্ঞও তাতে চঞ্চল। না হলে ষণ্ডামির ভক্ত মহাশিল্পী হেমিংওএই বা সাগরপাড়ি দেবেন কেন আর নিউইঅর্ক ছেড়ে জন্ ডস পাসস্ই বা কুরুক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াবেন কেন?

কিন্তু আশ্চর্য লাগে ঘরেই মোষ থাকতে বনের মোষ তাড়ানোয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই নবকবিরা সব চুপ কি কারণে? সে কি এই কিপলিঙের বংশধরদের নৈতিক দায়িত্বের জ্ঞানাভাবে? কিন্তু এ কথা ঠিক যে ভারতীয় উৎসাহ থাকলে অডেনকে রাজকীয় পদক-লাভের লাঞ্ছনা সইতে হত না। অথচ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রোমাঞ্চকর পরকীয় কৌতূহল অডেনের শ্রেষ্ঠ নাটকে দেখা যায়। কিন্তু সেই পেশাদার কৌতূহলের চেয়ে জোফ্রি গোরর্ বা মরিস্ কলিসের রাজনীতিহীন জ্ঞানও ভালো। অবশ্য এঁদের শক্তি বর্ধমান, এঁদের নিঃসন্দেহ প্রমিস্ বা ভবিষ্যতে আশা করি অনেক কিছুই। কিন্তু সিরিল্ কনোলির ভাষায়, প্রমিসের শত্রুও যে অনেক ও বলবান্। এবং তুলনার জন্য যখন কবি ও নাট্যকার এলিঅট্ ও ইএটস্ জীবিতই আছেন, যখন এজরা পাউণ্ডও বর্তমান।

ক্রাইটেরিঅনের সম্পাদকীতে এলিঅটের মারাত্মক নীরবতা নিশ্চয়ই দোষণীয় ; পুরোহিত স্বামীর পাল্লায় পড়ে' ইএটসের দিব্যদৃষ্টিও হয়ত হাস্যকর, ম্যাথু আর্নল্ডের শেষ ও উদ্দাম পূজারী পাউণ্ডের কুলচুর্-গাইড্‌বুক হয়তো ব্যর্থ। কিন্তু ফাশিষ্ট্ বলে' এঁদের বা উইণ্ডহাম্ লুইস্‌কে অপমান করা চঞ্চল ফ্যাশনের চাপল্য ছাড়া আর কি ? অবশ্য ইংলণ্ড্ অতি সভ্য দেশ এবং স্নায়ুবিকারে অপ্রকৃতিস্থও বটে, তাই ফ্যাশনের মাহাত্ম্য সেখানে আজ সাহিত্যেও প্রবল। না হলে তান্ত্রিক আতিশয্যের জন্যই ডি, এচ, লরেন্সকে হিউ কিংসমিলের মতো সুসমালোচক উড়িয়ে দেবেন কেন ?

অবশ্য ভ্যান্‌গঘের মতো চিত্তশুদ্ধি হয়তো এঁদের সত্যই নেই কিন্তু তাই বলে' একটা কিছু ইস্‌মের কালিমা ছড়িয়েই প্রবীণ কীর্তিমানদের বাতিল করা যায় কি ? শেষপর্যন্ত চৈতন্যশুদ্ধিতে দুরত সাহিত্যের সার্থকতা ছাড়া কাব্য ও সমাজ বা কাব্য ও রাজনীতির সমস্যায় আর কি সমাধান শুভবুদ্ধি মান্‌তে পাবে ? এবং সে কথা পাউণ্ড্‌ই প্রবন্ধে ও ক্যানটোস্-এ বলেছেন। সুখের বিষয়, আর্, জি, কলিংউডের মতো দার্শনিক এই কথাই সবিস্তারে বুঝিয়ে একটি মোটা বই লিখেছেন।

আসল কথা, নবীনেরই গলার জোর বেশি এবং যাঁরা এবষ্ট্র্যাক্‌শনেই বসবাস করেন, তাঁদেরই মতামত কাটাছাঁটা, কথা জোরালো হয়। আত্মসংস্কার ছেড়ে বিশ্বসংস্কার কাজে না নামলে, আত্মজিজ্ঞাসু না হয়ে বহির্মুখ না হ'লে এঁরাও হয়তো ইএট্‌সের মতো বাল্‌জাকের ভাবিকথন, হ্যামারস্মিথের আস্তাবলে বা মারিসের খাবারঘরে তর্ক, জাপানী সাধু ও শ্রমিক নেতা কাগাওআর কল্কিদর্শন বা কট্‌সওল্ড পাহাড়ে স্যাণ্ডাল পায়ে হেগেলের লজিক্ মাথায় কমিউনিষ্ট 'টি'র কথা ভাবতেন। ও ভাবিতই হতেন। হয়তো বা তারপরে চোখ বুজে' হিরনের ডিম নিয়ে'ই নাড়াচাড়া করতেন কিন্তু ভাবিতও হতেন।

অবশ্য ইএট্‌সের দিব্যদৃষ্টিতে হয়তো এইটেই স্বাভাবিক। কারণ তাঁর মতে ১৮১৫ (কোনো কোনো দেশে ১৮৭৫) খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২৭ অবধি নাকি এবষ্ট্র্যাক্‌শনের কাল,—১২৫০ ১৩০০-র অনুরূপ। এবং বলাই বাহুল্য মার্কিষ্ট্‌দের পাকা বনিয়াদ কন্‌ক্রিটেই। তাই কি ' even before the general surrender of the will, there came synthesis for its own sake, organisation where there is no masterful director, books where the author has disappeared, paintings where some accomplished brush paints with an equal pleasure or with a bored impartiality the human form or an old bottle, dirty weather and clean sunshine . . . . I think of recent mathematical research; even the ignorant can compare it with that of Newton . . . with its objective world intelligible to intellect; I can recognise that the limit itself has become a new dimension, that this ever hidden thing which makes us fold our hands has begun to press down upon multitudes. Having bruised their hands upon that limit, men, for the first time since the 17th century see the world as an object of contemplation, not as something to be remade, and some few, meeting the limit in their

special study, even doubt if there is any common experience, doubt the possibility of science.'

: সুখের কথা আজকাল জীন্‌স্‌, হোআইট্‌হেড্‌, এডিংটনকে ছেড়ে আমরা জনগণ হলডেন্‌ বা নীড্‌হাম্‌-কে পাকড়াই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসন্ধানে বা ধরি বের্নাল্‌ বা লেভিকে। তাই হয়তো ইএট্‌স্‌কে একটু অলঙ্কারবিলাসী বাক্যজীবী লাগে যখন তিনি তাঁর নবধর্মের সংহিতা শেষ করেন এই বলে', 'Shall we follow the image of Heracles, that walks through the darkness, bow in hand, or mount to that other Heracles, man, not image, he that has for his bride, Hebe, "The daughter of Zeus, the mighty and Hera, shod with gold."?'

বিষ্ণু দে

ভারতীয় সাহিত্য

আধুনিক বাংলা ছোটোগল্প

ইংলণ্ডে বুর্জোয়া-শক্তির অভ্যুত্থানের সঙ্গে-সঙ্গেই গদ্য উপন্যাসের উদ্ভব। রাজার শক্তিহ্রাস ও বণিকশ্রেণীর আধিপত্যের ফলে এলিজাবেথীয় নাটকের একত্রিক শিল্প লুপ্ত হ'লো; সমাজ-জীবন বাইরের খোলা হাওয়া ছেড়ে উদীয়মান ধনিকদের গৃহে ও উইলসের কাফিখানায় আশ্রয় নিলে। সাম্রাজ্য-স্থাপনের সূত্রপাতে ও পিউরিটন প্রভাবে নাগরিকরা রাজসভার উদ্দাম জীবনের বদলে আর্থিক অবস্থা উন্নত ক'রে মন দিয়ে ঘরসংসার করতে ব্যস্ত হ'লো, এলো ভারতবর্ষের চা, চায়ের সূত্র ধ'রে ঘরে-ঘরে দেখা দিলো ড্রয়িংরুম, পেয়ালা-চামচের টুংটাং সহযোগে খুচরো গল্প, পরচর্চা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে এলো বিরাট আকারের উপন্যাস। চোখ ও কানের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চে গরম-গরম নাটক উপভোগের চাইতে আরামকেদারায় ব'সে ছাপার অক্ষরে কল্পিত কাহিনী পড়াটাই গার্হস্থ্যধর্মী অষ্টাদশশতকী ইংরেজের বেশি মনঃপূত হ'লো।

এটা দেখা যায় যে ধনোৎপাদনের রীতি ও সামাজিক ব্যবস্থা অনুসারে বিশেষ-কোনো শিল্পরূপ বিশেষ-কোনো সময়ে প্রাধান্য পায়। যতদিন না মুদ্রাযন্ত্রের বিস্তৃত ব্যবহার আরম্ভ হ'লো ও সমবেত সমাজ-জীবন ছেড়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর ঝোঁক পড়লো, ততদিন লিখিত গল্পের উদ্ভব অসম্ভব ছিলো। তারপর থেকে সমাজের পরিণতি এমন পথেই চলেছে যে আজকের দিনে কথাসাহিত্যই হ'য়ে উঠেছে প্রধানতম শিল্পরূপ (অবশ্য সিনেমা বাদ দিয়ে বলছি)। কথাসাহিত্যের মধ্যেও দুটো ভাগ হয়েছে: উপন্যাস ও ছোটো গল্প। উপন্যাসের প্রাক্তন আকার অনেক ক'মে গেছে, এবং ছোটো গল্প অনেক সময় মোটেও ছোটো হয় না। তবু এ দুটো ভাগ সঙ্গত।

আমার তো মনে হয় ছোটো গল্পই আধুনিক গল্পলোভীর সব চেয়ে উপযোগী ভোজ্য। আজকের দিনে আমরা বেশির ভাগই অসহায়রকম ব্যস্ত, হাজার পৃষ্ঠার নভেল আরম্ভ করতেই ভয় করে। ছোটো গল্পের মস্ত সুবিধে এই যে তা বাস্-এ ট্রামে পড়া যায়, কাজের শেষে বাড়ি ফিরে চায়ের অপেক্ষা করতে-করতে পড়া যায়, স্নানাগারের নির্জনতায় ব'সে প'ড়ে ফেলতেও বাধা নেই। ছোটো গল্প একটানা বেশি সময়ের জন্য মনোনিবেশ দাবি করে না, অথচ আনন্দ দেয় নিবিড়। নানারকম কাজ ও বিক্ষেপ নিয়ে যাদের জীবনের জোড়াতালি, তাদের সময়ের ক্ষণিক ফাঁকগুলো ছোটো গল্প দিয়ে যত সহজে ও যত সুন্দর ক'রে ভরানো যায়,

---

ডবল ডেকার—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ডি, এম, লাইব্রেরি, দুই টাকা।

মিহি ও মোটা কাহিনী—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, দেড় টাকা।

শ্মশানে বসন্ত—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ডি, এম, লাইব্রেরি, দেড় টাকা।

এমন আর কিছুতেই নয়। যদি না সর্বগ্রাসী সিনেমা লিখিত সাহিত্যকেই বিতাড়িত করে, তবে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় ছোটো গল্পের আদর দিন-দিন বেড়ে চলাই উচিত।

তবে এ-সব মন্তব্য সম্ভবত আমাদের দেশে খাটে না। বাংলা বইয়ের কাটতি এখন হৃদয়-বিদারক। শুনতে পাই এর মধ্যে এক উপন্যাসেরই যা একটু চাহিদা আছে, ছোটো গল্প উপেক্ষিত। তার কারণ বোধ হয় এই যে বাংলাদেশে কথাসাহিত্য-পাঠক বেশির ভাগ হচ্ছেন মধ্যবিত্ত মেয়েরা ও তার পরেই রেলের গার্ড। সহরের ঘরে-ঘরে প্রতিটি দুপুর মেয়েদের দীর্ঘ দিবানিদ্রা, একটি মোটা-সোটা নভেল একাধারে তার সহায়ক ও ব্যতিক্রম। হাতে প্রচুর সময় থাকে ব'লে বইখানা যত মোটা হয় ততই ভালো, ঠিক যেমন রেলের গার্ডরা রাত জাগবার সহায়ক হিসেবে খুব কড়া গোয়েন্দা নভেল পছন্দ করেন। সুতরাং বাংলাদেশে আকারে বৃহৎ হ'লেই নভেলের বিক্রি বাড়বার সম্ভাবনা—অন্য সব ব্যাপার যেমনই হোক্ না। আপনার যদি লেখক হবার সখ্ থাকে, তাহ'লে যে কোনোরকমে একটি পাঁশো পৃষ্ঠার নভেল দাঁড় করান ; অতগুলো পৃষ্ঠা আছে ব'লেই আপনার বইয়ের চাই কি সেকেণ্ড্ এডিশন হ'য়ে যাবে।

তবু যে বাংলাদেশে ছোটো গল্প লেখা হচ্ছে, তার কারণ ঐ বস্তু না হ'লে মাসিকপত্র কি পূজা-স্পেশ্যল্ চলে না। সম্পাদকীয় অনুরোধেই ছোটো গল্প রচনা, তার পর কোনো একদিন বইয়ের আকারে গল্পগুলি গ্রথিত হয়। তবে সে-বই উপন্যাস হিসেবেই বিজ্ঞাপিত হয় ; এবং বইটি যে আসলে ছোটো গল্পের তা লুকোবার যথাসম্ভব চেষ্টাও করা হয়। যেমন কিনা, সূচীপত্র দেয়া হয় না, পৃষ্ঠার দু'দিকেই বইয়ের নাম থাকে—আশা এই যে অজ্ঞান পাঠক ভুলক্রমে একে উপন্যাস ভেবেই কিনে নেবে। এর যে ব্যতিক্রম না আছে তাও নয়, কিন্তু বেশির ভাগ ছোটো গল্পের বই-ই উপন্যাসের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে।

এত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও ছোটো গল্পের প্রতি ঝোঁক বাঙালি লেখকের একেবারে কেটে যায়নি। বরং, বেশ ভালো-ভালো গল্পই লেখা হচ্ছে। অচিন্ত্যকুমারের 'ডবল ডেকার' বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ছোটো গল্পের বই। কেননা যদিও অচিন্ত্যকুমার গত দশ-বারো বছর ধ'রে গল্প-উপন্যাস লিখে আসছেন, এবং যদিও আমি প্রথম থেকেই তাঁর লেখার অনুরাগী, তবু আমার মনে হয় 'ডবল ডেকারে'র উৎকর্ষ তাঁর সমস্ত পূর্ববর্তী রচনাকে ছাড়িয়ে গেছে। এ-কথা বলবার মানে এ নয় যে ইতিপূর্বে তাঁর কোনো গল্পই আমাকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেয় নি : 'অমর কবিতা' কি 'হুইস্‌ল্' স্মরণীয় গল্প। তবে অচিন্ত্যকুমার সম্বন্ধে মনে-মনে আমার দুটি আপত্তি ছিলো। প্রথমত, আমার মনে হ'তো যে তিনি ঠিক মনের মতো বিষয় খুঁজে পাচ্ছেন না, তাঁর রচনাশক্তির বীজ প্রায়ই যেন শূন্য জমিতে প'ড়ে অপ্রসূ হ'য়ে যেতো। একদিকে নিম্ন-মধ্যবিত্তের দুঃখের কাহিনী, অন্যদিকে নাগরিক ধনীর রঙিন শূন্যতা—এই দুই জগতেই তাঁর আনাগোনা, কিন্তু কোনো জগৎই যেন তাঁর নিজের নয়। গল্পের ঘটনা ও চরিত্রের উপর সহজ দখলের বদলে যেন থাকতো খানিকটা টানা-হেঁচড়ার ভাব। আর বোধ হয় তারই ফলে তাঁর ভাষার অতিরঞ্জিত উচ্চস্বর, যা তাঁর অনেক ভক্তই লক্ষ্য করেছেন, এবং যেটা আমার দ্বিতীয় আপত্তির উপলক্ষ্য। উপমায় অলঙ্কারে বিশেষণে তাঁর ভাষা এতই জমকালো যে তা

ঠিক স্বাভাবিক ঠেকতো না, মনে হ'তো নিজের ও পাঠকের উপর এতটা জোর করবার কোনোই কারণ কি দরকার নেই। তাছাড়া, কথার চাপে তাঁর বক্তব্য প্রায়ই চাপা পড়তো, এবং পাত্রপাত্রীর কথোপকথন বড়োই অবাস্তব শোনাতো।

'ডবল ডেকার' প'ড়ে সব চেয়ে খুসি হলাম এই কারণে যে মনে হ'লো এবারে অচিন্ত্যকুমার একটি বিষয় পেয়েছেন। বিষয়টি তাঁর সৃজনীশক্তির সঙ্গে চমৎকার মিলেছে, তাছাড়া বাংলা সাহিত্যেও তা অভিনব। বিষয়টি হ'লো বাংলাদেশের মফঃস্বল। বাংলা কথাসাহিত্য পল্লীকে আশ্রয় ক'রেই বেড়েছে, সহরের দিকে তার ঝোঁক খুবই সাম্প্রতিক ঘটনা। কিন্তু মফঃস্বল স্বতন্ত্র, মফঃস্বল বিশেষ। তা গ্রামও নয়, সহরও নয়; পল্লীসমাজ ও নগরজীবন দুই-ই সেখানে অনুপস্থিত। মফঃস্বল হ'লো প্রাদেশিকতার মূর্তি, জীবন সেখানে ধূসর ও মন্থর, জজ-মাজিষ্টর থেকে মুদি ও গ্রাম্য উমেদার পর্যন্ত সকলেই নিজ-নিজ সঙ্কীর্ণ চক্রে বিবর্ণ। এই মফঃস্বলে যে-সব শিক্ষিত ব্যক্তি উচ্চ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত, একদিকে সহরের সমীকরণ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে, অন্যদিকে স্থানীয় জন-জীবন থেকে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে, তাঁরা—এবং আরো বেশি তাঁদের স্ত্রীরা ক্রমেই নানাবিধ মানসিক রোগে আক্রান্ত হ'তে বাধ্য, এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে এমন এক-একটি জীবে পরিণত হন, দীনবন্ধুর 'ডেপুটি'তে আমরা যার পরিচয় পেয়েছি। অথচ তাঁদের পক্ষেও অনেক কথা বলবার আছে: তাদের জীবনধারণের প্রণালীটাই কৃত্রিম, কেবল গ্রামোফোন ও টেনিস-লনের সাহায্যে মনের স্বাস্থ্য থাকে না, এবং যতদিন না সরকারি চাকরির মূল ধারণাটাই বদলে যায়, ততদিন সবডেপুটি-গিন্নির পক্ষে ডেপুটি-গিন্নির খোষামোদ না-করাও অসম্ভব, এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে সমগ্র চাকুরেমণ্ডলকে দেবগণ-জ্ঞানে ভয়ভক্তি করাই স্বাভাবিক। এ-সমস্ত যা-ই হোক, এখানে গল্পের প্রচুর উপাদান রয়েছে, যা ব্যবহৃত হ'লে পাঠকের আমোদ ও শিক্ষা দুই-ই হ'তে পারে। অচিন্ত্যকুমার এই মফঃস্বল-জীবনের উদ্ঘাটনে স্বীয় শিল্পকে নিযুক্ত করেছেন।

এখন, বিষয় পাওয়া মানেই নিজেকে খুঁজে পাওয়া। তাই দেখতে পাই, 'ডবল ডেকারে'র অধিকাংশ গল্পে অচিন্ত্যকুমারের যে-আত্মবিশ্বাসী স্বাচ্ছন্দ্য, তা পূর্বে তাঁর রচনায় প্রায়ই পাইনি। প্রথম গল্প, 'মা ফলেষু', এর ব্যতিক্রম; গল্পটি তাঁর পূর্বতন ধরণেই রচিত, এবং বিষয়টাতেও কিছু 'কল্লোল' যুগের রোমান্টিসিজ্‌ম্‌এর ছায়া। গল্পটি অন্যায়রকম দীর্ঘ, ভাষাতেও প্রচণ্ড অতিরঞ্জন। 'ডবল ডেকার' গল্পটিরও বিষয়টা এত তুচ্ছ যে খেলার মাঠের অত চমৎকার বর্ণনাও তাকে বাঁচাতে পারেনি। 'দুপুর দুটো' সুপাঠ্য হ'লেও সস্তা। এই তিনটি বাদ দিয়ে আর প্রত্যেকটি গল্পই আমার ভালো লেগেছে। 'সময়' গল্পটি, যেখানে সদরালা বড়ো সাহেবকে সেলাম জানাতে সহরে গিয়ে নায়কের সারাটা দিন নষ্ট হ'লো, এদিকে মাঝরাতে বাড়ি ফিরে দেখে এক প্রত্যাশী তার অপেক্ষায় সারাদিন ব'সে আছে, নানাদিক থেকেই অতি উপভোগ্য। খুঁটিনাটি বর্ণনায় অচিন্ত্যকুমারের অসাধারণ দক্ষতা, এবং এ-ক্ষেত্রে খুঁটিনাটির প্রয়োজন ছিলো ব'লে গল্পটির দীর্ঘতা ক্লান্তিকর হয়নি। মফঃস্বলবাসী বিবিধ 'সাহেব'দের মনোভাব ও আলাপ-ব্যবহার নিয়ে অচিন্ত্যকুমারের সরস বিদ্রূপ অনেকেই উপভোগ

করবেন ; আমি ব্যক্তিগতভাবে 'শর্ট্‌স্' নামক পরিধেয় বস্তু সম্বন্ধে মন্তব্যের জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ('ওটা পরে' তবু দাঁড়ানো যায়, লোকে বসে কি করে'—কেউ-কেউ আবার পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বসে।' সত্যি কথা, আমিও তা ভেবে পাই না।) সমস্ত ছবিটি হুবহু জীবন্ত হ'য়ে ফুটেছে ; কোথাও একটু অস্পষ্টতা নেই, আতিশয্যও নেই, বেচারা বরেনের ঘেমে-ওঠা কলারটি পর্যন্ত চোখে দেখা যায়। 'উপান্ত' গল্পে কৃপণ মুন্সেফের চরিত্র-চিত্রণ বাস্তবিকই বিস্ময়কর, তাছাড়া 'সাপ' গল্পের হাস্যচ্ছুরিতা নায়িকাকে সহজে ভোলা যায় না।

কিন্তু এ-বইয়ের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্প 'ছুরি'। আমার বিবেচনায় এমন নিখুঁত, সম্পূর্ণ তৃপ্তিকর গল্প অচিন্ত্যকুমার এ-পর্যন্ত আর লেখেননি। গ্রাম্য সহরের মুদি দোকানে হিন্দুস্থানী তরুণীর প্রতি চাকুরে বঙ্গযুবকের লোলুপ দৃষ্টি ঘটনা হিসেবে সাধারণই বলতে হবে ; কিন্তু এই সূত্র ধ'রে লেখক গল্পটিকে আশ্চর্য পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছেন যে গৌরীয়া তুচ্ছ একটা মেয়ে নয়, প্রেমোপাখ্যানের ট্র্যাজিক নায়িকা। গল্পটিতে ভাববিলাস নেই, সস্তা সিনিসিজ্‌ম্‌ও নেই ; স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ভাষায় দুটি স্ত্রী-পুরুষের জটিল মর্ম-কথা চমৎকার বলা হয়েছে। গল্পটি আমার আরো বেশি ভালো লাগলো এই কারণে যে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অচিন্ত্যকুমারের দৃষ্টিভঙ্গি বরাবরই আমার একটু অদ্ভুত লেগেছে। মেয়েদের হয় তিনি কল্পনার অশরীরী দেবী বানিয়েছেন, নয় গায়ের জোরে ধুলোয় টেনে এনে নির্মম প্রহার করেছেন। যেমন, এ-বইয়ের 'ডিস্‌ক্' গল্পটি ভালো, কিন্তু গায়িকাটি বড্ড বেশি দেবীভাবাপন্ন ; অন্যপক্ষে, পুষ্পরাণী দে-কে অমন নিষ্ঠুর ও মিথ্যা অপমান তিনি যে কোন্ সাহিত্যিক বিবেকে করলেন তা বুঝলাম না। যে-মেয়ে সর্বদা পড়াশুনো নিয়ে থাকে, কোনো গয়না পরে না, এবং—সব চেয়ে আশ্চর্য!—'চিত্রা' কোথায় জানে না, সে-ই যে বিয়ের পরে মাংসল শরীরে বিস্তর গয়না প'রে বাংলা সিনেমা দেখতে যাবে, এবং পরিশেষে—আঘাতের উপর অপমান! ছেলের মা হবার কামনায় সন্ন্যাসীর শরণ নেবে—এ যদি রিয়্যালিজ্‌ম্ হয় তাহ'লে এ-রিয়্যালিজ্‌ম্-এ আমাদের দরকার নেই। এমন ঘটনা জীবনে ঘটতে পারে না তা বলি না ; জীবন নেহাৎই সত্য ঘটনা, সুতরাং সেখানে সবই সম্ভব। কাউকে বিশ্বাস করাবার দায় জীবনের নেই, যা ঘটছে চোখেই দেখা যাচ্ছে, গল্প-লেখকের সে-দায় আছে ব'লেই মুস্কিল। নয় তো গল্পের কোনো কঠিন সমস্যার স্থলে কোনো চরিত্রকে সাপের কামড়ে মেরে ফেললেও দোষের হ'তো না। 'পুষ্পরাণী দে' সম্বন্ধে আমি বলি : প্রথমত, গল্পটি খুব বেশি সম্ভব নয়, কেননা কেবল বিবাহের ফলে কোনো মানুষ এমন অস্বাভাবিক বদলাতে পারে না, কখনোই পারে কিনা তাও জিজ্ঞাস্য। অন্যপক্ষে, গল্পটি অতিরঞ্জন হিসেবেও মেনে নিতে হ'লে বলতে হয় যে উচ্চশিক্ষা মেয়েদের উপরকার পালিশ মাত্র, আসলে ওরা মাংসসর্বস্ব সন্তানবাহী জীব মাত্র, এবং এ-মত ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল, আজকের দিনের বাংলাদেশে এ-মত প্রচার করা সমাজ-বিরোধী। গল্পটি যে সুলিখিত, তাতে বিপদ বাড়ে বই কমে না। স্পষ্টই বোঝা যায়, পুষ্পরাণীকে হাত-পা বেঁধে গায়ের জোরে মারা হয়েছে। গল্পটি এতই অবাস্তব যে ঠাট্টা হিসেবেও অগ্রাহ্য।

স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে দুই বিপরীত অন্তিম থেকেই অচিন্ত্যকুমার মুক্তি পেয়েছিলেন, যখন তিনি 'ছুরি' গল্পটি লেখেন। গৌরীয়া রক্তমাংসের মেয়ে, এবং রক্ত-মাংসের আড়ালে মনুষ্যোচিত অন্যান্য লক্ষণও আছে। সে নিছক মেয়ে নয়, সে মানুষও। ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে সে স্মরণীয় নায়িকা।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিভাবান লেখক। তাঁর রচনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় থেকেই আমি তাঁর সম্বন্ধে উৎসাহী, যদিও এর আগে সে-সম্বন্ধে কিছু বলবার সুযোগ হয়নি। তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি' অপরূপ বই, 'পুতুলনাচের ইতিকথা' মহৎ উপন্যাস, যদিও প্রথম বইটির সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকলেও দ্বিতীয়টির অনেকে হয়তো এখনো নামও শোনেননি। সাময়িক পত্রাদিতে তাঁর কিছু-কিছু ছোট গল্প প'ড়েও মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর লেখার একটি বিশেষত্ব প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিলুম, চরিত্রগুলি প্রায়ই একটু উৎকেন্দ্রিক, তারা যেন ঠিক সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ নয়। বলা যেতে পারে আমাদের বর্তমান সমাজে মানুষের পক্ষে সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকা শক্ত, এবং মাণিকবাবু বর্তমান সমাজেরই ছবি আঁকছেন; তবু এ-কথা মনে না-ক'রে পারিনে যে সহজের চাইতে দুর্গম ও জটিলের দিকে, স্বাভাবিকের চাইতে অতি-স্বাভাবিকের দিকেই তাঁর ঝোঁক। এবং এই ঝোঁক উপন্যাসের চাইতে ছোটো গল্পেই তাঁর বেশি পরিস্ফুট। মানুষের মনের গহনতম রহস্যের সন্ধানে তিনি অনেক সময় নিষ্ঠুর শক্তিশালী গল্প লিখেছেন, যেমন 'প্রাগৈতিহাসিক', আবার কখনো-কখনো তা মনে হয়েছে মর্বিডিটিমাত্র, যেটা কাটিয়ে উঠলেই ভালো। যা-ই হোক, এ-পর্যন্ত তিনি এমন কিছুই প্রায় লেখেননি যা একেবারে তুচ্ছ, যাতে, ভালো বলতে চাই আর না-ই চাই, তাঁর স্বকীয়তা ও শক্তির পরিচয় না পাওয়া গেছে। আধুনিক কি প্রাচীন আর কোনো বাঙালি লেখকের সঙ্গেই তাঁর সাদৃশ্য নেই; সম্পূর্ণরূপে নিজের চোখ দিয়ে তিনি জীবনকে দেখেছেন, এবং কিছুটা রূঢ়তার সঙ্গেই সেই পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

'মিহি ও মোটা কাহিনী' তাঁর নতুন ছোটো গল্পের বই। আমার নিজের ধারণা, ছোটো গল্পের চাইতে উপন্যাসের প্রসারিত ক্ষেত্রই তাঁর বিশিষ্টতার অনুকূল; ছোটো গল্পে প্রায়ই যেন তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তাঁর উপন্যাসের পরিণতি ও পরিশেষ নিখুঁত, গল্প সম্বন্ধে সব সময় সে-কথা বলা চলে না—এবং ছোটো গল্পেই যে তাঁর 'অস্বাস্থ্য' বেশি লক্ষ্য করি তার কারণও তা-ই হ'তে পারে। এ-কথা বলার মানে এ নয় যে ভালো ছোটো গল্প তিনি লেখেননি। যথেষ্টই লিখেছেন, আলোচ্য গ্রন্থেও কয়েকটি চমৎকার গল্প আছে। অনেক সময় তিনি সম্পূর্ণ একটি গল্প লিখতে চেষ্টাই করেন না; একটিমাত্র চরিত্র বা ঘটনা অবলম্বন ক'রে এক খণ্ড জীবন আমাদের পরিবেষণ ক'রেই ক্ষান্ত হন। যেমন 'মিহি ও মোটা কাহিনী'তে 'অবগুণ্ঠিত' ও 'বিপত্নীক'। এক বাঙালি ভদ্রলোক বেলা দশটায় আপিসে বেরোচ্ছেন—এ-ই হচ্ছে 'অবগুণ্ঠিত' গল্পের 'ঘটনা'। মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠায় সেই সময়ে তাঁর বাড়ির কার্যকলাপ, স্ত্রীর লজ্জিত আবির্ভাব, প্রতিদিন একই গলি দিয়ে একই রাস্তা ধ'রে আপিসযাত্রার বিষণ্ণতা,

আর তারই মধ্যে এক গণিকাসক্ত 'বাবু'র সঙ্গে দেখা হওয়ার গ্লানি—সব মিলে যে-ছবিটি ফুটেছে তা অতি চেনা, অথচ ঠিক চেনা নয়, কেননা শিল্পকলা তাকে রূপান্তরিত করেছে। কয়েকটিমাত্র সরু রেখা—অথচ আমাদের মনে কোনো অতৃপ্তি থাকে না, মনে হয়, সম্পূর্ণ একটি সৃষ্টিকে পাওয়া গেলো। এ-ধরণের গল্প প'ড়ে এ-কথাই মনে হয় যে আমাদের চোখের উপর প্রতিদিন কত হাজার গল্প ঘ'টে যাচ্ছে, যিনি দেখতে জানেন তাঁর চোখেই শুধু ধরা পড়ে। আমি বরাবর বিশ্বাস করেছি যে 'ঘটনা' ছাড়াও গল্প হ'তে পারে, এখানে তারই প্রমাণ। 'বিপত্নীক'ও এই জাতের গল্প। গতরাত্রে স্ত্রীকে অপমান ও প্রহার করবার পর সকালে উঠে দেখা গেলো, তিনি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন। সেদিকে তাকিয়ে সদ্য বিপত্নীক শুধু এই ভাবতে লাগলো যে দড়িটা স্ত্রী হুকে আটকেছিল কেমন ক'রে? টেবল চেয়ার কিছুই সে টেনে নেয়নি, তবে?… ব্যস, হ'য়ে গেলো গল্প। এই সমাপ্তিতে চতুরালি, এবং সম্ভবত চতুরালির বেশি কিছু আছে।

সত্যি বলতে, মাণিকবাবুর কোনো গল্পেই ঘটনার প্রাধান্য নেই। মানুষের মনের বিশ্লেষণেই তাঁর আনন্দ, সেই সব দিকের বিশ্লেষণ, যা সাধারণত বাইরের আলোয় দেখা দেয় না, এবং যেগুলোর অস্তিত্ব নেই ব'লেই আমরা সাধারণত ভাণ করতে ভালোবাসি। সে-সব দিকই বেশি ক'রে দেখা বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির ফল কিনা, তা আমি বলতে পারি না, তবে এটুকু বলবো যে সে-সব দিকও সাহিত্যে প্রকাশিত হবার দরকার আছে, কেননা যতই আমরা ভাণ করি না, সেগুলোর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। তাছাড়া যেখান থেকে খুসি উপাদান সংগ্রহের অধিকার শিল্পীর আছে; কেমন ক'রে তিনি সেই উপাদান ব্যবহার করেন, তাঁর প্রচ্ছন্ন মন্তব্যেরই বা গতি কোন দিকে, শুধু তা-ই দিয়েই আমরা বিচার করতে পারি। আশ্চর্য এই যে মাণিকবাবুর লেখা থেকে কোনো প্রচ্ছন্ন মন্তব্যও বা'র করা দুঃসাধ্য। তিনি যে শুধু স্বল্পভাষী তা নন, নিজে তিনি প্রায় অনুপস্থিত। তাঁর নিরপেক্ষতা প্রায় মূল্যজ্ঞানের অভাবের সমান। প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও গল্প লেখার ধরণ নাটকীয়, অর্থাৎ নিরপেক্ষ, কিন্তু গল্পের মধ্যেই তাঁর মন্তব্য প্রচ্ছন্ন থাকে, নয় তো 'পুন্নাম' কি 'ভবিষ্যতের ভার' অত ভালো গল্প হ'তো না। মাণিকবাবু যেন এই বিরাট জীবনযাত্রার কোনো-কোনো অংশ রিপোর্ট ক'রেই খুসি। সামাজিক বিবেকের তিনি ধার ধারেন না। তা-ই যদি না হবে, 'সিঁড়ি'র মতো অমন নিষ্ঠুর, প্রায় বীভৎস গল্প অমন ঠাণ্ডা মেজাজে তিনি লিখলেন কেমন ক'রে? একটি অতি দরিদ্র পরিবার বাড়ি ভাড়া দিতে পারছে না, এবং 'অলস ধনী' শ্রেণীভুক্ত বাড়িওলা তার সুযোগ নিচ্ছে একটি খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচারে—এ গল্পটি মাণিকবাবু এমন ভাবে লিখেছেন যেন বিশেষ কিছুই ঘটছে না। সমস্ত ব্যাপারটির হুঙ্কারজনক ভয়াবহতা হৃদয়হীন মনোনিবেশের সহিত তিনি আস্তে-আস্তে অতি স্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন, আর-কিছুই করেননি। তিনি যে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী এ থেকে তা বুঝলাম, কিন্তু শিল্পীর কি আর কোনো দায়িত্ব নেই?

তবে এটা দেখা গেলো যে কখনো-কখনো মাণিকবাবুর নিষ্ঠুরতাও হার মানে। 'শৈলজ শিলা' গল্পটি ধরুন। এক কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে জন্ম থেকে পালন ক'রে গল্পের প্রৌঢ় নায়ক হঠাৎ আবিষ্কার করলো যে সদ্যযৌবনাপন্না 'নাৎনি'র সে দুর্দান্ত প্রেমে পড়েছে।

পরের মেয়েকে অনেকেই পালন করে, প্রৌঢ় বয়েসে বালিকার প্রতি প্রণয়সঞ্চারও বিরল নয়, কিন্তু সাক্ষাৎ নিজের পালিতা মেয়ের প্রেমে পড়া সচরাচর ঘটে না। তা হ'লেও এ নিয়ে গল্প হ'তে পারে, কিন্তু আস্ত একটা এলিজাবেথীয় ট্রাজিডি না ফাঁদলে এ-ঘটনা মানানো শক্ত। ভূমিকম্প রোজ ঘটে না, যখন ঘটে সর্বনাশ ক'রে যায়। কিন্তু 'শৈলজ শিলা'য় মাণিকবাবু শেষ সর্বনাশ পর্যন্ত যাননি। 'নাৎনি' যাতে বিয়ে করতে না পারে, সেই ভয়ে 'দাদু' তাকে নিয়ে কলকাতার বাইরে পালিয়ে গেলো; মেয়েটি সেখানে রাত্রে দরজা বন্ধ ক'রে শোয়, এবং 'দাদু' দরজায় করাঘাত ক'রে হতাশ হয়ে ফিরে যায়। এখানেই গল্প শেষ। সমস্যাটি এতই ভয়াবহ যে লেখক নিজেই যেন আর তার সম্মুখীন হ'তে পারলেন না, হঠাৎ পালিয়ে বাঁচলেন। শিল্পী হিসেবে এখানে তাঁর পরাভব।

এ-বইয়ের মধ্যে সব চেয়ে আমার ভালো লাগলো 'খুকী' গল্পটি। নেহাৎই দুটি তরুণ-তরুণীর প্রণয়-লীলা ও পরিশেষে বিবাহ, কিন্তু সমস্ত গল্পটি ক্ষুদ্র নায়িকার বিচিত্র ও গভীর ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল। এমন একটি সাবয়ব মুখর ও বাস্তব প্রণয়িনী আমাদের দেশের গল্পে বড়ো দেখা যায় না। এমন সহজ ও জীবন্ত কথাবার্তা ও কথাবার্তার ভিতর দিয়েই গল্পের পরিণতি— এ-ও আমাদের সাহিত্যে বিরল। গল্পটির 'সুখী' সমাপ্তি শুধু পাঠিকার পরিতৃপ্তির জন্য নয়, শিল্পের অনিবার্য তাগিদেই প্রয়োজন ছিলো। এ-গল্পটি মাণিকবাবুর অন্যান্য বেশির ভাগ গল্প থেকে আলাদা এই হিসেবে যে এর কারবার সহজ, স্বাভাবিক মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিয়েই। যে একবার গল্প লিখেছে সেই জানে যে যাকে সহজ বলি তা নিয়ে গল্প লেখা মোটেও সহজ নয়, বরং সব চেয়ে শক্ত। সোজাসুজি একটি প্রেমের গল্প লেখা গল্প-লেখকের সব চেয়ে দুস্তর পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় মাণিকবাবু সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন, শিল্পী হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। যদি কখনো বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্পের একটি সংগ্রহ বেরোয়, 'খুকী' গল্পটী সেখানে গৌরবের স্থান পাবে।

'হাত' ও 'আশ্রয়' খাঁটি অসুস্থ মনস্তত্ত্বের চর্চা। শোকাহত নষ্টধী ভৃত্যের নন্দরাণীর প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণ মেনে নিতে কষ্ট হয় না; কিন্তু 'হাত' গল্পটি দুঃস্বপ্নের মতো শ্বাসরোধকারী—এবং দুঃস্বপ্নের মতোই অলীক। যাতে আমাদের বাস্তবতা-বোধ শুধু আহত নয়, বিধ্বস্ত হয়, এমন গল্প লেখবার আমি তো কোনো সার্থকতা দেখিনে। 'চমকপ্রদ' হবার লোভ সামলাবার ক্ষমতা মাণিকবাবুর নিশ্চয়ই আছে? 'টিকটিকি' গল্পটি সাম্প্রতিক, কিন্তু এ যেন তাঁর অযোগ্য মনে হয়। ('চতুরঙ্গে'র গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'বোমা' সম্বন্ধেও সেই কথা।) এ দুটি গল্প থেকে আশঙ্কা হয় মাণিকবাবু বুঝি আত্ম-প্রত্যয় হারিয়ে ফেলছেন, এতে প্রয়াস এতই স্পষ্ট যেন ঘামের ফোঁটাও দেখা যায়। মাণিকবাবু যেন চেষ্টা ক'রে এমন কি গায়ের জোরে গভীর ও অসাধারণ হচ্ছেন। সত্যি-সত্যি যিনি অসাধারণ লেখেন অসাধারণ হবার চেষ্টা তাঁকে মানায় না।

'শ্মশানে বসন্ত' এগারোটি ছোটো গল্পের সমষ্টি। লেখক কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় পরিচিত হ'য়ে উঠেছেন। 'শবরী' নামে একটি কবিতার বইয়ের তিনি

প্রণেতা, এটি তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন এসেছেন, এসেছেন উৎসাহ ও প্রতিশ্রুতি নিয়েই। লিখতে পারার প্রথম সর্ত তাঁর মধ্যে বর্তমান, তাঁর কলম আড়ষ্ট নয়। তাঁর ভাষা সজীব ও সাবলীল, যদিও সংহত এখনো নয়, প্রাকৃতিক ও অন্যান্য বর্ণনার বাহুল্য চোখে পড়ে। গল্পের ছাঁচ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা আছে তাও এ-বই প'ড়ে বোঝা গেলো। এ-বইয়ের মধ্যে 'সেদিন আর আজ' গল্পটি আমার সব চেয়ে ভালো লাগলো। কিছুটা ভাব-প্রবণতা থাকলেও নিতান্ত তরল নয়; বিষয় অতি পুরোনো হ'লেও সরস লিখনভঙ্গির গুণে মোটের উপর উৎরে গেছে। 'একরাত্রির প্রেম' গল্পে নতুন ধরণের বিষয় অবতারণার চেষ্টা আছে; লেখক আর-একটু খাটলে গল্পটি বেশ ভালো হ'তে পারতো। তবে কথকের কাহিনী শেষ হবার পরে 'ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধের' আবির্ভাব নেহাৎই অনধিকারপ্রবেশ মনে হয়। এক টুকরো প্রকৃতি বর্ণনা দিয়ে গল্পের শেষ করা—এ ব্যাপার বাংলাভাষায় অতিব্যবহারে এতই প'চে গেছে যে আজকালকার লেখকের পক্ষে তা সজ্ঞানেই পরিত্যাজ্য। বন্ধুদের আড্ডায় নায়কের মুখে গল্পটি বলানো এবং আনুষঙ্গিক চা-সিগারেটও আর ভালো লাগে না। গল্প বলার এ কৌশল বোধ হয় আমরা মোপাসাঁর কাছে শিখেছি, কিন্তু ভালো ক'রে শিখতে পারিনি। কৌশলটি দুরূহ, এর প্রয়োগের ক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ, এবং অপপ্রয়োগ বিপজ্জনক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সোজাসুজি প্রথম পুরুষে গল্প ব'লে গেলেই সব চেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়।

বইটির বেশির ভাগ গল্পই অত্যন্ত বেশি রোমান্টিক। জীবনের একটা সময়ে রোমান্টিক হওয়া হয়ত দোষের নয়, কিন্তু গল্পের মধ্যে আমরা জীবনের সঙ্গে আর-একটু নিবিড় যোগাযোগ আশা করি। সে যোগাযোগ যখন স্থাপিত হবে, তখন এই নবীন লেখকের ভাষায় অত্যধিক লালিত্য কেটে গিয়ে ঋজু ও দৃঢ় হবে—কেননা ভাষার উচ্ছ্বাসবাহুল্য বিষয়ের অস্পষ্টতারই লক্ষণ। কামাক্ষীপ্রসাদের যতখানি উৎসাহ ও সম্ভাবনা, সেই অনুসারে তিনি যদি আন্তরিক পরিশ্রম করেন, যদি নিজের প্রতি সততাকে লক্ষ্য ক'রে লেখা অভ্যাস করেন, তা'হলে কি গল্পে, কি কবিতায় তিনি 'পৌছিয়ে' যাবেন, এমন আশা করা যায়।

বুদ্ধদেব বসু

আধুনিক গুজরাটি সাহিত্য

আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিঃসংশয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্যায়ে আসন অর্জন করেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে, অন্ততঃ গুজরাটি সাহিত্য সম্বন্ধে বোধ হয় সে-কথা বলা চলে না। আধুনিক কালে একটি গুজরাটি গদ্য সাহিত্য গড়ে উঠ্ছে সত্য; কিন্তু একটি বলিষ্ঠ নাটকীয় ঐতিহ্যের গোড়াপত্তন হ'তে এখনও দেরি আছে। আর গুজরাটি উপন্যাসকে ত' এখনও কেবল গঠনোন্মুখই বলা যায়। এবং ইউরোপীয় লেখকদের হাতে যে দুটি সুন্দর ও শক্তিশালী ভাবপ্রকাশের উপায় রয়েছে—অর্থাৎ ছোটগল্প ও প্রবন্ধ—তা গুজরাটি সাহিত্যে একেবারেই নতুন। কবিতার সম্বন্ধে অবশ্য বলা যায় যে, আমাদের প্রাচীন কাব্যে ধর্মের প্রভাব খুব বেশি হ'লেও বর্তমানের লিরিক কাব্য বেশ পরিণত রূপ ধারণ করেছে। এবং আধুনিক লেখকদের বিচিত্র প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে এই লিরিক্-কাব্য আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

বিগত শতকের শেষ দিকে বিদ্রোহী কবি নর্মদ এক সঙ্গত ও সতেজ গদ্য সাহিত্যের গোড়াপত্তন করেন। সমালোচক নবলরাম ও চিন্তাশীল লেখক মণিলাল নভুভাই এই প্রচেষ্টাকে বাঁচিয়ে রাখেন। এই সময়ে গোবর্দ্ধনরাম ত্রিপাঠীর বৃহৎ সামাজিক উপন্যাস 'সরস্বতী চন্দ্র' প্রকাশিত হয়; এর আগেই গুজরাটি গদ্য সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি অনেক এগিয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণ গদ্য—যে গদ্য জনসাধারণ লিখতে পড়তে ও বুঝতে পারে, যে গদ্যের প্রাণ হচ্ছে বিশুদ্ধ প্রসাদগুণ; যা ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীর বিলাতী গদ্য লেখকদের অনুপ্রাণিত করেছিল—এমন একটি গদ্য সাহিত্য গঠন করবার কৃতিত্ব শুধু গান্ধীজি ও তাঁর ভাবধারায় দীক্ষিত শিষ্যরাই দাবী করতে পারেন। সমরোত্তর যুগের লেখকদের ভেতর যাঁরা গান্ধীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁদের ভেতর কাকা কালেলকার, রামনারায়ণ পাঠক, ও মধুরুবালার নাম উল্লেখযোগ্য। কাকা কালেলকারের রচনা-ভঙ্গি মনোরম; ভ্রমণ, শিক্ষা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে তাঁর অনেক সুচিন্তিত মনোজ্ঞ লেখা আছে। রামনারায়ণ পাঠকের ছোটগল্প ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ এবং সমালোচনায় সমরোত্তর যুগের সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। মধুরুবালার লেখাতেও যথেষ্ট চিন্তার খোরাক আছে। গান্ধীজির উদ্যমের ফলে ও অন্যান্য সমরোত্তর চিন্তাধারার প্রভাবে আমাদের দেশ যে বৈপ্লবিক চিন্তাপ্রবাহের ভিতর দিয়ে চলেছে, তা'র ছাপ প্রায় প্রত্যেক আধুনিক গুজরাটি লেখকের রচনাতেই রয়েছে।

আধুনিক গুজরাটি কবিদের কাব্যে দেখা যায় নিঃস্ব ও পতিতের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ; সাধারণের জীবনের প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ—যাকে শুধু রং ফলাবার খেয়াল ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না; আর দেখা যায় নতুন প্রকাশভঙ্গির প্রতি একটা আগ্রহ এবং পুরানো শব্দগুলি গড়ে' তোলা ও প্রয়োজন মত নতুনের প্রবর্ত্তন করার প্রচেষ্টা; তা ছাড়া ভক্তিযোগাত্মক ও প্রেমমূলক, 'ফিউড্যাল্' ও 'ক্লাসিক্যাল' ঐতিহ্য থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি আধুনিক গুজরাটি কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বলবন্তরায় ঠাকুরের মত বয়সে-প্রবীণ অথচ চিন্তাধারায়-তরুণ কবি ও সমালোচকগণ অতীতের মোহ কাটিয়ে উঠেছেন এবং আধুনিক কাব্য-স্রোতকে নতুন পথে পরিচালিত করেছেন—একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। উমাশঙ্কর যোশীর 'গঙ্গোত্রি' এবং সুন্দরম্-এর 'কাড়বীবাণী' প্রভৃতি বই সত্যিকার কাব্য এবং এর ভেতরে অনেক উন্নতির আভাষ দেখা যায়, একথা 'আধুনিকতা'র তীব্র সমালোচকগণও অস্বীকার করবেন না।

আধুনিক সাহিত্যে বিখ্যাত পার্শী কবি খবরদার অথবা প্রবীণ জীবিত কবি ননলালের স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা শক্ত। ননলাল পুরানো ধাঁচের সমিল কবিতার বদলে অমিল অথচ ধ্বনিময় কবিতার (বা অপদ্য গদ্যের) প্রবর্ত্তন করেছেন বটে কিন্তু তাঁর বিদ্রোহ ও ভঙ্গি পার হয়ে কাব্যের বিষয়বস্তু পর্য্যন্ত তবু তিনি পৌঁছন নি। তাঁর সুললিত লিরিক্ কবিতায় গতানুগতিক মূল্যবোধ ও আদর্শবাদী রোমান্টিক ভাবধারা থেকে তিনিও তাই মুক্ত হ'তে পারেন নি। তাঁর আত্মগত স্বপ্নসুষমার ভেতর একটা নৈর্ব্যক্তিক জীবনের চিত্র খুঁজতে গেলে আমরা ব্যর্থ হ'ব। তাঁর 'রাস' প্রভৃতি মনোরম লিরিক্-কাব্যের ভেতর বাস্তবের সন্ধান করা মানেই রোমান্স্-এর বুদ্বুদে খোঁচা মারা।

আজকালকার তরুণ কবির লেখায় যে আধুনিকতার ছাপ ও জীবনের রুক্ষ বাস্তবতার সঙ্গে যে সংযোগ দেখতে পাওয়া যায়, তরুণ লেখক উমাশঙ্কর যোশী এবং চন্দ্রবদন মেহ্‌টার বস্তুতান্ত্রিক একাঙ্ক নাটকেও তার প্রতিচ্ছবি রয়েছে। তবে এই নাটকগুলি যে সব সময়েই রঙ্গমঞ্চে সফল হ'য়েছে এমন কথা বলা যায় না। এই রকম একাঙ্ক নাটক ও ছোট গল্পকে কেন্দ্র ক'রে একদল তরুণ সাহিত্যিক গড়ে উঠেছেন। এঁদের প্রচেষ্টা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বর্ণচ্ছটায় গুজরাটি সাহিত্যের পূর্ব্বদিগন্ত উদ্ভাসিত করে তুলবে, এরূপ আশা করা যেতে পারে। এই সম্পর্কে মাননীয় মুন্‌সিজীর সামাজিক কমেডি 'কাকানি শশী' উল্লেখযোগ্য; মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-রচনা হিসাবে 'কাকানি শশী' পাঁঠক সম্প্রদায়ের ভেতর যথেষ্ট আলোড়ন এনেছে। চন্দ্রবদন মেহ্‌টার নাটকগুলিও অভিনীত হ'য়েছে; এ দিক দিয়ে সৌখিন অভিনেতা ও পরিচালক হিসাবে এবং কবি হিসাবে চন্দ্রবদন মেহ্‌টা যথেষ্ট সুনাম কিনেছেন। চন্দ্রবদনের বস্তুতান্ত্রিক প্রোলেটারীয়ান্ নাটকগুলির ভেতর একটা বিদ্রোহী 'শেভিয়ান' ভাবধারা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর "আগ্-গাড়ী" (গরুর গাড়ী) নাটকে রেলওয়ে কুলির জীবন যাত্রার একটি নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়; এই ধরণের নাটক ভারতীয় সাহিত্যে বিরল।

গুজরাটি উপন্যাসের জীবন-ইতিহাসকে অপ্রতিহতগতি বলা যায় না। গোবর্দ্ধনরামের হাতে গুজরাটি উপন্যাস অনেকখানি পরিপুষ্টি লাভ করে; কয়েক বছর পরে কানাইয়ালাল মুন্‌সির প্রাণবান ও মনোরম ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভিতর দিয়ে গুজরাটি উপন্যাস খুব শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছিল। গত দশ বৎসর ধরে মুন্‌সিজীর উপন্যাস তরুণ চিত্তে দোলা দিয়েছে। রমনলাল দেশাই গুজরাটি উপন্যাসকে নতুন স্তরে নিয়ে গেছেন এবং উপন্যাসকে তিনি সামাজিক সমৃদ্ধির জনপ্রিয় পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। গত দশ বৎসর ধরে তিনি উপন্যাসের ভিতর দিয়ে গুজরাটের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি ও বিচিত্র চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন; এবং নতুন ও পুরাতনের সমন্বয় করবার চেষ্টাও করেছেন। তাঁর উপন্যাস জনপ্রিয় হ'লেও এতে বলিষ্ঠ প্রকাশধারা ও সূক্ষ্ম টেক্‌নিক্-এর অভাব দেখতে পাওয়া যায়; অনুবৃত্তি তাঁর লেখার প্রধান দোষ। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে ছোটগল্প আজকালকার লেখকদের কাছে নতুন নতুন পথ খুলে দিয়েছে আর সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার সন্ধান দিয়েছে। এবং যদিও এই সুন্দর সাহিত্যাঙ্গের ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তার জন্য গুজরাটি সাহিত্যে বহু নিকৃষ্ট ছোটগল্পের সৃষ্টি হয়েছে এবং যদিও এ-জাতীয় অনেক গল্পলেখক-ই অনিপুণতা, এবং টেক্‌নিক্ সম্বন্ধে নিতান্ত অকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তবু মাঝে মাঝে অতি সুন্দর দু-একটি গল্পও আমরা দেখতে পাই। সুন্দরম্-এর 'খোলকি', উমাশঙ্কর যোশীর 'ঝাকালিয়ঁা' (আশ্রয়), 'শ্রাবণী মেলো' (শ্রাবণের মেলা) প্রভৃতি উঁচুদরের ছোটগল্প আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ গল্প-সঞ্চয়ে অনায়াসেই স্থান পেতে পারে।

[অনূদিত]

হীরালাল গদীওয়ালা

সঙ্গীত

আধুনিক জীবনে রেডিয়ো একান্ত অপ্রতিবিধেয় ভাবে আবির্ভূত হয়েছে। সিনেমা বা থিয়েটারে না গেলেও চলে, কিন্তু প্রতিবাসীর দিনরাত্রিব্যাপী অকুণ্ঠিত রেডিয়ো উৎসবের হাত থেকে এত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। সুতরাং অনিচ্ছা সহকারেও শুনতে হয় এবং সেহেতু বেতারজগতের প্রতি নজর পড়ে। কোন যন্ত্র দ্বারা যখন সহসা জীবন নিয়ন্ত্রিত হতে আরম্ভ করে, তখন তার পূর্ণ সম্ভাব্যতা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। ধীরে ধীরে সে পরিস্ফুট হতে আরম্ভ করে। এখন যদিও বেতারের মাত্র সূত্রপাত হয়েছে, রেডিয়ো-সেটের প্রাচুর্য্য তত উচ্চভাষী নয়, তার বিরাট পরিসরের অনেকখানি এলোমেলো হয়ে ছড়ানো, তবু সূচনায় নানাদেশে যে ভাবে ও যেটুকু আলোচনা আরম্ভ হয়েছে তাতে বেতারলোকের গতিবিধি সুব্যবস্থিত করায় সামান্য সাহায্য হতে পারে।

পূর্ব্বে মানুষ সামনে গান গাইত, বাজনা বাজাত, আমরা বসে শুনতাম। এখন যন্ত্র মধ্যবর্ত্তী হয়ে পড়ে পরিবেষণ ভিন্নরকম দাঁড়িয়েছে। এক যন্ত্রের সামনে গায়ক গাইতে বসে, আর যন্ত্রের সাহায্যে সুবিস্তীর্ণ সঙ্গীত শ্রোতার কানে যায়। গায়ককে দেখতে পাই না, শুনি তার গান। এতে গানবাজনায় যে কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়, তাতে উপভোগ কি ভাবে ও কতটা ক্ষুণ্ণ হয় সেটা ভাববার কথা। এটা ঠিক যে সম্মুখবর্ত্তী শিল্পীর ব্যক্তিত্ব পূর্ণ বিকীরিত হতে পারে, আমরা তাঁর বৈশিষ্ট্যের কিছু পরিচয় পাই চেহারা ও হাবভাবে। যন্ত্রচালিত সঙ্গীতের সম্বন্ধে একথা খাটে না, এমন কি কণ্ঠস্বরও নিখুঁত থাকে না, সামান্য বিকৃতি এসে পড়েই। তবু লাভের দিকটা দেখতে হয়। একজন প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পীর সবজায়গায় মুখোমুখি নিজের কারু-কলার পরিচয় প্রদান সম্ভব নয়, মানুষের অর্থ সামর্থ্য দুই তার পরিপন্থী। মূল্যবান জিনিষ যখন কোন কারণে সস্তা হয়ে পড়ে, স্বভাবতই ক্ষোভ জন্মায়। এ মনোভাবকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। যা ভাল তা আলো হাওয়ার মত জীবনে এসে পড়ুক, সঞ্চারিত হোক, এতে আপত্তির কি থাকতে পারে? কিন্তু অর্থের অনুপাতে সস্তা হওয়া এক কথা, আর বুঝতে পারা সাধনালভ্য হওয়ার কারণে অবজ্ঞার, অনাদরের বস্তু হওয়ার সুলভতা অন্য ব্যাপার, কিন্তু সেকথা আলোচনা করবার পূর্ব্বে যান্ত্রিক ত্রুটি বলতে কি বোঝায় তা দেখা উচিত।

যন্ত্র যখন ধনতান্ত্রিক কারখানার নোংরা ও নিষ্ঠুর রূপ নিয়ে আসে, তাকে বিভীষিকা মনে করা অন্যায় নয়, কিন্তু তাতে যন্ত্রের কোন অপরাধ প্রমাণিত হয় না। কাস্তে, লাঙল দিয়ে যেদিন কৃষিকার্য্য আরম্ভ হোল, সেদিনও যন্ত্র মানবসভ্যতাকে সুগম ও সহজ করেছিল। মানুষ শুধু হাতে যে কাজ আয়াসসাধ্য মনে করে কিম্বা একেবারেই করতে পারে না, অতিমানুষের প্রতীক যন্ত্রদ্বারা তা সুসাধ্য হয়। জড়ের ওপর মানুষ নিজের প্রতিচ্ছায়া ফেলে তৈরী করেছে যন্ত্র। প্রাণীর বৈচিত্র্য না পেলেও প্রাণীর কর্ম্মঠতা বহুগুণিত হয়ে তার আয়ত্তে আসে। যে কাজ

যন্ত্র করে, মোটামুটি সেটা সে একভাবে করে যাবে এটুকু আশ্বাস লোকের থাকে। যন্ত্রের ব্যক্তিত্ব কিছু নেই এমন নয়। রেলওয়ে ড্রাইভার বলে প্রত্যেক ইঞ্জিনের বিশিষ্ট খামখেয়ালি লক্ষ্য করতে হয়। প্রতি ফাউন্টেন পেন্, ঘড়ি এবং সাইকেলের ভালমন্দ নাকি সহধর্ম্মিণীর প্রকৃতির মতই দৈবাধীন। তবু প্রাণীর তুলনায় যন্ত্রের খেয়াল গুরুতর নয়। গ্রামোফোন রেকর্ডে গান যখন খুসি একই ভাবে বারবার শোনা যেতে পারে, গায়কের প্রতি এত অত্যাচার সম্ভব নয়। চাবি ঘুরোলেই রেডিয়ো বেজে ওঠে, মানুষকে সামনে না পেলেও পাই যন্ত্রনিঃসারিত তার গানের প্রতিরূপ। এর মধ্যে অভিনবত্ব আছে বলেই টকি ও রেডিয়ো আমাদের এত অনিবার্য্য রূপে আক্রমণ করেছে এবং আপাততঃ এই কথাই মনে করিয়ে দেয় যে থিয়েটারের বা গানের মজলিশের দিন ফুরিয়েছে। কিন্তু মনে হয় এ সঙ্কট সাময়িক, কলের গান আর সামনে মানুষের গান জীবনে দুইয়েরই প্রয়োজন ও সার্থকতা রয়েছে, একের স্থান অন্যের লোপ বা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

এইবার যন্ত্রের শ্রোতা ও পরিচালকের কথা এসে পড়ে। ভারতীয় সঙ্গীত অতি মন্দভাগ্য এই কারণে যে সাধারণের সঙ্গীত সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য রসজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতা নেই বল্লেও হয়; আর সাঙ্গীতিকেরা বুদ্ধিমান হলেও অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত, কাউকে গানের সম্বন্ধে দুকথা বুঝিয়ে বলতে হলে গুটিকয়েক সঙ্গীত সম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব্দের অসম্বদ্ধ পুনরাবৃত্তি ছাড়া তাঁরা কিছুই খুঁজে পান না। য়ুরোপীয়েরা যথাসাধ্য পরিশ্রম করেও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ভারতীয় সঙ্গীত বুঝতে না পারার দরুণ এপর্য্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র তৈরী হল না। কবে তাঁরা অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে মাথা ঘামিয়ে আমাদের জন্যে সুবোধ্য সঙ্গীত পুস্তক লিখবেন, ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জীবকগণ তারই অপেক্ষা করছেন। এ প্রকার আবেষ্টনে যে সব মূল্যবান তথ্য ভারতে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে এইটি—যেহেতু সাধারণ লোক সাধারণ জিনিষই ভালবাসে ও বুঝতে পারে, সেহেতু রেডিয়োতে সাধারণ বিষয়ের পরিবেষণ করা লক্ষ্য হওয়া উচিত। কোন বিষয়ের কঠিন ও অসাধারণ দিক যদি প্রোগ্রামে থাকে ত সেটা কর্ত্তৃপক্ষদের অনুকম্পা, না থাকলে থাকার আবশ্যকতা কেউ দাবী করতে পারে না।

খুব সম্ভব এই ধারণার মূলে আছে ডিমোক্র্যাসিতে সাধারণের ভোট দেবার অধিকার। আইন সভায় সাধারণের নির্ব্বাচিত লোকেরাই গিয়ে রাষ্ট্রীয় শাসনের ভার নেন। অতএব মনে হতে পারে সাধারণ রুচির বিশেষ একটা সার্থকতা আছে। কিন্তু ভেবে দেখলে বিষয়টির স্বরূপ দাঁড়ায় অন্যরকম। সাধারণ লোক যখন ভোট দেয়, তখন সমাজের সবচেয়ে সাধারণের কথা যোগ্যতার দিক থেকে তার মনে পড়ে না, দৃষ্টি পড়ে সমাজের মুষ্টিমেয় অসাধারণদের ওপর। তাদেরই ওপর লোকের ভরসা থাকে কারণ তারা ঠেকে শিখেছে, জটিল বিষয়ের সমাধানে পাকা মাথার দরকার। সব সময় যে জনসাধারণ ভালরকম যাচাই করতে পারে এমন নয়, কারণ পৃথিবীতে সাধারণী কৃষ্টির উৎকর্ষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, তবু প্রতিনিধিরা বুদ্ধি ও বিদ্যায় বিশেষ খাটো না হন এ লক্ষ্য সাধারণের থাকে (সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এটুকুও আশা করতে বাধে, কারণ সাধারণের সঙ্গীত জ্ঞান ও রসপ্রিয়তা খুব উঁচুদরের না হওয়াতে সাঙ্গীতিক বাছবিচার নিতান্ত একদেশদর্শী ও ঘোলাটে হবার প্রবণতা থাকে)। সভ্যতার পত্তন থেকে মানুষের সংস্কৃতি

কয়েকটি প্রতিভাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যে লোক গাড়ীর চাকা প্রথমে আবিষ্কার করে, তদানীন্তন জ্ঞানভাণ্ডারে তার দান নিউটনের চেয়ে কম নয়। আর্থিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য সমাজে সমান ভাবে বণ্টন করার যৌক্তিকতা আছে, কিন্তু তাই বলে প্রতিভার তারতম্য ও আদর যে-কোন রাষ্ট্রে সর্ব্ববিধ প্রগতির জন্য থাকতে বাধ্য। আমরা খেতে পাই না এবং খেতে পাওয়া যে-কোন সংস্কৃতির পূর্ব্বগামী হওয়ার কারণে জীবনের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এত বড় হয়ে দেখা দেয়। আর্থিক সমস্যা জীবনের বড় সমস্যা হলেও চরম বা জটিলতম সমস্যা নয়। একথা সাম্যবাদী রাশিয়াও বুঝতে ভুল করেনি, তা না হলে সেখানে অভিজাত বংশীয় টলষ্টয়ের বই সম্প্রতি লক্ষ লক্ষ কপি মুদ্রিত করবার কোন অর্থ থাকত না। এই প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন বলেই শেক্‌স্‌পিয়র বা টলষ্টয়কে বর্ত্তমান জগতে এখনও আমরা বাতিল করতে পারি নি। তবে আসাধারণ তার অসামান্যতার উপাদান সবটুকু যে নিজের কাছে পায় তা নয়, তার বেশীর ভাগ সৃষ্ট হয় সমাজভুক্ত সাধারণ লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসামান্যতার উপঢৌকন। এই সব মালমসলা কুড়িয়ে বাড়িয়ে সংহতি দিয়ে এবং তাতে নিজস্ব কিছু যোগ করে তৈরি হয় অসাধারণত্ব। তাই সাধারণ ও অসাধারণের যোগসূত্র যতটা শিথিল মনে হয় ঠিক ততটা সত্য নয়। এই কারণে সাধারণ ও অসাধারণ পরস্পরের আনুকূল্য ও সহানুভূতির অপেক্ষা রাখে।

সুতরাং আজ যদি রেডিয়োতে অবিমিশ্র সহজ ও সাধারণ বিষয় চালান যায়, শেষ পর্য্যন্ত আপত্তি উঠবে সাধারণের কাছ থেকে। সাধারণত্বের গুরুতম ত্রুটি তার আকর্ষণ ক্ষণস্থায়ী এবং তার দ্বারা মানুষের জীবনে কোন গভীর ছাপ পড়া সম্ভব নয়। জনসাধারণ ভাবের ও আবেগের দিক দিয়ে কোন কোন সময় অসামান্য ও প্রবল আলোড়ন চায়, তাতে তার আনন্দের সঙ্গে যতটুকু অসুবিধে ও অস্বস্তি সহ্য করতে হয়, সেটুকু দূর করতে পারলে মনে হতে পারে তার খুব উপকার করা হোল, কিন্তু তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রতিবাদ করে জনসাধারণ নিজে। সেহেতু রেডিয়োতে যদি সস্তা ও সহজের একাধিপত্য কাম্য হয়, আমার মনে হয় সেই সিদ্ধান্ত ভুল প্রতিপন্ন করবার জন্যই তার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া দরকার।

উপসংহারে রেডিয়ো যে বিশ্বের সাঙ্গীতিক সংস্কৃতি মানুষের দুয়োরে নিয়ে এসেছে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে হয়। ভাষা-নিরপেক্ষ সুরের মধ্য দিয়ে যে আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান সঙ্গীতে এসে পড়ছে, ভারতীয় গোঁড়া ওস্তাদদের সর্ব্ববিধ আপত্তি সত্ত্বেও তাকে ঠেকান যাবে না। এর পরিণামে খুব সম্ভব নতুন ভারতীয় সঙ্গীত গড়ে উঠবে। সর্ব্বমানবের সঙ্গীত সম্ভারে সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের ভারতীয় সঙ্গীতে ভারতীয়ত্ব এবং তথা প্রাদেশিকত্ব বজায় রাখা কতদূর সম্ভব বারান্তরে তাই আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল।

হেমেন্দ্রলাল রায়

সমালোচনা

INFLUENCE OF ISLAM ON INDIAN CULTURE *by* Tara Chand (Indian Press, 5/-).
OUTLINES OF ISLAMIC CULTURE *by* A. M. A. Shustery (Bangalore Press, 15/-).

আপাতদৃষ্টিতে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের সংঘর্ষ বর্ত্তমানের ভারতবর্ষের ইতিহাসে সব চেয়ে রূঢ় সত্য। সে সংঘর্ষ কেবলমাত্র রাজনৈতিক মতামত নিয়েই বাধে নি। অনেকের মতে কৃষ্টির ক্ষেত্রে সে সংঘাত আরো তীব্র। সে মতবিরোধ সন্দেহ এবং বিদ্বেষের প্রভাবে আজ এতদূর বেড়ে গিয়েছে যে কোন কোন আধুনিক নেতার মতে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের মিলন তো দূরের কথা, সম্প্রীতিও সম্ভবপর নয়। দোষ যে দুই পক্ষেরই খানিকটা আছে, সে কথা বিচার না করেও বলা চলে, কারণ প্রবাদবাক্যে সকল সময়ে বিশ্বাস রাখা সম্ভব না হলেও একহাতে যে তালি বাজে না তা অস্বীকার করবারও উপায় নেই। যাঁরা মিলন বা অন্ততঃপক্ষে সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করেন, তাদের স্বপক্ষে যুক্তি অনেক থাকলেও হট্টগোলে তাঁদের কথা প্রায়ই চাপা পড়ে যায়। তাছাড়া যুক্তি থাকলেই যে যুক্তি সকলের জানা থাকবে, তারও কোন স্থিরতা নেই।

অধ্যক্ষ তারাচাঁদের বইখানি এ সমস্ত দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। আজকাল হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই ভাবেন যে ভারতীয় কৃষ্টি বলতে কেবলমাত্র হিন্দু সভ্যতাই বোঝায়, মুসলমানেরও যে সেখানে মস্ত বড় দান সে কথা জানেন না বলে' মুসলমানের প্রতি খানিকটা অবজ্ঞার ভাবও তাই অনেকের মনে আসে। অন্যপক্ষে মুসলমানের মধ্যেও অনেকেই ভাবেন যে ভারতীয় মানেই হিন্দুধর্ম্মগন্ধী, কাজেই মুসলমানের পক্ষে অস্পৃশ্য। দুইদিক থেকেই তাই ভারতীয় কৃষ্টিকে খণ্ডিত করবার চেষ্টা হয়—শত্রুদের বিরোধিতাও ভারতের কৃষ্টির ঐক্যনাশে সহযোগী হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু এবং মুসলমান দুইয়েরই কাছে তাই অধ্যক্ষ তারাচাঁদের বইখানি বিস্ময়কর মনে হবে, ভারতীয় কৃষ্টির রচনায় হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত সাধনা যে এত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেছে, তার পরিচয়ে ঐতিহাসিকের মধ্যেও অনেকেই অবাক হয়ে যাবেন।

সুফীমতবাদের উপর যে ভারতীয় ভাবধারার প্রভাব পড়েছিল, সে-কথা অনেকেই হয়তো জানেন। কোর-আনে তার ভিত্তি কিন্তু পরবর্ত্তীকালে খৃষ্টধর্ম্ম এবং নিও-প্লেটোনিজমের সংস্পর্শে তার রূপ খানিকটা বদলাল। হিন্দুধর্ম্ম এবং বৌদ্ধদর্শনের ছায়াও স্পষ্ট, এমন কি জরথুস্ত্রবাদ বা মানিষমের (monism) ছায়া তার উপর পড়েছে। কিন্তু সুফীমতবাদের প্রভাবে যে হিন্দুধর্ম্মেরও রূপ বদলে গিয়েছিল, সে তথ্য অনেকেরই জানা নেই। অথচ সহজ একটি ঐতিহাসিক সত্যের বিচার করলেই এ প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। প্রাচীনকাল থেকে প্রায় অষ্টম শতক পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের যা কিছু পরিবর্ত্তন, নতুন নতুন মতবাদের আবির্ভাব ও বিবর্ত্তন, তার পরিচয় উত্তর ভারতেই মেলে। কৃষ্টি এবং সভ্যতা, প্রাচীন রীতি এবং নতুন বিদ্রোহ—সবকিছুরই পরাকাষ্ঠা

উত্তর ভারতের জীবনে, কিন্তু হঠাৎ অষ্টম শতকে তা বদলে গিয়ে ভারতীয় ভাবধারার নেতৃত্ব দক্ষিণ ভারতে চলে গেল। শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বাদিত্য, বল্লভাচার্য্য, মাধব, সবাই দাক্ষিণাত্যের লোক—বৈষ্ণব এবং শৈব মতের উৎপত্তি, দ্বন্দ্ব এবং পরিণতি সেখানে। জাতির জীবনাবেগের এ পরিবর্ত্তন প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকই লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু তার কারণ বোঝবার চেষ্টা হয় নি বল্লেই চলে।

অথচ এ পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝতে গেলে ভারতে ইসলামের আবির্ভাবকে বাদ দেওয়া যায় না। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই যে দক্ষিণ ভারতে মুসলমানের আনাগোনা সুরু হয় তার প্রমাণ রয়েছে। কেবল তাই নয়, সেদিন দক্ষিণ ভারতীয় জীবনে মুসলমান যে কী গৌরবান্বিত স্থান অধিকার করেছিল, তারও প্রমাণ আজও মালাবারে সজীব। মালাবারের চেরামন পেরুমাল বংশের শেষ রাজা নিজে ইস্‌লাম গ্রহণ করে' আরবে চলে যান। আজ পর্য্যন্ত মালাবারে কিংবদন্তী রয়েছে যে জামোরীণ চেরামন পেরুমালের প্রতিনিধিমাত্র, তিনি আরব থেকে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তাঁরই হয়ে রাজ্যশাসন করছেন। আজ পর্য্যন্ত জামোরীণের অভিষেকের সময় মাথার চুল কামিয়ে ফেলে তাঁকে মুসলমানের বেশ পরতে হয়, এবং তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয় মুসলমানে। এমন কি মুসলমানদের যে মপিল্লা বলা হয়, সে মপিল্লা কথাটিই সম্মানসূচক, তার মানে হচ্ছে বর। তখনকার দিনে মুসলমানদের এ সম্মানলাভের কারণও ছিল, কারণ মালাবারে এবং কঙ্কনে যাঁরা এসে বসতি করেন, তাঁরা সম্মানিত অতিথি হিসাবেই এসেছিলেন। রাজার ধর্ম্মান্তরও ইসলামের প্রভাবের লক্ষণ, কিন্তু তার ফলে হিন্দুর সমাজমনে, তার ধর্ম্ম বিশ্বাসে যে সাড়া জাগল, তারই প্রকাশ দেখি বৈষ্ণব এবং শাক্তমতবাদে।

উত্তর ভারতীয় ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং জীবনদৃষ্টি মধ্যপন্থী, শান্ত এবং ভাবগম্ভীর। দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদে যে মনোবৃত্তির বিকাশ, আবেগ প্রাচুর্য্য এবং তীব্রতাই তার প্রধান লক্ষণ। উত্তর ভারতের শান্ত সমাহিত পরমতসহিষ্ণু বুদ্ধিপ্রধান শিথিল মতবাদ অকস্মাৎ দক্ষিণ ভারতে আত্মকেন্দ্রচ্যুত আবেগের প্রাবল্যে বিপ্লবী হয়ে উঠ্‌ল কেন, সে কথার বিচার করতে গেলে ইসলামের প্রভাবকে এড়ানো যায় না। এমন কি শঙ্করের মায়াবাদ এবং ব্রহ্মের ঐক্যস্থাপনের প্রচেষ্টার তীব্রতার মধ্যেও ইসলামের উন্মাদনা যে কার্য্যকরী হয়েছিল এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। শঙ্করের জীবন ইতিহাসেও তার খানিকটা আভাস মেলে। যে কলাদিতে তাঁর জন্ম, তার রাজা মুসলমান হওয়ায় দেশে দিন দিন ইসলামের প্রভাব বাড়ছিল। কেবল তাই নয়, শঙ্করের নিজের পরিবার ছিল জাতিচ্যুত, এবং মাতার মৃত্যুর পরে তাঁর সৎকার যে তিনি একজন নায়ারের সাহায্যে করেছিলেন, এ সব তথ্যেরও তাৎপর্য্য বোঝা কঠিন নয়। দাক্ষিণাত্যের ভক্তিবাদ এবং দর্শনের সূত্রগুলির প্রত্যেকটিই হয়তো উপনিষদের মধ্যে মিলবে, কিন্তু তাদের সামঞ্জস্যের যে ভঙ্গি, তা প্রতিপদে ইসলামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মুসলমান এবং হিন্দু ধর্ম্মমত এবং ভক্তিবাদের অদ্ভুত সাদৃশ্য অধ্যক্ষ তারাচাঁদ স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়েছেন যে মোস্‌লেম বিজয় এবং উত্তর ভারতে প্রথমে পাঠান

ঐবং পরে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের পর কি ভাবে নানা ক্ষেত্রে নানা স্তরে ইসলামের সঙ্গে হিন্দু-মতবাদের সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছিল। রামানন্দ, কবির, গুরু নানক এঁদের কথা তো সহজেই মনে পড়ে। বাঙ্‌লা দেশে এবং মহারাষ্ট্রে যে মিলনের প্রচেষ্টা হয়েছিল তারও প্রভাব কম নয়। ফলে আজ হিন্দুমতবাদের যে রূপ, তার কতখানি যে প্রাচীন বেদ উপনিষদ থেকে নেওয়া এবং কতখানি যে ইসলামের দান, সে কথা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ বোধ হয় অসম্ভব। ঠিক তেমনি ভাবে ভারতীয় মুসলমানের বিশ্বাসে এবং আচারে, মতবাদে এবং ব্যবহারে হিন্দু প্রভাব সমানই স্পষ্ট। স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা এবং সঙ্গীত—এক কথায় ভারতীয় জীবনের যতদিকে বিকাশ, প্রতি স্তরেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের মনোবৃত্তি আজ এমন করে' মিশে গিয়েছে যে আজ তাদের পৃথক করবার চেষ্টাও বাতুলতা। তাই আজ যাঁরা হিন্দু কৃষ্টি বা মোসলেম সভ্যতার অমিশ্র পবিত্রতার গর্ব্ব করতে চান, তাঁরা হয় ইতিহাস জানেন না, অথবা তাঁদের বুদ্ধির গোড়ায় রয়েছে গলদ।

অধ্যক্ষ তারাচাঁদের বই ভারতীয় সভ্যতার হিন্দু-মুসলমানের দানের নিবিড় যোগ দেখিয়েছেন—দেশের ইতিহাস যাঁরা জানতে চান, তাঁদের প্রত্যেকের বইখানি পড়া উচিত। অধ্যাপক শুস্তেরী কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলমানের সভ্যতার সংঘাত এবং সমন্বয় আলোচনা করে' ক্ষান্ত হন নি, দেশদেশান্তরে ইসলামের বিচিত্র প্রকাশের পরিচয়দান তাঁর লক্ষ্য। তাঁর বিশ্বাস যে অবিদ্যা হিংসার মূল এবং পরিচয় প্রেমে বিকশিত হয়। মানুষ পরস্পরের কথা যত জানবে, যত শিখবে তাদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন ততই নিবিড় হবে, এবং বন্ধুত্ব ও প্রীতির বিকাশেই জগতের কল্যাণের একমাত্র আশা।

অধ্যাপক শুস্তেরী কেবলমাত্র ইসলামের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের কাহিনী দিয়ে ক্ষান্ত হননি—সঙ্গে সঙ্গে তার মতবাদ, তার স্বভাবের বিকাশেরও পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন ধরণের মতবাদ ইসলামের মধ্যেও আত্মবিকাশ করেছে, তার বিবরণও তিনি দিয়েছেন, এবং তার বিবরণে পক্ষপাতের কোন চিহ্ন নেই। কামাল আতাতুর্ককেও তিনি মুসলমান ধর্ম্মগুরুদের মধ্যে স্থান দিয়েছেন, যদিও তাঁর প্রধান কীর্ত্তি তুরস্কের রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবন। স্যার সৈয়দ আহমদকেও একই দলে দেখে অধ্যাপক শুস্তেরীর মনোবৃত্তির খানিকটা পরিচয় মেলে। ইসলাম জীবনের সমস্ত দিককে গ্রথিত করে' কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছে, তাই জীবনের প্রকাশের যেদিকেই পরিবর্ত্তন বা সংস্কার আনা যাক না কেন, কোন না কোন বিশ্বাসে গিয়ে তা আঘাত করবেই।

মুসলমান সমাজে যে সমস্ত আচার ব্যবহার আজ প্রচলিত, তাদের বিবরণ দিতে গিয়ে অধ্যাপক শুস্তেরী দেখিয়েছেন যে পারিপার্শ্বিকের ছায়া কেমন করে' বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের আচার ব্যবহারকে রঞ্জিত করেছে। ইসলামের মূল নীতি সহজ এবং সার্ব্বিক, কিন্তু তার প্রয়োগের পার্থক্য এত বেশী যে এক দেশের আচারের সঙ্গে অনেক সময়ে অন্য দেশের আচারের কোন মিল নেই। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক কারণে যারা ইসলামের মূলগত ঐক্যকে বড় করে' প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করতে চান, তাঁরা অধ্যাপক শুস্তেরীর আলোচনা থেকে অনেক বিষয় শিখতে পারেন।

বইখানির মধ্যে বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে ইসলামের প্রভাবের পরিচয়ের অধ্যায়টি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। বিভিন্ন দেশের লেখকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়, কিন্তু সে ঐক্য যে কেবলমাত্র মুসলমান লেখকদের মধ্যেই মেলে তা নয়। মিসরের মহম্মদ তৈমুরের সঙ্গে প্রেমচাঁদের সাদৃশ্য লক্ষ্যনীয়। দুজনেই গল্প লিখেছেন এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মিলও আশ্চর্য্য রকমের। হিন্দুমনোবৃত্তির উপর ইসলামের প্রভাবের প্রমাণ এখানেও রয়েছে।

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান নানাদিকে ইসলামের প্রভাব বর্তমানের বিশ্বসভ্যতায় নেহাৎ কম নয়। আজ যে ইয়োরোপের সভ্যতা, মূরদের আমলে স্পেনই তার গোড়া পত্তন। গ্রীসের দর্শন এবং আরবদের বিজ্ঞান আধুনিক সভ্যতার মূলে, এবং গ্রীসের দর্শনও আরবদের হাতে ঘুরেই ইয়োরোপে পৌঁছে। অধ্যাপক শুস্তেরীর বই থেকে জানবার এবং শেখবার অনেক রয়েছে ভারতের জীবনের জন্য যা অপরিহার্য্য।

জহিরুদ্দিন আহমদ

ON THE FRONTIER. W. H. Auden & Christopher Isherwood. Faber, 6s.

অডেন-ইশরউডের নতুন নাটক আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ইংলণ্ডে কাব্য-নাটকের পুনরুজ্জীবন এঁদের কীর্ত্তি। একে নাটকেরই পুনরুজ্জীবন বলা যেতে পারে; কেননা Saint Joan-এর পরে বর্ণার্ড শ নিজের পুনরাবৃত্তি কিংবা নাট্যরূপে রাজনৈতিক তর্কই শুধু করেছেন, আর নোয়েল কোঅর্ড তো সাহিত্যিক নাটক ছেড়ে মিউজিক-হল-ঘেঁষা প্রণয়-লীলার কি দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসে বাহবা ও পয়সা লুটছেন। গত দশ বছরের মধ্যে ভালো ইংরিজি নাটক লেখা হয়েছে আয়র্লণ্ডে ও আমেরিকায়; অডেন-ইশরউডের আবির্ভাব তাই একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এলিজাবেথীয় যুগের পর ইংলণ্ড কাব্য-নাটক ভুলে গিয়েছিলো। ইয়েট্‌সকে বাদ দিয়ে বলছি, কেননা তাঁর নাটক আয়র্লণ্ডের জাতীয়তা আন্দোলনেরই অংশ। অডেন-ইশরউডের যুগ্ম প্রতিভা (এই দ্বিত্বও এলিজাবেথীয় যুগের স্মারক) ও-বস্তুকে ফিরিয়ে এনেছে। শেক্‌স্‌পিয়র ওয়েব্‌ষ্টরের নাটকের মতোই তাঁদের নাটক একাধারে অভিনেয় ও পাঠ্য। সম্ভবত অডেন পদ্যাংশের জন্য ও ইশরউড গদ্যাংশের জন্য দায়ী। সে যা-ই হোক, এই দু'জনের সম্মিলনে নাটকের একটি অভিনব রূপ গ'ড়ে উঠছে। পদ্যালাপ স্বীকার করা মানেই শ প্রবর্তিত বাস্তবতাকে পরিহার; তাছাড়া কোরাস ও সাঙ্গীতিক পটভূমির প্রবর্তনায় প্রমাণ হয় যে প্রয়োজন মতো রূপকের সাহায্য নিতে এঁরা অনিচ্ছুক নন্‌। নাটকে বাস্তবতার বহিরবয়বকে প্রধান না-ক'রে মনস্তত্ত্বের বাস্তবতার উপরেই এঁরা জোর দিচ্ছেন। এঁদের প্রথম নাটক *Dog Beneath the skin* প'ড়ে চমক লেগেছিলো; *Ascent of F6* প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম; তারপর *On the Frontier*।

Ascent of F6-এর ছাপ আমার মনে অন্তত এখন পর্যন্ত এত প্রবল যে তার তুলনায় এ-বইটি প'ড়ে একটু হতাশ হ'তেই হ'লো। নাটকটির বিষয় বর্তমান ইয়োরোপীয় রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও সমর-সম্ভাবনা। অস্টনিয়া ও ওয়েস্টল্যাণ্ড দুটি পাশাপাশি দেশ কল্পনা করা হয়েছে, প্রথমটি গণতান্ত্রিক ও দ্বিতীয়টি ডিক্টেটর-শাসিত। নাটকের বেশির ভাগ দৃশ্য দুই দেশের কাল্পনিক সীমান্তে একটি ঘরে; তার এক দিকে ওয়েস্টল্যাণ্ডের ও অন্যদিকে অস্টনিয়ান একটি পরিবারের বসবাস, এইরকম ধ'রে নিতে হবে। দুই পরিবারের কথোপকথন বেশির ভাগই প্রতিবেশী জাতির প্রতি তীব্র বিদ্বেষপ্রসূত। শুধু ওয়েস্টল্যাণ্ডীয় যুবক এরিক ও অস্টনিয়ান যুবতী আন্না এর ব্যতিক্রম, তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। এ ছাড়া আছে ওয়েস্টল্যাণ্ডের বণিক-সম্রাট ভ্যালেরিয়ান ও তারই হাতের পুতুল সে-দেশের 'Leader'। এই লীডারটি কে, চ্যাপলিন-গোঁফ না-থাকা সত্ত্বেও আমাদের চিনে নিতে দেরি হয় না। দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ লাগে-লাগে করতে-করতে একদিন সত্যি লেগে গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে ওয়েস্টল্যাণ্ডে সুরু হ'লো অন্তর্বিপ্লব, Leader ও ভ্যালেরিয়ান দু'জনেই নিহত হলো। অস্টনিয়াতে এরিক প্যাসিফিস্ট হ'য়ে জেলে গেলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-ও যুদ্ধে না গিয়ে পারলে না। শত্রুর গুলিতে মরলো সে, ওদিকে আন্না মরলো নর্স হ'য়ে হাসপাতালে প্লেগের ছোঁয়াচে। শেষ দৃশ্যে পাশাপাশি ঘরে দু'জনকে মরতে দেখা গেলো; তারপর প্রথম দৃশ্যের মতো পোষাকে দু'জনেই বেরিয়ে এসে মৃত্যুর পার থেকে নিজেদের কথা বললে।

ERIC. Standing at the barricade
The swift impartial bullet
Selected and struck.
This is our last meeting.

ANNA. Working in the hospital
Death shuffled round his beds
And brushed me with his sleeve.
I shall not see you again.

. . . .

Will people never stop killing each other?
There is no place in the world
For those who love.

সমস্ত নাটকটির মধ্যে মৃত এরিক ও আন্নার এই শেষ কথোপকথন আমার সব চেয়ে ভালো লেগেছে।

এই প্লটে নাটকীয় উপাদান প্রচুর। এবং ট্র্যাজিডির সঙ্গে প্রহসন, হৃদয়াবেগের সঙ্গে তর্কাতর্কি মিশিয়ে লেখকেরা একটি জমজমাট মেলোড্রামা তৈরি করেছেন সন্দেহ নেই। নাটকটির 'নীতি'ও অতি স্পষ্ট। এরিক ও আন্না অবশ্য দুই শত্রু-দেশের জনগণের প্রতীকমাত্র; দেশের লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে মিলতে ইচ্ছুক এবং যুদ্ধে ঘোরতর অনিচ্ছুক এ কথা আজকের দিনে রাজনৈতিকদের হাজার কারসাজি সত্ত্বেও প্রায় সকলেই বুঝে ফেলেছে। যুদ্ধ ব্যাপারটা

কুটিল রাজনৈতিকদের ও তাঁদের পশ্চাৎবর্তী বড়ো ব্যবসায়ীদেরই সৃষ্টি—Leader লোকটি আসলে সেন্টিমেণ্টালগোছের ভালোমানুষ, ভ্যালেরিয়ানই তাকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। জগতের এই বর্তমান সমস্যার সমাধান লেখকরা প্যাসিফিজম্-এ খোঁজেন নি দেখে আশ্বস্ত হলুম।

Believing it was wrong to kill,
I went to prison, seeing myself
As the sane and innocent student
Aloof among practical and violent madman,
But I was wrong. We cannot choose our world,
Our time, our class. None are innocent, none.
Causes of violence lie so deep in all our lives
It touches every act.
Certain it is for all we do
We shall pay dearly.

এরিক-এর এই উক্তিতে, সুখের বিষয় কোনো হেঁয়ালি নেই।

নাটকটি প'ড়ে যে একটু হতাশ হ'তে হয় তার কারণ বোধ হয় বিষয়টির অত্যন্ত সাময়িক প্রকৃতি। তাছাড়া, এতে পদ্যাংশ কম, এবং পদ্যালাপ সব সময় অডেনের উপযোগী নয়। কোরাসের গানগুলি বড়োই সরল, বড়োই তরল, যেন বিশেষ করে'ই জনগণকে উদ্দেশ্য করে' লেখা। গান কবিতার চেয়ে সরল হওয়া দরকার বটে; কিন্তু প্রোপাগাণ্ডা অতি সরল হ'লে জর্নালিজ্‌ম্ হয়, সূক্ষ্ম ও জটিল হ'লেই সাহিত্য হয়। এখানে *Ascent of F6*-এ Mr. A. ও Mrs. A.-র কথোপকথন অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে; তার তুলনায় এ-নাটকের কোরাসগুলি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলেমানুষের রচনা মনে হয়। লেখক ইচ্ছে করে'ই হয়তো ছেলেমানুষ সেজেছেন, সেটা আরো বিপদের কথা। শেষ পর্যন্ত, ভালো কবিতা লেখাই হয়তো কবির সব চেয়ে বড়ো সামাজিক কর্তব্য।

নাটকের টেকনিকে সিনেমার প্রভাব খুব স্পষ্ট। উপন্যাসে সিনেমার প্রভাব অল্ডস্ হক্স্‌লিতে আমরা দেখেছি, রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে-ও সিনেমার অনুকরণ দেখা যাচ্ছে। কতগুলো দৃশ্য সিনেমায় খুবই সুন্দর হ'তে পারে, বিশেষ করে' মৃত্যুর পরে আন্না-এরিকের আলাপ। অন্যান্য শিল্পের উপর সিনেমার নিগূঢ় প্রভাব সম্বন্ধে আজকের দিনে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার।

বুদ্ধদেব বসু

THE POLITICAL AND SOCIAL DOCTRINE OF COMMUNISM *by* R. Palme Dutt (Hogarth Press, one shilling).

১৮৪৮ সালের ফতোয়ার ঢঙে মিঃ দত্ত গোড়াতেই ঘোষণা করেছেন যে পোপ থেকে হিটলার এবং মিষ্টার নেভিল চেম্বারলেন থেকে স্যর ওয়ালটার সিট্রন পর্যন্ত সকলেই একমত যে সাম্যবাদই চরম এবং পরম শত্রু। মেটারনিক যেমন ছিলেন মরন্ত সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি, আজকের দিনে নাৎসিরা তেমনি প্রতিনিধি পড়ন্ত ধনতন্ত্রের, এবং সে ধনতন্ত্রও হিংস্রতায় কিছু

কেম যায় না। অষ্টাদশ শতকের বুদ্ধিবাদ বিপদের দিনে রূপান্তরিত হ'ল অনাচার এবং পাশবিকতায়। সংস্কৃতির বিকাশ ছিল পুরোনো আমলের একমাত্র গৌরব, তারই সাফাই গেয়ে সে আমলকে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা, কিন্তু দুর্যোগ সুরুর সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্ত্তন বন্ধ করবার ব্যর্থ চেষ্টায় সেই কৃষ্টিরই বিরুদ্ধে হ'ল যুদ্ধ ঘোষণা। আজকের দিনেও ঠিক তেমনি ভাবে ধনতন্ত্র আর উনিশ শতকের ভাবসজল ঔদার্য্যবাদ বা শুভ সংস্কারবুদ্ধিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না। আজ ধনতন্ত্রের সঙ্কট। তাই মজুরীর হার, সমাজ সেবার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, মজুরদের সংঘ গড়বার অধিকার, এমন কি যে সংস্কৃতির ফলে এ সমস্ত জিনিষকে বরণীয় মনে হয়েছে, সে সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই আজ নির্ম্মম, এবং প্রয়োজন হ'লে সশস্ত্র, অভিযান সুরু হয়েছে। কিন্তু তবু সেদিনের সঙ্গে আজকের তফাৎ রয়েছে কিছু কিছু। "একশো বছর আগে মুষ্টিমেয় লোক ছিল আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সংঘে। শ্রমিকশ্রেণী যেবার প্রথম প্যারিস কমিনটার্নের সময় ষাট বছর আগে পশ্চিম ইয়োরোপের একটি রাজধানীতে ছ সপ্তাহের জন্য শক্তিলাভ করে, তখন তাদের আধিপত্যধ্বংসকে সাম্যবাদের সমাপ্তি বলে' ঘোষণা করা হয়।···আজ -সাম্যবাদীরা পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ রাষ্ট্রে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, লক্ষ লক্ষ সদস্যের বলে শক্তিশালী সাম্যবাদীদল পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশে দিন দিন আরো শক্তিসঞ্চয় করছে, এবং ইতিহাসে নজীর মেলেনা এমন অত্যাচার স'য়েও অন্যান্য দেশে তাদের প্রসার কমছে না।"

গত শতাব্দীতে একথা বলা চলত যে দোষ তার যতই থাক না কেন তবু ধনতন্ত্রই পৃথিবীকে চালাচ্ছে। আজকে কিন্তু প্রয়োজনীয় এমন কোন জিনিষ নেই "যার উৎপাদন কমাবার জন্য একচেটে ধনিকেরা নানান রকম ফন্দী খাটাচ্ছে না। যুদ্ধের ব্যবসাই একমাত্র ব্যবসা যাকে অপ্রতিহত ভাবে বাড়তে দেওয়া হচ্ছে।" অতীতে কবি হাইনের ভয় ছিল যে সমাজের জন্য সাম্যবাদের প্রয়োজন থাকলেও সংস্কৃতির পক্ষে তা হবে মারাত্মক, কারণ তাঁর মতে সংস্কৃতির ভিত্তি ছিল বিত্ত এবং অবসরশালী শ্রেণীর অস্তিত্ব। আজকাল সেই বিত্ত এবং অবসরশালী শ্রেণীর কাছে উনামুনো আইনষ্টাইন বা টমাস মানের চেয়ে খাঁটি জার্মান বোমারু জাহাজের কদর বেশী। বর্ত্তমানের যে সংঘর্ষ, তার জোর শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে, কিন্তু তবু সকল শ্রেণীরই তাতে ভাগ নেওয়া প্রয়োজন। বুদ্ধিবাদীরা যে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকবেন বা শাসন করবার ভান করবেন, তারও উপায় নেই। ড্রাইডেন যাদের বলেছিলেন হতচ্ছাড়া বুদ্ধিবিলাসী—ফ্যাসিষ্টদের চোখেও তারা নিষ্প্রয়োজন ও অবান্তর।

শেষের অধ্যায়ই মিষ্টার দত্তের পুস্তিকাখানির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাতে সাম্যবাদীদের বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতির তিনি বিচার করেছেন। যুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পরের বিপ্লবী যুগে রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের সম্ভাবনা আসন্ন মনে হয়েছিল। সাম্যবাদীরাও তাদের সমস্ত শক্তি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করেছে। বিবর্ত্তনবাদী সোশ্যাল ডেমক্র্যাটদের ভীরুতার জন্যই তখন তারা সফল হতে পারে নি, কারণ সে ভীরুতা সময় সময় প্রতিবিপ্লবের পর্য্যায়ে এসে পড়েছে। অবশ্য হিট্‌লারের বিজয়ের পরে জার্মানির সোশ্যাল ডেমক্র্যাটরা স্বীকার করেছে যে তাদের সে ভীরুতা চূড়ান্ত ঐতিহাসিক ভ্রান্তি। তারপরে বিপ্লবে যখন মন্দা পড়ল, তখন প্রধান লক্ষ্য

হ'ল ধনিকদের প্রতি-আক্রমণ রোধের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংহতি। কমিনটার্নের তৃতীয় কংগ্রেসে তাই সম্মিলিত শ্রমিকশ্রেণীবাহিনীর সংগঠন স্থির হয়। দুটি কারণে এ কর্ম্মপন্থা সফল হয় নি। মতের অনৈক্য এবং দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমক্রাট নেতৃত্বের ফলে ফাশিজমের আবির্ভাব সম্ভব হয়ে ওঠে। আজ ফাশিজমের শক্তি বিপদজনকভাবে বেড়ে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যের প্রয়োজনও বেড়েছে। আজ তাই সাম্যবাদীদের দাবী জনসাধারণের বাহিনী, তার প্রেরণা এবং নেতৃত্ব জোগাবে শ্রমিকশ্রেণী, কিন্তু শ্রমিক ছাড়াও তাতে যোগ দেবে বুদ্ধিবাদী, কৃষক (আজ পৃথিবীর অনেক দেশেই তাদের গুরুত্ব প্রচুর) এবং পরাধীন শোষিত দেশের জনসাধারণ।

মিষ্টার দত্তের পুস্তিকাখানিতে তাঁর গুণের সঙ্গে জড়িত দোষও ধরা পড়ে। সময় সময় তাঁর লেখায় হিষ্টিরিয়ার সুর লাগে, অবশ্য এ দোষ সাম্যবাদী লেখার প্রায় অপরিহার্য্য অঙ্গ। কোথাও রয়েছে বাগাড়ম্বর, যেমন "পৃথিবীর ইতিহাসের বর্ত্তমান যুগে মানুষের প্রগতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছে সপ্তম কংগ্রেসের আহ্বান।" তাঁর লেখায় অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যও বড্ড একটানা হয়ে ওঠে, কিন্তু চিত্তগ্রাহী বিষয়ও অনেক তিনি আলোচনা করেছেন। একটি অত্যন্ত খাঁটী কথা উদ্ধৃত করে' এ আলোচনা শেষ করা যাক। তিনি লিখেছেন, "বিপ্লবকে গোলাপি রঙে আঁকতে যেন কেউ চেষ্টা না করে। ভাবালুতার খাতিরে সাম্যবাদ গ্রহণ করার চেয়ে পাঠকের পক্ষে বরং সাম্যবাদ বর্জ্জন করা শ্রেয়।......কিন্তু বর্জ্জন করবার আগে তাঁদের ভাল করে' ভেবে দেখা উচিত যে, যে পৃথিবীর দিকে তাঁরা ফিরছেন, সে ফাশিজমের পৃথিবী, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং ঔপনিবেশিক দাসত্বের পৃথিবী। সে পৃথিবীতে এক একবার নরহত্যা এবং ধ্বংসের যে পরিচয় মেলে, শ্রমিকবিপ্লবের সমগ্র ইতিহাসেও তার সহস্র ভাগের একভাগ ঘটে নি।"

ই, এল

POEMS OF WANG CHING-WEI. Translated into English by Seyuan Shu. George Allen and Unwin.

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে এ বইয়ের রচয়িতা পেশাদার কবি নন্, কবিযশঃপ্রার্থী। তাঁর বিচিত্র ও কর্ম্মবহুল জীবনের অবসর-ফাঁকে যে বিরল মূড্‌গুলি তাঁর মনকে দোলা দিয়েছে, তারই প্রকাশ Hours of Leisure-নামক বইয়ে। সে কবিতাগুলিকে বাছাই করে কয়েকটি অনুদিত ও সঙ্কলিত হয়ে বর্ত্তমান গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

রাষ্ট্রজগতে কবি ওয়াং-এর চেয়ে দলপতি ওয়াং-এর প্রসিদ্ধি বেশী। আধুনিক চীন দেশে মার্শাল চিয়াং-এর পরই এঁর নাম সর্বজনপরিচিত। সান্-ইয়াৎ-সেন্ ও অন্যান্য নেতৃবর্গের সাহায্যে জাতীয় শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানে তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোগী। প্রথমে তিনি বিদ্রোহ-পন্থীর দলে যোগদান করেন, এবং ১৯১০ সালে প্রিন্স-রীজেন্টের উপর বোমা-নিক্ষেপের অভিপ্রায় নিয়ে গুপ্তভাবে পীকিঙে প্রবেশ করেন। কিন্তু ধরা পড়ে যাবজ্জীবন কারাবাসে

দণ্ডিত হন। তখনকার বিদ্রোহী যুবকের মনোভাব নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি কয়টিতে ধরা পড়েছে—

" Tranquilly I enter the prison-house,
To die on the sword, what rapture!
A fate truly worthy of a young head!"

১৯১১ সালে মুক্ত হয়ে তিনি দেশের সঙ্গে রাষ্ট্র-সম্পর্ক ছিন্ন করে ফ্রান্সে চলে যান্ সাহিত্য ও সমাজতত্ত্ব অনুশীলন করবার উদ্দেশ্যে। অনেকদিন পরে দেশে ফিরে তিনি তাঁর স্বদেশবাসিদের কয়েকটি বক্তৃতা দেন, এবং সেই থেকেই তাঁর ক্রম-বর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা ও খাতিরের সূত্রপাত। এর পরে ন্যাশ্‌নালিষ্ট গভর্নমেণ্টের কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিষদের সদস্য ও সভাপতি হয়ে চিয়াং-এর সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয় এবং তিনি আবার ফ্রান্সে চলে যান। ফিরে এসে তিনি তিন বছর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং তার পরে কাজে ইস্তফা দেবার পরও তাঁকে পুনরায় ক্ষমতা দেওয়া হয়।

চীনের আধুনিক বহিঃসমস্যা হ'ল জাপানী উপদ্রব ও ভিতরকার সমস্যা হচ্ছে কমিউনিষ্ট-দল ও কুওমিন্‌টাং-এর মধ্যে বিরোধ। চীন সাম্যবাদীরা বলেন যে লেফ্‌টিষ্ট্‌ য়ুহান গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সাম্যবাদীদের শেষ ও ক্ষীণ সৌহার্দ্দ্য সম্পূর্ণ অপসারিত করার জন্যে দায়ী হচ্ছেন কমিন্‌টার্নের প্রতিনিধি বরোদিন ও এম-এন্-রায়। ওয়াং তখন বামপন্থী য়ুহান শাসনতন্ত্রের সভাপতি।

এ দুই দলের বিরোধের ফলে কেমন করে 'বুর্জ্জোয়া-ডেমক্রেটিক্' বিপ্লব বিফল হয়ে গিয়েছে এবং কী উপলক্ষ্য নিয়ে,—তা মিল্‌বে চীন বিদ্রোহের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে। সে প্রসঙ্গ অবান্তর, তবে ওয়াং যে একজন জনপ্রিয়, বিদগ্ধ ও প্রগতিশীল নেতাহিসাবে স্বদেশে সমাদর পেয়েছেন সেইটুকুই উল্লেখযোগ্য। আর বৈদেশিকের কাছেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও লেখক-খ্যাতি কি ভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে তার প্রমাণ আছে Peter Fleming-কৃত "One's Company"-তে।

তাঁর কবিতা পড়ে একটা কথা বারবার মনে হয়েছে। সেটা হচ্ছে, ওয়াং কবিতা ভালো লেখেন না। তাঁর লেখায় কোথাও তাঁর কর্ম্মী জীবনের আর অভিজ্ঞ উপলব্ধির মধ্যে প্রাণের যোগ নেই। কাজেই তাঁর রচনায় কয়েকটি ভালো ভালো পদাবলী থাক্‌লেও, অনেক স্থলেই তাতে সংস্কার ও গতানুগতিকতার আভাস আছে। এ জাতীয় কবিতাকেই 'Poetry of Escape' বলা হয়,—যার সাহায্যে কবি, এবং তাঁরি দৌত্যফলে, পাঠকেরাও কিছুক্ষণ পাহাড়, মেঘ আর ফুল আর পাখীর জগতে ঘুরে এসে তৃপ্তি পান। ওয়াং-এর কবিতায় পেলাম চীন প্রকৃতিসুন্দরীর একটুখানি উদ্‌ঘাটিত প্রকাশ, তাও সুসংবদ্ধ ও শোভন,—মোটেই অযত্নবিন্যস্ত নয়।

শুনেছি চীন কবিতা পড়বার জিনিষ। যতটুকু জানি, ও-কবিতা মোটামুটি দুরকমের,—হয় সদর্থবাচক, চীন দার্শনিকের মতই মন্থর, গম্ভীর, অবসর-ভোগী ও নীতিশাস্ত্রানুমোদিত, যার পিছনে আছে বহুকালপুষ্ট ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা,—না হয়, গীতিকবিতা-জাতীয়। শেষোক্ত কবিতায় জাপানী কবিতার অন্তর্গূঢ় সৌন্দর্য্য, সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিত না থাক্‌লেও মানুষের মন ও প্রকৃতির মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, সহজ সৌন্দর্য্যবোধ ও 'প্যাষ্টরাল্' কবিতার ছোঁয়াচ আছে।

মিঃ ওয়াং-এর কবিতায় গভীর অধ্যাত্মবোধ নেই, কিন্তু প্রকৃতিকে বোঝবার ও উপভোগ করবার একটি সুসঙ্গত ভঙ্গি আছে।

মিঃ ওয়াং-এর কবিতায় আর একটি উল্লেখযোগ্য বস্তু হচ্ছে, ছবি ও তার বর্ণসুষমা। মাত্র দুয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি, তাতে বোঝা যাবে, মধ্যে মধ্যে কবি তাঁর লেখনীকে নিপুণভাবে চালনা করেছেন—

" Sea spray is glittering in the sun,
Headlong currents fret among the jagged rocks,
And behind the haze yonder,
White herons glide by swiftly."

ছবি হিসাবে সত্যিই সুন্দর।

" I fall asleep, rocked by pleasant dreams,
Now and then I see a lonely star drop down into my lap."

অথবা " White clouds embalmed me like orchids in autumn,
Since that day a rare perfume clings to my garment."

এ সব লাইনে বেশ একটা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ধরা পড়েছে যা বাস্তবিকপক্ষে প্রশংসার বিষয়। বইয়ের শেষভাগে সনেটগুলি আরও ব্যক্তিগত মূড্ থেকে উৎসারিত হয়েছে বলেই আমার কাছে বেশী উপভোগ্য ঠেকেছে।

অনুবাদক যাই বলুন না কেন, মিঃ ওয়াং-এর কবিতাগুলি আমার কাছে কেমন যেন স্পন্দনহীন ঠেক্‌ল। আঙ্গিক অথবা চিন্তাশীলতার কোনো নতুনত্বের পরিচয় পেলুম না। তবে ভূমিকায় Sturge Moore যা বলেছেন, সে-কথা আংশিকভাবে সত্য। আধুনিক গতিশীল জগতের প্রতিক্রিয়া-পীড়িত পাঠকের কাছে মিঃ ওয়াং-এর কবিতায় শান্ত ও সমাহিত মনোভাব, অবসরবিনোদী প্রকৃতির উপাসনা, সমুদ্র, আকাশ ও পাহাড়ের গায়ে বর্ণচ্ছটা আর ভোরের কুয়াশা এবং সন্ধ্যার আব্‌ছায়া একটা মনোরম পরিমণ্ডল সৃষ্টি করবে।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

JOHN CORNFORD, A MEMOIR, *edited by* Pat Sloan (Cape, 1938, 7s. 6d.).

হিটলার-মুসোলীনির প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতায় আর ইংরেজ সরকারের পরোক্ষ সাহায্য নিয়ে স্পেনের ফ্যাশিষ্ট বিদ্রোহীরা আজ আড়াই বছর ধরে দেশের গণতন্ত্রকে নিস্পিষ্ট করার চেষ্টা করে আসছে। দুনিয়ার পুঁজিদারদের এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য স্পেনের জনসাধারণ যে বিরাট সংগ্রাম চালাচ্ছে, তার তুলনা ইতিহাসে অল্পই মিলবে। তাদের সংগ্রাম শুধু যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, তা নয়; সে সংগ্রামের ফলাফলের উপর পৃথিবীর সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তাই ফ্যাশিষ্ট বর্বরদের কবল থেকে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় সকল দেশের গণতান্ত্রিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন নানা দেশের সাহিত্যিক। আজ যাঁরা ইয়োরোপে ঔপন্যাসিকশ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত, তাঁদের মধ্যে ফরাসী আঁদ্রে মালরো আর জার্মান লুড্‌ভিগ্ রেন্ গণতন্ত্ররক্ষার জন্য

স্পেনে লড়াইয়ে নেমেছেন। ঐ যুদ্ধে যে সব সাহিত্যিক প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্স, ক্রিষ্টফার কড্‌ওয়েল, জন কর্নফর্ড, জুলিয়ান বেল আমাদের পরিচিত। এই চারিজনের মৃত্যুর সময় বয়স ছিল কুড়ি থেকে ছত্রিশের মধ্যে। জন কর্নফর্ডের জন্ম হয়েছিল ১৯১৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে; মৃত্যু হয় ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬।

একুশ বছরের একটি ছেলের বিষয়ে বই বার করবার প্রয়োজন সম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু অপরিণত বয়সেই কর্নফর্ডের বুদ্ধি ছিল সুপরিণত, স্বল্পপরিসরের মধ্যেই তার জীবন ছিল কর্ম্মবহুল। আলোচ্য বইটিতে তার পিতা ও বন্ধুদের লেখা আছে, আর আছে তার নিজের চিঠি, কবিতা আর প্রবন্ধের সঙ্কলন। কর্নফর্ড ছিল তার সমসাময়িকদের সামাজিক চৈতন্যের প্রতীক; ছাত্রদের মধ্যে সাম্যবাদী আন্দোলনের সে ছিল নেতা, দেশের মজুর আন্দোলনে ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা সে দেখেছিল। কেম্‌ব্রিজে গ্রীক ভাষার অধ্যাপকের এই মেধাবী পুত্র তাই শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ সম্মান লাভ করে অধ্যয়ন অধ্যাপনার নিশ্চিন্ত সুযোগ পেয়ে ক্ষান্ত হয়নি, ছাত্রনেতা হয়েছিল, কম্যুনিষ্ট দলে যোগ দিয়েছিল, স্বেচ্ছায় স্পেনে লড়তে গেছ্‌ল, 'ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের' ইংরেজ শাখা গঠনে বিশেষ সাহায্য করেছিল, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহযোদ্ধাদের আগ্রহাতিশয্যে তার 'ইউনিটের' অধিনেতা হয়েছিল, কর্ত্তব্য পালনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে দ্বিধা করে নি।

স্কুলে পড়ার সময়ই কর্নফর্ডের মন বিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট হয়। স্কুল সম্বন্ধে ক্রমে তার অধৈর্য্য আসে: "My trouble here is that I can get through a whole day without having to make a single response to a new situation of any kind." ষোল বছর বয়সে সে স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে কেম্‌ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজে বৃত্তি পায়; বয়স কম বলে কেম্‌ব্রিজে যাবার জন্য তাকে দু'বছর অপেক্ষা করতে হয়। সেই সময় লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্‌সে সে কিছুকাল পড়ে, এবং কম্যুনিষ্ট দলে যোগ দেয়।

খুব কম বয়সে "Student Vanguard" পত্রিকায় তার প্রবন্ধে গভীর চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের মায়ের কবিতা সম্বন্ধে পনেরো বছর বয়সে সে লেখে: Are the poems that you write really your most important experiences? . . . . it always seems to me that you have a great deal that needs to be said more urgently but can't because of the limitations of your view of poetry—because I should guess that until fairly recently you would have denied that every subject is equally poetical . . . . I believe in a much stricter vocabulary and a much wider range of subjects." কর্নফর্ডের তখনকার কবিতাতেও শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তার কবিত্বশক্তির যথার্থ বিকাশ হয় স্পেনে; এর প্রমাণ পাওয়া যাবে "Full Moon at Tierz: Before the Storming of Huesca"-তে—

> Though Communism was my waking time,
> Always before the lights of home

Shone clear and steady and full in view—
Here, if you fall, there's help for you—
Now, with my Party, I stand quite alone.

Then let my private battle with my nerves,
The fear of pain whose pain survives,
The love that tears me by the roots,
The loneliness that claws my guts,
Fuse in the welded front our fight preserves.

O be invincible as the strong sun,
Hard as the metal of my gun,
O let the mounting tempo of the train
Sweep where my footsteps slipped in vain,
October in the rhythm of its run.

এ বইয়ে কর্নফর্ডের দশটি কবিতা আছে; তার মধ্যে স্পেনে লেখা তিনটি সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। যাঁরা সে কবিতার পরিচয় পেতে চান্, তাঁরা বইটা একবার দেখবেন আশা করি।

সাহিত্য সম্বন্ধে কর্নফর্ডের মতামত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করব না। শুধু ১৯৩৬ সালের জুন মাসে লেখা একটা চিঠি থেকে খানিকটা তুলে দেব:

"The poems are too much: Look, I'm a Marxist, but even so I think flowers are beautiful and I can love, etc., without being in any way false. But that seems really to me like for Cezanne to say: 'Look, I'm an impressionist, but I'll paint half my pictures pre-Raphaelite just to show you I can.' What I mean is, to be revolutionary means to approach the whole reality there is, which is different and wider than other people's, in a different way. Not just to demonstrate that you are human, although that may be, as it were, a necessary foundation stage . . ."

এরকম মন্তব্য দেখে যাঁরা প্রতিকূল সমালোচনা করতে চাইবেন, তাঁদের শুধু অনুরোধ করব কর্নফর্ডের অল্প বয়সের লেখা একটু যত্ন করে পড়ে দেখতে। বিপ্লবী কর্ত্তব্য নির্ম্মম হলেও যথার্থ মানবতার ভিত্তির উপর যে প্রতিষ্ঠিত, তা তাঁরা বুঝ্লেও বুঝ্তে পারেন।

যে কয়েকটি প্রবন্ধ এ বইয়ে আছে, তা ছাড়া আর একটা লেখা থাকলে ভাল হ'ত মনে করি। জন্ ল্যুইস্ সম্পাদিত "Christianity and Communism"-এ কর্নফর্ডের "What Communism Stands for" বলে এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ ছিল। তার ধীশক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় তাতে পাওয়া যাবে। "The Struggle for Power," বলে যে প্রবন্ধ এ বইয়ে আছে, সেটাকে স্পেণ্ডরের "Forward from Liberalism"-এর কয়েকটি পরিচ্ছেদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তুলনা করলে স্পেণ্ডরের বিপ্লবী বিশ্বাসের দৌর্ব্বল্য প্রমাণ হবে। কর্নফর্ডের মৃত্যুতে সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে, বিপ্লবী আন্দোলন, এক অতি বিশিষ্ট কর্ম্মী হারিয়েছে।

No wars are nice, and even a revolutionary war is ugly enough "— মার্গট হাইনেমানকে লেখা এক চিঠিতে কর্নফর্ড লিখেছিল। রোমান্টিক মোহে পড়ে সে যুদ্ধে যায় নি, কিন্তু যুদ্ধে যাওয়ার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে তার মনে কখনও সন্দেহ জাগে নি। কেউ কেউ হয়তো একে ভাববিলাস বলতে পারেন; তাঁরা বলবেন শুধু এই কারণে যে স্পেনের যুদ্ধ যে সমস্যার প্রতীক, তা তাঁদের অন্তর স্পর্শ করতে পারে নি। তাঁরা মহানুভব হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের সামাজিক চৈতন্য অর্দ্ধজাগ্রত মাত্র, বিপ্লবী আন্দোলনকে তাঁরা দূরে পরিহার করেই চলবেন।

এই বইয়ে একুশ বছরের ছেলের অন্তর্দৃষ্টি দেখে অনেক সময় আশ্চর্য্য হতে হয়েছে। বামপন্থীদের চিরাচরিত অন্তর্বিবাদের কথা ভেবে যখন নৈরাশ্য আসার উপক্রম হয়, তখন কর্নফর্ডের স্পেনের চিঠিগুলো যেন আশ্বাস আর অনুপ্রেরণা এনে দেয়।

". . . I am beginning to find out how much the Party and the International have become flesh and blood of me. Even when I can put forward no rational argument, I feel that to cut adrift from the Party is the beginning of political suicide. . . ."

সাহিত্য হচ্ছে যাঁদের কাছে স্বসম্পূর্ণ, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, এ বই তাঁদের জন্য নয়। তবে আশা করি যে তাঁরাও বেছে নেবার ধৈর্য্য থাকলে কিছু মনের খোরাক এ বই থেকে পাবেন। আরও আশা করি যে আমাদের সকল সাহিত্যিকই তাঁদের সমগোষ্ঠী নন্।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

খসড়া—অমিয় চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ভারতী-ভবন। দাম দেড় টাকা।

বাঙালী কবিরা ভারতের বাইরে গিয়ে কবিতা লিখলেও বিদেশের আবহাওয়া বিশেষ আনতে পারেন না। স্বয়ং বিশ্বকবি এর ব্যতিক্রম নন। কোনো কবিতার নীচে রিও ডি জেনারো ধরণের নাম থাকলে যে প্রত্যাশা জাগে তা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোনার বাংলার বর্ণনায় অনেকবারই মাঠে মারা গিয়েছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী এবিষয়ে আমাদের হতাশ করেননি, সেটা তার কাব্যে হিউমিলিটি বোধের লক্ষণ:

চলো সেই চেনা পথে পথে
এডেন পেরিয়ে।
আকাশ চাকায় ঘোরো
জলের চাকায়,
পাহাড় দ্বীপের সারি রাঙা-ছাত বাড়ি
ঠাণ্ডা সহর এলো, পুরাণো বন্ধুর;
দ্বীপজ্বালা বিদেশী বন্দর।

কিম্বা :

রাত্রে মাস্তলে মেঘে ছিন্ন চাঁদ ঝোলে
সিনাইয়ের বালু ছায়া দূরে যায় চলে।

'খসড়া' বেশীর ভাগ চিত্রবহুল কবিতায় পূর্ণ। কয়েকটি ছবি স্থানবিশেষে ভালো হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যদিকে তারা অধিকাংশ কবিতার স্বল্প জড়তার কারণ। যে ছন্দের আশ্রয় অমিয় চক্রবর্ত্তী নিয়েছেন তার ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু তার সম্পূর্ণ সাফল্যের অন্তরায় হয়েছে অনাবশ্যক চিত্রবহুলতা। দার্শনিক কবিতাগুলি আমার ভালো লাগেনি।

পঞ্জাবে, পাঁচই মাঘে, রং নিয়ে ওপাশের ছাতে
বিকেলের মূর্ত্তি এল সেলাম জানাতে।
বিশেষ বিকেল
(চায়ের বেলা)

* * * *

দরজা, মলিন পর্দ্দা, কুলি-টানা পাখা,
ভিস্তি-বওয়া জল, ঝাঁটা, বহুর বেদনা রক্ত মাখা
জমিদারী মঞ্চে রাখা
দুর্লভ আরাম। আর, বৃষ্টির প্রার্থনা
কৃপালোভী ভিড়ের সান্ত্বনা।
(মর্ম্মান্তিক)

ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিগুলি "খসড়া"র যে ধরণের কবিতাগুলি সত্যিই সফল তার ভালো উদাহরণ। সহজ কথা এবং অনাড়ম্বরতা এদের বিশেষত্ব। কিন্তু এ সঙ্গে এ-কথাটাও মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যিকার সহজ প্রকাশভঙ্গির পিছনে যে প্রয়াস কাজ করে "খসড়া"র কবি অনেক জায়গায় সেটা পিছনে রাখতে পারেন নি, পাঠককে বুঝতে দিয়েছেন।

ছন্দের নূতনত্বের জন্য "খসড়া" খুব সম্ভব সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, কিন্তু এই বিষয়ে বর্ত্তমান সমালোচকের জ্ঞান নামমাত্র বলে অনধিকার চর্চ্চা থেকে নিরস্ত হওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

সমর সেন

আধুনিক শ্রেষ্ঠ গল্প—শ্রীরমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভারতী ভবন প্রকাশিত, মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য বইখানি কয়েকটি গল্পের সঙ্কলনবিশেষ। ' সম্পাদক যদি কোনো একটি বিশেষ বৎসরের উল্লেখ ক'রে বইয়ের নামকরণ করতেন—'অমুক বছরের সেরা গল্প', তা হ'লে কিছু বল্‌বার থাক্‌ত না, বরঞ্চ সুসঙ্গত হ'ত, যেহেতু সন্নিবিষ্ট গল্পগুলির অধিকাংশই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। বিলেতে এ রীতির প্রচলন আছে, এমন কি নির্দিষ্ট সাময়িক

পত্রিকা থেকে শ্রেষ্ঠ গল্প সঙ্কলিত করা হয়। কিন্তু এ বইখানিকে, সম্পাদকের মতানুসারে "শ্রেষ্ঠ লেখকদের শ্রেষ্ঠ গল্প সঙ্কলন" হিসাবে স্বীকার ক'রে নিতে শুধু আমার নয়, প্রত্যেক সুস্থমস্তিষ্ক ভদ্রলোকেরই ঘোরতর আপত্তি থাকা উচিত।

আপত্তির প্রথম কারণ হ'ল "শ্রেষ্ঠ লেখক" এই বিশেষণটির অবিধেয় ও অপ্রাসঙ্গিক ব্যবহার। বাংলা সাহিত্যের যাঁরা চর্চা করেন (এবং সম্পাদক মহাশয়ের চেয়েও যাঁরা বাংলা সাহিত্যের প্রতি কম অনুরাগী নন) তাঁরাও জানেন যে এই বইতে যাঁদের গল্প দেওয়া হয়েছে,—যেমন কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, বনফুল, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, সরোজ রায়চৌধুরী,—তাঁরা প্রকৃতপক্ষে শুধু সাহিত্যিক নন্, গল্প রচনায়ও তাঁদের যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে এবং সম্পাদকীয় পরিচিতির প্রতীক্ষা তাঁরা করেন না। কিন্তু এ কথা ভাবলে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না, যে বাংলা ভাষা এঁদের ছাড়া অন্যান্য লেখকদের কাছেও গল্প রচনার জন্যে কিছু কম ঋণী নয়। সম্পাদক মহাশয় যে বুদ্ধদেবের কোনো গল্পই পড়েননি অথবা তাঁর প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টি "রেখাচিত্রে"র নাম শোনেননি, এ কথা স্বীকার করে' নিলে আমাদের দেশের তথাকথিত সম্পাদকদের প্রকাণ্ড অজ্ঞতা মেনে নিতে হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের "নিশীথ নগরী" অথবা "অফুরন্ত" ছোট গল্পের রাজ্যে শীর্ষস্থানীয়, আর অচিন্ত্যকুমারের "ইতি" বা "দিগন্ত"ও অনাদরের বস্তু নয়। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মৌরীফুল" অথবা "যাত্রাবদল", মণীন্দ্র বসুর "রক্তকমল" অথবা "কল্পলতা" এ বইগুলির নাম সুপরিচিত এবং তাতে কিছু ভালো গল্পও আছে, এ কথা কি সম্পাদক মহাশয় জানেন না?

দ্বিতীয় আপত্তি হ'ল, যে বয়সের গণ্ডী না মেনে যদি কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাকে রসবিচারের ফলে আধুনিক রচনার মধ্যে ফেলা যায়, তাহ'লে ছোটগল্পের প্রবর্ত্তক রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমার নিশ্চয়ই স্থান পেতে পারতেন। ভূমিকায় নাম করা হ'লেও, রাজশেখর বসুকে বাদ দেওয়া কোনোমতেই যুক্তিসঙ্গত হয়নি।

তৃতীয় আপত্তি হ'ল, যাঁরা উপন্যাস লেখেন, তাঁরাই যে ছোটগল্পেও সিদ্ধহস্ত হবেন, এ তথ্য কেমন করে' সম্ভব হয়! সরোজকুমারের ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্যের ঔপন্যাসিক হিসাবে নাম হয়েছে অথবা হচ্ছে, কিন্তু পিঠ-চাপ্‌ড়ানো ভঙ্গিতে তাঁদেরকে ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ লেখকদের শ্রেণীতে সমুন্নীত করলে সমালোচনার প্রয়োজন ঘটে।

চতুর্থ আপত্তি এই যে, সম্পাদক মহাশয় ভুলে গেছেন যে প্রত্যেক গল্পলেখকের মনীষা অথবা প্রতিভা সমজাতীয় নয়, প্রত্যেকেরই রচনাধারা বিভিন্ন হতে বাধ্য। এবং সেইখানেই তাঁদের মৌলিকত্ব ও সিদ্ধি। বিভূতি মুখোপাধ্যায় বিশেষ করে' হাসির গল্পে, তারাশঙ্কর ঐতিহ্যের আবেষ্টনীতে ও পুরানো দিনের কাহিনীতে, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনস্তত্ত্বপূর্ণ রচনায়, নিজস্ব ভঙ্গিতে যথাক্রমে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সঙ্কলনে এমন সব গল্প দেওয়া হয়েছে, (বোধ হয় না বুঝে ও বিশিষ্ট কোনো নির্বাচন-প্রণালী অবলম্বন না করে') যেগুলি পড়লে লেখকদের একান্ত স্বতন্ত্রতা ও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না বরং বিপরীত ফল দাঁড়ায়। প্রথম চৌধুরীর "ঝোট্টন ও লোট্টন" গল্পটি কখনই তাঁর নিজস্ব বীরবলী ভাষায় রচিত বুদ্ধিমার্গীয়

"ঘোষালের" গল্পগুলির সমকক্ষতা দাবী করতে পারে না। কাজেই গল্পগুলি কেমন করে "শ্রেষ্ঠ লেখকদের শ্রেষ্ঠ গল্প সঞ্চয়ন" বলে' দাবী করতে পারে,—যখন অনেক "আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখক" বাদ পড়ে গেলেন, আর সব চেয়ে যেটা নিন্দনীয় ব্যাপার—গল্পগুলি মোটেই উক্ত লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনা নয়, উপরন্তু তাঁদের প্রতিভার প্রতি অবিচার করে?

অবশ্য অল্পমূল্যে যদি কিছু বইয়ের কাটতি হয়, সেটা নিন্দনীয় উদ্দেশ্য মোটেই নয়। কারণ কয়েকখানা বাংলা বইয়ের বিক্রয়ের মত অসম্ভব ঘটনাও যদি এদেশে সম্ভব হয়, তাও ভালো,—যদিও সে বইয়ের সঙ্কলনে কোনো কৃতিত্বই নেই, কোনো প্রতিনিধিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না, এবং সঙ্কলন কার্য্যে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি অথবা নির্বাচন-পদ্ধতির চিহ্ন নেই, উপরন্তু একটি নিতান্তই গায়ে-পড়া 'আধুনিকতা' ও 'আর্টের' ওপর টিপ্পনী সম্বলিত মামুলী মুখবন্ধ আছে।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পরিক্রমা—বুদ্ধদেব বসু (ডি, এম, লাইব্রেরী, মূল্য দুই টাকা।)

উপন্যাসের পরিধি আজকাল এত বেড়ে গেছে যে উপন্যাসকে বর্ত্তমান যুগের মহাকাব্য বলা চলে। জীবনের নানামুখী বৈচিত্র্য তাতে প্রকাশ পায়, প্রকাশ পায় মানুষের মনের পরিবর্ত্তন ও পরিণতি। চরিত্র-চিত্রণ এককালে ছিল উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ, কিন্তু চিত্রণের মধ্যে স্থিতির যে আভাস, তাতে জীবনের অবয়ব ধরা পড়ে না। আমাদের দেশে ছবি ও ভাস্কর্য্যের আমরা তফাৎ করিনে, সাহিত্যেও তাই গল্প এবং উপন্যাসের আমাদের কাছে একই দর। গল্প এবং উপন্যাস দুইয়েরই মধ্যে তাই আমরা চিত্রণের পরিচয় পাই, রূপায়ন কিন্তু তার মধ্যে বড় বেশী মেলে না।

বাংলা উপন্যাসের সম্বন্ধে এ সাধারণ অভিযোগ হয় তো অনেক পাঠকই মানবেন না—অনেকে হয়তো উপন্যাসের এ সংজ্ঞাকেও স্বীকার করতে চাইবেন না। এ সংজ্ঞা অস্বীকার করলে সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের পরিসরও কিন্তু কমে যায়, বর্ত্তমানের মহাকাব্য বলে তার যে দাবী, সে দাবী টেকে না। রূপায়নের মধ্যে দেশ ও কাল দুই ধরা পড়ে, ইংরিজীতে তাকে stereoscopic বলা চলে। বাংলা উপন্যাসে কিন্তু সে গভীরতার পরিচয় নেই, তার বদলে রয়েছে পটভূমির প্রসার। তাই সাময়িক হোক অথবা চিরন্তন হোক, জীবনের ছায়াই কেবল যেখানে দেখি, ঘটনার বস্তুবহুলতার মধ্যেও সত্য জমাট হয়ে ওঠে না।

(বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসখানিও বাংলা সাহিত্যের এ সাধারণ অভাবকে পূরণ করতে পারেনি) ভাষা তাঁর শাণিত, দৃষ্টি তাঁর প্রখর, সমাজের গলদ এবং ফাঁকি সহজেই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। ঔপন্যাসিকের আর একটী মস্ত বড় গুণ—কথ্যভাষার উপর দখল, এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তাকে সজীব করে তোলা—তাও তাঁর রয়েছে। চিত্রণ হিসাবে তাই তাঁর বইখানি চমৎকার। এক একটী ছবি vignette-র মতো মনে গেঁথে যায়।

চরিত্রের রূপায়নে কিন্তু তার সার্থকতা সমান নয়, চরিত্রগুলি পটভূমির উপর আঁকা বিবর্ণ ছবি, তারা ত্রিবর্গের রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে ওঠে নি।

তবু তাঁর লেখার মধ্যে আশ্বাস রয়েছে যে বাংলা উপন্যাসের এ দাবী হয়তো একদিন তিনি মেটাতে পারবেন। পাণ্ডিত্যের ভারে উপন্যাস যখন বোঝাই, তখন কল্পনার সহজ প্রকাশ তাতে মেলে না। রূপায়নের সেখানে প্রকাশ হয় নির্ম্মাণে, সৃষ্টিতে নয়। টমাস মানের মতন দিগ্বিজয়ী ঔপন্যাসিকের রচনাও তাই আমাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি দেয় না, মনে হয় যে কৌশল এবং শিল্পচাতুর্য্য সেখানে রয়েছে, কিন্তু যে সহজ দৃষ্টিতে শিল্পীর সৃষ্টি প্রাণবন্ত হয়ে উঠে, তার বীজমন্ত্র সেখানে নেই। অলডুাস হাক্সলীর মতন অতি বুদ্ধিমান লেখকও তাই মনকে পীড়িত করে তোলেন—মনে হয় বুদ্ধির কণ্টকিত প্রকাশের মধ্যে জীবনের লালিত্য ও চিরনতুনত্ব সেখানে বাদ পড়ে গেছে। তবু হাক্সলীও যখনই সহজ হতে পেরেছেন, তখনই তাঁর লেখায় এসেছে নতুন সৌকুমার্য্য এবং দরদ।

বুদ্ধদেবের রচনায়ও বুদ্ধির এ বিদ্রোহ এককালে উগ্র হয়ে ধরা দিয়েছিল। আজও তার জের পুরো কাটে নি, পরিক্রমার কোন কোন চরিত্রে সে বুদ্ধিবিলাসের আভাস মেলে। বুদ্ধির সে প্রাধান্য জীবনকে বিশ্লেষণ করে, খণ্ড খণ্ড ক'রে তার ত্রুটীবিচ্যুতি ফুটিয়ে তোলে, কিন্তু সে দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনের পূর্ণতা ধরা দেয় না। ব্যঙ্গ রচনায় ও বিদ্রূপে তাই বুদ্ধির দীপ্তি সঙ্গত, কিন্তু রসরচনায় কেবলমাত্র দীপ্তি দিয়ে আকাশের নীল রহস্য উদ্ভাসিত হয় না। বুদ্ধির সচেষ্ট নির্ম্মাণে তাই চরিত্র ব্যঙ্গ বা ক্যারিকেচারে পর্য্যবসিত হয়, সহজ জীবনে ভরে ওঠে না।

বুদ্ধির নির্ম্মাণের আর একটী লক্ষণও বুদ্ধদেবের অনেকগুলি চরিত্রে পরিস্ফুট। কল্পনার সহজ সৃজনে চরিত্রের পরিপূর্ণ অবয়ব অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, কিন্তু সে দ্বিতীয় দৃষ্টি নেই ব'লে বুদ্ধির রচনায় স্মৃতিশক্তির রসদ পদে পদে ধরা পড়ে। চরিত্রসৃজনেও স্মৃতির স্থান আছে, কিন্তু সৃষ্টির মুহূর্ত্তে স্মরণ বরণীয় হয়ে উঠে। চরিত্রনির্ম্মাণে স্মৃতি কিন্তু স্মৃতিই থেকে যায়। নির্ম্মিত চরিত্র তাই সাধারণ থেকে যায়, ব্যক্তির অনুপম বৈশিষ্ট্যে পৌঁছায় না। 'পরিক্রমা'র সুমিতা বা বিজন ঘোষকে টাইপ বলে ভুল করা চলে, এমনকি প্রশান্তের চরিত্রেও সৃষ্টির চেয়ে স্মৃতির লক্ষণ বেশী। কথাবার্ত্তায় একএকবার প্রশান্ত জীবন্ত হয়ে উঠছে, কিন্তু কথোপকথনের বাইরের প্রশান্তের জায়গা সজীব মানুষের জগতে নেই। বরুণা দত্ত সম্বন্ধেও বোধ হয় একথা বলা চলে, যদিও বরুণা দত্তকে জীবন্ত ক'রে তুলতে বুদ্ধদেব শিল্পীর অনেকগুলি কৌশলই প্রয়োগ করেছেন।

আমার চিরদিনই মনে হয়েছে যে কবি বুদ্ধদেব বুদ্ধদেবের সত্যি পরিচয় নয়, তার পরিপূর্ণ পরিচয় প্রথম পেয়েছি 'হঠাৎ আলোর ঝলকানী' বা 'সমুদ্রতীরে'র মতন বইয়ে। কিন্তু সে বইগুলোও তার উপন্যাস রচনার মালমসলা ছাড়া আর কিছু নয়। নিজের অধীত বিদ্যা এবং লব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে সেখানে তিনি পরীক্ষা করেছেন, জীবনের দানা সেখানে পুরো বেঁধে ওঠেনি। কিন্তু দানা বাঁধার সম্ভাবনার আশ্বাস তারা দেয়। 'পরিক্রমা'য় সেই আশ্বাস

আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সোমনাথের চরিত্রে স্মৃতির অসংখ্য রেখাপাত সত্ত্বেও তাই সোমনাথ কল্পজগতের প্রান্তদেশের অধিবাসী। মল্লিকার চরিত্রই 'পরিক্রমা'র আমার কাছে সবচেয়ে বেশী জীবন্ত লেগেছে, এমনকি 'পরিক্রমা'র অত্যল্প পরিসরের মধ্যেও মল্লিকার চরিত্রে পরিণতির ইঙ্গিত রয়েছে।

গল্প হিসেবে যাঁরা বইখানি পড়বেন, তাঁরা গল্প হিসেবেই তাতে আনন্দ পাবেন। যাঁরা উপন্যাসের গভীরতা ও পরিণতি সেখানে চাইবেন, তাঁদের অতৃপ্তির মধ্যেও কিন্তু এটুকু আশা থাকবে যে বুদ্ধদেব নিজের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা ও বহুমুখী বিদ্যাকে যেদিন কল্পনার সহজ সৃষ্টিতে সজীব ক'রে তুলবেন, সেদিন বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের এক নতুন পর্য্যায় সুরু হবে।

ইবনে বতুতা

Published and Printed by K. C. Banerjee at the Modern Art Press,
1/2, Durga Pituri Lane, Calcutta, Edited by Humayun Kabir
and Buddhadeb Bose.

চতুরঙ্গ

চৈত্র,
১৩৪৫

প্রথম বর্ষ,
তৃতীয় সংখ্যা

অহিংস অসহযোগ

বটকৃষ্ণ ঘোষ

৩১শে ডিসেম্বর অহিংস অসহযোগের সাহায্যে স্বরাজ লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করায় ৺পিতৃদেব আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তখন হইতে এতদিন ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি অহিংস অসহযোগ জিনিষটা কি, কিন্তু এখনও তাহার কূল কিনারা পাইলাম না।

"অহিংসা" এবং "অসহযোগ"—এই দুইটি কথার সহযোগে সম্পন্ন হইয়াছে "অহিংস অসহযোগ"। এই দুইটির একটি বিশেষ্য এবং অপরটি বিশেষণ হইতে বাধ্য। কারণ দুইটিই বিশেষ্য হইলে "অহিংস অসহযোগ" বলিতে আর একটি রাজনৈতিক আন্দোলন বুঝাইবে না; আর দুইটিই যদি বিশেষণ হয় তবে তৃতীয় একটি বিশেষ্যের অধ্যাহার না করিলে কথা দুইটির কোন অর্থই হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে "অহিংসা" যদি বিশেষ্য হয় তবে "অসহযোগ" হইবে বিশেষণ, আর "অসহযোগ" বিশেষ্য হইলে "অহিংসা"ই হইবে বিশেষণ। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে "অহিংস অসহযোগে"র অর্থ এক নহে, বহু। বিশেষ্য সকল সময়েই বিশেষণ অপেক্ষা বলবত্তর; সুতরাং অহিংসা বিশেষ্য হইলে "অহিংস অসহযোগ" আন্দোলনে বেশী জোর দেওয়া হইবে "অহিংসা"র উপর, এবং অসহযোগ বিশেষ্য হইলে বেশী জোর দেওয়া হইবে অসহযোগের উপর। কার্য্যক্ষেত্রেও "অহিংস অসহযোগে"র বিভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায় কি? তাহাও যায়, কারণ সকলেই জানেন, গান্ধীজীর আন্দোলন Irwin-এর সময়ে ছিল অসহযোগপ্রধান, কিন্তু Willingdon-এর আমলে তাহা দ্রুতগতিতে অহিংসা-প্রধান হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে "অহিংস অসহযোগ" বলিতে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মপন্থা বুঝায় না। ইহার প্রকৃত অর্থ যে কি তাহাই উদ্ঘাটন করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে গান্ধীনীতির অন্ততঃ একটি গুণ আশা করি বুঝিতে পারা গিয়াছে; সেটি এই যে গান্ধীনীতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া

থাকে। কিন্তু এই গুণের অধিকারী কখনও লোকোত্তর সত্য হইতে পারে না, কারণ সত্য অমোঘ ও অদ্বয়। সুতরাং "অহিংস অসহযোগ" সত্য নহে, এবং যাহা সত্য নহে তাহারই নাম মিথ্যা।

আমাদের শব্দালোচনা এখনও শেষ হয় নাই। "অহিংস অসহযোগ" বলিতে যে কখনও একটিমাত্র সুনির্দিষ্ট নীতি বুঝাইতে পারে না, তাহাই কেবল দেখান হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা কোন প্রকার নীতিই বুঝাইতে পারে কি? আমার মতে তাহাও পারে না। বিশেষণ প্রয়োগের উদ্দেশ্য—বিশেষ্যবাচক শব্দটির অর্থ সঙ্কীর্ণতর গণ্ডীর মধ্যে সন্নিবদ্ধ করা; কিন্তু বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়ই যদি সর্বব্যাপী হয় তাহা হইলে কোন ভাবই ব্যক্ত হইতে পারে না। এখন "অহিংসা" বলিতে হিংসা ভিন্ন জগতের আর সব কিছুই বুঝায়,—যথা, চৌর্য, মানুষ, এরোপ্লেন ইত্যাদি। "অসহযোগ" বলিতেও সেইরূপ সহযোগ ভিন্ন আর সবই বুঝাইবে। এক্ষেত্রে "অহিংসা" ও "অসহযোগ" এই দুইটি কথা এক সঙ্গে ব্যবহার করার তাহা হইলে কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? "হরিজন" পাঠকেরাও আশা করি স্বীকার করিবেন যে "অহিংসার" মধ্যে যে বস্তুটির অভাব আছে সেইটি পূরণ করিবার জন্যই "অসহযোগ" কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে, এবং "অসহযোগে"র অভাব পূরণের জন্যই গান্ধীজী "অহিংসা"র শরণাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে অহিংসার মধ্যে কেবল এক হিংসারই অভাব আছে, এবং অসহযোগেরও যদি কিছুর অভাব থাকে তবে তাহা সহযোগের। সুতরাং স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে গান্ধীর অহিংসার অর্থ সহযোগ, এবং তাঁহার অসহযোগের অর্থ হিংসা।

অন্য দিক দিয়া চিন্তা করিলে কিন্তু দেখা যাইবে যে গান্ধীর "অহিংসা" ও "অসহযোগে"র অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। "ভাগলপুরী গরু কি?"—এই প্রশ্নের উত্তরে আমি যদি বলি "যাহা আরবী ঘোড়া নহে" তাহা হইলে সকলেই অবশ্য আমার জন্য রাঁচির ব্যবস্থা করিবেন। মহাত্মা হওয়ার সুবিধা এই যে এইরূপ কথাও নির্ভয়ে সর্বসমক্ষে বলা যাইতে পারে, কেহ প্রতিবাদও করিবে না। এই অনুমান করিতেছি গান্ধীজীর দৃষ্টান্ত হইতে। গত পঁচিশ বৎসর হইতে ভারতবাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে "আপনার অহিংসা কি?" উত্তরে তিনি এ পর্যন্ত কেবলমাত্র বলিয়াছেন "তাহা সহযোগ নহে"। আবার যদি প্রশ্ন করা হয়—"আপনার অসহযোগ কি?" তবে তিনি ঐ রূপেই আমাদের জানাইয়াছেন যে তাহা হিংসা নহে। এইরূপেই এই বিশ্ববিশ্রুত "অহিংস অসহযোগে"র অভ্যুদয়। ভাগলপুরী গরু যে আরবী ঘোড়া নহে, এ কথা জানিয়াও যাঁহারা

সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, তাঁহারা কিন্তু মহাত্মার নিকট যখন শোনেন যে, যাহা ভাগলপুরী গরু নহে তাহা আরবী ঘোড়াও নহে, তখন তাঁহাদের চিত্তে সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকে না, নহিলে যাহা হিংসা নহে তাহা সহযোগও নহে—এই সুগভীর তথ্য মহাত্মার নিকট শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন কিরূপে? যাহা হিংসা নহে তাহা সহযোগও নহে,—এই কথার যদি কোন অর্থ থাকে তবে তাহা এই যে, যাহা হিংসা তাহা অ-সহযোগ নহে, অথবা যাহা সহযোগ তাহা অ-হিংসা নহে। কিন্তু তাহার অর্থ ইহাই নহে কি যে, যাহা হিংসা তাহাই সহযোগ? অথচ পূর্বেই দেখান হইয়াছে, অহিংসা = সহযোগ; এখন কিন্তু দাঁড়াইল, হিংসা = সহযোগ। যে কথা সত্যরূপে ধরিয়া লইলে পরস্পর বিরুদ্ধ দুই সিদ্ধান্ত উদ্ভূত হয়, অঙ্ক শাস্ত্রে তাহা absurd বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। গান্ধীর "অহিংস অসহযোগ"ও এইজন্য absurd।

আসল কথাটা এই যে, "অহিংস অসহযোগ" দুইটি মিথ্যার সাহায্যে একটি সত্য প্রতিষ্ঠা করার ব্যর্থ চেষ্টা। বিয়োগে বিয়োগে যে যোগ হয় তাহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু রাজনীতি, ধর্মনীতি বা সমাজনীতির ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করিতে ইতিপূর্বে কেহই আর সাহস করে নাই। গান্ধীজী তাহাই করিয়া মহাত্মা হইয়াছেন। ইংরাজের প্রতি কোন ভারতবাসীর মনই যে সম্পূর্ণরূপে অহিংস নয়, একথা যিনি অস্বীকার করেন তিনি হয় মহাত্মা না হয় মিথ্যাবাদী। অপর দিকে বল্লভভাই, ভুলাভাই প্রভৃতি গান্ধীর দেশভাইগণ যে এই ইংরাজের সহিতই সহযোগ স্থাপনের জন্য গোপনে গলদ্ঘর্ম চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা আজ "হরিজন"-পাঠকের দলও বোধ হয় অস্বীকার করিতে পারিবে না। সুতরাং ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে বলিতেই হইবে যে, হিংসা (বিশেষতঃ বাংলাদেশে) ও সহযোগই (বিশেষতঃ গুজরাটে) হইল আমাদের মনের কথা। এই মনের কথাটাই গান্ধীজী রাজনীতির ভাষায় "অহিংস অসহযোগ" বলিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষা যদি "হরিজন"-পাঠকেরা বুঝিতে না পারে তবে বাস্তবিকই গান্ধীকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ "হরিজন"-পাঠকদেরও Talleyrand-এর এই কথাটি স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ভগবান্ মানুষকে বাক্শক্তি দিয়াছিলেন যাহাতে সে মনের ভাব গোপন করিতে পারে।

এইখানে, একটু অবান্তর হইলেও, বাধ্য হইয়া স্মার্তকেশরী রঘুনন্দনের কথা উত্থাপন করিতে হইল। একটা কিম্বদন্তী আছে যে, একটি বিশেষ ঘটনার পর তবে রঘুনন্দন বুঝিতে পারেন যে এইবার তাঁহার স্মৃতির বিধান দিবার সময়

আসিয়াছে। ঘটনাটি এই।* একদিন তর্পণান্তে রঘুনন্দন দেখিতে পাইলেন যে, ব্রাহ্মণগণ সকলেই মুক্তকচ্ছ হইয়া গঙ্গাতীরে তর্পণের জন্য জলাঞ্জলি দিতেছেন। রঘুনন্দন ইহাতে বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করাতে ব্রাহ্মণগণ ততোধিক বিস্মিত হইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "গুরুদেব, আপনি স্বয়ং যে মুক্তকচ্ছ!" ব্যাপার এই যে, তর্পণের সময় রঘুনন্দনের অজ্ঞাতসারে কখন্ তাঁহার কাছা খুলিয়া গিয়াছিল; এবং শিষ্যবর্গ গুরুদেবের এই অবস্থা দেখিয়া বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া সকলেই কাছা খুলিয়া তর্পণ আরম্ভ করিয়াছিল। এই ঘটনা হইতে রঘুনন্দন বুঝিতে পারিলেন, তিনি যাহা বলিবেন লোকে তাহাই দ্বিরুক্তি না করিয়া মানিয়া লইবে, যুক্তি দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিবে না।

আমার মনে হয় ৩১শে ডিসেম্বর স্বরাজলাভের কথা আসলে ঐরূপ একটি test case ভিন্ন আর কিছুই নহে। পার্থক্য কেবল এই যে, রঘুনন্দনের test case তাঁহার অজ্ঞাতসারেই সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু গান্ধী তাঁহার test case-টি স্বহস্তে এবং সযত্নে এক বৎসর ধরিয়া সাজাইয়াছিলেন। আমার আরও বিশ্বাস যে, রঘুনন্দনের শিষ্যগণ তুলনায় মুষ্টিমেয় হইলেও কোনক্রমেই এক বৎসর ধরিয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে রাজি হইত না। গান্ধী কিন্তু দেখিলেন যে, সারা ভারতের লোক এক বৎসর ধরিয়া তাঁহার সৃষ্ট মায়া-স্বরাজের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, একবার ভাবিয়াও দেখিল না তাহা সম্ভব কি না। অন্ততঃ ৩০শে ডিসেম্বর তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন যে, ১লা জানুয়ারী তাঁহাকে Himalayan blunder স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তথাপি তিনি ৩০শে তারিখেও স্বরাজের কথাই বলিয়াছিলেন, blunder-এর কথা বলেন নাই। তৎসত্ত্বেও দেশবাসী কিন্তু ১লা জানুয়ারী তাঁহাকে ধূর্ত ও প্রতারক না বলিয়া বলিল মহাত্মা। ইহার পরেও কি আর কাহারও আপন মহাত্মতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে? মহাত্মাদের লক্ষণই এই যে, তাঁহাদের কর্মপ্রণালী যুক্তির অতীত; গান্ধীও তাই ইহার পর হইতে যুক্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ inner vision ও sudden flashes-এর উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন। আজিকার খবরের কাগজেও (27.2.39) দেখিতেছি গান্ধীর ভক্তপ্রধান বীর বল্লভভাই প্যাটেল বলিতেছেন, গান্ধীজী এইরূপ একটি sudden flash পাইয়াই রাজকোটে সত্যাগ্রহ বন্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। মহাত্মার সহিত হিট্লার প্রভৃতি দস্যুর এই দিক দিয়া একটা বিস্ময়কর সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহারাও এই বলিয়া গর্ব করিয়া থাকে যে, তাহারা চিন্তা করে রক্ত দিয়া, মাথা খাটাইয়া চিন্তা তাহারা করে না।

গান্ধীর বীর অনুচরের নাম শুনিয়া পাঠকবর্গের অনেকেই হয়তো বিস্মিত হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহারা যদি "হরিজন"-পাঠক হইতেন তবে তাঁহাদের বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিত না। কারণ "হরিজন"পাঠকেরা সকলেই জানে যে, গান্ধী রামচন্দ্রের অবতার। কিন্তু রামচন্দ্রেরও লঙ্কাদহন প্রভৃতি "অহিংস" কর্মের জন্য একটি বীর হনুমানের প্রয়োজন হইত। গান্ধীর এই বীর অনুচর বল্লভভাই প্যাটেল। দৃষ্টান্তস্বরূপ এইটুকু বলিলেই হইবে যে, বোম্বাই-এ মিল-ধর্মঘটের সময় গত বৎসরে ইঁহার উপস্থিতি সত্ত্বেও (ইঁহার উপদেশে কিনা জানি না) পুলিশ অহিংসভাবে গুলি চালাইয়া কতকগুলি শ্রমিককে খুন জখম করিল কিন্তু গান্ধী বা বল্লভভাই কেহই তাহার প্রতিবাদ করিলেন না। ডাক্তার খারের ব্যাপারে এই বল্লভভাই যখন অমানুষিক ঔদ্ধত্যের সহিত বলিয়াছিল "I am super-Hitler", তখন আশা করি বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হওয়াতেই গান্ধীজীর মুখ দিয়া কোন প্রতিবাদ বাহির হয় নাই। দেশদ্রোহী শ্রমিকপীড়ক গুজরাটী মিলওয়ালার পরম বন্ধু এই বল্লভভাই ; আহমেদাবাদে মিলের ধর্মঘট মিটাইতে এই super-Hitler বল্লভভাইয়েরই ডাক পড়ে, এবং তাহা যে শ্রমিকদিগের পক্ষ হইতে নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। শুনা যাইতেছে যে, গান্ধীর অনুমতিক্রমে আগা খাঁর সহিত দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়া এই বল্লভভাই সেখানকার ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যে আন্দোলন চালাইবে যাহাতে ইংরাজরা সেখানকার এক ছটাক জমিও জার্মাণীকে ফেরৎ না দেয়। এই বল্লভভাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নেতা! ইংরাজ তাহার সাম্রাজ্যের কোন অংশ রাখিতে পারুক আর নাই পারুক সেজন্য ভারতবাসীর মাথাব্যথা কেন ?

সুভাষবাবু কংগ্রেসের সভাপতি থাকিতেও ইনি তাঁহাকে না জানাইয়াই Working Committee-র একটি মিটিং করিয়া ফেলিলেন এবং ফতোয়া জারি করিয়া দিলেন যে, জনসাধারণ যেন পট্টভাই সীতারামিয়াকেই সভাপতি নির্বাচিত করে। সর্বপ্রকার নীতিবিগর্হিত এই কর্মের জন্য কিন্তু গান্ধীজীর দিক হইতে কোন প্রতিবাদ শোনা গেল না। পরাজিত সুভাষবাবুকে ক্ষমা করিতে গান্ধীজী নিশ্চয়ই প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন ; কিন্তু ভ্রাতৃত্রয়ের (বল্লভভাই, ভুলাভাই, পট্টভাই) ষড়যন্ত্র বিধ্বস্ত করিয়া সুভাষবাবু যখন মুক্ত নির্বাচনে জয়ী হইলেন তখনই গান্ধীজীর নির্লিপ্ততার মুখোশ এক মুহূর্তে খসিয়া পড়িল। রাগের মাথায় বলিয়া ফেলিলেন, 'সীতারামিয়ার পরাজয় হইল আমারই পরাজয়"। যে গান্ধীজী গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই বলিয়া আস্ফালন করিয়া

আসিতেছেন যে, তিনি কংগ্রেসের চার আনির সভ্যও নন, সীতারামিয়ার পরাজয়ে বা সুভাষবাবুর নির্বাচনে তাঁহার কি আসে যায়? আসল কথা তাহা হইলে এই যে, জওহরলাল নেহেরু যে গান্ধীকে বে-সরকারীভাবে "permanent super-president"-এর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন সেই পদটি গান্ধীজী এখনও মনে মনে আঁকড়াইয়াই আছেন, কেবল মহাত্মাসুলভ বিনয়বশতঃ কথাটি স্পষ্ট করিয়া কখনও উচ্চারণ করেন নাই। এখন কিন্তু তাঁহার এই পদটি যাইতে বসিয়াছে, কারণ সুভাষবাবুর মত যে ব্যক্তি একটি principle-এর জন্য আপনার সমস্ত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বিপদগ্রস্ত করিতে ভয় পান না, সেই ব্যক্তি কি একটি বেসরকারী permanent super-president বরদাস্ত করিবেন? ক্রোধ ও হতাশার আতিশয্যে গান্ধীর মুখ দিয়া অসামাল কথা বাহির হইয়া গেল। মনে রাখিতে হইবে যে, গান্ধীর মত মন্ত্রগুপ্তি William the Silent-এরও বোধ হয় ছিল না, কারণ এত দিন ধরিয়া যদিও তিনি স্থির সঙ্কল্প করিয়া বসিয়া ছিলেন যে পরিশেষে তিনি ভারতবাসীকে Federation-ও গলাধঃকরণ করাইবেনই, তথাপি তিনি একটি বারের তরেও কোনদিন তাহার সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলেন নাই। সুভাষবাবুর জয়লাভে কিন্তু এ হেন ব্যক্তির মুখ দিয়াও অসামাল কথা বাহির হইয়া গেল; গান্ধীর হতাশার গভীরতা ইহা হইতেই অনুমেয়। কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া গান্ধী উত্তেজনার বশে আরও এমন একটি কাজ করিয়াছেন যে জন্য ভারতবাসী কোনদিন তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিবে না। একই ব্যক্তি চিরকালই জননেতা থাকিতে পারে না, কিন্তু সেই জন্য পদচ্যুত রাষ্ট্রনেতা কখনও জাতিসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করে না। গান্ধী কিন্তু পরাজয়ের পূর্বাভাষ দেখিয়াই কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সমস্ত ভারত স্তম্ভিত হইয়া শুনিয়াছে যে গান্ধী হরিজন-পাঠকদের কংগ্রেস ছাড়িয়া দিতে বলিতেছেন। অথচ এই গান্ধীই বল্লভভাইয়ের হস্তে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত ও অপমানিত বামপন্থীদের কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়াই কার্য করিতে কতবার আদেশ ও উপদেশ দিয়াছেন!

কোন রাষ্ট্রনেতা যখন ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রচারিত পরমধর্ম অহিংসার কথা বলেন তখন সাধারণতই আমাদের মনে সন্দেহের উদয় হয়। তখনই আমাদের সন্দেহ হয় যে, তাঁহার নিকট অহিংসা policy মাত্র, principle নহে। এবং এই policy যে কিরূপ জঘন্য তাহা আধুনিক বাংলার "হরিজন"-পাঠকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। যে বাঙ্গালী একদিন বলিয়াছিল, ইংরাজ যদি বলপ্রয়োগপূর্বক আমাদের স্বাধীনতালাভের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে তবে

ইংরাজের প্রতিও বলপ্রয়োগ করিবার অধিকার আমাদের আছে, সেই বাঙ্গালী আজ নিয়মিতভাবে "হরিজন" পাঠ করিয়া বলিতে শিখিয়াছে, ইংরাজ যদি আমাকে চাবুক মারে তবে আমি এমন উৎকটভাবে চীৎকার করিব যে, তাহাতে শুধু পাড়ার কেন পৃথিবীর লোক ছুটিয়া আসিবে, এবং ইহাতে বিব্রত হইয়া ইংরাজ শেষে তাহার চাবুক থামাইতে বাধ্য হইবে। ইহারই নাম সত্যাগ্রহ, অথবা aggressive অহিংসা। এই ধর্ম প্রচার করিয়াই এই আধুনিক বুদ্ধাবতার ভারতবাসীর না হইলেও ইংরাজের হৃদয় জয় করিয়াছেন; কারণ ইংরাজ জানে যে, ভারতে যতদিন গান্ধীনীতি প্রচলিত থাকিবে ততদিন তাহাদের সাম্রাজ্যলোপের কোন আশঙ্কা নাই। ভারতবর্ষে ইংরাজের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু আজ গান্ধী, এবং ইংরাজও তাহা জানে। ইংরাজ জানে যে গান্ধী ও তাঁহার ভ্রাতৃত্রয় বাহিরে লোক ঠকাইবাব জন্য যতই লম্ফঝম্প করুন, অন্তরে তাঁহারা স্বাধীনতা চাহেন না, কারণ ইংরাজের অধীনে তাঁহাদের ভারতে যে প্রতিপত্তি আছে, ইংরাজ না থাকিলে তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। ইংরাজ এখনও আশা রাখে যে, গান্ধীজী ক্রমে ক্রমে ভারতবাসীকে বুঝাইয়া দিবেন যে পূর্ণ স্বরাজের অর্থ Dominion Status, এবং Dominion Status-এর অর্থ Federation। এই ডবল-ভেল্কিব প্রথমটি পূর্বেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল এবং দ্বিতীয়টিও নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইতে যাইতেছিল, কিন্তু মাঝখান হইতে বাধা দিল যত নষ্টের গোড়া এই বাঙ্গালী সুভাষ বোস।

সাধে কি বাঙ্গালী গান্ধীজীর দু'চক্ষের বিষ? বাঙ্গালী চিরকাল ভাবের ভাবুক, আদর্শের দাস,—কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া চলার অভ্যাস তাহার হয় নাই। গুজরাটী কিন্তু আর্থিক লাভের আশা না থাকিলে কোন বিষয়ে উৎসাহই পায় না,—একথা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙ্গালী একা হইয়াও ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বিন্দুমাত্র ভয় পায় নাই, কারণ তাঁহাদের সম্মুখে ছিল বাস্তবিকই একটি মহান্ আদর্শ। বাঙ্গালী তখন বাস্তবিকই প্রাণমন দিয়া স্বাধীনতা চাহিয়াছিল, যদিও ভারতের অপর প্রদেশ হইতে তখন বিশেষ কোনই সাড়া পাওয়া যায় নাই। গান্ধী-আন্দোলনের মূলে কিন্তু ছিল কেবল কড়া-ক্রান্তির হিসাব। গান্ধীজী ভারতবাসীকে বুঝাইলেন, চরকা ধর তাহা হইলেই স্বাধীনতারূপ পরমার্থের সঙ্গে সঙ্গে অর্থও মিলিবে; অমনি সারা ভারতে উৎসাহের বিদ্যুদ্বহ্নি খেলিয়া গেল,—বাঙ্গালী কেবল ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া রহিল। এই জন্যই গান্ধী ও বল্লভভাই ইংরাজ অপেক্ষাও বাঙ্গালীকে অধিক ঘৃণা করিয়া থাকেন। রাজকোপে নির্বাসিত জনসেবকদের সাহায্য করিবার জন্য

বিঠলভাই প্যাটেল সুভাষবাবুর হস্তে যে টাকা দিয়া গিয়াছিলেন সেই টাকা সুভাষবাবুর নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে বল্লভভাই (গান্ধীর অনুমোদনে ?) ইংরাজের দরবারে পর্যন্ত উপস্থিত হইতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। তথাপি বিশ্বাস করিতে হইবে যে, বল্লভভাই ভারতের স্বাধীনতাকামী এবং অহিংসার অবতার !

একথা আজ সকলেরই উচ্চ কণ্ঠে বলিতে পারা চাই যে, রাজনীতি জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ না হইলেও তজ্জন্য সাধারণ মানুষের লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। অধীন জাতির একমাত্র রাজনীতি স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করা, এবং এই উদ্দেশ্যে শাসক ও শোষক শক্তির বিরুদ্ধে সময়োপযোগী আন্দোলন চালানও কিছুমাত্র অন্যায় নয়। গান্ধীর মত যাঁহারা অহিংসার নামে এই আন্দোলনে বাধা দেন তাঁহারা রাজনৈতিক নকল অহিংসা ভিন্ন অপর কোন অহিংসার সহিত পরিচিত নহেন। ভগবান্ বুদ্ধদেব যে পরম ধর্ম অহিংসার কথা প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন তাহা লোকোত্তর ; ইহার প্রকৃত অর্থ অচঞ্চল প্রীতি, non-violence নহে। হিন্দু শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে অস্তেয়ই তপঃ ; কিন্তু তাহার অর্থ কি এই যে, চুরি না করাটাই প্রাচীন হিন্দুর নিকট তপস্যা করার মত কঠিন ব্যাপার ছিল ? আপন পর ভেদজ্ঞানের অবসানের নামই অস্তেয়। সেইরূপ, চিত্তের যে অবস্থায় অখণ্ড ও অচঞ্চল প্রীতি ভিন্ন আর কোন ভাবের উদয়ই সম্ভব হয় না তাহাকেই বলে অহিংসা। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিংস্রভাব কিছুকালের জন্য দমন করিয়া রাখার নাম non-violence ; কিন্তু চিরকালের জন্য হিংস্রভাবের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনে হইল অহিংসা। চিত্ত সম্পূর্ণ নির্দ্বন্দ্ব না হইলে কেহই এই অহিংসার অধিকারী হইতে পারে না,—এই জন্যই ইহাকে বলে পরম ধর্ম। গান্ধীজী এই পরম ধর্ম অহিংসার উপর রাজনৈতিক twist দিয়া ভারতের উপকার না অপকার করিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গ চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

দেশবিদেশ

বিষ্ণু দে

(শ্রীক্ষিতীশ রায়-কে)

দেশে ও বিদেশে চলে দিবানিশি চড়কগাজন।
রাজন্যসম্পদ শুধু ছদ্মবেশ ভীষিকাভাজন।
দেশান্তরে প্রাণভয়ে ছিন্নভিন্ন সগরসন্তান
খোঁজে প্রায়শ্চিত্ততীর্থ, মরুভূমি খোঁজে মুক্তিস্নান!
উন্মত্ত স্বার্থের শক্তি, অর্থ হানে অট্টহাসি বায়ু,
পলে পলে শুষে নেয় বণিকের বর্ণহীন আয়ু।
বসুন্ধরা সর্বহারা, ক্ষুধার্তের ঘর্মে শূন্য খনি
রসদের জমে স্তূপ, পাত্র খুঁজে মরে তবু ধনী।
ধামাচাপা ধর্ম্মঘটে, নির্মনন শূদ্রটানা রথে
ধর্মধ্বজ লোভ ঘোরে সৈন্যকণ্টকিত রাজপথে।
জলেস্থলে অন্তরীক্ষে ক্ষাত্রমৃত্যু খুঁজে পায় মিতা
রক্তবীজ জীবাণুতে। অস্তমিত জীবনসংহিতা।
স্থানাভাব, বিশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্যহীন কোলাহল ভরে
ধোঁয়ায় মলিন ধূম্রলোচনের গ্রামে ও সহরে।
কর্মবীর ঘর্মক্লান্ত, মর্মভেদী অর্থাভাব ঘিরে,
ভাবে গৃহস্থের সুখ বন্ধ্যা স্ত্রীতে, পুন্নামেরই তীরে,
নিদেন, বধিরমূক সন্তানে বা মরণে বা রেসে।
নিদ্রার সাধনা করে, কাল আছে মেল্-ডে আপিসে।
ক্রস-ওয়ার্ড পড়ে' থাকে, আশা নেই। কিবা যায় এসে?
ছুটি দেবে কি কেউ কোনোদিন দেশে বা বিদেশে?

জীবন সঙ্গীত

জীবনানন্দ দাশ

ষ্ট্রেচারের পরে শুয়ে কুয়াসা ঘিরিছে বুঝি তোমার দু চোখ :
ভয় নেই, মৃত্যু নয় কোনো এক অপদার্থ অন্যায় আলোক ;
তাহ'লে কি এত লোক ম'রে যেত মশালের লালসায়—মাছির মতন?
অমৃতের সিঁড়ি ব'লে মানুষেরা গড়িত কি এত শাদা শ্লোক।

আজ মৃত্যু ; এর আগে ম্যাটেডরদের মৃত্যু ছিল নাকি স্পেনে ?
লড়েছে বীরের মত, রাঙা রৌদ্রে আপনারে সব চেয়ে হাম্বড়া জেনে
খেয়েছে আঁধার রাত্রি অকস্মাৎ। তবু এক হরিয়াল : বাংলার পাখি
শিকারীর-গুলি-সার-নীলাকাশ ভেবে নয় মরণকে মেনে।

তবু মোরা দিবালোক উত্থাপন করি রোজ শৌণ্ডিকের মত ;
গেলাস ভরিয়া দেই ;—মনে হয় কম্পাশ, সিন্ধু, রৌদ্র,—জীবন ফলত
ধীমান মৃত্যুর চেয়ে। মরে গেছে : ভূস্তরের অন্ধকারে চূণ তারা।
কিন্তু আমাদের আয়ু সানস্পট্ গিলে ফেলে সূর্য্যের মতন ব্যক্তিগত।

কয়েকটি কবিতা

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

চেকোস্লোভাকিয়া

শুনেছি চেকের স্বাধীনতা অধিকার
ইসারায় সারে জনৈক হিটলার।
দুর্দিনে তাই ভরসা বা করি কার।
সস্তা বাটার জুতাও পাব না আর।

বুরিদানের গাধা বা পেটি বুর্জোয়া

জানে না কেহই বিষম এ যে কি ধাঁধা।
মনস্তত্ব বোঝে না কোনই মাথা।
দোটানায় কাবু কোন সে এমন গাধা
উনিশ শতকে গড়েছেন যে বিধাতা।

প্রাইভেট প্রপার্টি

ছেলেবেলা থেকে পিতার কাছেতে খালি
মন্ত্র নিয়েছি—কোথায় এবং কিসে।
সাফাই চুরির পাই কত হাততালি
দীন অভাজন কৃতজ্ঞ কুর্ণিশে।

ভ্রষ্ট লগ্ন

সেজেছি অঢের ইনানো বিনানো ছাঁদে।
এখনো সে হায় পড়বে না এই ফাঁদে।
হতাশ-পথিক পৃথিবীতে শুধু আমি
চিনি টাকা আর মানি অন্তর্যামী।

বড় সাহেব

" After much eating, drinking, speaking ill
Of others, here Timocreon lies still. '
সব নিভে গেছে। ঝোলাও পর্দা কালো।
আহা বাবুদের বাঁচে তবু একদিন।

নারদের ডায়েরী

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ডায়মণ্ডহারবার থেকে ধুরন্ধর গোয়েন্দা হাওয়ারা
ইতিমধ্যে ক'ল্‌কাতায়। এপ্রিলের চৌদ্দই চম্পট,—
প্রকাশ, তাদের ইচ্ছা। (এ-বিষয়ে নিরুত্তর তারা।)

হৃদয় সম্পর্কে হ'বু দম্পতির হিং-টিং-ছট্।
ফাল্গুনী সনাক্ত করে শিরোধার্য বৈমানিক পাড়া।
বাহান্ন হাতীর শুঁড়ে হাঁচিগ্রস্ত অহিংস শকট।

বাপুজি, দক্ষিণ করে আনো যুক্তরাষ্ট্রের মিঠাই।
সাঙ্গ প্রভু সত্যাগ্রহ ? একচ্ছত্রে বেজেছে বারোটা ?
শেষে কি নৈমিষারণ্যে পাবে আত্মগোপনের ঠাঁই ?

নিষিদ্ধ খনির গর্ভে লালকোর্তা সূর্যের বারতা !
ঈশ্বর ব্যক্তির টিকি পাবে নাকো নাস্তিক চড়াই।
আদালত সচ্চরিত্র। রেস্তোরাঁয় আড্ডা তাই ভোঁতা।
(বসন্ত কী আর্য, আহা ! এসপ্লানেডে আশ্চর্য জনতা।)

ম্যাল্‌-এ

বুদ্ধদেব বসু

(১)

'আপনারা কবে ? আমরা এসেছি সাতাশে।
ওক্‌ভিলে আছি। আসবেন একদিন।'
শাড়ির বাঁধনে শোভে শরীরের ইসারা,
ঠোঁটের গালের রঙের চমকে কী সাড়া !
কী করুণ, আহা, অতরুণ তনু সাজানো !
সবি বুঝলুম। ইচ্ছে হ'লে যে বাংলাও পারে বলতে
তাও বুঝলুম। মহৎ যত্নে অ্যাক্‌সেন্ট্‌গুলো মাজানো
ব্যর্থ কি হবে তাই ব'লে, বলো !
নিখুঁত বাংলা ফোটে ফিরঙ্গ রঙ্গে
ইংরিজি সুরে তির্যক গতিভঙ্গে।
আমরা চম্‌কে থম্‌কে দাঁড়াই, হয়তো বা কারো জুতোই মাড়াই,
বাংলা শুনেই সার্থক শ্রম চৌরাস্তায় সন্ধেবেলায় হাঁটলে।
ভাবি শুধু এই, অমনি সুরেই বেরোবে কি বুলি হঠাৎ চিমটি কাটলে।

(২)

আজকে না-হয় ম্যালেই চলো,
ভারি সুন্দর বিকেল—না ?
মিমির জন্যে কী খেলনা
কিনবে ? দোকানে গেলেই হ'লো।
তোমার নতুন কী চাই, বলো ?
কিছু চাইনে ? এমন মিথ্যে
কী ক'রে বললে ? কপট অঙ্ক
রটায় আমার কত কলঙ্ক,
তুমিও কি তাই শুনে ঘাবড়ালে ?

গণিকা গণিত লক্ষপতিকে
খোসামোদ করে ; পেয়ে বেগতিকে
আমাকে নিত্য করে নাজেহাল ;
কখনো একটু পিঠ চাপড়ালে
খুসি হ'য়ে উঠি—পানি পায় হাল।
এ ছাড়া আমার, বিশ্বাস করো, আর-কোনো দোষ নেই চরিত্রে।

(৩)

আজো কি মানবে গণিতের কড়া জুলুম
জাদুকর-রোদে এমন বিরল বিকেলবেলায় ?
হীন অঙ্কের মেনে দাসত্ব
হারাবো কি শেষে জীবনস্বত্ব;
বেঁচে থাকবার এই কি সর্ত ? তুমিই বলো !
সিঁদুরে শাড়িটা প'রে নাও তাড়াতাড়ি। ম্যালেই চলো
মলিন হিসেব ঋণের কুঁজও আজকে মিলায়
তুষার-তাঁবুর দড়ি-ছেঁড়া তিব্বতী এ-হাওয়ায়।
ভোলো প্রতিদিন-পুঞ্জিত ঋণ, ভোলো বেমালুম
জোড়াতালি-দেয়া ছেঁড়াখোঁড়া দিন।
কপাল ভালো,
খালি প'ড়ে আছে আস্ত বেঞ্চি।
ভোলো, ভয় ভোলো,
যে-ভয় জীবনে ফণিমনসার বন,
যে-ভয়ে নিত্য মেনে চলি মহাজন,
যে-ভয়ে কখনো গান্ধির কভু অরবিন্দের চরণ-শরণ,
ত্যাগের কন্থা যোগের পন্থা মানস-বরণ,
দিশি সিনেমায় ঋষি-মহিমায় ইচ্ছা-পূরণ,
সত্য, শিব ও সুন্দরে ঢাকি জীর্ণ জীবন, জীবনে-মরণ,
যে-ভয়ে নিত্য ব্যর্থ কর্ম, মিথ্যাচরণ,
কেননা জীবন কেবলি জীবনধারণ,
জীবিকাই হায় জীবন। আজ
-ভয় ভোলো।

দ্যাখো চেয়ে দ্যাখো পায়ের তলায় মেঘের মেলায় আলো মিলায়,
উত্তর-জোড়া তুষার চূড়ায় খেয়ালি বিকেল আগুন ছড়ায়,
ক্ষণিক রঙের বণিক সূর্য নিবলো এবার। হারালো তুষার-মোড়া উত্তর,
হারালো আকাশ হঠাৎ কুয়াশা লেগে, বারুদ-গন্ধী মেঘে।

ছায়ামুড়ি দিয়ে ছায়ামূর্তির মতো
জটিল জনতা প্রগল্‌ভ গতিশীল।
স্বৈরী মেঘের পূর্ণ স্বরাজ
দেখেই কি ওরা এমন দরাজ?
স্বেচ্ছাচারের উচ্চচূড়ার জঙ্গমতা
বঙ্গমাতার সন্তানেরাও আজ কি পেলো?
মেঘ-মুড়ি দিয়ে জ্বললো আলো,
ল্যামপোস্টগুলো পরেছে আলোর গোল টুপি,
ঠিক খৃষ্টান দেবদূত!
এসো কাছে এসো, শোনো কথা চুপি-চুপি।
এ কি নয় অদ্ভুত
তুমি আর আমি ব'সে আছি এই কুয়াশামোড়া
চৌরাস্তায়, মেঘের মধ্যে,
সব বেয়াদব চোখ মুছে গেছে এ-ঘন মেঘে—
এবার বলো!
এখনি হয়তো হঠাৎ-হাওয়ার আঘাত লেগে
মেঘ কেটে যাবে। কেটে যাবে এই গণিত-অতীত বিরল ক্ষণ।
এখনি বলো। ঐ তো এলো
নিষ্ঠুর হাওয়া মেঘের ঝাঁটা, কুয়াশা-কাটা!
আকাশ ফেটে কি ফুটলো তারা? লাগলো হাওয়ার তীব্র তাড়া?
এবার তাহ'লে ফিরেই চলো। আজো কি হ'লো
তোমার আমার অনেকদিনের অঙ্গীকারের উদ্‌যাপন!

উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস

হুমায়ুন কবির

ইয়েটস আজন্ম নিঃসঙ্গ। তাঁর কাব্যলোকে একেলা তাঁর বিহার, আপনার স্বপ্নকে কেন্দ্র করে সেখানে তিনি চিত্তের সান্ত্বনা রচনা করেছেন। তাই বাস্তব-জগতের ক্রূরতা এবং গ্লানি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি, সেই অপ্রিয় গুণ্ঠনের আড়ালে তিনি খুঁজেছেন শাশ্বত সত্য, দেখেছেন যে সত্যের সে ভাস্বর দীপ্তি সৌন্দর্য্যে গরীয়ান। কবির কল্পনা বিশ্বাসের ভিত্তি, এবং বিশ্বাসেই সত্যের চরম রূপ অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তাই একমাত্র কবিই সত্যদ্রষ্টা। কৈশোরে এবং যৌবনে তাই ইয়েটসের নিঃসঙ্গতার কঠিন সাধনা, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার সাধারণ ভঙ্গির মধ্যে তাঁর কল্পনার বৈশিষ্ট্য যাতে মিলিয়ে না যায়, তার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা। উনিশ শতকের শেষে বিজ্ঞানের যে বিজয় গৌরব, সৃষ্টির শেষ রহস্যটুকু ঘুচিয়ে দিয়ে সাধারণের জ্ঞানগোচর করার যে দম্ভ, তারই মধ্যে কল্পনাবিহারী ইয়েটসের নিঃসঙ্গ স্বপ্নবিলাস বিস্ময়কর। রহস্যের মধ্যে জীবনের সুরু, রহস্যে তার অবসান, এবং রহস্যের সেই গভীর ছায়া ইয়েটসের কল্পনার উপাদান। ইঙ্গিতে আভাসে যে রহস্যের আলোড়ন মানুষের মনকে দোলা দেয়, বিজ্ঞানের স্পষ্ট ভাষায় সে রহস্য প্রকাশের অবকাশ নেই, তাকে রূপ দিয়েই কবির কাব্য-সৃষ্টি সার্থক।

ইয়েটসের নিঃসঙ্গ অভিযানে অনেক প্রতিমাই তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে। নিঃসঙ্গতার চেয়ে বড় পরীক্ষা মানুষের নাই, নিঃসঙ্গতার ভয়ই মানুষের জীবনের ভয়। সাধারণ মানুষ তাই চায় সবার সঙ্গে এক সাথে থাকতে, চায় যে সবার ভাবনা হোক তার ভাবনা, তাদের চলার পথ হোক তারও চলার পথ। সে পথ ছেড়ে নিজের পথ খুঁজে নিতে যে চায়, তার হৃদয়ে চাই দুর্জ্জয় সাহস, চাই অদম্য শক্তি। ইয়েটসের সে দুর্জ্জয় সাহস, সে অদম্য শক্তি ছিল, তাই চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে তার মনে দ্বিধা আসেনি। কাব্যে মিথ্যাচারকে তিনি নির্ম্মম হস্তে আঘাত করেছেন, জাতিয়তাবাদের সংকীর্ণতা যখন কাব্যের সীমানাকে সঙ্কুচিত করতে এসেছে, তার বিরুদ্ধে করেছেন বিদ্রোহ। গণতন্ত্রের অত্যাচার, মানুষের দলগত অপবুদ্ধির অহঙ্কারের বিরুদ্ধে তিনি নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছেন,—বাক্যে, অভ্যাসে, স্বভাবে ঘোষণা করেছেন যে ব্যক্তির স্বপ্রতিষ্ঠাও সমানই সত্য। তার প্রচণ্ড

ব্যক্তিত্বের প্রকাশে তাই সাধারণ মানুষ তাকে কোনদিন আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারেনি, দূর থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা করেছে ; কাছে এসে আপনার বলে ভালবাসেনি।

অনাত্মীয় জীবনের নিঃসঙ্গতা কিন্তু কোনদিনই ইয়েটসের বাস্তববোধকে ব্যাহত করেনি। তাঁর স্বপ্নবিহারও তাই জাগ্রত সাধনা, অলস চিত্তের তন্দ্রাচ্ছন্নতা দিয়ে তাকে বোঝা যায় না। পৃথিবীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কবির মতন তারও ছিল প্রখর ব্যবসাবুদ্ধি, কিন্তু সে শক্তিকে অর্থকরী উদ্দেশ্যে প্রয়োগ না করে তাঁদেরই মত তিনিও সজ্ঞানে সৌন্দর্য্যচর্চ্চাকে করেছিলেন জীবনের সাধনা। কবির চিত্ত প্রত্যক্ষদর্শী, তাই বাস্তবের অনাবশ্যক জঞ্জালের পরিবর্ত্তে সত্যের মর্ম্মমণির প্রতিই তার ঝোঁক। ইয়েটসের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বও তাই নিঃসঙ্গতার মধ্যে পেয়েছিল জীবনের চরম সত্য। সে নিঃসঙ্গতায় নাস্তিকতা নাই, সমাজের সমস্ত সম্বন্ধকে স্বীকার করে তাদের অতিক্রমণই সে নিঃসঙ্গতার মর্ম্মকথা।

ইয়েটসের অসাধারণ প্রভাবের ভিত্তি প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজসম্বন্ধের সমন্বয়। এই সমন্বয়ের ইতিহাস কেবলমাত্র ইয়েটসের কাব্য সাধনারই ইতিহাস নয়, আইরিশ সাহিত্যের পরিণতির প্রতীক তারই মধ্যে মেলে।

উনিশ শতকের শেষাশেষি আয়র্ল্যাণ্ডের রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতা আয়রিশ সাহিত্যকেও নানাদিকে এবং নানাভাবে স্পর্শ করেছিল। রাজনৈতিক বিপ্লব এবং সংঘর্ষের মধ্যে যে সাহিত্যের উদ্ভব, বিদ্রোহে তার জন্ম বলে তার সজাগ এবং সজ্ঞান ধর্ম্ম নেতিমূলক না হয়ে পারে না। কিন্তু কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রূপ সৃষ্টি নাই, তাই সে সাহিত্যেও মানুষের চিত্ত আপনাকে সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করতে চায়। সাহিত্যের সে সাধনাকে তখন আর প্রতিক্রিয়ার নেতিবাদের মধ্যে আটকে রাখা চলে না, নতুন সত্যের রূপায়নে তার স্বভাব প্রতিষ্ঠা খোঁজে। সে-যুগের আইরিশ সাহিত্য তাই সজ্ঞানে ইংরাজি সাহিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রতীক মাত্র, কিন্তু বিদ্রোহ হিসাবে তাকে বিশ্বমানবের চিত্ত বরণ করে নেয়নি, রূপসৃষ্টিতে আপনার স্বধর্ম্মের সাধনায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল বলেই রসিকের কাছে তার আদর। আইরিশ চিত্তের এ রূপসাধনার সর্ব্বপ্রথম না হলেও সর্ব্বপ্রধান সাধক উয়িলিয়ম বাটলার ইয়েটস।

রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদ্রোহের সিদ্ধি স্বরাষ্ট্রে, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ রূপান্তরের পরিচয় স্পষ্ট। রাজনৈতিক প্রতিভা পরাধীনতার বন্ধনের মধ্যেও

স্বরাজের সন্ধান পায়, সাহিত্যিক প্রতিভা প্রতিক্রিয়ার নেতিবাদের মধ্যেই নতুন আস্তিকতার প্রতিষ্ঠা আনে। উনিশ শতকের শেষে এবং বর্ত্তমান শতকের সুরুতে আয়র্ল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসে দুঃখযামিনীর শেষ প্রহর। রাজনৈতিক আয়র্ল্যাণ্ড সেদিন বিধ্বস্ত, বিক্ষুব্ধ, তার সমাজ সংগঠনে প্রতিপদে ইংরাজের করচিহ্ন, এমন কি তার অর্দ্ধজাগরূক চিত্তও সম্পূর্ণভাবে ইংরেজের মায়ামন্ত্রে আচ্ছন্ন। দেহে এবং মনে, কাব্যে এবং ভাবে, চিন্তা এবং কল্পনায় সেদিন আয়রিশ চিত্ত নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ইংরেজের ছায়া মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ইংরেজের প্রতিধ্বনির মধ্যেই দেখেছিল নিজের সার্থকতা। ইংলণ্ডেও সেদিন যান্ত্রিকতার জয়জয়কার, আর্থিক সফলতা এবং সিদ্ধিতে মদমত্ত ইংরেজ সেদিন বস্তুবিলাসকে বাস্তবতার পরাকাষ্ঠা মনে করে আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ। তারই বিরুদ্ধে তরুণ আয়রিশ চিত্তের বিদ্রোহ, তাকেই অস্বীকার করে আয়র্ল্যাণ্ডের ইতিহাসের পুনপ্রতিষ্ঠার সাধনা। ইংরেজের গর্ব্ব, ইংরেজের সাফল্যকে অতিক্রম করে আয়রিশ ইতিহাসের পুনরুজ্জীবনে আয়রিশ তরুণ মুক্তির ইসারা পেয়েছিল, বুঝেছিল যে আপনার বিস্মৃত এবং অবহেলিত অতীতকে কল্পনার মায়ামন্ত্রে পুনপ্রতিষ্ঠিত করেই আয়রিশ চিত্তের কল্যাণ।

বিদ্রোহে তাই আইরিশ সাহিত্যের নতুন যুগের সূচনা এবং সে বিদ্রোহের প্রাণমন্ত্র অবিমিশ্র রোমান্তিকবাদ। পুরাতন আয়র্ল্যাণ্ডের কাহিনী ও রূপকথা, স্বপ্নবিলাস এবং অভিলাষ ঘিরে যে গুঞ্জরণ, তার মধ্যে বিদ্রোহের সঙ্গে মিশেছিল আত্মবঞ্চনা এবং পলায়ন মনোবৃত্তি। বর্ত্তমান এবং ঐতিহাসিক অতীতের যত পরাজয়, যত গ্লানি ও লজ্জা সমস্তকেই অস্বীকার করে তাই আয়রিশ চিত্ত গৌরবময় অতীত এবং উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে লাগল, ইংরেজের সঙ্গে যে তার কোনদিন কোন বিষয়ে কোনখানে কোন সম্বন্ধ ঘটেছিল, সেকথা ভুলে সর্ব্বতোভাবে অমিশ্র আইরিশিকতাকেই করে তুলল আপনার বীজমন্ত্র। জাতিয়তাবাদ প্রবল হয়ে উঠলে এ ধরণের রোমান্তিকতার আবির্ভাব এবং যথেচ্ছ বিকাশ অনিবার্য্য, তাই আইরিশ সাহিত্যেরও আরম্ভ রোমান্তিক বিদ্রোহে, এবং অনেক সাহিত্যিকের সাধনা বিদ্রোহের যুদ্ধ ঘোষণাই রয়ে গেল।

সাহিত্যই হোক আর রাজনীতিই হোক, কেবলমাত্র বিদ্রোহে প্রতিভার তৃপ্তি নাই। ইয়েটসের সাহিত্য সাধনাও তাই প্রথম থেকেই ধ্বংসের চেয়ে সৃজনকে মহত্তর বলে জেনেছিল, রোমান্তিক বিদ্রোহের ভিত্তির উপর গেঁথেছিল নতুন রূপসৃষ্টির প্রেরণা। তাঁর জাতিয়তাবাদেও তাই সংকীর্ণতার কোন ছোঁওয়া

লাগেনি। প্রথম থেকেই তিনি বুঝেছিলেন যে কেবলমাত্র নিজের মধ্যে বদ্ধ কোন জাতি কোনদিন বড় হ'তে পারেনি, সমগ্র বিশ্বইতিহাসের সমস্ত মানবচিত্তের ঐশ্বর্য্যকে নিজস্ব করে নিয়েই জাতির গৌরব। ইয়েটসের যৌবনের লেখাতেও তাই একথা পরিস্ফুট, বারে বারে সহকর্ম্মীদের তিনি তাই বলেছেন যে নেবার যার শক্তি আছে, গ্রহণে তার কোন গ্লানি নেই। এলিজাবেথের যুগের ইংরেজ যা পেয়েছে তাই দুহাতে লুটে নিয়েছে, কিন্তু নিতে পেরেছিল বলেই আজও সে যুগ ইতিহাসের গৌরবের যুগ। ইয়েটসের রোমান্তিকবাদে বিদ্রোহ তাই শেষ কথা নয়,—স্থান-কাল-দেশ-সভ্যতা নির্বিবশেষে তাঁর সৌন্দর্য্যের মাপকাঠিতে যেখানে যা ধরা পড়েছে, তাকেই তিনি নিজের সাহিত্যে গ্রহণ করেছেন।

অভিজ্ঞতার এই পূর্ণতাবোধের উপরেই ইয়েটসের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের ভিত্তি। সে বোধ এত প্রবল বলেই তাঁর চোখে কিছুই তুচ্ছ বা নগণ্য নয়, অন্য লোকে যা এড়িয়ে যায়, মুহূর্ত্তিক বিভ্রম বা ব্যতিক্রম বলে ভুলতে চেষ্টা করে, তাকেও সন্তর্পণে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ইয়েটসের তীব্র সাধনা। পার্থিব অমরতার মধ্যে লোকে কবির ত্রিকালজয়ী পরিচয় খোঁজে, কিন্তু সে সন্ধান কোনদিন সার্থক হ'তে পারে না। মহাকবিকেও ভবিষ্যৎ বিজয় নিয়ে তুষ্ট থাকতে হয়, রবীন্দ্রনাথ বা ইয়েটসের মতন বর্ত্তমানও যাদের ভাগ্যে জোটে, তাদের সংখ্যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। কিন্তু আর এক অর্থে ইয়েটসের কাব্যসাধনা প্রকৃতপক্ষেই ত্রিকালজয়ী, কারণ মুহূর্ত্তের সঙ্গে মুহূর্ত্তকে গেঁথে কালস্রোতের যে অভিজ্ঞতা, সেই মুহূর্ত্তকে এমন করে অবিনশ্বর করতে বর্ত্তমান কালে আর কেউ পেরেছেন কিনা সন্দেহ। চকিত চোখের দৃষ্টি, হঠাৎ শোনা কথার গুঞ্জন, সমুদ্রতরঙ্গে আলোর হঠাৎ দীপ্তি, পুরোনো গানের রেশ,—তার মনে নতুন নতুন প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে, ভঙ্গুর নশ্বর অভিজ্ঞতা রূপসৃষ্টির মধ্যে অমর হয়ে উঠেছে।

সমগ্রতার এ তীব্র অনুভূতি না থাকলে সাহিত্য জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে। রোমান্তিক সাহিত্যের সৌন্দর্য্যের প্লাবনের মধ্যে অপূর্ণতার সম্ভাবনা তাই স্বভাবতই নিহিত। প্রাত্যহিক এবং পরিচিত জগতকে অতিক্রম করে যে সাহিত্য অপরূপ মায়ালোকের সন্ধানে উন্মুখ, সেই একাগ্রতার ফলেই সে সাহিত্য একমুখীন ও একদেশদর্শী হতে বাধ্য। বাস্তবকে লঙ্ঘন করে রোমান্তিক সাহিত্য কল্পনার জগতে আকাঙ্ক্ষার সিদ্ধি খোঁজে, কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করবার প্রয়াসে কালে তার সত্যবিচ্যুতি অনিবার্য্য। সম্পূর্ণতাই সাহিত্যের প্রাণ এবং জীবনের সত্যপ্রকাশ করেই সাহিত্য সম্পূর্ণ। তাই রোমান্তিক সাহিত্যের

কল্পনাবিলাস কালক্রমে জীবনের সত্যবিমুখ হয়ে পড়ে,* এবং সে বিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তার সাহিত্যধর্ম্মের হানিও অবশ্যম্ভাবী। অপরূপ সৌন্দর্য্য-অনুভূতির সূক্ষ্মতা এবং আবেগের তীব্রতা সত্বেও তখন সে সাহিত্য প্রাণহীন হয়ে পড়ে। মানুষের চিত্ত সে সাহিত্যকে আদর করতে পারে, তার স্বপ্নমদিরার নেশায় আত্মবিস্মৃতি খুঁজতে পারে, কিন্তু সে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে স্থায়ী আবাস রচনার কথা ভাবে না, তার অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের মাদকতার মধ্যে আত্মার তৃপ্তি খুঁজে পায় না। সেইজন্যই রোমান্টিক সাহিত্যে সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশেই চিত্তবৃত্তির প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার মুমূর্ষতার সূচনাও লুক্কায়িত।

আইরিশ সাহিত্যের বেলাও ঠিক তাই হয়েছে। ইয়েটসের মতন সাহিত্যিক প্রতিভার রচনায় এ দৌর্ব্বল্য রূপসৃষ্টিকে ব্যাহত করতে পারেনি, কিন্তু জাতিয়তা-বাদী রোমান্টিক আয়রিশ লেখকদের অধিকাংশের মধ্যেই এ দুর্ব্বলতা আত্মপ্রকাশ করেছে, রোমান্টিকবাদ বিশ্বাসের বদলে অভ্যাসের স্তরে নেমে এসেছে। রূপসৃষ্টির সাধনা নতুনত্বের মোহে চাপা পড়ায় তাঁদের হাতে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে, বহুক্ষেত্রেই তার প্রকাশভঙ্গীতে চিত্ত চমৎকৃত হয় বটে কিন্তু সৌন্দর্য্যের সন্ধান পায় না, ক্বচিৎ সৌন্দর্য্যের সন্ধান পেলেও সে সৌন্দর্য্যের ক্ষণভঙ্গুর দীপ্তিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। জর্জ্জ রাসেল (এ-ই) আয়রিশ সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল, কিন্তু ইয়েটসের সঙ্গে তাঁর রচনার তুলনা করলে রোমান্টিক সাহিত্যের এ স্বভাব-দৌর্ব্বল্যের কারণের সন্ধান মেলে। মানবচিত্তের গভীরতায় মুহূর্ত্তের জন্য যে বিশ্বাতীত জ্যোতি ফুটে উঠে, সেই অবিনশ্বর মুহূর্ত্তকে কাব্যলোকে বন্দী করেছেন বলে এ-ই'র অনেক রচনাই ভাস্বর। সে সমস্ত রচনা চিত্তকে বিস্ময়ে আপ্লুত করে, অন্তরের গভীরতম কন্দরে প্রতিধ্বনি জাগায়। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই তারা বন্দী, তাই এ-ই'র কাব্যগগনে আত্মকেন্দ্রিক নক্ষত্রের দীপ্তি বিচ্ছিন্ন, তাদের পরিসর অল্প। আপনার মধ্যে পরিপূর্ণ হয়েও তাদের আলোকে সূর্য্যালোকের বিপুল প্রসার ও দীপ্তির কোন আভাস মেলে না।

সংকীর্ণ অভিজ্ঞতা যতই গভীর হোক না কেন, তার ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে মানবজীবনের অনন্ত বৈচিত্র্যের স্থান মেলে না। তাই কেবলমাত্র মুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতার মধ্যে বদ্ধ থাকলে অবশেষে হৃদয় অবসন্ন হয়ে পড়ে, জীবনের নিষ্ঠুরতা ও কঠিনতা, তার নির্ম্মম প্রবাহের প্রবলতার জন্য তৃষাতুর হয়ে উঠে। এ-ই'র রচনার অপার্থিব সৌন্দর্য্যের মধ্যেও চিত্ত তাই ক্লান্ত হয়ে পড়তে চায়। শেষ জীবনে এ-ই নিজেও বোধ হয় সেই অবিমিশ্র সৌন্দর্য্যের কারাপ্রাচীরের বাইরে আসবার জন্য ব্যগ্র হয়ে

উঠেছিলেন। অভিজ্ঞতার অমর মুহূর্ত্তগুলিকে কাব্যের সূত্রে গাঁথবার সাধনার বদলে তিনি তখন চেয়েছিলেন জীবনের প্রসার ও বৈচিত্র্যকে তাঁর কাব্যসাধনায় মূর্ত্ত করে তুলতে। পরাজয় ও তার গ্লানি, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় জীবনের নবীন ঔজ্জ্বল্য কেমন করে দিনে দিনে ম্লান হয়ে আসে, তরুণ দিনের অখণ্ড আদর্শ অভ্যাসের জড়তায় প্রাণহীন হয়ে পড়ে—তারই মধ্যে মানুষের জীবনের ইতিহাসের চিরপরিণতি। নরনারীর প্রেম কেবলমাত্র প্রীতিপ্রদ এবং সুখদায়ক নয়, প্রেমের অবসানে চিত্তে বিক্ষোভ এবং আত্মদ্রোহ জাগে, সন্দেহের তীব্র জ্বালা এবং ঈর্ষার বিষে হৃদয় তিলে তিলে জ্বলে যায়—জীবনের এ অন্ধকার দিককে অস্বীকার করবার উপায় কই? শেষ বয়সে এ-ই তাই নিছক সৌন্দর্য্যপ্রীতির মধ্যে তৃপ্তি পাননি, তাঁর কাব্যরাণী অতীন্দ্রিয় জগতের মায়াসৌন্দর্য্যের বেড়া পার হয়ে আমাদের পরিচিত পৃথিবীর আলো-অন্ধকার-হাসি-কান্নার প্রাঙ্গণে এসে মানুষীর বেশে দাঁড়িয়েছিল।

ইয়েটসের কাব্যসাধনায় এ রূপান্তরের কোন প্রয়োজন হয়নি। তাঁর রচনায় কল্পনাবিলাসের চূড়ান্ত প্রকাশও অন্তর্নিহিত জীবনশক্তির প্রাবল্যে সজীব। তাঁর কাব্যসৃষ্টি তাই কোনদিনই ক্ষীণজীবী হয়নি, রোমান্তিক সাহিত্যের সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্য্যের মধ্যেও তাঁর চিত্তবৃত্তির প্রবলতা সুস্পষ্ট। রোমান্তিকবাদ তাই ইয়েটসের পক্ষে কাব্যবিলাস মাত্র নহে, তার কাব্য রচনায় তাই স্বধর্ম্ম। তাই প্রথমদিন থেকেই স্থান-কাল-দেশ নির্ব্বিশেষে সৌন্দর্য্যের সন্ধানে তাঁর কাব্যের অভিযান। কাব্যসৃষ্টির প্রেরণায় তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মবিলোপ করেছেন, তাঁর নিজের ব্যক্তিগত প্রয়াস বা লক্ষ্য প্রকাশের জন্য কাব্যপ্রবাহকে ব্যাহত করেননি। বিদ্যা এবং বুদ্ধি, সজ্ঞান অভিজ্ঞতা ও সজাগ চিন্তা তাঁর কাব্যের মসলা যুগিয়েছে, কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের তো কথাই নাই, জাতিয়তাবাদের সংকীর্ণতাও তাঁকে আবদ্ধ রাখতে পারেনি, কাব্যের সত্যসাধনায় সমস্ত সংকীর্ণতার আহ্বানকে তিনি অবহেলা করেছেন।

আবেগ এবং বুদ্ধির সংহতি ইয়েটসের কাব্যসাধনার মূলসূত্র, এবং ঠিক সেই কারণেই তার কাব্যসাধনায় রূপান্তরের প্রয়োজন হয়নি। অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে যে, একদিকে কল্পনার জীবন এবং অন্যদিকে বাস্তব জগতের শিল্পবিজ্ঞান ও রাজনীতির সংঘর্ষ ইয়েটসের জীবনকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছিল। তাই প্রথম জীবনে আয়র্ল্যাণ্ডের প্রাগৈতিহাসিক ও কাল্পনিক ইতিহাসের প্রতি

তাঁর ঝোঁক, প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত বিভীষিকা ও সৌন্দর্য্যের জন্য তাঁর আকর্ষণ। আয়র্ল্যাণ্ডের কেলটিক গোধূলির অস্পষ্ট আলোক, চিহ্নহীন প্রান্তরের জলা বিল চোরাবালির শঙ্কাকুল আহ্বান, তারই মধ্যে ইয়েটসের কল্পনার উদ্দাম বিলাস। ব্যক্তিকেন্দ্রিক নিজের পৃথিবীতে তাঁর বাস, তার আশা আকাঙ্ক্ষা সুখদুঃখকে অমর শব্দসূত্রে গেঁথে তাঁর কাব্যের সার্থকতা। কিন্তু সেই কল্পনাবিলাসী দিনেও প্রকৃতির বিপুল আহ্বানকে তিনি স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, ব্যক্তিকে অতিক্রম করে সৃষ্টির যে মানস, তার সত্ত্বা-প্রকাশে দেখেছেন কাব্যের সার্থকতা। লোকাতীত সে জীবনের ইঙ্গিত আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তের কর্ম্মে সঞ্জীবিত বলেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, হাসিকান্নায় সুখদুঃখের মধ্যে হৃদয়ের গভীরতার অনন্ত সম্ভাবনা। চিন্তা দিয়ে তাকে প্রকাশ করা চলে না, কিন্তু চিন্তার অতীত যে ভাষা কাব্যে সাহিত্যে মূর্ত্ত, তার আহ্বানে হৃদয় সাড়া দেয়, লোকাতীত সেই মানসকে ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেও কার্য্যকরী করে তোলে।

তরুণ বয়সেই ফরাসী প্রতিবিম্ববাদীদের প্রভাবে ইয়েটস এ কথা বুঝেছিলেন যে বুদ্ধির যে প্রত্যয়, তার সীমানা নির্দ্দিষ্ট বলে তার আবেদনও সংকীর্ণ। প্রত্যয়ের বেলায়ই বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠে, তাই প্রত্যয়েব বদলে প্রতিবিম্বকে কাব্যের উপাদান করলে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বও মিটে যায়। স্বীকৃতি অস্বীকৃতি দর্শনবিজ্ঞানের গোড়ার কথা, কারণ প্রত্যয় নিয়েই দর্শনবিজ্ঞানের কারবার। কাব্যে যে প্রতিবিম্বের ব্যবহার, তার বেলা বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন অবান্তর, কিন্তু তারও সজীবতার জন্য প্রয়োজন গভীর আন্তরিকতা। এই গভীরতার সন্ধান ইয়েটস খুঁজেছিলেন জাতির সঞ্চিত স্মৃতিভাণ্ডারে। যে লোকাতীত মানস ব্যক্তির মধ্যেও কার্য্যকরী, তারই প্রকাশ রূপকথায়, কাহিনীতে, গানে, দেশ ও জাতির যুগযুগান্তের সৃষ্ট কল্পনার জগতে। যে গানের কথা ফুরিয়ে গেলেও রেশ কানে বাজতে থাকে, তারও উৎস মিলবে প্রতিবিম্বের এই গভীর আবেদনে। সে আবেদন জাগাতে পারলে আর বর্ণনার প্রয়োজন নেই, সামান্য একটু ইঙ্গিতে চিত্তের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে সৌন্দর্য্যের অপরূপ ছবি। ইয়েটসের এ যুগের চরমসৃষ্টি তাই. তাঁর হৃদয়ের অনুভূতিকে সাক্ষাৎভাবে আমাদের মনে সঞ্চারিত করে, ফলে আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার রঙে আমরা তাকে বিচিত্রভাবে রাঙিয়ে নিই, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংবেদনা বিশ্বমানবের আবেদনে ভরে ওঠে।

ইয়েটসের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার মধ্যেও তাই বাস্তববোধের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। আয়রিশ ইতিহাসের প্রভাব তাঁর কাব্যসাধনাকে যে রূপ দিয়েছিল, তার লক্ষণ

বিচার আমরা করেছি, দেখেছি যে তাঁর কাব্যপ্রতিভা নেতিমূলক বিদ্রোহকে রূপান্তর করেছিল স্বরাষ্ট্রে। সে স্বকীয়তা তাঁর কাব্যের ভাষার মধ্যেও সমান স্পষ্ট, কারণ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জাতীয় প্রতিভার সমন্বয়েই তাঁর কাব্যরীতির প্রাণ। ইংরাজি ভাষার কঠিনতাকে এমন করে তরল করে তুলতে আর কেউ পেরেছেন কিনা সন্দেহ। শেলির রচনার প্রাণ গতিচঞ্চলতা, আগুনের শিখার মতন তার দীপ্তি ও বর্ণবিকাশ। কিন্তু ইয়েটস ছন্দ মন্থরতার মধ্যেও এনেছে অপরূপ নমনীয়তা, নদীজলের অলস বিচরণের মতন অপার্থিব সঙ্গীত, আয়রিশ গোধূলির অনিশ্চয় মাধুরী।

স্বপ্নবিহারী, পৃথিবীর সঙ্গে সম্বন্ধরহিত ইয়েটস তাই কেবলমাত্র পরবর্ত্তীকালের সমালোচকদের সৃষ্টি। বস্তুতপক্ষে ইয়েটসের মতে বিচিত্র সম্বন্ধ ও প্রভাবের সমন্বয় করেই ব্যক্তিত্ব, তাই যার জীবনে যত বিভিন্ন ধরণের প্রভাব এসে মিলেছে, তাঁর ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদাও তত বেশী। এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজের কথা তিনি যা বলেছেন, তাঁর নিজের জীবনেও তার নিদর্শন মেলে। প্রতিবিম্ববাদ বিশ্বাস অবিশ্বাসের শৃঙ্খল থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল। রসেটী, মরিস প্রভৃতি ইংরেজ কবির প্রভাবে বর্ণ-বৈচিত্র্য ও বর্ণনা-সম্পদের দিকে এসেছিল তাঁর ঝোঁক। আয়রিশ গাথা ও লোকসাহিত্য তাঁর কল্পনাকে দিয়েছিল নবীন সজীবতা, ব্লেকের তীব্র সারল্য তাঁর রচনাকে করে তুলেছে প্রখর ও গভীর। বাস্তবের দিকে তাঁর যে ঝোঁক চিরদিনই ছিল, তার পরিণতি ও বৃদ্ধির মূলে কি সিঞ্জের প্রভাবের পরিচয় মেলে না ? কিন্তু সমস্ত প্রভাবকে তিনি করে নিয়েছিলেন নিজস্ব, তাই তাদের উদ্ভব যেখানেই হোক না কেন, ইয়েটসের কাব্যে তারা ইয়েটসেরই কল্পনার সৃষ্টি।

ইয়েটসের কাব্যজীবনকে যে দুইভাগে ভাগ করা হয়, তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেখা তাই ভুল। পঞ্চাশ বৎসরে প্রায় কবিরই আর নতুন কিছু বলবার থাকে না, এমন কি পুরোণো কথাও নতুন করে বলবার শক্তি তাদের শিথিল হয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথের মতন ইয়েটসও এ সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয়, কিন্তু তাই বলে পঞ্চাশোত্তর ইয়েটসকে নবীন বিপ্লবী বলাও চলে না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংবেদনার মধ্যেও তিনি বিশ্বমানবের আবেদনই দেখেছেন, সে-কথা আগেই বলেছি, তাই পঞ্চাশোত্তরে তাঁর কাব্যে যে পরিবর্ত্তন, তাকে রূপান্তর না বলে পরিণতি বলাই ঠিক। নতুন মানসিক কঠিনতার আভাস তাঁর এ নতুন রচনায় মেলে, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংযোগও স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠে। কেল্টিক গোধূলির মায়াবিলাসে যে অস্পষ্টতা, তার পরিবর্ত্তে প্রথম প্রভাতের নির্ম্মল আলোকের

ছোঁওয়ায় প্রথমে মনে হয় যে ইয়েটসের কবিপ্রকৃতির রূপ বুঝি একেবারেই বদলে গেছে, কিন্তু যাঁদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, তাঁরা সেই প্রদোষেও এ ভবিষ্যৎ পরিণতির আভাস পাবেন। তাই এ নতুন যুগে তাঁর কাব্যের পরিধি বৃহত্তর ও গভীরতর হয়ে এল, কিন্তু সে পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপ্রত্যাশিত বিস্ময় খুঁজে পাওয়া ভুল।

ইয়েটসের এ নতুন পরিণতির জন্য সিঞ্জ কতখানি দায়ী, সে কথার বিচার করবার আজও সময় আসেনি। আয়র্ল্যাণ্ডের রাজনৈতিক বিদ্রোহ ততদিনে স্বরাষ্ট্রের লক্ষ্যের সন্ধান পেয়েছে, অনেক আইরিশ দেশসেবকের মতে স্বরাট স্থাপনও তখন সিদ্ধ। তাই প্রথম যুগের বিদ্রোহী ইয়েটসের খানিক পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। বিদ্রোহের যুগে নিজের মনের মধ্যে স্বপ্ন রচনা করা চলে, কিন্তু স্বরাষ্ট্রের যুগে সেই স্বপ্নকে দিতে হবে রূপ, তাই তখন চাই কল্পনার সামাজিক অভিব্যক্তি। তাই এ পঞ্চাশোত্তর ইয়েটস বাস্তব জগতের বাসিন্দা এবং সে বিষয়ে সজাগ। সাধারণ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ অনিবার্য্য এবং গীতি ও নাট্য-রূপের মধ্যে এই সাধারণ অভিজ্ঞতার রূপায়নই তাঁর সাধনা। সাহিত্যে সৃষ্টি-কৌশল তাঁর পূর্ব্বের মতনই অব্যাহত, কিন্তু এবার সে সাহিত্যের উপাদানে প্রতিবিম্বের বদলে এল মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রতি ঝোঁক। ইয়েটসের পরবর্ত্তী রচনায় তাই প্রত্যয়ের নতুন সমাদর, নতুন মানসিক কঠিনতা ও শক্তি।

এ নতুন উপলব্ধিতে যে দুঃখের অনুভূতি সুখের চেয়ে তীব্র তার কারণও বোধ হয় খানিকটা আইরিশ ইতিহাসের মধ্যে মেলে। আইরিশ বিদ্রোহের অগ্নি পরীক্ষায় আইরিশ চিত্ত টলেনি, কিন্তু সন্ধির সম্ভাবনা যেদিন দেখা দিল, সেদিন এল আত্মদ্বন্দ্ব, আত্মদ্রোহ এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। মৃত্যুর মুখে যারা পাশাপাশি এসে নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছে, শান্তির সূচনায় তাদের মধ্যে এল নতুন আশঙ্কা এবং সন্দেহ। বন্ধু সেদিন বন্ধুকে আঘাত করেছে, আদর্শের সংঘাতের সঙ্গে মিশেছে লোভ এবং প্রলোভনের চাতুরী। আয়র্ল্যাণ্ডের সে দুর্দ্দিনে ইয়েটসের কবিচিত্ত যে বিদ্রোহ করেনি, নিরাশাবাদের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে দেয়নি, তাঁর চিত্তবৃত্তির প্রবলতার এত বড় প্রমাণ আর কি আছে? জীবনের বিপুলতা এবং অন্ধ নিয়তির অনিবার্য্য গতির অনুভূতিতে তাই তাঁর পরবর্ত্তী রচনা প্রাণবন্ত, কিন্তু সেই বিপুল দুঃখবোধ তাঁর কাব্যসাধনায় গভীরতাই এনেছে, দিকভ্রান্তি আনতে পারেনি। চক্রের আবর্ত্তনে নিস্পিষ্ট প্রজাপতির সমস্ত সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কালপ্রবাহের প্রগতিতে মানুষের প্রতিভা রূপ এবং মহত্ত্বের বিনাশও তেমনি সুনিশ্চিত। ট্র্যাজেডীর মর্মকথা দুঃখ নয়, সমস্ত প্রয়াসের

অনিবার্য্য অবসানেই জীবনের প্রকৃত ট্র্যাজেডী। অবিনশ্বর ও অনন্ত প্রেমের শপথে প্রণয়ের সুরু, কিন্তু প্রেমলাভের ভরসাটুকুতেও বিসর্জ্জন দিয়া আত্মার শান্তি।

মানুষের সীমাবদ্ধ চেষ্টার চারিদিকে যে বিপুল এবং অসীম শক্তিসমূহের লীলা, তারই আসন্ন অনুভূতিতে তাঁর পরবর্ত্তী রচনা ভারাক্রান্ত। নিয়তির দ্বন্দ্ব প্রকাশই তখন তাঁর কাব্যের লক্ষ্য, তাই তার নাট্যরূপেও ইয়েটস চরিত্র সৃষ্টির দিকে মনোযোগ দেননি। সে চরিত্রগুলিও তাই রক্তমাংসের মানুষ নয়, বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে যে সমস্ত অদৃশ্য শক্তির লীলা চলেছে, তারা তাদেরই প্রতীক মাত্র। কিন্তু এই প্রতীক-রূপের মধ্যেই তাঁর পূর্ব্বকার রচনার প্রতিবিম্ববাদের ইঙ্গিত সুনির্দ্দিষ্ট। কল্পনার অনুভূতি ও চিন্তার প্রত্যয়ের মধ্যে এ সামঞ্জস্য তাঁর পূর্ব্বাপর সমস্ত কাব্যসাধনাকেই প্রাণবন্ত করেছিল বলেই ইয়েটস ত্রিকালদর্শী।

I can see nothing plain ; all's mystery.
Yet sometimes there's a torch inside my head
That makes all clear, but when the light is gone
I have but images, analogies,
The mystic bread, the sacramental wine,
The red rose where the two shafts of the cross,
Body and soul, waking and sleep, death, life
Whatever meaning ancient allegorists
Have settled on, are mixed into one joy.
For what's the rose but that? miraculous cries,
Old stories about mystic marriages,
Impossible truths? But when the torch is lit
All that is impossible is certain,
I plunge in the abyss.

দ্বিতীয়া

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কে জান্‌তো অতুল আবার বিয়ে করবে! বন্ধু ও আত্মীয়দের অসংখ্য অনুরোধের উত্তরে যে শুধু ফিকে হেসে অন্য বিষয়ে কথা পাড়্‌তো, হঠাৎ যে তার কাছ থেকেই এ-খবর পাওয়া যা'বে, প্রথমে এ'কথা বিশ্বাসই করা যায় না। পৃথিবীতে কত আশ্চর্য্য ঘটনাই না ঘটে।

অতুল লিখেছে: কাকীমা, জয়পুরেই শুভকাজ শেষ হবে। এখান থেকে তোমার বৌমাকে নিয়ে সোজা ল্যান্সডাউন রোডে উঠ্‌বো। আমার বিশেষ ইচ্ছে বৌভাত ইত্যাদি যে-সমস্ত সামাজিকতা নিতান্তই আবশ্যক তোমাদের ওখানেই সুসম্পন্ন হয়। জানোই তো এ'বার আমোদ-আহ্লাদের জন্য এ'সব নয়, নিতান্তই কর্ত্তব্য বোধে······ইত্যাদি।

চিঠিটা পড়ে জয়া খুব খুসি।

পুরন্দরকে বল্‌ল, "হ্যাঁ গো, তারিখটা ছাখো দিকিনি ওরা কবে আস্‌বে। মাগো, আজকালকার ছেলেদের নিয়ে তো পারবার জো নেই। পাঁজি না হয় না-ই মান্‌বি বাপু, তবু এ'সব শুভকাজে গুরুজনদের খুসি করার জন্যেও অন্ততঃ···"

অতুলের রুগ্ন হাবা ছেলেটির কাছে গিয়ে সে বল্‌ল, "জানিস্ খোকোন, তোর নতুন মা আস্‌ছে যে!" জয়ার চোখ জলে ছল্‌ছল্ ক'রে উঠ্‌লো।

নির্ব্বোধ শিশু কিছু বুঝ্‌লো না; অবুঝ চোখে ফ্যাল্‌ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো।

জয়ার উৎসাহের সীমা নেই। অতুলের কাছে হয়তো কোনো রকম উৎসবই এবারে নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু আহা, যে মেয়েটি চেলি পরে নতমুখে এখানে এসে দাঁড়াবে তার জীবনে এই-ই তো প্রথম উৎসব। তা' ছাড়া সেই সব বিগত দিনের কথা স্মরণ ক'রে অতুলের মন সেদিন নিশ্চয়ই ভারী হ'য়ে উঠ্‌বে, হৈ-চৈ ও আনন্দ-কোলাহলের আবহাওয়ায় যতটা তাকে ভুলিয়ে রাখা যায়।

বাড়ীটা রীতিমতো সাজানো হয়েছে।

অনেক আত্মীয়-স্বজন এসেছে। আগামী কাল ভোরেই অতুল তার নব-বধূকে নিয়ে পৌঁছবে। মঙ্গল-ঘট থেকে সানাই পর্য্যন্ত কিছুরই অভাব নেই। তিন তলার সবচেয়ে ভালো ঘরটা ফুলশয্যার জন্যে নিখুঁতভাবে সাজানো হয়েছে। তার পাশের ঘরটিতেই নতুন বউ এসে সেদিন থাক্‌বে।

নারী-সুলভ কৌতূহলেরও জয়ার শেষ নেই! রাত্রে পুরন্দরকে বল্‌ল, "হ্যাঁ গো, তোমাকে যে মাইক্রোফোনের কথা বল্‌লুম, সেটা খেয়ালই নেই। কেমন? এতো তুমি ভুলে যাও। তোমাকে নিয়ে পারি না বাপু। মেয়েরা সবাই এসেছে। ঘরে বসে কি রকম মজা ক'রে আড়ি পাত্‌তুম বল দিকিনি!"

হেসে পুরন্দর বল্‌ল, "নতুন আর কি শুন্‌তে বল? আমাকে তুমি যা বলেছিলে, কিংবা বীণাকে অতুল যা বলেছিল, সেই পুরোণো কথাগুলোই নতুন ক'রে আবার শুন্‌তেঃ তোমাকে ভারি ভালোবাসি; কিংবা, বীণাকে কি আর সত্যিই ভালোবাস্‌তুম! কাকা-কাকীমা নেহাৎ জোর ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তো......" পুরন্দর অতুলের গলা নকল করতে চেষ্টা কর্‌ল। "মাইক্রো-ফোনের কথা ভুলে গিয়েছি; ভালোই হয়েছে।"

সকাল ছ'টাতেই অনেকগুলো মোটরকার আর ট্যাক্সী বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। সানাই উঠ্‌লো বেজে, মেয়েরা বাজালো শাঁখ। জয়া তুড়তুড় ক'রে একতলায় নেমে এলো। ভিড় ক'রে এলো মেয়েরা। পুরন্দর ষ্টেশনে গিয়েছিলো। সে নাম্‌লো মাঝের বড় গাড়ীটা থেকে আর সেই সঙ্গে প্রায় লাফিয়ে নাম্‌লো অতুল; দামী সুট্‌-পরা। সে গাড়ীতেই নতুন বউ রয়েছে। শাড়ীর ওপর ওভারকোট, গলায় সিল্কের মাফ্‌লার। জয়া ছুটে এলো, ওমা এই বউ! রঙ ময়লা, বয়েস বাইস-তেইসের কম নয়। রুক্ষ চুলগুলো খানিক এলোমেলো। কপালে চন্দন নেই; মুখে পাউডার, ঠোঁটে লিপ-ষ্টিক্‌, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ্‌। এ কেমন বউ!

অতুল খুসীতে টল্‌মল্‌ কর্‌ছে। "কাকীমা," জয়ার কাছে এসে সে বল্‌ল, "তোমাদের মেয়েলি কাণ্ডগুলো কিছু কমিও। কাল ওর একটু ঠাণ্ডা লেগেছে, জলে-টলে বেশীক্ষণ না দাঁড়ানোই ভালো। আর ট্রেণে তো এতোটুকু বিশ্রাম পায় নি। ছেলে-মানুষ, ঘুম-টুম একটু বেশী দরকার।"

জয়া প্রথমে একটু চম্‌কে উঠ্‌লো। সাম্‌লে নিলো পরক্ষণেই। "যা-যা, তোকে আর জ্যাঠামো কর্‌তে হবে না। কি বেশেই এসেছিস্‌। আজকের দিনে ধূতি পর্‌লে কি জাত যেতো? এখন গাঁটছড়া বাঁধি কি করে?" নব-বধূর

হাত ধরে সে বল্‌ল, "এসো বৌমা,……এই অতুল, নে আঁচলের এই খুঁটটা ধর।" অতুল একমুখ হেসে আঁচলটা ধর্‌লো : "আহা, দেখো-দেখো, হোঁচট্‌ খেয়ে পোড়ো না।"

শাঁখ বাজ্‌ছে, সানাই বাজ্‌ছে। দর্‌জা ধরে জয়ার বড় মেয়ে দাঁড়িয়ে। সেবারও সে দর্‌জা ধরেছিল।

"দোর-ধরণী কৈ ?……"

"কেরে, সান্নু ?…বেশ-বেশ, কটা নোট নিবি ?" মানি-ব্যাগটার ভেতর থেকে অনেকগুলো নোট অতুল বার কর্‌ল।

থতমত খেয়ে সান্নু একদিকে সরে গেল।

মেয়েরা উলু দিচ্ছে। দোতলায় বধূ-বরণের জায়গায় তারা এসে থাম্‌ল। সান্নুই তার বৌদির পা থেকে হাই-হিল জুতোটা খুলে দিল। এখানে দুধে-আল্‌তায় দাঁড়াতে হবে।

"কাকীমা, দেখো ওর শরীর ভালো নয়। সর্দ্দি হয়েছে। জলে-টলে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হলে আবার আমাকেই ভুগতে হবে।……কাকাবাবু, কাকাবাবু কোথায় গেলেন…দেখিয়ে দিন না কি ক'রে দাঁড়াতে হয়। এ-সব তো আপনাকেও আগে ভুগতে হয়েছে।" জয়া অবাক হ'ল। অতুল হঠাৎ এ রকম মুখর হ'ল কি ক'রে। কাকাকে ভুগতে হয়েছে, কিন্তু তাকেও কি হয়নি ?

এমন সময় গুটি পাঁচ-ছয় কুঁচোকুঁচো ছেলেমেয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে শান্তি এসে দাঁড়ালো। "আস্‌তে আমার কি দেরীই হ'ল গো! সেই কোন্‌ ভোরে উঠে, ঘর-দোর নিকিয়ে, রান্নার উজ্জুগ ক'রে, কত্তার চা ক'রে দিয়ে… আস্‌তে কি আর পারি কাকীমা!" শান্তি সত্যিই হাঁপাচ্ছে। কোলে মাস ছয়েকের শিশু। শীর্ণ তার দেহ, চোখের কোলে কালি, পরণে গরদের লালপেড়ে কোঁকড়ানো শাড়ী। তার দীপ্তিহীন চোখ আর শীর্ণ দেহ আজ যেন উৎসাহে হঠাৎ জ্বলজ্বল করছে। "কাকীমা, রিক্সো-ভাড়াটা পাঠিয়ে দাও না গো।" আবার একটু থেমে, "কৈ গো, আমাদের বৌ কোথায় গেল ?"

অতুল এতোক্ষণ অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে উঠ্‌ছিলো। কাকীমার যেমন কাণ্ড। অত ক'রে লেখা হ'ল শান্তিকে আজকের দিনে যেন খবর দেয়া না হয়, আর তাতেই কিনা…! না আছে এর কাণ্ডজ্ঞান, না আছে বুদ্ধিশুদ্ধি। পরে একদিন বৌকে নিয়ে না হয় নিজেই সে একবার দেখা ক'রে আস্‌তো। তবু আবহাওয়াকে লঘু করার জন্যে সে বল্‌ল, "তুই চশ্‌মা নে শান্তি। জ্বলজ্যান্তো

মানুষটা পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর তুই চারদিকে বৌ-বৌ বৌ-কৈ ক'রে অস্থির হয়ে উঠেছিস্ !"

এতোক্ষণে শান্তি নব-বধূকে আবিষ্কার করেছে। "ও, এই আমাদের বৌ গা !" একটু থেমে, "তা' কি করেই বা চিন্‌বো বল দাদা, না আছে মুখে চন্দন, না আছে লাল চেলি।" আর একটু থেমে একটু ইতস্ততঃ ক'রে, "···আমি ভেবেছিলুম আরো কচি হবে। বীণা যখন এসেছিল এর চেয়ে···"

শান্তি কথা শেষ কর্‌তে পার্‌লো না। অতুল তাড়া দিয়ে উঠ্‌লো, "কাকীমা, কতক্ষণ আর দাঁড় করিয়ে রাখ্‌বে ? না-ও না বাপু চট্ ক'রে। ঠাণ্ডা লাগ্‌লে তখন আমাকেই তো···"

"অমন কর্‌ছো কেনো দাদা", অনুযোগের সুরে শান্তি বল্‌ল, "ওতে যে অমঙ্গল হয় ! আজকের দিনে এ সব কর্‌তেই হবে। কোট-পেন্টুলুন পর্‌লেও তুমি তো আর সত্যি সায়েব হয়ে যাও নি।" তার কোলের ছেলেটা এমন সময় চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌লো। "আর পারিনে বাপু, এ এক ঝক্‌মারি। ···আহা, ষাট্-ষাট্, বেস্পোতিবার সক্কালে কি বল্‌লুম গো······" দ্রুতপদে শান্তি পাশের ঘরে চলে গেল।

বরণ শেষ হ'ল। ফর্‌সা কাপড়ের ওপর আল্‌তার গোলাপি ছাপ ফেলে নব-বধূ এগিয়ে গেল। শাঁখ বাজ্‌ছে, শানাই বাজ্‌ছে, মেয়েরা উলু দিচ্ছে।

"কাকীমা, এবার চায়ের বন্দোবস্ত কর দিকিনি। ওর আবার সকাল-সকাল চা না পেলে মাথা ধরে।" তেতলার ঘরে গিয়ে অতুল বল্‌ল।

চায়ের কথা জয়ার মনেই ছিল না। তাড়াতাড়ি সে বন্দোবস্ত কর্‌তে বেরিয়ে গেল। ঘরে অনেক ছেলেমেয়ের ভীড়। অতুল ধমক দিয়ে উঠ্‌ল, "এই তোরা গোলমাল করিস্ নে।" কয়েকজন কিশোরী মেয়ে, যারা নব-বধূর সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা কর্‌ছিল, অতুলের কথা শুনে মুখে কাপড় দিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল। কে একজন মুখরা কি একটা অস্পষ্ট টিপ্পনি কাট্‌লো। এমন সময় জয়া আবার ফিরে এলো, পেছনে শান্তি। আঁচলটা সে কোমরে জড়িয়েছে।

বৌয়ের কাছে গিয়ে নিতান্ত অন্তরঙ্গ সুরে সে জিগ্‌গেস কর্‌ল, "তোমার নাম কি ভাই ?"

"সুষমা।" এই বোধ হয় নব-বধূর প্রথম কথা।

"আমার দেওরের কোলের মেয়েটীর নামও সুষমা। কিন্তু ও নাম হ'লে হবে কি, ছিরি-ছাঁদ যদি একটু আছে !" শান্তি বল্‌ল।

"সব সময়ই কি আর নামের সঙ্গে মানুষটার মিল হয়। এই ধর না যেমন তোর নাম শান্তি, কিন্তু···" অতুলকে থামিয়ে জয়া বল্‌লে, "এই নে, তোর চা-টা ধর।"

ঘরের একমাত্র চেয়ারে ব'সে অতুল চায়ের পেয়ালায় চুমুক্ দিলো।

"তুমি নীচে যাও না দাদা," শান্তি অনেকটা শাসনের স্বরেই ব'লে চল্‌ল "তোমার সাম্‌নে বৌদি খাবে কি ক'রে?"

"কেনো, মুখ দিয়ে।" পেয়ালায় আর এক চুমুক দিয়ে অতুল বল্‌ল, "আজকাল আর সেকেলে লজ্জা আছে নাকি!"

"ওমা, সে কি কথা গো!" গালে হাত দিয়ে শান্তি সত্যিই অবাক্ হ'ল, "সেদিন নেই ব'লে কি বৌ-মানুষ প্রথম দিনেই বরের সঙ্গে ব'সে চা খাবে? এই তো ধর না, আমার যখন বিয়ে হ'ল। সে তো আর বেশীদিনের কথা নয় বাপু। আমাকে তখন কত কথাই শুন্‌তে হয়েছে। বরকে পান দিতে গেলে ননদ-শাশুড়ী হাঁ-হাঁ ক'রে উঠ্‌তো, বরকে······"

"কাকীমা, চায়ে মিষ্টি কম হয়েছে···," অতুল বল্‌ল।

"আর যে-দিন প্রথম শ্বশুরবাড়ী এলুম ননদ কি বল্‌লে জানো? বল্‌লে, সত্যি বল্‌চি ভাই, এ মাগীর জন্যেই তো আমার বৌদি মর্‌ল। সে না মর্‌লে তো আর এ আস্‌তো না······," শান্তি বলে চল্‌ল।

"এক গেলাস জল নিয়ে আয় দিকিনি।" শান্তিকে অতুল বল্‌ল।

"সে কি দাদা! চা খাবার পরেই জল খাবে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, শিগ্‌গীর যা।"

"জল আমি আন্‌চি। কিন্তু একটু পরে খেয়ো।" শান্তি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কোনো রকমে তা'কে ঘর থেকে অন্য কোথাও পাঠাতে পার্‌লে অতুল বাঁচে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো: এক হাতে জল অন্য কোলে তার ছোটো ছেলে। অতুলকে জল দিয়ে সুষমাকে সে বল্‌ল, "এই ভাই আমার ছোটো ছেলে। নাম রেখেছি বুধি, বুধবার হয়েছে কিনা। জানো, এখনো তো ছ'মাসও পুরো হয়নি কি রকম হামা দিয়ে বেড়ায়। কথাও বলে। আমার শ্বশুরবাড়ীর সাম্‌নের দিকটায় এক ময়রা ভাড়া আছে—আমাদের অবস্থাতো খুব ভালো নয়। সে ময়রার ঘরেই রাতদিন বুধি থাকে। সমস্ত ঘর গুড়ে চ্যাট্‌চ্যাট্ কর্‌ছে, তারা বাতাসা আর মুড়কি করে কিনা, তার ওপরেই বুধি হামা দিয়ে

বেড়ায়। ছুটি মুড়্‌কি মেঝেয় ছড়িয়ে দাও, ব্যাস্‌। আর ভাবনা নেই। যাই বল, ছেলেটা বেশ শান্ত।"

শান্তি তার কনিষ্ঠ পুত্রকে আদর কর্‌তে লাগ্‌ল।

এমন সময় তার তৃতীয়া কন্যা চোখ-মুখ ফুলিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এলো, "মা আমার বাঁ কানের মাকড়িটা কোথায় পড়ে গ্যাছে।"

"এ্যাঁ! বলিস্‌ কি রে? সোনার জিনিস্‌, বছর ঘুর্‌লো না,······" ছেলেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে শান্তি ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। "কোথায় কোথায় গিয়েছিলি মুখপুড়ি মেয়ে? কেবল ধিঙ্গিপনা! বাপকে এখন বল্‌বি কি? তোকে তো চাবুক পেটা কর্‌বে, আমারো কি দুর্গতি করে কে জানে।" শান্তির স্বরে স্পষ্ট ভয়ের আভাষ। মিনিট পোনেরো ধরে সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে হাঁপাতে-হাঁপাতে শান্তি আবার ওপরে এসে দাঁড়ালো। "সব্বোনাশ হয়েছে দাদা। এখন কি বলি! ও তো আর আমাকে আস্ত রাখ্‌বে না!"

"আঃ, অত ব্যস্ত হচ্ছিস ক্যানো? কত দাম আর হবে, বল্‌ না ছাই···,"

"সাতটাকা চোদ্দ আনা এক জোড়ার জন্যে লেগেছিল।"

"এই নে নোটটা রেখে দে। শিবনাথকে দিস্‌। সে আর একটা করিয়ে আন্‌বে।" অতুল একটা দশ-টাকার নোট বের ক'রে দিল।

ক্রমশঃ বেলা বেড়ে উঠ্‌ছে। "কাকীমা, ওর স্নানের জন্য গরম জলের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ো। ঠাণ্ডা লেগেছে। আবার না বাড়ে। আমি ততক্ষণে একটু কাজ সেরে আসি।" অতুল বেরিয়ে গেল।

"কৈ বৌদি, তুমি তো ভাই কথা বল্‌চো না!" শান্তি যেন একটু অনুযোগের সুরে বল্‌ল, "তা, নতুন বউ। একটু লজ্জা-টজ্জা কর্ব্বে বৈকি। তবে ভাই আমাদের তো আর লজ্জা কর্‌লে চল্‌বে না। আমাদের আস্‌তে হয় ভাঙ্গা সংসার জোড়া দিতে। আমরা তো আর বাড়ীর প্রথম বউ নই।···আমি যখন প্রথম শ্বশুর বাড়ী গেলুম, সেদিন বিকেল থেকেই কত্তার ও-পক্ষের কচি-কচি ছেলে দুটিকে আমাকেই দেখ্‌তে হতো। জানো ভাই, প্রথম দিন থেকেই আমাকে হাঁড়ি ঠেল্‌তে হয়েছে। অবশ্য আমাদের অবস্থা খারাপ, তাই। কিন্তু দাদা বড় চাক্‌রি করে, তার তো আর ও-সব বালাই নেই। তবুও নিজের সংসার তোমাকে নিজেরই গুছিয়ে নিতে হবে। ও-পক্ষের ছেলেটিকে তোমাকেই তো মানুষ কর্‌তে হবে।" একটু থেমে, "আহা, বাছা যেন ভালো হয়ে ওঠে। তুমি ভয় পেয়োনা বৌদি, এমন কিছু শক্ত ব্যামো নয়। কি রকম যেন হাবা ধরণের, মুখ দিয়ে নাল পড়ে

দাদার অনেক টাকা আছে কিনা তাই সায়েব ডাক্তারদের দেখায়। নইলে আমাদের সব ঘরে ওরকম কত আছে। বড় হ'লে সেরে যায়। সেরে যাবে বৈকি বৌদি, তুমি ভেবো না।"

স্নানাহারের পর সুষমাকে নিয়ে মেয়ের দল আবার ওপরে এলো। অতুলের কড়া আদেশ দুপুরে ঘুমুতে হবে। কেউ যেন না বিরক্ত করে। একে ট্রেণে ঠাণ্ডা লেগেছে, তার ওপর এই সব হাঙ্গামা। অনেক পরিশ্রম হয়েছে।

মেয়েরা অবশ্য ঠাট্টা ক'রে বলেছে, "আজ রাত্রে ফুলশয্যে কিনা!"

শান্তি তার সঙ্গে ওপরে এলো।

"তুমি ভাই ঘুমিয়ে নাও খানিক," শান্তি ব'লে চল্‌ল, "নইলে দাদা আবার রাগ করবে।"

"তুমি বোসো না। আমার ঘুম পায়নি।" সুষমা বল্‌ল।

শান্তি বস্‌ল। কিন্তু কথা না ব'লে সে থাকতে পারে না। "জানো, দাদা আমাকে নীচে নিয়ে গিয়ে বল্‌ল তার ও পক্ষের বউয়ের গল্প তোমার সঙ্গে যেন না করি।···হ্যাঁ ভাই, তাও আবার কেউ করে নাকি! তবে আমার যে ননদ, তার মত অমন ডাক-সাঁইটে মেয়ে তুমি আর দুটি পাবে না। আমি যখন নতুন বৌ হয়ে গেলুম, আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে কত কথা বল্‌তো। আগেকার বউয়ের চেয়ে আমি নাকি অনেক কুচ্ছিত, সে বউ ছিল লক্ষ্মী আমি তার প্যাঁচার যুগ্যিও নই, এ রকম কত সব কথা! তখন তো ছেলেমানুষ ছিলুম, তাই প্রথম প্রথম কত কাঁদ্‌তুম। পরে সব সয়ে যায় ভাই। এখন আর গায়েও লাগে না।" একটু থেমে খানিক কি ভেবে শান্তি বল্‌ল, "তা' ভাই, তুমি মনে দুঃখু পেয়ো না, আমাদের আগেকার বউ ছিল সত্যিই সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যেন, কি রূপ, কি গুণ! ছেলে হবার সময় মরে গেল; কত ডাক্তার এলো বদ্দী এলো। হুহু ক'রে টাকা বেরিয়ে গেল; কত কাটাকুটি করা হ'ল, কত সে-সব যন্ত্রপাতি। কিন্তু কেউ তাকে ঠেকাতে পার্‌লে না। হাতের নোয়া আর মাথার সিঁদূর নিয়ে ড্যাঙ্‌-ড্যাঙ্‌ ক'রে চলে গেল। কত ভাগ্যি থাকলে স্বামী-পুত্তুর রেখে ওরকম ক'রে যেতে পারে!—দাদা তো পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। আবার বিয়ে করার কথা বল্‌লে তো মার্‌তে আস্‌তো! তার ছবিকে চন্দন পরাণো, মালা পরাণো, কত কাণ্ডই কর্‌তো! তবে পুরুষরা ভাই, ওই এক জাত—তা'দের কাঁদতেও যতক্ষণ হাস্‌তেও ততক্ষণ। ভেতরে ভেতরে আদতে তারা ছেলেমানুষ। তখনকার দাদাকে দেখ্‌লে কে বল্‌তো দাদা আবার নিজেই দেখেশুনে বিয়ে করবে? এখন কি আর সে-বউয়ের কথা তার একটুও মনে আছে? দেখ্‌লে

না, তোমাকে নিয়েই এখন ও অস্থির : তোমার সর্দ্দি লেগেছে, যেন জলে না দাঁড় করানো হয়, চা না খেলে তোমার মাথা ধরে, কত কী! আমার ভাই এমন হাসি পাচ্ছিল ।"

বাইরে জয়ার গলা শোনা গেল, "শান্তি, শান্তি কোথায় রে ?"

"এই যে কাকীমা, বৌদির ঘরে।"

জয়া সেখানে এলো, "চল্ বাপু আমরা নীচে যাই। বউ এখন বিশ্রাম করুক। অতুল নইলে তো খেয়ে ফেল্‌বে।"

"বৌদি এখন ঘুমুবে না বল্‌লে, তাই একটু গপ্প কর্‌ছিলুম। আমাকে আবার বিকেল-বিকেল ফির্‌তে হবে কিনা। কত্তা আপিস্ থেকে আস্‌বে। তাকে চা খাবার ক'রে দিতে হবে। রাত্তিরের রান্নার উজ্জুগ কর্‌তে হবে—উনুন ধরানো থেকে মশ্‌লা পেশা সবি আমাকে কর্‌তে হয় কিনা। তাই ভাব্‌লুম এখন একটু গপ্প ক'রে নি। রাত্তিরে তোমরা তো আমোদ ক'রে আড়ি পাতবে, হুল্লোড় কর্‌বে ; তোমাদের অনেক সময়। কিন্তু আমি আর কখন সময় পাবো বল ?"

তবু আরো খানিক পরে শান্তিকে নেমে আস্‌তে হ'ল। তার কোলের ছেলেটা ভারি কান্নাকাটি লাগিয়েছে। সে না গেলে কিছুতেই থাম্‌বে না।

বিকেলের কিছু আগেই অতুল ফিরে এলো। জয়ার ঘরেই তার শান্তির সঙ্গে দেখা। ফিরে যাবার জন্যে সে প্রস্তুত হচ্ছিল। অতুলকে দেখে বল্‌ল, "এই যে দাদা, তোমার সঙ্গে আমার যে কতকগুলো দরকারি কথা ছিল। উনি ওঁর ছোটো ভাইয়ের কথা তোমাকে বল্‌তে বলেছেন। তোমার আপিসে তার যেন একটা চাকরি ক'রে দাও। তুমি যে বল্‌বে, না তা সম্ভব নয়, তা আমি শুন্‌বো না। এ তোমাকে ক'রে দিতে হবেই। আর তা' ছাড়া, এই শীতে ছেলেমেয়েগুলো ভারি কষ্ট পাচ্ছে। গরম জামা নেই। তা'দের একটা ক'রে গরম জামা যেন তুমি করিয়ে দাও। এই পুঁট্‌লিতে তা'দের জামার মাপ রয়েছে। উনি বলেছেন শ্বশুরবাড়ী থেকে লোকে কত পায়। শ্বশুর-শাশুড়ী নেই বলে কি উনি কিছুই পাবেন না ? তা' ছাড়া তুমি যখন মস্ত চাক্‌রি কর্‌ছো, তখন তোমার তো দেখাই উচিত।—অবশ্য তুমি জিনিসপত্তর যে দাও না তা নয়। সে তো আমি জানিই। তুমি কত দাও। তবু ওঁর মন ভেজে না।—তা' বাপু ওদের এই জামাগুলো করিয়েই না হয় দিয়ো।—আর হ্যাঁ, আমার পিস্‌শাশুড়ীর কাছে খবর পেয়েছি যে তাঁদের গাঁয়ের বটতলার শিবের কাছে হত্যে দিয়ে পড়্‌লে এমন

অসুখ নেই যা সারে না। তোমার ছেলের জন্যে একবার ছাখো না।" অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শান্তি অতুলের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

"হ্যাঃ, গণ্ডা-গণ্ডা সায়েব ডাক্তার পার্‌লো না সারাতে আর শিবঠাকুরের কাছে হত্যে দিয়ে পড়্‌লেই......"

"তা' বাপু, তোমার বিশ্বাস না থাকে তুমি না হয় কোরো না। আমি নিজেই এ'বার পূজোর সময় গাঁয়ে গিয়ে হত্যে দেবো। আমার মন বল্‌ছে এতে সার্‌বেই সার্‌বে...।" পোঁট্‌লাটা বেঁধে নিয়ে অতুলকে প্রণাম ক'রে শান্তি দাঁড়ালো। "চলি দাদা, বাড়ী ছেড়ে বেরুবার কি আর জো আছে।"

জয়া তাকে ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে দেবার জন্যে নীচে নেমে এলো। ছেলেমেয়েদের হাতে একটা ক'রে টাকা দিল, কয়েক হাঁড়ি মিষ্টি তুলে দিলো গাড়ীতে। জয়াকে প্রণাম ক'রে গাড়ীতে ওঠার সময় শান্তি বল্‌ল, "চলি কাকীমা। আবার একদিন সময় ক'রে আস্‌বো।—আমি ভেবেছিলুম বৌ আমাদের আরো ছোটো হবে, আরো সুন্দর হবে। কিন্তু, সুন্দরে আর কাজ নেই কাকীমা। আমাদের যা ভাগ্যি, বেঁচে থাক্‌লেই হ'ল।" গাড়ীতে উঠে জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আবার ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে সে বল্‌ল, "আর ছাখো কাকীমা, খোকোনকে এখন তুমিই যত্ন-টত্ন কোরো। নতুন বউ, তার হাতে ছেড়ে দিয়ো না। এখনো তো ওর ওপর বৌয়ের মায়া পড়েনি। তবে ক্রমশঃ পড়বে, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।"

জয়া ওপরে উঠে এলো। অতুলে, হাবা ছেলে জেগে উঠে কাঁদ্‌ছে। তার কশ বেয়ে অজস্র লালা ঝরে মাথার বালিশটা প্রায় ভিজে গিয়েছে। জয়া কোলে তুলে নিতেই সে চুপ কর্‌ল।

"বৌকে ছুপুরে ঘুমুতে দিয়েছিলে তো?" অতুল প্রশ্ন কর্‌ল।

"হ্যাঁরে, এখনো সে ঘুমুচ্ছে।"

"কাকীমা, এবারে তাকে জাগিয়ে দাও। বেশী বিকেল পর্য্যন্ত ঘুমুলে আবার মাথা ধর্‌বে।...আচ্ছা আমি-ই যাচ্ছি।...শান্তিটা কি রকম যেন বদ্‌লে গিয়েছে, না? কি রকম যেন বোকা হয়ে গিয়েছে?" দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে আবার সে বল্‌ল, "গরম জামাগুলো আবার পাঠাতে হবে। তোমাকে টাকা দিয়ে দেবো। তুমি পাঠিয়ে দিয়ো কাকীমা।...ওর বরটা একটা অমানুষ, এমন নির্লজ্জভাবে সব চেয়ে পাঠায়।" অতুল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যে হয়ে আস্‌ছে। এখুনি সব নিমন্ত্রিতেরা আস্‌তে স্থুরু কর্‌বে। অনেক কাজ। তবু জয়া অতুলের হাবা ছেলেকে কোলে নিয়ে খানিক চুপ ক'রে বসে রইলো।

তার নতুন মা এসেছে। জয়ার চোখ অকারণেই ছলছল ক'রে উঠ্‌লো। নির্ব্বোধ শিশু কিছু বুঝ্‌লো না ; অবুঝ চোখে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইলো।

ভারতের স্বর্ণ রপ্তানী

পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষ থেকে গত দশবছরে চারশো কোটি টাকার সোণা বিদেশে রপ্তানী হয়েছে। এই রপ্তানী সুরু হয় ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি; তখন থেকে এক বছরে যে সোণা রপ্তানী হয়েছে তার পরিমাণ তেমন বেশী নয়। কিন্তু ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে হঠাৎ রপ্তানীর পরিমাণ অতিমাত্রায় বেড়ে গেল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ নিয়মিতভাবে কোটি কোটি টাকার সোণা বিদেশে চালান হ'তে সুরু হোলো। রপ্তানী চরমে পৌঁছে ১৯৩২ সালে, তার পর থেকে সোণার চালান ক্রমশঃ কমতে লাগলো বটে, কিন্তু এতদিনেও একেবারে বন্ধ হয় নি।

এদেশ থেকে এইভাবে ক্রমাগত সোণা রপ্তানী হওয়ায় সকলেই বিস্মিত হয়েছে। বিস্ময়ের কথাই বটে! যে দেশ আবহমান কাল অবধি সোণা আমদানীই করেছে, সে দেশ থেকে দশবৎসর ধ'রে ক্রমাগত সোণা রপ্তানী হওয়া একেবারে অচিন্তনীয়। প্রায় দুহাজার বছর আগে রোমের ঐতিহাসিক প্লিনি ভারতবর্ষের স্বর্ণবুভুক্ষার কথা উল্লেখ করে গেছেন। আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে ইউরোপীয় বণিকেরা তাদের দেশ উজাড় ক'রে রাশি রাশি সোণা ভারতে চালান দিতো ব'লে, ইউরোপের বণিক ও ধনবিজ্ঞানীরা সেই যুগে অর্দ্ধশতাব্দী ধ'রে এতে ইউরোপের লাভ না লোকসান হচ্ছে এই নিয়ে পরস্পর তুমুল ঝগড়া করেছে। গত শতাব্দীতে নানা দেশে সোণার খনি আবিষ্কার হওয়ার পরে প্রতিবৎসর খনি থেকে যত সোণা পাওয়া গেছে, গড়ে তার প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ নিয়েছে এই একটি দেশ ভারতবর্ষ। অন্যান্য দেশে কোন বছরে বা কিছু সোণা আমদানী হোলো, কোন বছরে বা কিছু রপ্তানী হোলো, কিন্তু এদেশ থেকে সোণা রপ্তানী কদাচিৎ কখনো হয়েছে। এ যেন একটা অতল কূপে সোণা ফেলে দেওয়া, যা থেকে তা উদ্ধার করা অসম্ভব।

সেই অসম্ভব যে কি ক'রে সম্ভবপর হোলো তা' বুঝতে গেলে ১৯৩০ সাল থেকে পৃথিবীব্যাপী যে অর্থসঙ্কট সুরু হয় প্রথমেই তার কথা মনে করা উচিত। এই অর্থসঙ্কটের ফলে আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ সকল দেশেই কমে গিয়েছিল, তবে যে সব দেশ থেকে কাঁচা মাল রপ্তানী হয় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সব

চাইতে বেশী। ১৯২৯-৩০ সাল থেকে তিন বছরের মধ্যে ভারতের আমদানী-রপ্তানীর পরিমাণ অর্দ্ধেক হয়ে গিয়েছিল। ১৯২৯-৩০ সালে মোটামুটি ২৫০ কোটি টাকার পণ্য ভারতে আমদানী হয়, এবং মোটামুটি ৩১৯ কোটি টাকার পণ্য এদেশ থেকে রপ্তানী হয়; ১৯৩২-৩৩ সালে আমদানী হয় ১৩৫ কোটি টাকার এবং রপ্তানীও হয় ঠিক ঐ পরিমাণ, অর্থাৎ ১৩৫ কোটি টাকার। সুতরাং এই তিন বৎসরে আমদানী যতটা কমেছিল, রপ্তানী কমেছিল তার চাইতেও বেশী। এর ফল এই হ'ল যে আমদানীর চাইতে রপ্তানী বেশী হ'ত ব'লে এতদিন যাবৎ বিদেশের কাছে আমাদের প্রতিবৎসর যে টাকা পাওনা হোতো, এবং বিদেশীরা এদেশে সোণা চালান দিয়ে যে পাওনা শোধ দিতো, সেই পাওনাটা যেন একেবারে উবে গেল, কারণ আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ প্রায় সমান হ'য়ে গেল। আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ সমান হওয়ায় অবস্থা দাঁড়াল এই যে বিদেশীদের মোটের উপর ভারতের কাছে প্রতিবৎসর কিছু কিছু পাওনা আছে দেখা গেল, কারণ এদেশের কপালগুণে প্রতিবৎসর প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা বিদেশে পাঠাতে হয়। এই টাকাটা যায় বিদেশ থেকে যে টাকা এদেশে ধার করা হয়েছে তার সুদ মেটাতে এবং বিদেশীরা সরকারী চাকুরী, ব্যবসায় ইত্যাদিতে এদেশে যা রোজগার করে সেই টাকাটা বিদেশে পাঠাতে। ১৯৩১ সাল থেকে বিদেশের কাছে ভারতের এই দেনা মেটাতে হয়েছে সোণা চালান দিয়ে। ১৯৩১ সালের আগে ভারতের পণ্য রপ্তানী ক'রে, ভারতে আমদানী মালের দাম শোধ তো হতোই, তা ছাড়া এই ত্রিশ কোটি টাকার বাৎসরিক দেনাও মিটে গিয়ে বেশ কিছু এদেশের পাওনা হোতো। সুতরাং, সংক্ষেপে বলতে হ'লে বলা যায় যে ভারতের পণ্য রপ্তানী কমে যাওয়াটাই স্বর্ণ রপ্তানী হওয়ার কারণ।

পণ্য ও স্বর্ণ রপ্তানীর মধ্যে যে সম্বন্ধের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা দুদিক থেকে দেখা উচিত। আর এক দিক থেকে দেখলে, এও বলা চলে যে স্বর্ণ রপ্তানী হওয়াটাই পণ্য রপ্তানী কমে যাওয়ার কারণ। যদি এই হোতো যে সোণার আমদানী বা রপ্তানী বিশেষ কোন কারণে হচ্ছে না, তা' হ'লে বলা চলতো যে পণ্য বা মালের আমদানী রপ্তানীর উপরেই সব কিছু নির্ভর কচ্ছে। কিন্তু এদেশের দিক থেকে বিশেষ একটি কারণ ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে হঠাৎ দেখা দিল। সেই কারণটি সোণার দামের হঠাৎ বৃদ্ধি। সাধারণতঃ এদেশে সোণার বাজার দর ছিল একুশ টাকা থেকে বাইশ টাকা ভরি। হঠাৎ সেই দর চড়ে চব্বিশ টাকা দশ আনা হোলো, তা'র পরে প্রতি সপ্তাহে বেড়েই

চললো। ১৯৩২ সালের শেষ দিকে সোণার দর ছিল ভরি প্রতি ত্রিশ টাকারও উপরে, তার পরে আরও বেড়েছে, বর্ত্তমানে প্রায় সাঁইত্রিশ টাকার কাছাকাছি আছে। সোণার দাম এই ভাবে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় যাদের সঞ্চিত সোণা ছিল তারা যে সোণা বিক্রয় করবে এটা খুবই স্বাভাবিক। পণ্য রপ্তানী কমে যাওয়ায় দেশের আয় খুবই কমে গেল, গহনা তৈরী করা বা সঞ্চয় করার জন্য সোণা কেনা অনেকের পক্ষেই আর সম্ভবপর হ'ল না। আয় কমার দরুণ অনেকে বাধ্য হ'য়ে সঞ্চিত সোণা বিক্রয় করা সুরু করলো। তার উপরে সোণার দাম বাড়ায় যাদের অবস্থা তেমন খারাপ হয়নি, তারাও সঞ্চিত সোণা বিক্রয় করতে লাগলো। এর ফলেই সোণা রপ্তানী হয়েছে এবং চলছে। সোণার দাম যদি না বাড়তো তা হ'লে দুই এক বছরের মধ্যেই সোণা চালান বন্ধ হ'য়ে যেত, আমদানী পণ্যের পরিমাণ আরও কমতো, এবং উভয়দিক কমা সত্ত্বেও, আমদানীর তুলনায় রপ্তানী পণ্যের পরিমাণ বেশী হোতো।

সোণার দাম চড়ার প্রথম কারণ গ্রেটবৃটেনের স্বর্ণমান পরিত্যাগ। এর অর্থ এই যে নোটের পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোণা সর্ব্বদা দেওয়ার যে নিয়ম ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এতদিন পালন করতেন, তাঁরা ১৯৩১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর সেই নিয়ম তুলে দিলেন। গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে সোণা পাওয়া অসম্ভব হোলো, এবং বিলাতের বাজারে সোণার দর হঠাৎ চড়ে গেল। ভারতের টাকা ও বিলাতের নোটের বিনিময়ের হার এদেশের গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট ক'রে রেখেছেন, সুতরাং এদেশেও সোণার দর বেড়ে গেল। ইংরেজদের অনুকরণ ক'রে অন্যান্য অনেক দেশের গবর্ণমেণ্ট স্বর্ণমান ছেড়ে দিলেন। এর ফলে পৃথিবীব্যাপী গোলমাল সুরু হোলো। সর্ব্বত্রই লোকের মনে ভয় হোলো, সোণা বোধ হয় আর পাওয়া যাবেনা। যে সব দেশে সোণা কেউ সঞ্চয় করতো না, সে সব দেশেও সোণা জমান সুরু হোলো। সোণা সঞ্চয় করে ব'লে ভারতীয়দের এতদিন বিদেশীরা বিদ্রূপ করেছে, এখন তারাই সোণা সঞ্চয় করতে লাগলো। পৃথিবীব্যাপী স্বর্ণবুভুক্ষা উগ্রভাবে দেখা দিলো। এতেই সোণার দর ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। এর পরে অবশ্য আরও নানা কারণ ঘটেছে, কিন্তু গোড়ার কথা এইটাই।

যে কারণে এদেশ থেকে সোণা রপ্তানী হয়েছে তার ফলে অন্যান্য দেশ থেকেও সোণা রপ্তানী সুরু হয়েছিল। চীনের অবস্থা অনেকটা ভারতবর্ষের মতই, সুতরাং চীন থেকেও যথেষ্ট সোণা বিদেশে চালান হয়েছে, তবে ভারতবর্ষের তুলনায় তার পরিমাণ অতি সামান্য। ১৯৩২ সালে সারা পৃথিবীতে খনি থেকে যে পরিমাণ

সোণা পাওয়া গিয়েছিল, ভারতবর্ষ থেকে ঐ বৎসরে রপ্তানী সোণার পরিমাণ তার প্রায় অর্দ্ধেক, এবং চীন থেকে ঐ বৎসরে রপ্তানী সোণার পরিমাণ তার প্রায় কুড়ি ভাগের এক ভাগ। চীনে সঞ্চিত সোণা সামান্যই ছিল, কাজেই রপ্তানী তত বেশী হয়নি। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ থেকে ও কিছুদিনের জন্য সোণা রপ্তানী হয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে আপনা থেকেই রপ্তানী বন্ধ হয়ে যায়, কোথাও বা দেশের গবর্ণমেণ্ট আইন ক'রে সোণা রপ্তানী বন্ধ করেন। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও জাপানে ১৯৩১ সালেই আইন ক'রে সোণা রপ্তানী বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ মাসে গভর্ণমেণ্ট সোণা রপ্তানী নিষিদ্ধ করেন। এই সব দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের অবস্থার কিছু তফাৎ আছে। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়ায় সোণার খনি আছে, বিদেশে সোণা বিক্রয় করা তাদের জাতীয় ব্যবসায়। সুতরাং নিছক সোণা রপ্তানীতে তাদের ভয় পাবার কিছু নেই। তবুও তারা যে রপ্তানী বন্ধ করেছিল, তার কারণ এতে ঐ সব দেশের ব্যাঙ্কের অবস্থা হঠাৎ অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল, এবং সোণা রপ্তানী বন্ধ না করলে বহু ব্যাঙ্ক ফেল পড়তো ; বাস্তবিক অনেক ব্যাঙ্ক এ সত্ত্বেও ফেল পড়েছিল, বিশেষতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, কারণ লোকে ভয় পেয়ে একযোগে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা সুরু করেছিল। কিছুদিনের ভিতরেই এসব দেশে আংশিকভাবে অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে সোণা রপ্তানী করার অনুমতি পাওয়া গেল, এবং রপ্তানীও আবার আরম্ভ হোলো। ভারতবর্ষ থেকে সোণা রপ্তানী হওয়ায় এ দেশের ব্যাঙ্কগুলি বিপন্ন হয়নি, তবে দেশের অবস্থা খারাপ হওয়ায় কোন কোন ব্যাঙ্ক, বিশেষভাবে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি, বিপন্ন হয়েছিল। সোণা রপ্তানী বন্ধ করা হ'লেও তাদের অবস্থা ভাল হোতো না।

অবশ্য ভারতেও অনেকে সোণা রপ্তানী আইন ক'রে বন্ধ করার কথা বলেছেন। দিল্লীতে ব্যবস্থাপক সভায় এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং ভারতীয় বণিক সমাজের পক্ষ থেকে এই রপ্তানী বন্ধ করার জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে দাবী করা হয়েছে। এই দাবীর পক্ষে প্রধানতঃ তিন রকম যুক্তি দেখান হয়েছে। প্রথম যুক্তি, সোণা রপ্তানী ক'রে দেশ দরিদ্র হ'য়ে যাচ্ছে। বিশেষতঃ, বর্ত্তমানে সকল দেশই সোণা জমাবার চেষ্টা কচ্ছে, কারণ আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা খুবই সঙ্গীন। এ অবস্থায় দেশ থেকে সোণা রপ্তানী হ'তে দেওয়া অন্যায় ; আজ যে সোণা ছেড়ে দিচ্ছি, কাল তা চাইলে আর পাওয়া যাবেনা। দ্বিতীয় যুক্তি, এতে দেশজাত পণ্যের রপ্তানী কমে যাচ্ছে। বর্ত্তমানে আমদানী মালের দাম শোধ কচ্ছি সোণা এবং পণ্যদ্রব্য দু'ই রপ্তানী ক'রে,

যদি সোণা রপ্তানী বন্ধ করা যায়, তা' হ'লে হয় দেশী মালের রপ্তানী বাড়বে না হয় বিদেশী মালের আমদানী কমবে। সুতরাং দেশী মালের হয় স্বদেশে না হয় বিদেশে কাটতি বাড়বে, সম্ভবতঃ দু'দিকেই বাড়বে। তৃতীয় যুক্তি, সোণা রপ্তানী বন্ধ করলে বিলাতী টাকার দাম এদেশে বেড়ে যাবে। বর্ত্তমানে ভারতের এক টাকায় বিলাতের দেড় শিলিং পাওয়া যায়, সোণা রপ্তানী বন্ধ হ'লে তার চেয়ে কম পাওয়া যাবে, অর্থাৎ বিদেশীদের কাছে আমাদের টাকা এবং সেজন্য আমাদের পণ্যদ্রব্য খুব সস্তা হয়ে যাবে, সুতরাং ভারতীয় মালের রপ্তানী বাড়বে।

এই সকল যুক্তি সমীচীন ব'লে মনে হয় না। প্রথম যুক্তিটি নেওয়া যা'ক। বাস্তবিক কি এদেশের প্রায় সব সোণা বিদেশে চলে গেছে? হিসাব ক'রে দেখা যায় ১৮৯৩ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার সোণা আমদানী হয়েছে, এবং ১৯৩১ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রায় চারশো কোটি টাকার সোণা রপ্তানী হয়েছে, সুতরাং ১৮৯৩ সালের আগের সোণা আমদানী ছেড়ে দিলেও এখনও প্রচুর সোণা দেশে রয়েছে। তা ছাড়া কোনটা ভাল, সোণা জমিয়ে গয়না ক'রে বা সিন্দুকবন্দী ক'রে রাখা, না সোণার বদলে কলকজা কিনে তাই দিয়ে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করা? সোণা রপ্তানী ক'রে আমরা যে কলকজা আমদানী করছি এতে সারা দেশের দিক থেকে লোকসানটা কোথায়? যদি ধরা যায়, বিপদের দিনে কাজে লাগবে বলে সোণা জমিয়ে রাখা ভাল, তা হ'লে উত্তরে বলা চলে যে গত কয়েক বৎসর দেশের খুবই খারাপ অবস্থা গিয়েছে, সুতরাং সঞ্চিত সোণা রপ্তানী ক'রে তার সদ্ব্যবহারই করা হয়েছে। সোণা রপ্তানী বন্ধ ক'রে দিলে সঙ্গে সঙ্গে সোণার দাম কমে যেত। গরীবের এই দুর্দ্দিনে তাতে অসুবিধা বই সুবিধা কিছু হোতো না। সুতরাং একথা কিছুতেই বলা চলেনা যে সোণা রপ্তানী ক'রে দেশ দরিদ্র হ'য়ে গেল। বরঞ্চ সোণা রপ্তানী বন্ধ করলেই দেশ আরো দরিদ্র হোতো।

দ্বিতীয় যুক্তিটি যাঁরা তোলেন, তাঁরা এই কথাটা ভুলে যান যে দেশের রপ্তানী বাড়া কমা নির্ভর করে বিদেশের চাহিদার উপরে। সোণা চালান বন্ধ করলে সম্ভবতঃ এই হ'ত যে আমদানীর পরিমাণ কমে যেত। তাতে অবশ্য কোন কোন দেশী শিল্পের স্বদেশে কাটতি বাড়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ঐ সব শিল্পের উৎপন্ন মালের দাম নিশ্চয় বেড়ে যেত। সুতরাং বিদেশী মালের আমদানী যতটা কমতো দেশী মালের আমদানী ততটা বাড়তো না, এবং দাম বাড়ার জন্য সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ দরিদ্রের কষ্ট অনেক বেশী হ'ত।

তৃতীয় যুক্তিটিও মোটের উপর ঠিক নয়। তবে গত বৎসর অবস্থা এমন হয়েছিল যে সেই সময়ে সোণা রপ্তানী বন্ধ হ'লে বিলাতী টাকার দর এদেশে দেড় শিলিং রাখা সম্ভবপর হ'ত না। তার আগে অর্থাৎ ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত যে অবস্থা ছিল তাতে সোণা চালান বন্ধ করলে বিলাতী টাকার দাম বরঞ্চ বাড়তো, কারণ আমদানী মালের দাম শোধ করার জন্য এ দেশে বিলাতী টাকার চাহিদা খুবই বেড়ে যেত, সোণা চালান হচ্ছিল ব'লে সেই চাহিদা ততটা উগ্রভাবে দেখা দেয় নাই।

সুতরাং সোণা চালান ক'রে এদেশের যে মোটের উপর লাভই হয়েছে এ কথাটা অস্বীকার করা যায় না। আর কতদিন এভাবে চালান হ'তে থাকবে তা নির্ভর করে সারা পৃথিবীর আর্থিক অবস্থার উপর। গত দুই তিন বৎসরে সোণা রপ্তানী অনেকটা কমে গেছে। তবে বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা এমন ঘোরালো যে এ থেকে নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না যে অল্পদিনের ভিতরেই সোণা চালান বন্ধ হ'য়ে যাবে।

অনর্থক

প্রতিভা বসু

আমি একথা কখনোই বুঝিনি যে সমীর আমাকে ভালবাসে। বাপ ওর সবজজি ক'রে চুল পাকিয়েছেন, এসব বিষয়ে তাঁর শ্যেন-দৃষ্টি। মাঝে-মাঝে এ বাড়ি আসবার অপরাধে ছেলেকে লাঞ্ছিত করতেন শুনেছি। আমার বাবা মহাদেব—তাঁর মনে দুর্ব্বুদ্ধি নেই, একথা তাই মনে করেননি যে সমীরের সঙ্গে মেশামেশির ফলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। চরিত্র খারাপ হবার ভয়ে তিনি আমাকে চেপেও রাখেননি। অতিশয় সহজ মনের আনন্দ আমি স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, বন্ধুতা পাতিয়েছি এবং ছেলেবেলা থেকে মেলামেশায় বাধা না পেয়ে স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে অতটা সচেতনও হইনি।

সমীরকে ভাল লাগতো, সমীর এলে খুসী হতাম এবং যতক্ষণ সমীর থাকতো সময়টা কাটতো ভাল। ওর বিলেত-ফেরত দাদার কাছে ও নানারকম খেলা শিখেছিল, সে-সব খেলা আমাকে শেখাতো, আমি পাড়া থেকে ছেলে-মেয়ে সংগ্রহ ক'রে খেলার সঙ্গী করতাম। সবাই বলতো সমীর দেখতে সুন্দর, আমি বলতাম না। ও ফর্সা ছিল বটে, কিন্তু পুরুষমানুষ অত ফর্সা আমি পছন্দ করতাম না। ওর চোখ বড় বড় ছিল, কিন্তু আমি তাতে বুদ্ধির দীপ্তি দেখিনি। ওর হাত ছিল গোল গোল নরম আর ধব্‌ধবে ফর্সা। পুরুষমানুষের ঐ ননীর শরীর দেখলেই আমার মোটাবুদ্ধি রাখু গয়লাকে মনে পড়তো। একথা ব'লে আমি সমীরকে ঠাট্টা ক'রে রাখতাম না। সমীর ম্লানমুখে বলতো, 'আমার কিছুই কি তোমার ভাল লাগে না? আমার রং ফর্সা তার আমি কি করতে পারি, আমার হাত গোল তাতেই বা আমার কি হাত আছে, আমার চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধি খেলে না সেও বিধাতার অভিশাপ।' আমি ওর হাতের উপর হাত রেখে বলতাম, 'রাগ করলে?' তক্ষুনি লক্ষ্য করেছি ওর চোখে আলো জ্ব'লে উঠেছে—হাসিতে ভ'রে উঠেছে মুখখানা।

আমার বয়স যখন চোদ্দ তখনই আমার সমীরের সঙ্গে প্রথম দেখা। ও তখন সবে আই-এ পড়ছে। চোদ্দ বছরের মেয়ের মধ্যেই সাধারণত জোয়ার আসে, আমার এসেছিলো দেরিতে। অর্থাৎ ষোলো বছর বয়সে আমি প্রথম উন্মনা

হ'তে শিখলাম। ফাল্গুন মাসে আমার জন্ম, আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে সেবার যারা এলো তারা সবাই বল্‌ল, আমার আর আগের মত উদ্দাম আনন্দ নেই। ওরা বুঝল না আমার মনে এখন উদ্দাম বসন্ত নেমেছে। আর দেরিতে নেমেছিল ব'লে তার গভীরতা হয়তো একটু বেশী হ'য়েছিল। সেদিন আমি একজনকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সে যখন আমার কাছে পান চেয়েছিল তার চোখের দিকে চেয়ে বুক কেঁপে উঠেছিল। সমীর সেখানে ছিল—কি ভেবেছিলো জানি না হঠাৎ উঠে বাড়ি চ'লে গেল।

পরের দিন বিকেলে এলো না, তারপরের দিনও এলো না। আমার বাবার এক বন্ধু থাকেন ওদের পাড়ায়, বাবার সঙ্গে তাদের বাড়ি গিয়েছিলাম সেখান থেকে সমীরের খোঁজেও গেলাম তাদের বাড়ি। ওর সঙ্গে পরিচয় আমাদের আত্মীয়তার ছেঁড়ালতায়। আর পরিচয়ের পর থেকে এমন দিন যায়নি যেদিন বিকেলে সমীরকে আমাদের বাড়ি-ছাড়া কেউ দেখেছে। পারলে সে সমস্ত দিন থাকে, কিন্তু প্রশ্রয়ের অভাবে সে-ইচ্ছা ও চেপে রাখতো অতি কষ্টে। গিয়ে দেখ্‌লাম বাড়িতে কেউ নেই, অন্ধকার ঘরে সমীর কপালে হাত রেখে ডেক্-চেয়ারে শুয়ে আছে। আমাকে দেখে লাফিয়ে উঠলো। তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝছি ওর বুক তখন ধ্বক্‌ধ্বক্ ক'রে কাঁপছিল, হয়তো আমার কান থাকলে সে-স্পন্দন শোনা কিছুই কষ্ট হ'ত না। 'এ কি, তুমি এসেছ?' মুখে ওর রক্ত উঠে এসেছিলো বোধ হয়। দৌড়ে গিয়ে সুইচ্ টিপলো। আমি বললাম, 'তুমি যে যাও না?'

'এমনি।'

'এমনি মানে?'—আমি একটু রাগ ক'রে বললাম।

সমীর কোনো জবাব দিল না।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'পিসীমা কোথায়?'

'বিয়ের নেমন্তন্নে গেছেন।'

'তুমি গেলে না যে?'

'বিয়েতে যেতে আমার ভাল লাগে না।'

তারপর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌ল, 'অশোকের সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ?'

'ও, অশোক?' আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম, 'ও তো ছোটমামার বন্ধু, আমার সঙ্গে ঐ সেদিনই দেখা। ভারি চমৎকার কিন্তু।'

বিদ্রূপের স্বরে সমীর মুখে মুখে ব'লে উঠলো, 'তাই নাকি?'

ওর বিদ্রূপ বুঝতে পেরে একটু যেন বিরক্ত বোধ করলাম। অশোকের মুখ তখনো স্পষ্ট আমার মনে দাগ কেটে আছে। প্রথম দেখেছি, তাও হয়তো বড় জোর আধ ঘণ্টার দেখা। অথচ এ দু'দিন ক্রমাগত ওর প্রসঙ্গ উঠলে আমি যেন উত্তাল হ'য়ে উঠতাম। সমীরের কথার জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

'রাগ করলে নাকি?'—সমীর কোমল গলায় বললে।

'রাগ করব কেন?'

'কথা বলছ না যে?'

'এবার যাই—আর কি।'

'না, না, বোসো বোসো'—তারপর হঠাৎ একান্ত কাছে এসে বসলো—বল্‌ল, 'মণি', আমি বি.এ. পাশ ক'রে কলকাতা চ'লে যাবো।'

'বেশ তো, বেড়িয়ে আসবে।'

'না ভাই, বেড়াতে না—পড়তে।'

'কেন?'

'ভাল লাগছে না এখানে। পরীক্ষার আমার দেরী নেই বেশী—অথচ একটুও পড়ায় মন দিতে পারছিনে।'

ঠাট্টা ক'রে বল্লাম, 'প্রেমে পড়েছো নাকি?'

'হ্যাঁ।'

সমীর যে হ্যাঁ কথাটা উচ্চারণ করলো তার মধ্যে এতটুকু হাল্‌কা সুর ছিলো না। কথাটা যেন সত্যি ক'রেই বল্‌ল। আমি জানতাম সমীরের বাবা যখন খুলনা ছিলেন তখন ছোট্ট একটি মেয়েকে তাঁরা বৌ করবেন এরকম জল্পনা কল্পনা করতেন। সেখানকারই এক মুন্সেফের মেয়ে। হঠাৎ পাঁচ বছর পরে সেই মুন্সেফ যখন পেন্সন নিয়ে এসে ঢাকা বাড়ি ক'রে বসলেন তখন সমীরের মা কথাটা প্রায় পাকা ক'রে ফেলবার চেষ্টা করলেন। মেয়েটি তের বছরের। সমীরের মা বলেছিলেন কথা এখন ঠিক ক'রে রাখবো তারপর ছেলে এম্. এ. পাশ করলে বিয়ে দিয়ে বিলেত পাঠাবো। বিলেতের খরচাটি অবিশ্যি মুন্সেফবাবুই দেবেন।

সমীর একটু পরে আবার বল্‌ল, 'আচ্ছা মণি, অশোককে তোমার কেমন লাগলো? ব্রিলিয়েণ্ট ছেলে শুনেছি, কিন্তু দুর্নাম অনেক।'

ঠোঁট উল্টিয়ে বল্‌লাম, 'ভারি দুর্নাম, কেউ একটু মাথা তুললেই লোকেরা অমন বলতে থাকে—আমি ওসব মানি না।'

সমীর সে কথার জবাব দিল না, একটু চুপ কোরে থেকে বল্‌ল, 'আমি কলকাতা যাবার আগে তোমাদের বাড়ি আর যাব না ভেবেছি।'

'ভালই তো ভেবেছো।' আমি রাগ ক'রে মুখ ঘোরালাম।

সমীর মৃদুস্বরে বল্‌ল, 'তুমি তো তা হ'লে খুসীই হও।'

'তুমি তো দেখছি অন্তর্যামী।'

'আর কারো না হই, তোমার অন্তর্যামী অন্ততঃ।'

'তবে যেয়ো না।' আমি রাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালাম।

'পাগল নাকি'—সমীর আমার হাত টেনে বসালো। শুনতে পেলাম বাবার পায়ের শব্দ। জুতোর শব্দ করতে করতে উনি উঠে এসে বল্‌লেন, 'মণি—যাবি না?' সমীরকে জিজ্ঞেস করলেন 'তোমার মা কোথায়?' 'বিয়ে বাড়ি গেছেন, বসুন না একটু।' সমীর কাকুতি করতে লাগলো আর একটু বসবার জন্যে, কিন্তু বাবা আর বস্‌লেন না। চ'লে এলাম।

তারপরে ওর সঙ্গে আমার একমাস মাত্র আর ভাল ক'রে দেখাশোনা হয়েছিল। সত্যি সত্যিই ও বি. এ. পরীক্ষা হবার পরে কলকাতা চ'লে এলো পড়তে। আমার ভারি কষ্ট হয়েছিল ওর চ'লে আসবার দিন। আগের দিন সন্ধ্যেবেলা যখন বল্‌ল, 'কাল থেকে তোমাকে দেখবো না ভাবতে বড় কষ্ট হয়', আমার কান্না পেয়েছিল, ভাঙা গলায় বলেছিলাম, 'তুমি তো যাচ্ছ নতুন জায়গায়—আমি তো এখানেই থাকলাম—আমারই অভাবটা লাগবে বেশী।'

'তোমার কষ্ট হবে? আমার কথা তুমি ভাববে এরকম সময়?' কথাটার যেন জবাব শুনবে ব'লে উৎসুক হ'য়ে তাকিয়েও রইলো আমার মুখের দিকে। আমি চুপ ক'রে রইলাম।

তারপরে দেখা আমাদের পুরো এক বছর পরে। ওর বাবা মাও কলকাতা গিয়ে ছিলেন কিছু দিন। ছেলেকে লায়েক ক'রে দিয়ে শেষে হষ্টেলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এলেন এতদিনে। সমীরকে দেখে আমার লজ্জা করলো যেন। চমৎকার বাবু হয়েছে দেখলাম। চেহারাও বদ্‌লেছে কিছু। কথাবার্তায় দিব্যি সপ্রতিভ। আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে বল্‌ল, 'বাঃ, এতদিন পরে এলাম, প্রণাম করলে না?'

'ঈস্‌!'

'ঈস্‌ কি—আমি তো তোমার বড়'—ব'লেই আমার কাপড়ের আঁচল টেনে বসিয়ে দিলো। বললাম, 'কেমন আছ?'

'দেখ্ছোই তো—তুমি কেমন আছ ?'

'ভালই।'

'আমার চিঠির জবাব দাওনি যে ?'

'কী আর জবাব দেবো।'

'তা দেবে কেন—আমাকে মনেই থাকতো ভারি।'

'চিঠিটাই নাকি মনে রাখার নিদর্শন!'

'নিশ্চয়ই।'

'তবে এবার থেকে দেবো।'

তারপর এ-কথা সে-কথার পরে হঠাৎ বল্ল, 'তোমার অশোক রায়ের খবর কী ?'

বল্লাম, 'আমি কী জানি!' সত্যিই আমি জান্তাম না। সেই যে একদিন এসেছিলো—তারপর বড় জোর আর দু'দিন এসেছিলো কিনা সন্দেহ।

হেসে টিপ্পনি কেটে বল্ল, 'তোমার বন্ধুর খবর তুমি রাখো না, ভারি আশ্চর্য্য তো।'

টিপ্পনিটুকু আমার কোথায় যেন বাজলো। বললাম, 'বন্ধু হ'লে খুসী হতাম, কিন্তু বন্ধু না হ'য়েও একথা সবাই জানে যে অশোক রায় এবার এম্, এ-তে ফার্ষ্ট হয়েছে।'

সমীর গম্ভীর হ'য়ে রইল।

গ্রীষ্মের আড়াই মাস ছুটির মধ্যে দেড় মাসই প্রায় কলকাতায় কাবার ক'রে এসেছিল। দিনকুড়ি থেকে আবার চ'লে গেল। প্রথম প্রথম গিয়ে আমাকে চিঠি লিখ্তো কিন্তু ওর মাথায় কী যে এক অশোকের চিন্তা ঢুকেছিল—সব চিঠিতেই একটা রূঢ় মন্তব্য না ক'রে পারতো না। ফলে আমি জবাব দিতাম না, কাজে কাজেই সম্পর্কটা শিথিল হ'য়ে এলো। তাছাড়া একবার লিখলো মুন্সেফের মেয়েটিকে বিবাহ করবার জন্য পিড়াপিড়ি করায় মার সঙ্গে ও ঝগড়া কোরেছে। আমি অবাক হ'লাম, কিন্তু সত্যি-সত্যি তার পরে যে ও এলো সে একেবারে এম-এ পরীক্ষা শেষ ক'রে। বল্ল, বিলেত যাচ্ছে একমাসের মধ্যে। যাবার দিন আমাকে একটা ফাউন্টেন্ পেন্ উপহার দিয়ে বলেছিলো, 'চিঠি লিখো।' আমি সেদিন কেঁদেছিলাম। সমীরের জন্য নয়—একজন মানুষ অতদূরে চ'লে যাচ্ছে ভেবে। সমীর কী বুঝলো জানি না—আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বল্ল, 'তিনটি বছর আরো, আরো তিনটি বছর। আমি

এখনো সম্পূর্ণ মা-বাপের হাতের মুঠোয়; আমি এখনো নাবালক।' কথাটা বলতে বলতে ও উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। হঠাৎ পলকে যেন আমি ওর মনের কথাগুলো বুঝতে পেরে লাল হ'য়ে উঠলাম, কিন্তু কয়েকদিন পরেই তা আর মনে রইলো না।

এক বিকেলে বক্‌সিবাজার থেকে ফিরছিলাম ঘোড়ার গাড়ীতে। প্রত্যেক রবিবার আমার এক বন্ধুর বাড়ি আমার নিমন্ত্রণ থাকতো। বন্ধুটি আমার চেয়ে কম ক'রেও দশ বছরের বড়। নতুন ফিরেছেন বিলেত থেকে—তারপর কাজ নিয়ে এসেছেন মেয়েদের কলেজে। আমার সঙ্গে দেখা হবার কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা বয়সের অত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের বন্ধু হলাম। মাধুরীদি যে আমাকে কেবলমাত্র স্নেহ করতেন তা নয়, কেমন একটা বন্ধুতা হয়েছিল যার জন্য দু'জনে সমস্ত দিন একসঙ্গে কাটিয়েও আমরা বিরক্ত বোধ করতাম না। স্নেহাস্পদের সঙ্গে মানুষ কখনোই সমস্তদিন হাসি-গল্প ক'রে কাটাতে পারে না—কিন্তু আমরা একখাটে শুয়ে সমস্তটি দুপুর যে-রকম উচ্চস্বরে হেসেছি আর কথা বলেছি তাতে কেউ একথা মনে করতে পারেনি যে আমি মাধুরীদির অত ছোট, এবং সমস্ত দিক দিয়েই ছোট।

বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন। সমস্ত দিন পরে বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় একটু যেন থামলো। আমি মাধুরীদির চাপরাশি নিয়ে গাড়ি ক'রে ফিরছিলাম, কিন্তু একটু পরেই বৃষ্টি আবার ঘন হ'য়ে নামলো। ত্রস্তে জানালাটা টেনে দিতে গিয়েই পথে দেখলাম অশোক। কোঁচা লুটিয়ে সে ভিজতে ভিজতে চলেছে, হাতে ছাতা নেই। আদ্দির পাঞ্জাবি ভিজে ভিতরের শরীরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আমি নিমেষে গাড়ি থামাবার আদেশ করলাম, তারপর মুখ বাড়িয়ে ইসারায় তাকে ডাকলাম। গাড়ির দরজাটা ধ'রে মৃদু হেসে নমস্কার করলো। চেয়ে দেখলাম তার হাসির তুলনা নেই, তার চোখের তুলনা নেই। কুণ্ঠিতভাবে বললাম, 'গাড়িতে আসুন'—কথা কয়টার সুরে আমার মনের সমস্ত ইচ্ছা হয়তো জড়ানো ছিল। সে আপত্তি করলো না, ইতস্ততঃ করলো না—অত্যন্ত সহজে গাড়ির মধ্যে ঢুকে বল্‌ল, 'বাঁচালেন।' তারপর সমস্তটা পথ প্রায় চুপ ক'রেই কাটলো। অশোকদের বাড়ি পথে পড়ে না, আমি গাড়োয়ানকে ডেকে ওদের বাড়ির দিকে যাবার কথা বলতে যাচ্ছিলাম। অশোক বাধা দিয়ে বল্‌ল, 'ক্ষেপেছেন—আপনি একজন মহিলা, আপনাকে ফেলে আমি আগে নেমে যাবো? আপনাকেই আগে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি চলুন।'

হেসে ফেললাম—'বাঃ, আমিতো একাই যাচ্ছিলাম।'

'তা যাচ্ছিলেন—কিন্তু এখন যখন সঙ্গী জুটলো তখন তাকে এই সম্মানটুকু অন্তত দিন।'

কী বলবো, চুপ ক'রে রইলাম।

বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে সে সেই গাড়িতেই চ'লে গেল। অনেক ব'লেছিলাম, কিন্তু নামলো না, গাড়ি-ভাড়াও দিতে দিলে না। পরের দিন বিকেলের ডাকে ধন্যবাদ বহন ক'রে শুধু এইটুকু একলাইন চিঠি এলো।

জবাব দেবার কিছু নেই, তবু সমস্তদিন সে ইচ্ছার তাগিদে আমি উন্মনা হ'য়ে ঘুরে বেড়ালাম। চিঠির লাইন দু'টি একশোবার মনে মনে আবৃত্তি করলাম, তারপর সন্ধ্যার নির্জ্জন অবকাশে আবছা অন্ধকারে ব'সে ব'সে দেয়ালের গায়ে ইঁটের কণা দিয়ে লিখলাম, 'আমি তাকে ভালোবাসি'—কতবার লিখ্‌লাম তা জানি না—একবার, দু'বার, তিনবার, অসংখ্যবার একটার গায়ের উপর আর একটা লিখে চললাম।

এর ঠিক ছ'মাস পরে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। ছ'মাসের মধ্যে তিনমাস অশোক ঢাকা ছিল—আর সে তিনমাসেই আমরা পরস্পরকে সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছিলাম, এতটুকু মেকি বা ফাঁকি ছিল না। তিনমাস পরে অশোক কলকাতার এক কলেজে প্রোফেসরি নিয়ে চ'লে এলো—ব'লে এলো, 'ভাল ক'রে ভেবে দেখো এ তিন মাস।'

সুদীর্ঘ তিনমাস পরে বাবাকে বললাম। বাবা একটু অবাক হ'লেন। এমন কিছু ওঁরা পাননি আমাদের ব্যবহারে যা থেকে একটু আঁচও করতে পারেন। তাছাড়া এ তিনমাসে অশোক আর আমি চিঠিপত্র লেখা লেখিও করিনি। মা বল্‌লেন, 'অশোক তো এখানে নেই।' আমি বললাম, 'তাতে কী।'

'তবে কি ক'রে হবে?'

আমি অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে অস্ফুটে বললাম, 'আমি লিখবো।' মা-বাবা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, আমি কুণ্ঠিতভাবে পাশের ঘরে চ'লে এলাম। কয়েকদিন পরে মার নামে চিঠি এলো অশোকের মার কাছ থেকে।

বিয়ে হবার এক বছর পরে শুন্‌লাম সমীর ফিরে এসেছে। মনটা ব্যগ্র হ'লো দেখবার জন্যে।

অশোককে বললাম, 'সমীর আমার অত্যন্ত বন্ধু ছিল, কতদিন পরে এলো, দেখতে ইচ্ছে করছে।' অশোক বলল, 'কোথায় আছে জানো?'

'তা তো জানি না।'

'তবে?'

'তাই তো।'

মাকে লিখ্‌লাম ঠিকানার জন্যে। মা লিখলেন তিনিও জানেন না। আরো কিছুদিন পরে খবর পেলাম সমীর ভাল কাজ পেয়েছে, আছে কলকাতাই। আমার আগ্রহও ততদিনে নিবে এসেছিল। দেখা হ'লে খুসী হই এ পর্য্যন্ত।

হঠাৎ সেদিন সমীরের মামাতো ভাই বাব্‌লুর সঙ্গে পথে দেখা। কথায় কথায় বল্‌ল, 'সমীরদার খবর রাখো?' আগ্রহের সঙ্গে বললাম, 'তুমি রাখো নাকি? ঠিকানা জানো?'

'নিশ্চয়ই—আরে সে যে মস্ত সাহেব হ'য়ে ফিরেছে, শুনছি নাকি মেম বিয়ে ক'রে এসেছে। মা-বাপ তো বিয়ে দেবার চেষ্টায় খুন হ'য়ে গেল।'

'তাই নাকি?'—অবাক হ'য়ে বললাম।

বাব্‌লু একটু ঠাট্টার সুরে বল্‌লে, 'কেন, তোমার সঙ্গে এত ভাব, আমরা তো তখন কতই ভেবেছিলাম—তোমার সঙ্গেও দেখা করেনি?'

আমি সে কথার জবাব না দিয়ে বললাম, 'আমাকে ওর ঠিকানাটা দিতে পার?' বাব্‌লু একটা টুক্‌রো কাগজ বার করলো পকেট থেকে—তারপর ঠিকানা লিখে দিল।

কী যে কৌতূহল হ'লো, ঠিকানা নিয়ে এসেই অশোককে বললাম, 'এই চলো না—সমীরকে দেখে আসি।'

'তুমি যাও, আমি তো চিনি না।'

'তাতে কী! আমারই তো বন্ধু। আর এই তো কাছে থাকে।' অশোকের কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সত্যিই যাওয়া হোলো না। অগত্যা আমি একাই গেলাম দেখা করতে।

দোতলার ফ্ল্যাট। বিলিতি ধরণে সাজানো গোছানো। বসবার ঘরে গিয়ে বস্‌তেই 'বয়' এসে অত্যন্ত বিনয় ক'রে বলল, 'মাইজি থোড়া বৈঠিয়ে—সাব বাহার গিয়া।'

আমি অত্যন্ত হতাশ হ'য়ে গেলাম। এত কষ্ট ক'রে বাড়ি খুঁজে এলাম, তাও কিনা বাবু বাড়ি নেই। উদ্বিগ্ন ভাবে বল্‌লাম, 'সাহেব কখন আসবেন জান?' মাথা নিচু ক'রে বয় বিনয়ের ভঙ্গিতে বল্‌ল, 'এই আব্‌ভি আ যায়গা মাইজি— আপ থোড়া বৈঠিয়ে।' বসলাম একটুখানি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম এদিক ওদিক। কিন্তু মিনিট পনেরো কাট্‌লো, তবু সমীর এলো না। কতক্ষণ আর বস্‌বো। তার চেয়ে বরং একখানা চিঠি লিখে রেখে চ'লে যাই। বয়কে বল্‌তেই সে পুরু নীল কাগজের একটা প্যাড্ আর কলম নিয়ে এলো। প্যাডের মলাটটি ওটলাতেই অর্দ্ধ সমাপ্ত একখানা চিঠি চোখে পড়লো। সমীরের হাতের লেখা এতদিনেও একটু বদলায়নি দেখলাম। পাতাটা ওলটাতে গিয়ে হঠাৎ একটা জায়গায় আমার নামটা চোখে পড়তেই আমি থমকে গেলাম। বুঝতে পারছিলাম খুব অন্যায় হবে তবু কিছুতেই চিঠিটা পড়বার লোভ সামলাতে পারলাম না। চিঠিটি কোনো একজন বন্ধুকে লেখা, এবং তা এই রকম—

'তুমি আমায় জিজ্ঞেস করেছো, এখনো কেন আমি বিয়ে করতে চাই না। মা-বাবা কষ্ট পাচ্ছেন সে কথার উল্লেখ করতেও ভোলোনি। মা-বাবার মনের কথা জানিনে—আমি নিজে যে বিয়ে না ক'রে কষ্টে নেই এ কথা তুমি বিশ্বাস কোরো। তাছাড়া বিয়ে যদি করতেই হয় তবে আমার মতে মা-বাবাকে সুখী করবার চাইতে নিজের সুখের কথাটাই বেশী ভাবা দরকার। কিন্তু আসলে সুখী হবার যোগ্যতাই বোধ হয় আমার নেই, নয়তো অকারণে এমন একটা অনর্থ ঘটবে কেন! এখন অবশ্য খুব স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে আমি গোড়াই মণিকে ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল—যাক্‌গে, সে কথা ব'লে আর কি হবে। তবে এটুকুই বাঁচোয়া যে মণিও বরাবর আমাকে ভুল বুঝেছিল। নয়তো লজ্জায় আমাকে ম'রে যেতে হ'তো। তুমি বলবে এ সব কথা দুঃখবিলাস মাত্র—যথেষ্ট সময় কাটলে এ দাগের উপর পলিমাটি পড়বে সে কথাও সত্য, তবে যতদিনে সেই সুদিন আসবে, ততদিনে—'

এই পর্য্যন্ত লিখেই চিঠিটা শেষ হ'য়ে গেছে। চিঠিটা পড়বার পরে আমি একটু ব'সে রইলাম চুপ ক'রে, তারপর মলাট উল্টিয়ে প্যাডটি বয়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আস্তে নেমে এলাম সিঁড়িতে। ঠিক শেষ সিঁড়িটির মুখেই সমীরের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল একেবারে মুখোমুখি।

'আরে মণি যে, এসো, এসো।'

বিস্ময়ে আনন্দে সমীর থম্‌কে দাঁড়ালো।

'অনেকক্ষণ ব'সে ছিলাম, এবার আমাকে যেতেই হবে।'

'ক্ষেপেছো নাকি—একটু বসবে চল'—দুসিঁড়ি লাফিয়ে উঠে ও আমাকে ডাকতে লাগলো। আমি তবু নেমে এলাম নিচে—'সত্যি সমীর এবার আমার না গেলেই নয়।'

সমীর আস্তে আস্তে নেমে এলো কাছে, আর আমি একটু ফিরে দাঁড়ালাম, চকিতে তাকালাম ওর মুখের দিকে।

সমীর সঙ্গে সঙ্গে এলো একটুখানি, তারপর দাঁড়িয়ে রইল স্থির হ'য়ে।

মনটা বড়ই খারাপ লাগছিলো, কিন্তু আমি কী করতে পারি।

অনুরাধা রায়

একাঙ্ক গীতি-নাট্য

বুদ্ধদেব বসু

সময়—বর্তমান

স্থান—কলকাতায় অনুরাধার বাড়ির বসবার ঘর।

(গান)

অনুরাধা। আমায় তুমি জাগালে আজ কোন্ খেয়ালে,
শিশির-ছোঁওয়া উতল হাওয়ার এই সকালে।
আমি ঘুমের ঘোরে ছিলেম ভালো,
সেথা নেইকো কালো নেইকো আলো
ডুবেছে সব নিশীথিনীর স্বপ্ন-তিমির-অন্তরালে।
আমায় ব্যথা দিতেই জাগালে কি আজ সকালে।
এখনো ঐ আকাশ-পটে করুণ কুয়াশা
মনে আমার জাগিয়ে তোলে নতুন দুরাশা।
যেন অতীত থেকে হঠাৎ ছিঁড়ে
কোন্ গোপন স্মৃতি এলো ফিরে,
হারালো সব সেই অচিনার স্বপ্ন-বীণার ছন্দে-তালে,
আমায় ব্যথা দিতেই জাগালে কি আজ সকালে।

[মালতীর প্রবেশ]

মালতী। আজ বড় সকালেই ভেঙেছে যে ঘুম?

অনুরাধা। আজ বড় সকালেই ভাঙিয়াছে ঘুম।
রাত্রিশেষে স্বপ্ন এক এলো মোর কাছে
ঘুমের গভীর কালো জলের উপরে
উড়ে-যাওয়া যেন শুভ্র পাখি। তারপর
ঘুম ভেঙে গেলো।

মালতী। কী সে স্বপ্ন, শুনি?

অনুরাধা। সে বড় অদ্ভুত। এখন ভাবিতে গেলে
কিছু মনে পড়িবে না। তবু মনে হয়

---

* অভিনয়ের সমস্ত স্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

আমারে ঘিরিয়া আছে যেন তার হাওয়া
আমারে জড়ায়ে আছে যেন তার সুর।
যেন কোনো অপরূপ মধুর সঙ্গীত
এইমাত্র শেষ হ'লো। এখন আকাশ
ভরে' গেছে সুরে ফোটা তারায়-তারায়।

মালতী। শুনিলাম অপরূপ মধুর সঙ্গীত
এইমাত্র, তোর কণ্ঠে। দাঁড়ায়েছিলাম
দুয়ার-আড়ালে চুপ ক'রে। মনে হ'লো
লজ্জাহীন সজ্জাহীন জ্যোতির্ময়ী উষা
তোর মধ্যে হ'লো মূর্তিমতী।

অনুরাধা। কী যে বলো!

মালতী। স্বপ্ন তোর সত্য হোক্ এ-প্রার্থনা করি,
বাসনা সার্থক হোক্।

অনুরাধা। কখনো শুনেছো
স্বপ্ন কারো হয়েছে সার্থক? চিরকাল
মানুষ দেখেছে স্বপ্ন ভয়াল নিষ্ঠুর,
মানুষ দেখেছে স্বপ্ন উন্মত্ত মধুর,
কত ভাঙা, কত ভুল, কত গুপ্তপাপ,
কত কল্পনার অপরূপ উন্মীলন,
আর কত সূর্য্য-অভিমুখী দুঃসাহস।
সহস্র স্বপ্নের জালে শৃঙ্খলিত মোরা
কিন্তু কোনো স্বপ্ন কভু হয়নি সার্থক।

মালতী। বুঝি তোর নিয়তির অদৃশ্য দেবতা
ক'রে গেলো অলক্ষ্য ইঙ্গিত ঘুম-ঘোরে।

অনুরাধা। কেন? এ-কথা তোমার মনে কেন এলো?

মালতী। সে-কথা শুনবি পরে। সম্প্রতি আমার
শরীরে চায়ের তৃষ্ণা তীব্র দুর্নিবার।
মন্ বাহাদুর।

মন্ বাহাদুর (নেপথ্যে)। জু !

মালতী। চা নিয়ে আয়, চা।
তোর এই পুষ্যি নিয়ে আর তো পারি না।
এমন নিষ্কর্মা কুঁড়ে মেজাজি বাদশা।
মূর্তিমান হনুমান।

অনুরাধা। ওকে তুলে দাও।

মালতী। আজ তোর কী হয়েছে ? মন ভালো নেই ?
কেমন উন্মনা যেন অনুপস্থিত।

অনুরাধা। আজিকার দিন বুঝি বসন্তের দিন।
আজিকার সূর্য বুঝি উত্তরায়ণের
যাত্রাপথে ঘুরিবার আগে ক্ষণতরে
থমকি' রয়েছে। বাতাসে বসন্ত আজ।

(গান)

মালতী। বাতাস এসে কী ব'লে গেলো, আধো কথা ব'লে চ'লে গেলো,
কী যে সে কথা তা জানি না, তবু, নিমেষে হৃদয় দ'লে গেলো।

অনুরাধা। তোমার অন্তর আজ বসন্ত-সরস।
ঝলকিছে কণ্ঠে তব সবুজ প্রমোদ
নটিনীর কঙ্কণ-স্ফুরিত আলো-সম।
বাতাসে বসন্ত আজ।

(গান)

মালতী। বাতাসে বসন্ত আজ
ওরে প'রে নে তোর রঙিন সাজ।
আয় বেরিয়ে আয়
এই চঞ্চলিত মর্মরিত দক্ষিনে হাওয়ায়।
আজ সবুজ আগুন বনে-বনে উঠলো রে জ্ব'লে
উচ্ছলিত উল্লসিত কী কলরোলে।
ওরে আয় বেরিয়ে আয়
আকাশ আজি মাতাল হ'লো দক্ষিনে হাওয়ায়।

অনুরাধা। মনে হয় তুমি আজ বসন্ত-মাতাল—
এত সুখী !

মালতী। ওরে বোকা, সুখী ? সুখী ! তোর
সুখে সুখী। এই নব-বসন্তের দিন
সে যে তোরি সুখে সুখী।

অনুরাধা। বুঝি না কী বলো।

মালতী। লজ্জা কুমারীর অলঙ্কার। তবু এ-ও বলি
আজিকার দিনে যদি লজ্জার বসনে
ছেঁড়া দেখা যায়, কিছু তাতে দোষ নাই।

অনুরাধা। এ-বসন্তদিন বাজে ব্যথার মতন
মোর বুকে।

মালতী। এ-ব্যথা সুখের। আমাদের
হৃদয় অপরিসর, ভেঙে যেতে চায়
বিশাল সুখের জোয়ারের উপপ্লবে।
তখন ব্যথার মত বুকে বাজে সুখ।

অনুরাধা। বাজে ব্যথার মতন, বাজে ব্যথার মতন
এ-বসন্ত ব্যথার মতন বুকে বাজে।
ওরা বলে কত সুখী বসন্তসময়
হৃদয়ের বন্ধহীন উৎসবের ঋতু—
বসন্ত নিষ্ঠুর।
স্পর্শে তার গন্ধে তার মর্মরিত ছন্দে তার
জেগে ওঠে কোন্ গূঢ় নামহীন ভাষাহীন
বিশাল বিরহ।

মালতী। আজ তোর অবিরহ দিন। আসিছে সে
আজ তোর কাছে ফিরে। এতদিন পরে
ধন্য হবে উভয়ের অঙ্গীকার। কিছু
বলছিস না যে ?

অনুরাধা। কী আর বলবো ? তুমি
বলো সব মোর হ'য়ে। আমি শুনি।

মালতী।　　দাঁড়া,

আগে তোর পুষ্যিটাকে দিয়ে নিই তাড়া।

হতভাগা! মন্ বাহাদুর!

মন্ বাহাদুর (নেপথ্যে)।　　জু!

মালতী।　　জু! জু! জু!

চা আনবি কিনা বল্, যদি না আনিস

আছে আজ কিছু তোর কপালে জানিস।

[চায়ের ট্রে হাতে মন্ বাহাদুরের প্রবেশ]

এত দেরি করলি যে?

মন্ বাহাদুর।　　চিনি থেলো না।

মালতী।　　আজ তোর চিনি নেই, কাল নেই চা

যখন যা দরকার, আনবি তো না।

কেবল জবাবদিহি, আছে মস্ত হাঁ।

মন্ বাহাদুর। আমার কী দোষ—হুঁঃ—চিনি থেলো না।

মালতী।　　ফের যদি কোনোদিন চিনি থাকে না

ফের যদি একডাকে না আনিস চা

তবে ঠিক—ঠিক টের পাবি মজাটা।

হাঁ করে' কী শুনছিস? এইবার যা।

[মন্ বাহাদুরের প্রস্থান]

আয় অনু, এইবার খাওয়া যাক্ চা,

মাথাটা ধরিয়ে দিলে মন্ বাহাদুরটা।

[মালতীর চা ঢাললো, দু'জনে বসলো]

সত্যি বলছি তোকে আজ হিংসে হচ্ছে বড়,

কখন আসবে পুরন্দর?

অনুরাধা।　　জানি না তো।

মালতী।　　জানি না তো! কী বলিছে রক্তের স্পন্দন,

কী বলিছে হৃৎপিণ্ডের উন্মত্ত স্পন্দন,

ভালো ক'রে শোন্।

অনুরাধা। বহুদিন মনে-মনে
ভেবেছি একটি কথা শুধাবো তোমারে।
মালতী। তোর কিছু আছে নাকি মোরে শুধাবার?
সবুজ মঞ্জরী তুই, আমি জীর্ণ পাতা।
অনুরাধা। শুনেছি জীবনে তব এসেছিলো প্রেম,
শুনেছি প্রেমের মূল্যে তুচ্ছ মেনেছিলে
সমস্ত পৃথিবী।
মালতী। আর কী-কী শুনেছিস?
অনুরাধা। আর সেই প্রেম তিক্ত মৃত্যুর মতন—
যে-প্রেমের মূল্য দেবে সমস্ত পৃথিবী!
মালতী। কে তোকে এ-সব বলে? ছেলেবয়েসের
হাম খুব স্বাস্থ্যকর, হ'য়ে যাওয়া ভালো।
অনুরাধা। ভয় করে তোমার এ হাসি দেখে।
মালতী। ওরে
বোকা, আমার মতন সুখী কেউ নয়।
আমি অনাসক্ত, আমি মুক্ত। এ-জীবনে
যত ভালোবাসা তোর, তত বেশি ভয়,
দুঃখ তত বেশি।
অনুরাধা। দুঃখ তত বেশি!
তাই বুঝি এমন একান্ত তুমি একা?
মালতী। ছিলো নবযৌবনের মদির দিনের
আকাঙ্ক্ষা আমার—মনে হ'তো আপনারে
লক্ষ খণ্ডে ভেঙে দিই লক্ষ মানুষের
মধ্যে করি' বিকীরণ। উদ্দাম সেদিন
প্রগল্‌ভ মহার্ঘ মূঢ় বন্ধনবিহীন—
মনে হ'তো তারা-ভরা সহস্র আকাশ
লুটায়ে পড়িছে পায়ে স্তুতির মতন,
মনে হ'তো অপরূপ পূর্ণিমার চাঁদ
সে আমারি প্রেমিকের নিঃশব্দ গুঞ্জন।

—বার-বার ফিরে আসে পূর্ণিমার চাঁদ
ফিরিতে পারি না মোরা পূর্ণিমার কাছে।

অনুরাধা। নিষ্করুণ নিদারুণ পরিবর্তনের
চক্রে বদ্ধ আমাদের নশ্বর নিয়তি।

মালতী। অপরিবর্তন শুধু মৃত্যুর নিয়ম।
হয়-তো এ নিষ্করুণ পরিবর্তনের
সোপানে-সোপানে মোরা করি আরোহণ
পূর্ণতায়।

অনুরাধা। জানি না সে-পূর্ণতা কেমন
যার মধ্যে চাঁদ ম'রে যায়।

মালতী। থাক্, থাক্,
আজ এ-প্রসঙ্গ অসঙ্গত। বল্, বল্,
মন খুলে তার কথা বল্।

অনুরাধা। কার কথা?

মালতী। অনেক মেয়ের মুখে শুনবি কেবল
পুরুষ কুটিল ক্রুর নির্লজ্জ চপল,
পুরুষ মাংসাশী জন্তু স্বার্থপর খল,
স্ব-সর্ব্বস্ব কাপুরুষ নপুংস দুর্বল।
কিন্তু আজ দেখা গেলো পুরুষ গম্ভীর
স্থিরলক্ষ্য দৃঢ়চিত্ত কীর্তিশালী বীর
সমূর্ত নিষ্ঠার মত নিষ্কম্প গভীর
উদার মিলন-ক্ষেত্র হৃদয়-বুদ্ধির।
পুরন্দর সেন
বহু কীর্তি জয় করি' আজ ফিরেছেন
পশ্চিমের প্রান্ত থেকে ; আজ ফিরেছেন
পৃথিবীর প্রান্ত থেকে পঞ্চবর্ষ পরে
যেথা অপেক্ষিছে স্বয়ম্বরা অনুরাধা
সন্ধ্যা-সম যে সুন্দর, সন্ধ্যাতারা-সম
অনির্বচনীয়। স্বতঃস্ফূর্ত্ত মুক্ত ইচ্ছা
উভয়েরে যুক্ত করেছিলো শুভক্ষণে,

সাঙ্গ হবে আজ সেই যুগ্ম অঙ্গীকার
আমরণ অমরণ পরিপূর্ণতায়।
—কিন্তু তোর চোখে দেখি ক্লান্তি ঘনায়েছে।

অনুরাধা। ম্লান মোর চোখ।

মালতী। স্বপ্নে ভারাক্রান্ত
তোর চোখ। অপ্রস্তুত অপ্রসাধনের
লাবণ্যের আভা তোর গায়ে। কিন্তু ওঠ্,
অঙ্গে তোর ধন্য হোক্ উজ্জ্বল শাড়ির
কারুকলা। সুগন্ধে সম্ভ্রমে বর্ণে
মর্মরিত ছন্দে আর আনন্দ-হিল্লোলে
মুঞ্জরিত আন্দোলিত তরুণ তরুর
মতো হোক্ তোর রূপ।

[মন্ বাহাদুর ঘরে ঢুকে অনুরাধাকে কী বললে বোঝা গেলো না]

কী বলছে ও?

অনুরাধা। এসেছেন—

মালতী। পুরন্দর?

অনুরাধা। এখানে আসতে বল্।

মালতী। কে এসেছে? অনিরুদ্ধ বুঝি? আমি তবে
পালাই এবার। বোবা মানুষের সঙ্গ
সয় না আমার ধাতে। তোকে ধন্য বলি!
আমি যাই, ঘর-বাড়ি ফিটফাট করি
বেশী দেরি করিসনে, তোর পায়ে পড়ি।

[মালতীর প্রস্থান। তার পিছনে মন্ বাহাদুর চ'লে গেলো চায়ের ট্রে নিয়ে। অনুরাধা উঠে দাঁড়ালো। অনিরুদ্ধের প্রবেশ। খানিকক্ষণ কেউ কিছু বললে না।]

অনিরুদ্ধ। এখনো রয়েছে ভোর। আরো একদিন!

অনুরাধা। আরো একদিন!

অনিরুদ্ধ। দিনগুলি উড়ে চলে
দ্রুতপক্ষসঞ্চারিত বিহঙ্গমসম,
প্রসারিত ধ্বংসহীন চিরন্তনতায়।

আকাশে তারার মত অফুরন্ত তারা
সমুদ্রে ঢেউয়ের মত সংখ্যাহীন। তবু
আজ আমাদের দিন শেষ হ'লো।

অনুরাধা। শেষ!

অনিরুদ্ধ। রক্তে মোর দিগন্তের সুদূর আঘ্রাণ।

অনুরাধা। আজ তুমি চ'লে যাবে?

অনিরুদ্ধ। রক্তে বাজে মোর
রাত্রিভরা সমুদ্রের সুদূর আঘ্রাণ।

অনুরাধা। চ'লে কি যেতেই হবে?

অনিরুদ্ধ। রক্তে বাজে মোর
চিরন্তন চঞ্চলতা, আমি আজ্ঞাবহ।

অনুরাধা। কোন্ চির-পলাতক দিগন্তে দাঁড়ায়ে
ডাকিছে তোমারে!

অনিরুদ্ধ। বালক ছিলাম যবে
ভাবিতাম চির-অবগুণ্ঠিত কল্পনা
স্পর্শ ক'রে যায় মোরে নিমেষ উন্মেষে—
তাই আমি অনাশ্রয় শান্তিহীন।

অনুরাধা। আর
আজ বুঝি বিজ্ঞতার নেমেছে পাষাণ?
এখনি কি বিজ্ঞতার কঠিন পাষাণ
অন্ধ ক'রে দিয়েছে তোমারে?

অনিরুদ্ধ। দিন যায়
মোদের হৃদয় 'পরে ছায়া ফেলে যায়
মোদের হৃদয় ভ'রে বিজ্ঞতা ঘনায়
নিষ্প্রাণ পাষাণ। আজ তাই মনে হয়
এ আমার আত্মঘাতী বিদ্রোহী রক্তের
অবাধ্য দুর্বোধ্য ব্যাধি। আর কিছু নয়।

অনুরাধা। তুমি ক্লান্ত তবে?

অনিরুদ্ধ। আমার জন্মের লগ্নে
যে-তারার আধিপত্য, তার বুঝি মৃত্যু হবে

কুক্ষিচ্যুত উন্মত্ত নৃত্যের আবর্তনে।
যত পাশে পাকে-পাকে জীবন জড়ায়
মানুষেরে,—যত স্নেহ, যত স্বার্থ, আশা—
আমারে এড়ায়ে গেছে। আমি মূলহীন,
পরিবেষ পরিচয় অনুষঙ্গহীন।
মোর দিন সমুদ্রের নৃত্যের মতন,
রাশি রাশি হাওয়ার মতন মোর দিন।

অনুরাধা। আমাদের দিন কাটে ধূসর নিঃশ্বাসে,
অনুদার মধ্যবিত্ত মসৃণ আরামে,
স্থূল আত্ম-তৃপ্তি আর পাণ্ডিত্য-দম্ভের
দু'পাটি দাঁতের ফাঁকে পান-খাওয়া হাসি।

অনিরুদ্ধ। নীল আকাশের নিচে নীল সমুদ্রের
ঢেউয়ের উপর দিয়ে উড়ে চ'লে যায়
আলোর ঝলক তুলে দ্রুত শুভ্র পাখি।
তুমি সেই।

অনুরাধা। কতদিন আমাদের দেখা
কত দীর্ঘ প্রহরের শান্ত অবসরে,
রুদ্ধশ্বাস দ্বিপ্রহরে, সোনার সন্ধ্যায় :
তবু তুমি আজিকার আগে বলিলে না,
সমুদ্রের বুকের উপরে আমি পাখি।

অনিরুদ্ধ। আলোর ঝলক-তোলা তুমি শুভ্র পাখি।

অনুরাধা। কী কথা ব'লেছি মোরা দীর্ঘ অবসরে
সব যেন ভুলে' গেছি। আজ মনে হয়
কোনো কথা বলা হয় নাই।

অনিরুদ্ধ। কোনো কথা
না-ই হ'লো বলা। দীর্ঘ স্তব্ধ অবসরে
দেখেছি তোমারে, নয়নের পল্লবের
অন্ধকার দৃশ্যপটে দেখেছি তোমারে।

অনুরাধা। তবু আজিকার দিনে তুমি বাণীময়।

অনিরুদ্ধ। অপরাধ ক্ষমা করো। সূক্ষ্ম ছায়া-সম
যত কথা নেপথ্যে করিছে সঞ্চরণ
যত কথা অদৃশ্য নিঃশব্দ ভাষাহীন
তোমার সঙ্গীতে তারা পেয়েছে শরীর।
কথা, কথা !
কথা মূঢ় অর্থহীন নির্বোধ প্রলাপ
কথা মানুষের দুর্ভাগ্যের অভিশাপ,
কথায় সন্দেহ হানে জাগায় আক্রোশ
জ্বালে অন্তর্দাহ আর বিষবাষ্প রোষ,
যত ভুল বোঝা, যত ভাঙাচোরা, আর
যত বিরোধের আত্ম-লাঞ্ছিত ধিক্কার
কথার বিকৃত-যন্ত্র-নির্গত সকলি।
কিন্তু তুমি—
তুমি বাণী, তুমি বীণা। তোমার কণ্ঠের
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ফোটে অপ্রকাশ্য অনির্দেশ্য
পরিপূর্ণ-উন্মীলিত সংবেদন। সেথা
ভুল নাই, ভাঙা নাই, বুদ্ধির বিকৃতি
নাই। বুদ্ধির অতীত সেথা পূর্ণবোধ।
শুনায়েছো তুমি সেই জড়তাবিনাশী
হৃদয়হ্লাদিনী বাণী কতদিন। আজ
একবার শুনে যাবো, মনে আশা ছিলো।

অনুরাধা। তুমি যবে করো মোরে গানের আদেশ
সব গান ভুলে যাই, চুপ ক'রে থাকি।

অনিরুদ্ধ। আদেশ নয় এ, দীন ভক্তের প্রার্থনা।

(গান)

অনুরাধা। আজ এসেছে আঁধার, জেগেছে জোয়ার হৃদয়ের তটে আকুলি',
তুমি ছেড়ে দাও পথ, রেখো না দুয়ার আগুলি'।
কূলে-কূলে কালো মরণের জল
চরণে তোমার করে ছলছল,

সেথা ডুবে যাক ক্ষণিক রঙিন গোধূলি,
বুঝি এলো আজ আঁধার-জোয়ার হৃদয়ের কূলে আকুলি'।
আজ রজনী ঘনালো, নিবে গেলো আলো রঙিন মেঘের খেলেনা,
কান পেতে শুনি আর বুঝি তুমি এলে না।
ভাঙুক দুয়ার, নামুক আঁধার,
কূলে-কূলে ভরা বিশাল জোয়ার,
জ্বলে তারি তলে তোমার আমার গোপন মিলন-গোধূলি,
আজ হৃদয় আমার বিরহবেলার আঁধারে উঠিছে আকুলি'।

অনিরুদ্ধ। আমি যদি দেবতা হতাম—
রাশি-রাশি আকাশের রাশি-রাশি তারাদের
পাঠায়ে দিতাম তোমা কাছে।
ছিটায়ে দিতাম তারা কালোচুলে এলোচুলে
ছড়ায়ে দিতাম তারা পদমূলে বাহুমূলে
মালা হ'য়ে জড়াইতো ধূলা হ'য়ে গড়াইতো
তুমি হ'তে দেবী!
আমি যদি দেবতা হতাম।

অনুরাধা। আমার মরণ যদি হ'তো!
এ-মুহূর্তে এ-নিভৃতে উতলা বসন্ত-প্রাতে
দ্বিধাহীন ব্যথাহীন সব শঙ্কাবাধাহীন
মধুর তন্দ্রার মতো দিগন্তে চন্দ্রের মতো
মরণ আসিতো যদি মোর!
সব স্বপ্ন অবসান, সঙ্কটের সমাধান
একটি নিঃশ্বাসে,
মিশিয়া যেতাম আমি মর্মরিত চঞ্চলিত
বসন্ত-বাতাসে।

অনিরুদ্ধ। তুমি কেন মৃত্যু চাও? সব আছে তব।

অনুরাধা। হয়তো এ যৌবনের ক্ষণিক বিলাস।

অনিরুদ্ধ। তবু যেন মনে হয় মৃত্যু হোক্ তব
এ-নিভৃতে এ-মুহূর্তে। আর সব যাক্,
যাহা-কিছু তুমি নয় সকলি মিলাক,

যাহা-কিছু আমাদের এ-মুহূর্ত নয়।
আমাদের এ-মুহূর্ত হোক্ চিরন্তন।

অনুরাধা। আর-একটি গান তোমা শোনাবো কি? কথা
ঘুরে-ঘুরে ঘুর্নিপাকে কবন্ধ অতলে
নিয়ে যাবে টেনে। তার চেয়ে গান ভালো।

(গান)

মরণেরে আমি ডাকিয়াছি ভালোবেসে কতবার
মরণের ছবি আঁকিয়াছি যেন প্রিয় দেবতার।
কে জানিতো যাহা আমি চাই মরণেও নাই তাহা নাই;
মরণে তোমারে যদি পাই মরি তবে শতবার।
মরণেরে আমি ডাকিয়াছি ভালোবেসে কতবার।

কানে-কানে গোপনে-গোপনে ঘুম-ভাঙা নিমিষেই
যার সুর বেজেছে স্বপনে কে জানিতো তুমি সেই।
যে-মরণ-বঁধুর মধুর ক্ষণে-ক্ষণে বেজেছে নূপুর
কে জানিতো এমন নিঠুর হবে তার অভিসার,
যে-মরণে আমি ডাকিয়াছি ভালোবেসে কতবার।

অনিরুদ্ধ। তুমি গান গাও—
যে-গান ভ্রমরযোগ্য বসন্তবেলায়।
তবু তা ব্যথায় ভরা। তুমি গান গাও—
তোমার চুলের গন্ধ ঝড়ের হাওয়ায়-
কল্পনারে কোথায় উড়ায়ে নিয়ে যায়।
—তুমি আর আমি
যেন কোন্ চিরন্তন বিকেলবেলায়
যে কোন্ রূপকথা-পাহাড়-চূড়ায়
সূর্য্য আর চন্দ্র নিয়ে অলস খেলায়
চিরক্লান্তিহীন। বহুনিম্নে অস্পষ্ট রেখায়
মেঘ-ম্লান পৃথিবীর সবুজ আভাস
কোথায় মিলায়ে গেলো মুহূর্ত-মায়ায়।

অনুরাধা। তুমি আর আমি—
আমরা দেবতা নই, দেবতার মোরা

নিয়তির অন্ধ, অন্ধকার দেবতার।
আজিকার বাতাসে জেগেছে সর্বনাশ
লাল বিদ্যুতের ঝড়ে জ্বালায়ে আকাশ
ঐ এলো বিচ্ছেদকারীর দল। তুমি
আর আমি দেখি চেয়ে, রক্ত-পীত সেই
উন্মত্ত বিদ্যুৎ-স্রোতে আমাদের পথ
সময়ের সীমা-প্রান্তে দ্বিধা হ'য়ে গেলো।

অনিরুদ্ধ। ঐ আসে বিচ্ছেদবাহিনী দলে-দলে
পলে পলে বিদ্যুতের আকাশের তলে
আসে বজ্রস্বরে, আসে মৃত্যুর হাওয়ায়।
সময় হয়েছে শেষ। এবে যেতে হবে।

অনুরাধা। কোন্‌খানে যাবে?

অনিরুদ্ধ। চলো তুমি মোর সঙ্গে।

অনুরাধা। কোনখানে?

অনিরুদ্ধ। চলো মৃত্যুর সীমান্তে, চলো
নিরুদ্দেশ আকাশের অভিসারে। চলো
যেখানে বাতাসে আসে সমুদ্রের ঘ্রাণ
যেখানে রক্তের সুরে সমুদ্রের গান
চিরকালকল্লোলিত। তুমি হবে পাখি
নীল আকাশের নিচে নীল সমুদ্রের
বুকের উপরে। তুমি হবে জলরাশি
তুমি হবে মর্মরিত তরঙ্গিত হাওয়া
তুমি হবে আমার রক্তের চঞ্চলতা
তুমি হবে আমার অশান্ত উদ্দীপনা
তুমি হবে আমার দুঃখের উদ্‌যাপন।

অনুরাধা। স্তব্ধ হও, স্তব্ধ হও।

অনিরুদ্ধ। এসো মোর কাছে,
এসো তুমি মৃত্যুর মতন চুপে-চুপে
এসো তুমি মৃত্যুর রাত্রির মতো। এসো
ঘুমন্ত হাওয়ার মতো নিঃশব্দ কোমল

ঝড়ের হাওয়ার মত দুরন্ত প্রবল
ঢেউ-তোলা বাতাসের সহস্র লীলায়
আন্দোলিত অরণ্যের অশান্ত লীলায়।
ওঠো
অন্ধকার স্তব্ধরাত্রে কালপুরুষের
জ্যোতির্ময় জ্বলন্ত খড়্গের তীক্ষ্ণতায়
বিচ্ছুরিত বিশ্বের সর্বনাশ-সম।
হও
সূর্য, হও চন্দ্র, হও কালপুরুষের
ঝলসিত তারাময় তরবারি। হও
সূর্যের প্রচণ্ড শান্তি। সূর্যের ভীষণ
জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ডের শান্তি হও তুমি।
আর দাও
দাও
সেই শান্তি মোরে দাও।

অনুরাধা। বলো, আরো বলো। স্বপ্নে-শোনা অরণ্যের
মর্মরের মত তব স্বর। মনে হয়
মৃত্যু আর দূরে নয়, দূরে নয়।
ঐ শোনা যায় তার গম্ভীর ভীষণ
পদশব্দ, হৃৎপিণ্ডে বাজে প্রতিধ্বনি।
আকাশে পাখির ঝাঁক উড়ে চ'লে যায়।

অনিরুদ্ধ। মৃত্যু আরো দূরে, আরো দূরে। মোরা হ'বো
দিন আর রাত্রির সম্রাট, তুমি যদি
আসো সঙ্গে মোর।

অনুরাধা। আমরা দেবতা নই,
দেবতার মোরা, নিয়তির অন্ধকার
দেবতার। নিয়তির শৃঙ্খল ঝঙ্কারে
মোর প্রতি পদক্ষেপে। পথ নাই মোর।

অনিরুদ্ধ। আমি দেখি তব পথ সন্ধ্যার তারায়
চ'লে গেছে; অদৃষ্টের আঁকাবাঁকা ঘুরে
চ'লে গেছে সূর্যের হৃৎপিণ্ডের 'পরে।

অনুরাধা। তোমার কথার ধ্বনি কেবলি বাজিছে
মৃত্যুর কল্লোল-সম হৃৎশব্দে আমার।
আমি
প্রতিজ্ঞার অমোঘ আজ্ঞায় শৃঙ্খলিত।

অনিরুদ্ধ। তুমি
তুমি মুক্ত নিরুদ্দেশ সমুদ্রের পাখি,
মানুষের ভাষা তোমা বাঁধিবে কেমনে ?
মানুষ ভঙ্গুর, তার ভাষাও ভঙ্গুর।

অনুরাধা। শুনি তব কণ্ঠস্বরে বিশাল নদীর
অন্ধকার সঞ্চালন—যে-নদী এখনি
খুলে যাবে সমুদ্রের নীল মোহানায়।
বাজে আতঙ্কের মতো রাত্রির কল্লোল।

অনিরুদ্ধ। চলো, চলো।

অনুরাধা। শোনো, শোনো,
ঊর্ধাকাশে চক্রাকারে উড়িছে পাখিরা,
বক্রনখ ক্ষুধিত চঞ্চুর সঞ্চালনে
সংঘর্ষে সমস্ত আকাশ গেলো ভ'রে।

অনিরুদ্ধ। চলো

অনুরাধা। তুমি যাও।

অনিরুদ্ধ। আমরা কি বন্দী তবে
অদৃষ্টের অমোঘ অনিবার্যতায় ?

অনুরাধা। যাও, যাও—
একটু দাঁড়াও, শোনো :
আবার কি হবে দেখা তোমায় আমায় ?
আর যেন না দেখা হয় তোমায় আমায়।
শোনো, শেষ কথা—

অনিরুদ্ধ। আমরা কি বন্দী তবে
অদৃষ্টের অমোঘ অনিবার্যতায়,
অদৃষ্টের অন্ধ নিয়মানুবর্তিতায়

প্রতিজ্ঞার নিষ্ঠার নিষ্ঠুরতায়
ভঙ্গুর মনুষ্যতার ভঙ্গুর ভাষায়
বন্দী কি আমরা ?
সত্য অনাবিষ্কৃত, সত্য নিরুত্তর
শপথ সমূর্ত উচ্চারিত তৃপ্তিকর।
সত্য অবগুণ্ঠিত, সুস্পষ্ট নিয়ম,
সত্য মিথ্যা, প্রথা সত্য অশঙ্ক অভ্রম।
ভঙ্গুর মনুষ্যতার ভঙ্গুর ভাষায়
তাই স্বেচ্ছা-বন্দী মোরা। তাই বন্দী মোরা
প্রতিজ্ঞার দম্ভের প্রতিহিংসায়
অদৃষ্টের অলঙ্ঘ্য অমোঘ ঘটনায়
দৈবের অনিবার্য অনুবর্তিতায়।
অনাবিষ্কৃত সত্যের ছদ্মবেশে
সত্যম শিবম সুন্দরম,
নির্ভরোপযোগী আর নিশ্চিন্ত নির্ভুল
অপ্রশ্ন অপ্রতিবাদ্য সরল নিয়ম
সত্যম শিবম সুন্দরম।

[অনিরুদ্ধের এই কথা শেষ হবার আগেই অনুরাধা আস্তে গান ধরেছে। কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে গান শোনা গেলো]

(গান)

অনুরাধা। দিনের স্বপনে রাতের স্বপনে ভ'রে আছো তুমি হৃদয় মম
প্রিয় মোর, প্রিয়তম হে।
মোর জীবনের দিবা-বিভাবরী স্মৃতির ব্যথায় রেখেছো আবরি'
তোমার প্রেমের স্মরণ আমার মরণ-বনের সুরভি-সম,
প্রিয় মোর, প্রিয়তম হে।

[এই গান যখন চলেছে অনিরুদ্ধ আস্তে আস্তে অলক্ষিতে বেরিয়ে গেলো। অনুরাধা লক্ষ্য করলে না, গেয়েই চললো। তারপর গান থামিয়ে হঠাৎ দেখলো, অনিরুদ্ধ নেই। ব'সে রইলো চুপ করে']

[মালতীর প্রবেশ]

মালতী। যাক্, আজ অল্পেতেই দিয়েছে রেহাই,
ভয় ছিলো, গেলো বুঝি সমস্ত বেলাই।

একবার বসলে তো উঠতে জানে না
অদ্ভুত কিম্ভুত মনুষ্য-নমুনা !
তোর যত কাণ্ড ! এ-সব মানুষকে
কখনো কি ও-রকম দিতে আছে উস্কে ?
যাক্‌গে, কাটলো ফাঁড়া আজ অল্পতেই।
তা ছাড়া, কাটতো যদি বেলা গল্পতেই
তাহ'লে কি ঘর-বাড়ি হ'তো ফিটফাট,
যেখানে যা থাকবার সব ঠিকঠাক।
এইবার তোর কাছে দিই ধন্না
দয়া ক'রে উঠে সাজ শেষ কর্‌ না।

অনুরাধা বাড়ি-ঘর সাজানো হয়েছে। এইবার
আমার সাজবার পালা।

মালতী। পুরন্দর
হয়তো এখনি আসবে। তাড়াতাড়ি কর্‌।

কোরাস। টেবিলে পেতেছি আজ নতুন চাদর,
চামচেগুলো ঝকঝকে ; বিলিতি চায়না
সারি-সারি পাতা যেন নিটোল আয়না।
পরদাগুলো নক্সা-আঁকা লেটেষ্ট ক্রেটোনে।
মাছ পাখি পশু শস্য বাবুর্চিখানায়
মাননীয় অতিথির অভ্যর্থনায়।
মাননীয় অতিথির অভ্যর্থনায়
যুক্ত আজ আসবাবের মসৃণ আদর
রূপোর চামচে আর ক্রেটোন কাপড়
গন্ধ-ভরা রন্ধনের সরস আসর।
আর
মন-ভোলানো ঢেউ-খেলানো সাড়ির শোভায়
মাননীয় অতিথির অভ্যর্থনায়
ঝকঝকে চামচে আর চকচকে চায়না—
সে-সবার সঙ্গে যুক্ত অনুরাধা রায়।

মালতী। বেলা বাড়লো যে। এইবার স্নান আর
প্রসাধন শেষ ক'রে ঠিক হ'য়ে থাক্‌।

অনুরাধা। আমি তো প্রস্তুত।

মালতী। বেলা বেড়ে যায়,
সে তো আসে না রে।

অনুরাধা। কবন্ধ সময়
অন্ধকারে রেখেছে লুকায়ে সব,
অন্ধকারে কিছুই রহে না চিরকাল ;
সময় লুকায় সব, সময় দেখায়।

(গান)

মালতী। বেলা বেড়ে যায় সে তো আসে না,
ফুল ঝ'রে যায় সে তো আসে না।
হৃদয় শুকায় ;
সময় লুকায়
আঁধার-আড়ালে যে চির-চেনা।

কোরাস। অনাগত ভবিষ্যৎ—
সে কি রাশি-রাশি তুচ্ছ ঘটনার প্রতিঘাত
শুধু দৈবসংযোগের
আকস্মিক ক্ষণিকের
অসংলগ্ন গণিতের
ফলাফল ?
নির্বোধ নিশ্চেতন অন্ধ আকস্মিক
তারি নাম ভাগ্য ? ভবিষ্যৎ ?
নাকি কোনো সর্বব্যাপী মহান বুদ্ধির
সর্বব্যাপী সর্বদ্রষ্টা
সর্বক্ষম সর্বস্রষ্টা
সর্বশুভময় কোনো মহান বুদ্ধির
শাশ্বত সঙ্কল্প এই :
প্রাক্-জ্ঞাত, প্রাক্-সঙ্কল্পিত
প্রাক্-নির্মিত এই সৃষ্টি ফিল্‌মের রীলের মতন ?
আমরা ক্ষণিক, তাই ক্ষণে-ক্ষণে দেখি উন্মোচন ?
আমরা সৃষ্টিরে দেখি ফিল্‌মের দর্শকের মতো ?

ক্ষণে-ক্ষণে পলে-পলে
ছায়া-ছবি দলে-দলে
উন্মোচিত হয় ; তাই অন্ধকার বলি ভবিষ্যৎ ?
নরত্বের সীমা থেকে
মরত্বের সীমা থেকে
যদি মুক্ত হ'তে পারিতাম, তবে আর
ভবিষ্যৎ রহিতো না অন্ধকার ?
জানা হ'য়ে যেতো তবে ফিল্‌মের সবগুলো রীল,
দেখিতে হ'তো না আর পলে-পলে ছায়ার মিছিল

(গান

মালতী। এসো তুমি আর দেরি কোরো না,
তৃষিত আকাশে আনো করুণা।
কালের কুহেলি
নিজ হাতে ঠেলি'
দেখা দাও আজ হে চির-চেনা।

কোরাস। আসিছে সে। এবার সময় পূর্ণ হ'লো।
সময় লুকায় যাহা সময়ই দেখায়।

[পুরন্দরের প্রবেশ]

পুরন্দর। হ্যালো!

মালতী। এসো, এসো। অভ্যর্থনা হোক্ তব
সংবেদিত হৃদয়ের পরিপূর্ণতায়।
এসো গৃহে, এসো নীড়ে, শান্তির কুলায়ে
এসো ; শান্তির শিশির-ঝরা সন্ধ্যায়
সব কীর্তি তব, সব দীপ্তি তব, সব
দীর্ঘধৈর্য তপশ্চর্যা ধন্য হোক্ আজ
পরিপূর্ণতায়।

পুরন্দর। অদ্ভুত এ ফিরে-আসা।
অনেক দিনের পরে
পাঁচ বছরের পরে
আপনার ঘরে।

এখানে মধুর গন্ধ
এখানে অদ্ভুত শব্দ,
সর্বেক্ষেত বাঁশবন
বৃষ্টির পশ্‌লায়-ধোয়া
কাঁচা মাটি।　ভিজে মাটি
ভিজে ধূলো, কতগুলো
শুকনো পাতার পিরামিড।
অদ্ভুত এ ঘরে-ফেরা এতদিন পরে।
এখানে গন্ধের ডাক
ওখানে শব্দের ভোজ
অদ্ভুত, মধুর—
আর যত চেনা মুখ পুরোনো দিনের।

কোরাস।　পুরন্দর সেন আজ প্রত্যাবর্তনের
দিনে আমাদেরে জানালো অভিবাদন।
কেমন অদ্ভুত, কেমন মধুর তার
চোখে যত চেনা মুখ পুরোনো দিনের।
আরো ভালো ক'রে শোনা আমাদের আশা

পুরন্দর।　অদ্ভুত এ চেয়ে দেখা,
অদ্ভুত এ চেয়ে থাকা
পুরোনো দিনের 'পরে
পুরোনো মুখের 'পরে।
পুরোনো দিনের মুখ
পুরোনো চেনার মুখ
বারে-বারে
ডেকেছে আমারে
হোটেলে রাস্তায় রেস্তোরাঁয়
থিয়েটারে
জাহাজের বারে,
সমুদ্রের রং-বেরং বীচে,

ক্লান্ত কোনো মুহূর্তের নিঃসঙ্গ সুযোগে
পুরোনো দিনের মুখ ডেকেছে আমারে।

কোরাস। তুমি ছিলে হাজার-হাজার মাইল দূরে
আমাদের হৃদয়ের তবু কাছে ছিলে।
আমাদের হৃদয়ের শুভ ইচ্ছাগুলি
তোমার অদৃশ্য সঙ্গী প্রতি মুহূর্তের
জলে স্থলে বায়ুপথে গেছো যেখানেই
হাজার হাজার মাইল দূরে।

পুরন্দর। হাজার হাজার মাইল দূরে
কাজ আর আমোদের ফাঁকে-ফাঁকে
যে-ছায়া পড়েছে ;
চেষ্টা আর বিশ্রামের ফাঁকে-ফাঁকে
ইচ্ছা আর ক্লান্তির ফাঁকে-ফাঁকে
যে-ছায়া পড়েছে ;
সেই ছায়া এখনো কি
মনে ক'রে রেখেছে কি
পুরোনো, পুরোনো দিন
পুরোনো, পুরোনো মুখ ?
ভিজে মাটি, ভিজে ধুলো
জড়ো-করা শুকনো পাতা
তারা জড়, তাই স্থির।
তাই তারা চিরকাল
আনে গন্ধ আনে স্মৃতি
আনে স্মৃতি-ভরা দিন
ক্ষয়হীন, অন্তহীন।
জড় তারা, তাই এক
চিরকাল তারা এক।
কিন্তু কি পুরোনো মুখ
রেখেছে কি মনে ক'রে
যে-ছায়া পড়েছে ?

একদিন চুপে-চুপে
নির্জন অবসরে
যে-ছায়া পড়েছে ?

কোরাস। ভয় করিয়ো না।
কথা বলা হ'য়ে গেছে, কথা ধ্রুব, কথা এক,
কথা আজ কর্মে হবে মুঞ্জরিত। ভয় করিয়ো না।

মালতী। করিয়ো না ভয়।
যে-হৃদয়
স্পর্শে তব জেগেছিলো,
স্পর্শ তব লেগেছিলো
যে-হৃদয়ে একদিন,
রয়েছে সে অমলিন
নিঃসঙ্গ নির্ভয়।
সে-হৃদয়
জড় নয়, মৃত নয়
তবু স্থির ;
সে-হৃদয়
অসংশয়
অচঞ্চল, আত্ম-প্রত্যয়ের
নিষ্ঠায় গম্ভীর।
তারে তুমি অপেক্ষায় রাখিয়াছো দীর্ঘদিন—
দীর্ঘ এ-সময়।
এসো আজ অকৃপণ অনবগুণ্ঠনদিনে
করিয়ো না ভয়।

পুরন্দর। হৃদয় কি ঘুরে মরে কথার ধাঁধাঁয়
আপনার শাসনে আপনারে কাঁদায় ?
কথাই কি রাজা তবে
কথাই কি রাজা হবে
বিধিকর্ত্তা শাস্তিদাতা অলঙ্ঘ্য চরম ?

কথাই কি একমাত্র শাশ্বত নিয়ম ?
যে-হৃদয়
কথায় দিয়েছে ধরা সে-ই কি নির্ভয় ?
যে-হৃদয়
চায় আজ কথার আশ্রয়
হয়-তো সময়
সে-কথারে উড়ায়ে অলক্ষিতে
নিয়ে গেছে বিস্মৃতির ধূসর অতীতে।
হয়তো হৃদয়
চায় শুধু স্থিতির আশ্রয়
কারণ রক্তের স্রোতে জাগে তার মৃত্যু-সম ভয়।
হয়তো রক্তের স্রোতে জাগে তার মৃত্যু-সম ভয়
তাই সর্বনাশা
ধ্বংস হ'তে আত্মরক্ষা-আশা
যে-কথা গিয়েছে স'রে
আঁকড়িয়া ধ'রে
তারে প্রাণপণে। অচঞ্চল নিষ্ঠায় সে চায় স্থিতি
ভুলে যেতে চায় দূর ধূসর বিস্মৃতি,
যদি বা হৃদয়
অন্য কোনো কথা কয়
আজিকার বসন্ত-বাতাসে
সেই সর্বনাশে
ভুলে যেতে চায়
নিষ্ঠুর নিষ্ঠায়।
আমাদের শক্তি নেই, নেই দুঃসাহস,
আমরা যুক্তির বশ, আমরা বুদ্ধির বশ,
আত্ম-সার্থকতা চেয়ে আত্ম-সম্মানের
ভিখারি আমরা। এই আত্ম-সম্মানেরে
অক্ষত রাখিবে ব'লে অনুরাধা রায়
হয়তো প্রতিষ্ঠিত নিশ্চল নিষ্ঠায়।

কোরাস। অনুরাধা, কথা ব'লো। আমরা উৎসুক
আমরা অপেক্ষমান। সংশয়ে শঙ্কায়
কম্পিত আমরা। আমাদেরে শান্ত করো।

পুরন্দর। এই দ্বিধা এ-মুহূর্তে অসঙ্গত নয়,
তবু এই দ্বিধা হোক্ ক্ষণস্থায়ী। হোক্
নির্দ্বন্দ্ব সকল চিত্ত উন্মুক্ত প্রকাশে।

কোরাস। ব্যগ্র আগ্রহের চোখে চেয়ে আছি মোরা
কখন্ কাঁপিবে তব ওষ্ঠাধর।

পুরন্দর। আমি দেখি
ওষ্ঠাধর কাঁপিছে চেষ্টার নিপীড়নে।

কোরাস। তোমার শরীরে যেন আসন্ন ঝড়ের
শ্বেত মূর্চ্ছা। অনুরাধা, আনো শুভ বাণী।

অনুরাধা। আমি প্রতিশ্রুত, আমি অনুগত।

মালতী। ওরে
বোকা, ভালো ক'রে বল্। যে-কথা রাত্রির
অন্ধকারে তরঙ্গিত, যে-কথা গোপন
স্বপ্নের আকাশ ভ'রে বিদ্যুতের মতো
ব্যথায় চমকি' উঠে, সেই কথা বল্।

অনুরাধা। অদৃষ্টের রশ্মি মোর যাঁর হাতে, তিনি
দাঁড়ায়ে সুমুখে মোর। আমি অনুগত।

পুরন্দর। ধন্য হোক্ তব উচ্চারণ।
এখন নির্দ্বন্দ্ব সব, উন্মুক্ত আকাশ।
আর নাই ভয়
সকল সংশয়
অবসান।

মালতী। তুমি ধন্য, পুরন্দর। যা ছিলো তোমার
অনন্য সম্পূর্ণ অধিকার, তুমি তাও
নিলে ভিক্ষা-সম উপযাচকের মতো
শোভন বিনয়ে আর সুন্দর শ্রদ্ধায়।

পুরন্দর। সকল সংশয়
হ'লো অবসান।
অনুরাধা, করিয়ো না ভয়
তাকাও আমার দিকে, আমি বন্ধু তব।
যে-আত্মসম্মান
তোমারে রেখেছে বেঁধে কথার শৃঙ্খলে
তা থেকে নির্মূল মুক্তি দিলাম তোমারে।
এই উপহার
হয়তো বা অনাদৃত হবে না তোমার
এই আশা নিয়ে আমি
যাই চ'লে ; আর না রহিবে বাধা
তোমার জীবনে। অনুরাধা,
ধন্য আমি তোমার মুক্তির
উপস্থিত উপলক্ষ্য হ'তে পেরে। নির্মম যুক্তির
রক্তচক্ষু দুঃশাসনে করেছিলে ভয় ?
নিপীড়নে নির্যাতনে প্রতারণে
আপনারে ক্ষণে-ক্ষণে
ধ্বংস ক'রে ভেবেছো কি নিয়তি নিষ্ঠুর ?
মনে-মনে মৃত্যুরে কি ভেবেছো মধুর ?
দেখেছি তোমার চোখে
চকিত ঝলকে
সে-যন্ত্রণা, সে-প্রার্থনা
সেই আত্মপ্রতারণা
মহত্ত্বের করুণ বিকৃতি :
আজ মুক্তি নাও
আজ দাও
আপনারে
সেই দেবতারে
যে-দেবতা তোমারি রচনা।
জীবনের যে-মন্ত্রণা

ফোটে ফাল্গুনের ফুলে-ফুলে
তারে ভুলে
রহিয়ো না,
তার দিকে দাও কান, তার দিকে ফুলে দাও প্রাণ,
অন্য-সব হোক্ অবসান
বিস্মৃতির কূলে।

কোরাস। এ কী নব সংবাদের হঠাৎ আভাস ?

মালতী। ভুল, ভুল, সব ভুল। অনুরাধা, বল্,
সব ভুল। প্রতিবাদ কর্। মিথ্যা কথা !
এ-মুহূর্তে না যদি করিস অস্বীকার
তবে এই মিথ্যাই স্থায়ী হবে।

পুরন্দর। না, না,
মিথ্যা নয়। তোমাদের নেই জানা—
এ-কথাটা এতদিন বলা ছিলো মানা—
অবশ্য এ নিয়ে বাগ্‌চি ফিরে এসে কানা-
ঘুষা যদি ক'রে থাকে সে-কথা জানি না।
অন্য কেউ হ'তো যদি, কথাটায় নানা
প্যাঁচ দিয়ে আস্তে-আস্তে বলতো হয়তো।
মোর অত ধৈর্য নেই, শক্তি নেই তত।
এ-কথাটা বিশ্বাস কোরো অন্তত
সরল ভাষায় ক'বো ঠিক কথাটাই
দেবো না কোনোরকম মিথ্যা সাফাই
সাড়ম্বর কবিত্বের দেবো না দোহাই
উপমায় বিশেষণে নেবো না রেহাই
তাতে তোমাদের ভক্তি পাই বা না পাই।
শোনো তবে : মোর সঙ্গে এসেছেন এক
আইরিশ যুবতী। আইনত বিবাহিত
পত্নী মোর। নাম তার আনা।

মালতী। প্রবঞ্চক !
প্রতারক নিষ্ঠুর কপট ! পুরুষের

শপথ কি এতই ভঙ্গুর ! পুরুষের
সত্যভঙ্গ এতই সহজ ! পুরুষের
পশুবৃত্তি মজ্জাগত, শত সভ্যতার
আবর্তনে বিবর্তনে তার উৎপাটন
হ'লো না সম্ভব। ওরে ধূর্ত লজ্জাহীন
ঈশ্বরেরে করো না কি ভয় ?

পুরন্দর। ঈশ্বরেরে ভয় নাই, ভয় মানুষেরে।
ঈশ্বর করেন ক্ষমা, মানুষ নিষ্ঠুর।
মানুষের আঁচড় কামড়
চড় ও চাপড়
মানুষের মতের নখের খোঁচা, আর
সংস্কারের সঙ্কীর্ণতা
অভ্যাসের দাসত্বের সঙ্কীর্ণতা
সব চেয়ে, সব চেয়ে নিষ্ঠুর ভয়ানক।
মানুষের দাঁত আর নখ
পরস্পরে
দিন-রাত ছেঁড়ে খোঁড়ে ;
মানুষের জিভ
কেউটের মতো,
কেউটের মতো বিষে ধারালো সজীব
মানুষের জিভ ;
ঈশ্বরেরে ভয় নাই, ভয় মানুষেরে।
মানুষের ভাষার অতীত ঈশ্বর,
তাঁর স্বর
বাজে বসন্ত বাতাসে
বাজে অশান্ত আকাশে
বাজে স্তব্ধ অন্ধকারে হৃদয়-স্পন্দনে।
আমাদের বুকে বাজে বসন্ত-বাতাস
বাজে স্তব্ধ অন্ধকারে হৃদয়-স্পন্দন
তবু কি শুনিতে পাই ঈশ্বরের স্বর ?

ঈশ্বর মানুষের ভাষার অতীত
তাই তাঁর চোখে
নেই প্রতিশ্রুতি, নেই অঙ্গীকার
নেই প্রতিজ্ঞার ভার,
মন্ত্র নেই, ধর্ম নেই, আইন নেই,
নেই স্বামী, নেই স্ত্রী, নেই তো বিবাহ।
আছে শুধু চিরন্তন মিলন বিরহ
আছে শুধু চিরন্তন উজ্জ্বল বাসনা।

মালতী। এত বড়ো পাপী তুমি, ঈশ্বরের নাম
নিয়ে আপনার ধূর্ত ক্রূর কপটতা
করিছো স্খালন! ভেবেছো কি, মূঢ়
ঈশ্বরের ক্ষমার তোমার আছে আশা?
তিনি কি তোমার মতো ক্লেদাক্ত ঘৃণিত
কীটেরে উৎসর্জন না-ক'রে পারেন!

পুরন্দর। ঈশ্বর মহান,
আছে স্থান
তাঁর কাছে সকলের।
তুমি তো ঈশ্বর নও, মালতী মল্লিক,
তাঁহার মনের ভাব তুমি ঠিক জানো
এমন হয় না মনে। আমিও জানি না।
সুতরাং এ-প্রসঙ্গ থাক্। ঈশ্বরের ক্ষমা
না-ই যদি পাই,
তা-ই নিয়ে শোকের সময়
মনে হয়
এখনো হয়নি।
তবে এটা জানি
ক্ষমা পাবো একজনের,
ঘৃণা-ভরা বর্জনের
ভয় নেই তার কাছে।
আছে

ক্ষমা, আছে ধন্যবাদ
আছে মুক্তি প্রসাদ।
তার চোখে নেই মোর কোনো অপরাধ।
অহিংস নির্মলপ্রাণ অনুরাধা রায়
দেবেন বিদায়
মুক্তির আদেশ মোরে ক্ষমার সরল ঘোষণায়

মালতী। প্রতারক! তুমি তার ভেঙেছো হৃদয়।

অনুরাধা। কেউ কারো ভাঙে না হৃদয়। আপনার
হৃদয় আপনি মোরা উপাড়িয়া ফেলি।
পুরন্দর, আমার অভিনন্দন নিয়ে
যাও তুমি, তুমি সুখী হও। আর কোনো
কথার সময় নাই, এখন সময় নাই আর।

পুরন্দর। বহু ধন্যবাদ।
আর কোনো
কথার সময় নাই
কথার দরকার নাই
এবার তাহ'লে আমি যাই।
এ-রকমই হবে আমি জানিতাম ঠিক।
আমার মনের কথা
তোমারো মনের কথা
তবু তুমি মনে-মনে
মরিতে কি সঙ্গোপনে
বিচার বিতর্ক ইত্যাদির
কর্তব্য দায়িত্ব ইত্যাদির
আবর্তের পাকে?
ভালো হ'লো এই
সব পরিষ্কার হ'লো এক নিমেষেই।
মিছিমিছি হাজার কথায় ঘুরে-ঘুরে
অন্তরের গর্ত খুঁড়ে
লক্ষ ইতস্তত

সেটাই কি ভালো হ'তো ?
ভালো হ'লো এই
যত মিথ্যা অভিযোগ অনুযোগ
অভিমান মার্জনা প্রার্থনা
অকারণ লাঞ্ছনা দুর্ভোগ
অন্যায় অনুশোচনা
অকারণ দীর্ঘশ্বাস, ছলোছলো
চোখ, সব শেষ হ'লো
এক নিমেষেই।
বিস্মৃতির অন্ধকার অতীতের তীরে,
ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেবতার কোলে।

[পুরন্দরের প্রস্থান]

মালতী। অনুরাধা, যেতে দিলি ! ওকে যেতে দিলি !
ধর্, ধর্, ধ'রে রাখ্ ! পালিয়ে গেলো যে !
সর্বনাশ ক'রে গেলো তোর। ডাক্, ডাক্,
ডাক্ চীৎকার ক'রে, তোল্ তোলপাড়
চুরি ক'রে চ'লে গেলো চোর।

অনুরাধা। চ'লে গেলো, চ'লে গেলো।

মালতী। ওরে ভীরু, বোবা,
চুপ ক'রে যেতে দিলি ! জোর ক'রে বল্,
জোর ক'রে কেড়ে আন্, এতে লজ্জা নেই,
ছিঁড়ে নিয়ে আয় তাকে বন্দী-সম তোর
পদতলে।

অনুরাধা। এখন সময় নাই আর।

কোরাস। এ কী দৈবসংঘটন এ কী রূঢ় বিসর্জন
মোরা কি দৈবেরি তবে দাস ?
মোরা কি দৈবের দাস,
অন্ধ মূঢ় অর্থহীন নিরুদ্দেশ্য সংজ্ঞাহীন
আকস্মিক ঘটনার দাস ?
না কি আমাদেরই ভয় শক্তিহীন সংশয়

আমাদেরই দ্বিধা আর লক্ষ্যহীন ক্লীবতার
সংযোগে ঘটায় সর্বনাশ ?
মানুষ কী ক'রে তবে সুখী হ'তে চায় তবে
কেমনে সে সুখী হবে দৈবের যে দাস ?
কেমনে সে সুখী হয় যার মনে ক্লীব ভয়
শক্তিহীন সংশয় আনে সর্বনাশ ?

যবনিকা

ইংরাজি সাহিত্য

ইংরাজি 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধ

ধনোৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্যরূপেরও বিশেষীকরণ লক্ষ্য করবার জিনিষ। গোড়ায় গান আর কবিতা এক জিনিষ ছিল, কবিতা আর নাটকও আলাদা ছিল না, এবং সমগ্র সাহিত্যই ছিল পদ্যে, আইন, নীতি, কৃষিবিদ্যা, বিজ্ঞান সব সুদ্ধ। গদ্য এলো পরে, এবং কালক্রমে গদ্যেরও নানা বিভাগ দেখা দিলো। গদ্যের প্রাথমিক রূপ বানানো গল্পে, তারপর, বিশেষ ক'রে ছাপাখানা আবিষ্কারের পর থেকে, এটা দেখা গেলো যে গদ্যকেও যথেষ্ট কাজে লাগানো যায়। প্রবন্ধ বলতে আজকাল আমরা যা বুঝি তার সূত্রপাত ইয়োরোপে খুব বেশিদিনের কথা নয়। কেননা প্লেটো আরিষ্টটল্‌কে প্রাবন্ধিক না ব'লে শাস্ত্রকার বলাই ভালো, যেহেতু এই দুই মহাপুরুষ এক হিসেবে পরবর্তী সমগ্র সংস্কৃতিরই ভিত্তি; আজকের দিনেও, অন্তত অজ্ঞাতসারে, এঁদের একজনের অনুসরণ না ক'রে কিছু লেখা বা কোনো বিষয়ে চিন্তা করা নাকি অসম্ভব। কিন্তু প্রবন্ধ বলতে আজকাল আমরা যা বুঝি, তার জন্মদাতা ফরাসি লেখক মন্টেইনকে বলতে হয়। এই প্রবন্ধেরও নানা বিভাগ বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে; ইংরিজি essay আর বাংলা প্রবন্ধ সব সময় এক জিনিস নয়। সেই বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন নাম ইংরিজি ভাষায় আছে, কিন্তু বাংলায় একটি মাত্র শব্দ থাকাতে অসুবিধে হয় বিস্তর। যে গদ্যরচনা কাল্পনিক গল্প নয়, তাকেই বাংলায় আমরা প্রবন্ধ বলি; কিন্তু এ তো সহজেই বোঝা যায় যে শ্রীযুক্ত প্রবোধ সেনের ছন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আর প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'মলাট সমালোচনা' এক জাতীয় রচনা নয়; শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা' আর রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যে উপেক্ষিতা'তেও প্রভেদ আছে। একজাতীয় গদ্য পাণ্ডিত্য ও যুক্তিনির্ভর, যা কিছু প্রমাণ করতে চায়, কোনো প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে সে-বিষয়ে পাঠকের সম্মতির প্রত্যাশা রাখে, কি বিশেষ কোনো তত্ত্ব পাঠকের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে। এই ধরণের প্রবন্ধের রূপের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু এ ছাড়াও গদ্যের—ও প্রবন্ধের—অন্য একটা রূপ আছে। সে-গদ্য কিছু প্রমাণ করতে চায় না; শুধু লেখকের কোনো অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি পাঠকের চিত্তে সংক্রামিত করতে চায়; কল্পনাকে তা অস্বীকার করে না, এমনকি দরকার হ'লে ধ্বনির ইন্দ্রজালকেও তার সাহায্যে ডাকে। অবশ্য অনেক সময়েই এই দুই শ্রেণীর ভেদরেখা অস্পষ্ট হ'য়ে পড়ে; এবং পারস্পারিক মেলামেশায় উভয়েরই উপকার হয় ব'লে আমার ধারণা। তবে প্রথম শ্রেণীর গদ্যের উদাহরণ হিসেবে বেকনকে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে ল্যামকে মেনে নিতে বোধ হয় কারুরই বিশেষ আপত্তি হবে না। বেকন্‌-এর পাণ্ডিত্য ও ধীশক্তি অসাধারণ; গূঢ় অর্থসম্পন্ন ক্ষুদ্র বাক্যরচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত; কিন্তু ল্যাম প'ড়ে আনন্দ বেশি পাওয়া যায়। এ-কথা

বলবার উদ্দেশ্য যুক্তিনির্ভর গদ্যকে খাটো করা নয়; বস্তুত, সে-গদ্যের মূল্য এতই নিশ্চিত যে কল্পনা-আশ্রয়ী গদ্যের সার্থকতা সম্বন্ধেই অনেকে সন্দিহান। কিন্তু ল্যাম গদ্যের যে-রূপটি প্রবর্তন করলেন, পরবর্তীকালে তার বিবিধ ও বিচিত্র বিকাশ ইংরিজি সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যদিও তাঁর সমসাময়িক দুই বন্ধু—ডিকুইন্সি ও হ্যাজলিট—কখনো-কখনো অসংলগ্ন ও প্রগল্‌ভ স্বেচ্ছাচারকেই গদ্যের মুক্তি ব'লে চালাতে দ্বিধা করেননি।

গত একশো বছরের মধ্যে ইংরিজি প্রবন্ধ সাহিত্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেছে। গণতন্ত্রের ও সংবাদপত্রের ব্যাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে অন্তত হালকা কি সাময়িক প্রবন্ধের চাহিদাও বেড়ে গেছে খুব; এবং সেই রাশি-রাশি মুদ্রিত বস্তুর মধ্যে কিছু-কিছু সাহিত্যে স্থান পাচ্ছে। এটা লক্ষ্য করবার যে আধুনিক ইংরিজি লেখকরা প্রায় সকলেই সাংবাদিক হিসেবে জীবন আরম্ভ করেন, কেউ-কেউ শেষ পর্যন্ত সাংবাদিক থেকে যান। সাংবাদিক-সাহিত্যিকের কথা ভাবতে গেলে আজ আমাদের শুধু অ্যাডিসন স্টীলের কথা মনে পড়ে না; আধুনিক ইংলণ্ডে প্রায় সমস্ত লেখকই, অন্তত অর্থোপার্জনের জন্য, সাময়িকপত্রের নানাবিধ প্রয়োজন মেটাচ্ছেন কি মিটিয়েছেন। আধুনিক সময়ে ইংরিজি প্রবন্ধ সাহিত্যের এই অসাধারণ স্ফীতির সেটা একটা কারণ নিশ্চয়ই। সাময়িক পত্রে নিয়মিত লিখতে গেলে সব লেখা ভালো হ'তে পারে না, এ তো জানা কথাই; বরং তার এতটা অংশ যে ভালো হয়েছে তাতেই বিস্মিত হ'তে হয়। জি, কে, চেস্টার্টন এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই লেখক সাপ্তাহিক পত্রের দাবি মেটাতে অজস্র লিখে গেছেন, ফ্লীট স্ট্রীটের তাড়াহুড়ো থেকে উৎসারিত তাঁর কোনো-কোনো প্রবন্ধের সত্যি তুলনা নেই। তাঁর প্রথম দিককার গোটা দুই বইয়ের প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধই উৎকৃষ্ট। যে-কোনো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে এমন রচনা যিনি ফাঁদতে পারেন, যা একাধারে সরস ও সারবান, হাস্যমুখর ও চিন্তা-উদ্দীপক, তাঁকে রূপকার ব'লে মানতেই হয়। আসলে, বিষয়টা তাঁর পক্ষে উপলক্ষ্য-মাত্র ছিলো; যে-কোনো ছুতো ধ'রে নিজের জীবন-দর্শনই তিনি উদ্‌ঘাটন ক'রে গেছেন। তাঁর কোনো-কোনো রচনা আবার ছোটো গল্প ধরণের—হয়তো রেখাচিত্র বললেই ঠিক হয়—সেখানে প্রবন্ধের পরিধি অনেকটা বেড়ে গেছে। চেস্টার্টনের এই রচনাগুলিকে যে—শিল্পীর সৃষ্টি বলতে দ্বিধা হয় না, তার জন্য দায়ী তাঁর রোমান ক্যাথলিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, তাঁর বিশিষ্ট রচনারীতি, যাকে শুধু চতুর বললে যথেষ্ট হয় না। ভাষার নানারকম কৌশল তাঁর আয়ত্তে ছিল, কিন্তু তাঁর রীতি শুধু সেই কৌশলগুলির সমষ্টিতে নয়। তা যেন কোনো প্রিয় বন্ধুর কণ্ঠস্বরের মত স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ, তাকে চিনতে ভুল হয় না। এবং নানা রচনার ভিতর দিয়ে নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ ক'রেই প্রকাশ করেছেন, তাঁর বিরাট বপু থেকে আরম্ভ ক'রে ছোটোখাটো মুদ্রাদোষ পর্যন্ত সব মিলিয়ে একটি জীবন্ত ও অখণ্ড চরিত্র পাঠককে তিনি উপহার দিয়েছেন। তাঁর শেষ বই, তাঁর আত্মজীবনী, যে আমাদের নিরাশ করেছে, কারণই এই যে তাঁর নিজের জীবনচরিত ঐ বইয়ের চাইতে নানা বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তিনি ঢের বেশি ভালো ক'রে ব'লে গেছেন। মন্টেইনের বিখ্যাত কথা, 'It is myself I portray', ল্যাম-এর পরে বোধ হয় তাঁর সম্বন্ধেই প্রযুজ্য।

অথচ তিনি কখনো অনর্থক আত্ম-প্রীতিতে আত্মহারা নন, বিষয় উপলক্ষ্যমাত্র ক'রে নিরুদ্দেশ যাত্রায় উদ্‌ভ্রান্ত হতেও তাঁকে বড়ো দেখা যায় না, সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যক্তিগত না হবার মতো সংযমও তাঁর ছিলো। এ-কথাগুলি তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য প্রাবন্ধিকদের সম্বন্ধে বলা যায় না—ই, ভি, লুকস কি গার্ডিনার কি রবর্ট লিণ্ড, এমন কি চেষ্টারটনের অর্ধাঙ্গ স্বয়ং বেলক্‌-এর রচনাও প্রায়ই 'ব্যক্তিগত' হ'তে গিয়ে স্থৈর্য হারিয়ে ফেলে, কথোপকথনের ভাবটা আনতে গিয়ে অসংলগ্ন হ'য়ে পড়ে। পাঠকের সঙ্গে 'অন্তরঙ্গ' হওয়ার কাজটি সোজা নয়, এঁদের বেশির ভাগ প্রবন্ধ পড়লে এ-কথাই মনে হয়। বেলক্‌ কি লুকসের মতো অতি নিপুণ লেখকের ভালো রচনাকেও তাই শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকতার চাইতে বেশি কিছু বলতে ইচ্ছে করে না।

চেষ্টার্টনের সঙ্গে একমাত্র উপমেয় ম্যাক্স বিয়রবোম, এবং এই দু'জনের মধ্যে কোনো-কোনো পাঠকের বিয়রবোমের দিকেই পক্ষপাত থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কেননা যদিও ১৯২০-র পর তাঁর কোনো প্রবন্ধের বই বেরোয়নি, এবং আমাদের দেশের সাধারণ পাঠক তাঁর হয়তো নামও জানেন না, তার উপর, সব সুদ্ধ প্রবন্ধের সংখ্যাও তাঁর খুব বেশি নয়, তবু এই সুসভ্য নিখুঁত নাগরিকের লেখা একবার যে পড়েছে সে-ই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে স্মরণ করবে। এমন মৃদু বিদ্রূপ, এমন চতুর চাপা হাসি, আর রচনার এমন উজ্জ্বল শালীনতা! কত কঠোর পরিশ্রমে বিয়ারবোম তাঁর অপরূপ গদ্য গঠন করেছিলেন তা তাঁর বইগুলি ধারাবাহিকভাবে পড়লেই আঁচ করা যায়। বিশেষ একটি ধরণের গদ্যে তিনি আজও বোধ হয় অতুলনীয়—যে গদ্য যুক্তিনির্ভর নয়, ভাববাহী, অথচ 'কবিত্ব' বর্জ্জিত, যা শ্লেষাত্মক ও ইঙ্গিতময়, সুতরাং বর্ণনার অনুপযোগী এবং চরিত্রচিত্রণের পক্ষে প্রশস্ত। তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি প্রায়ই ছোটো গল্পের পর্যায়ে এসে ঠেকে, কিন্তু চেষ্টার্টনের মতো তিনি কোনো মত প্রচার করতে চান না। অবশ্য কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছোটো গল্পও তিনি লিখেছেন—এবং সেগুলির সঙ্গে তাঁর প্রবন্ধের প্রকৃতিগত পার্থক্য খুব বেশি নয়। চেষ্টার্টনের হাসি প্রায়ই অট্টহাসি, বিয়রবোম গলার স্বর কখনো চড়ান না। তাঁর লেখার যা প্রধান বিশেষত্ব তাকে মেজাজ বলা যেতে পারে। লেখকদের মধ্যে মেজাজ গুণটি বিরল। ব্যক্তিত্ব গুণটি যদিও মহত্তর, তবু ব্যক্তিত্ববান লেখকের চেয়েও মেজাজি লেখক কম দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে এ-পর্যন্ত একজনমাত্র মেজাজি লেখক হয়েছেন—প্রমথ চৌধুরী। এই গুণের জন্যেই ইংরিজি সাহিত্যে বিয়রবোমের একটি বিশিষ্ট স্থান, যদিও ঐতিহাসিক দিক থেকে তিনি বিংশ শতকের প্রথম দিকের একজন 'মাইনর' লেখক মাত্র।

যদিও চেষ্টার্টন মৃত, এবং ম্যাক্স বিয়রবোমে গত কুড়ি বছরের মধ্যে কিছু লেখেননি তাহ'লেও ইংরেজি প্রবন্ধ-সাহিত্যের এই শাখায় নতুন পত্রোদ্গমের বিরাম নেই। লিটন স্ট্রেচির আবির্ভাব ইংরিজি গদ্যসাহিত্যের একটি প্রধান ঘটনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। জীবন-চরিতকার হিসেবে তাঁর আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু তাঁর অনেক ছোটো প্রবন্ধও যে ইংরিজি সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর প্রবন্ধগুলি কোনো অর্থেই 'ব্যক্তিগত' নয়, কিন্তু ইয়োরোপের সামাজিক ও সাহিত্যিক চরিত্র ঘেঁটে যে-সব কাহিনী ও

চরিত্র তিনি উদ্ধার ও সৃষ্টি করেছেন, সেগুলি এতই জীবন্ত যে তাঁর এক-একটি প্রবন্ধ এক-একটি নিখুঁত ছোটো গল্পের মতোই তৃপ্তি দেয়। তাঁর Books and Characters ও Portraits in Miniature এ দুটি বইয়ের রচনাগুলি তাড়াতাড়ি একবার প'ড়ে রেখে দেবার মতো নয়; আস্তে-আস্তে, রসিয়ে-রসিয়ে পড়লে, এবং একাধিকবার পড়লে তবেই তাদের পূর্ণ স্বাদ পাওয়া যায়। স্ট্রেচির অসামান্য প্রতিভা অতীতে প্রাণসঞ্চার করতো, তথ্যকে রস-সাহিত্যে উত্তীর্ণ করতো; মহৎ চরিত্রের মনুষ্যীকরণ ও ক্ষুদ্র চরিত্রের উজ্জীবন, নাট্যকারের এ দুটি গুণই তাঁর ছিলো। তাঁর প্রবন্ধগুলি, তাই, ইতিহাস, জীবনী ও 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যের সংমিশ্রণ। ভারজিনিয়া উল্‌ফের প্রবন্ধগুলিও খানিকটা এই জাতের, যদিও মুখ্যত উপন্যাসিক হওয়ায় তাঁর আলাপ-আলোচনার প্রধান বিষয় সাহিত্য। তাঁর আঁকাবাঁকা ঘোরালো গদ্যের অভিনবত্ব সকলেই স্বীকার করবেন, এবং মতামতের সঙ্গে সব সময় মিলতে না পারলেও তাঁর সাহিত্যিক রচনাগুলি সেই বিশিষ্ট রীতির জন্যই পঠিতব্য ও উপভোগ্য, যদিও কখনো-কখনো তা অকারণ বাক্‌বিস্তারকে প্রশ্রয় দেয়।

এ ছাড়া, যুদ্ধের পরে যে-সব লেখকের অভ্যুদয় হয়, তাঁদের মধ্যে ডি, এইচ্, লরেন্স ও আল্ডস হাক্সলিই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। জে, বি, প্রিস্টলি একবার বলেছিলেন, অল্ডস হক্সলি একজন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধকার, প্রবন্ধগুলি যখন খুব লম্বা হ'য়ে পড়ে তখন সেগুলোকে তিনি উপন্যাস বলেন।' এই উক্তির দ্বিতীয়ার্ধ নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক চলে, কিন্তু প্রথমার্ধ যে সত্যি ১৯৩০ সন পর্যন্ত তা মেনে নিতে কারুরই দ্বিধা ছিল না। অল্ডস হক্সলির রচনায় দুই জাতীয় প্রবন্ধের মিশ্রণ দেখা যায়; তাঁর কোনো প্রবন্ধই সম্পূর্ণ 'ব্যক্তিগত' নয়, আবার নিছক 'একাডেমিক'ও নয়। তবে ব্যক্তিগত দিকে যেখানে ঝোঁক, সেখানেই তাঁর রচনা সব চেয়ে ভালো হয়েছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর ইটালীয় ভ্রমণচিত্রগুলির, এবং Jesting Pilate-এর কোনো-কোনো অংশের উল্লেখ করা যায়। এই প্রবন্ধগুলির সততা ও প্রাঞ্জলতা সত্যি প্রশংসনীয়, এবং আগাগোড়া মানবচরিত্র ও ভৌগলিক পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে যে সচেতন সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তা একজন কৃতী ঔপন্যাসিকেরই উপযুক্ত। কিন্তু তাঁর তত্ত্বমূলক প্রবন্ধের মূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে; কেননা প্রচুর পড়াশুনো ও ভ্রমণ ইত্যাদি ক'রেও কোনো বিষয়েই তিনি আজ পর্যন্ত মন স্থির করতে পারেননি। তাই যে-কোনো সমস্যার বিশ্লেষণ তিনি অতি নিপুণভাবে করলেও বিশ্লেষণ ক'রেই ক্ষান্ত হন ব'লে শেষ পর্যন্ত পাঠকের তৃপ্তি হয় না; দু'পক্ষেই বলবার যা আছে সবই তিনি বলেন, কিন্তু তাঁর নিজের মতটা এত অস্পষ্ট থেকে যায় যে সন্দেহ হয় তাঁর নিজের মত ব'লে কিছু নেই। যে-কোনো বিষয়েই কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে তিনি অক্ষম; এবং যে-বিশ্লেষণী প্রতিভা কেবল কেটে-কুটে অস্ত্র-তন্ত্র উদ্‌ঘাটন করে, কিন্তু তা থেকে নতুন কোনো সঙ্গতির ইঙ্গিত দিতে পারে না, তার ব্যর্থতা স্বতঃসিদ্ধ। হক্সলির নিরপেক্ষতা আসলে অক্ষমতা; পাছে কোনো 'দলে' যোগ দিয়ে ফেলেন, সে-ভয়ে সর্বদাই তিনি তটস্থ, যদিও পাঠকের এ-রকম মনে হ'তে পারে যে কোনো দলে যোগ দেবার মতো যথেষ্ট মনের জোরই তাঁর নেই। দার্শনিক হিসেবে অল্ডস হক্সলি তাই তুচ্ছ, কিন্তু রূপকারী প্রবন্ধ রচনায় তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হয়।

অল্ডস হাক্সলি আর ডি, এইচ, লরেন্সের মতো সম্পূর্ণ বৈপরীত্য সাহিত্যজগতে বড়ো পাওয়া যায় না। হক্সলি অতি সতর্ক, এক পা এগোলে দু'পা পেছোন; আভিজাত্যের নীরক্ত ম্লানতাই তাঁর গর্বের বিষয়। অন্য পক্ষে, লরেন্স একেবারে বেপরোয়া উদ্দাম, এমন নির্মম-ভাবে দানোয়-পাওয়া লেখক পৃথিবীতে কমই দেখা যায়। তাঁর সমস্ত লেখার পিছনে একটা ব্রত ছিল, সে-ব্রত পতিত মানুষকে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়া, এবং তাঁর ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম রচনাও সে-উদ্দেশ্যের উত্তাপ থেকে বঞ্চিত নয়। তাঁর প্রবন্ধের জাতিনির্ণয় করা মুস্কিল; সেগুলি অধ্যাপকীয় কি দার্শনিক তো নয়ই, অথচ তত্ত্ববর্জিত নয়; আবার হালকা গল্প-গুজবের ধরণের একেবারেই নয়—লরেন্সের চাইতে গম্ভীর লেখক কল্পনা করা শক্ত—যদিও সহজ পরিভাষাবর্জিত ভাষায় সাধারণ পাঠকের জন্যই লেখা। 'Fantasia of the Unconscious' কী জাতীয় বই? নাম শুনে যা-ই মনে হোক, দর্শনশাস্ত্রের এলাকায় তা পড়ে না, তাকে কখনো-কখনো কবিতা বলতে লোভ হয়, আবার একশ্রেণীর পাঠকের পক্ষে পাগলের প্রলাপ ব'লে ভুল হওয়াও অসম্ভব নয়। মোটের উপর এমন তীব্র ও দুরন্ত গদ্য আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে; তাছাড়া লরেন্সের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিগুলিও অসাধারণ তো বটেই, এমনকি অতি-সাধারণ। যে-কোনো সাধারণ জিনিস তাঁর চোখে হ'য়ে উঠতো অতি আশ্চর্য, প্রায় অলৌকিক আবিষ্কার। উল্লিখিত গ্রন্থে একটি গাছের দীর্ঘ বর্ণনা আছে, তা কবিতার মতো রোমাঞ্চকর। তাঁর সারদিনিয়ার ভ্রমণ-কাহিনীর পাতায়-পাতায় এই অলৌকিক দৃষ্টির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; ক্ষুদ্র এক সহরের বাজারের বর্ণনা প'ড়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতে হয়। আলু-কুমড়ো যে কোনো মানুষের মনে এমন তীব্র আবেগ সঞ্চার করতে পারে, লরেন্স না পড়লে তা বোঝা শক্ত। এই নিবিড় ও আশ্চর্য অনুভূতির ক্ষমতা তাঁর ক্ষুদ্র প্রবন্ধগুলিতেও বর্তমান; তর্ক করতে গিয়েও এই জাদুকরী উন্মাদনা তাঁর রচনাকে পরিত্যাগ করতো না। আসলে তিনি তর্ক করতেন ঠিক যুক্তি দিয়ে নয়, তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে; এবং যদিও তার ফলে তর্ক তাঁর কখনো-কখনো দুর্বল হ'তো, তবু 'Obscenity and Pornography' সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে প্রামাণ্য রচনা।

অবশ্য এই বিশেষ জাতের প্রবন্ধেও বিংশ শতকে এঁরাই একমাত্র লেখক নন, এবং এঁদের সমসাময়িক ও পরবর্তী আরো অনেক লেখক উল্লেখযোগ্য, যাদের কথা স্থানাভাবে বাদ দিতে হ'লো। মোটের উপর বর্তমান ইংরেজী সাহিত্য এ-ধরণের রচনায় খুবই সমৃদ্ধ, যা অধ্যাপকীয় নয়, গবেষণা কি তত্ত্বমূলক কি দার্শনিক নয়, যা প'ড়ে প্রায় একটি ভালো ছোটো গল্প পড়বার আনন্দ হয়, অথচ যা থেকে আমরা যথেষ্ট শিক্ষিতও হ'তে পারি। সাহিত্যের এই রূপটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং এর বিশেষ মূল্য এই যে সাধারণ পাঠকের পক্ষেও এ ব্যর্থ হয় না। আমরা দেখতে পাই যে সাধারণ বাঙালি পাঠক প্রবন্ধ বলতেই আঁৎকে ওঠেন, সাময়িক পত্রে প্রবন্ধগুলো সাবধানে বাদ দেওয়াটাই এ-দেশে নিয়ম। কিন্তু বাংলায় এই ধরণের রচনা কিছু লেখা হ'তে থাকলে প্রবন্ধ সম্বন্ধে ভয় ভাঙানো সহজ হ'তে পারে।

ভারতীয় সাহিত্য

বাংলা সাহিত্য

একদল ইয়াঙ্কি একবার মিশর দেশে বেড়াতে গেছল। সেখানে গাইডের বিচিত্র ইংরিজিতে মমির বর্ণনা শুনে তারা হতভম্ব। গাইড যতই বলে, 'Mummy, sir, mummy! Corpse, sir, corpse! Six thousand years old!' ততই তারা রেগে আগুন হ'য়ে বলে, 'কী বললে! ছ' হাজার বছরের বাসি মড়া! এই পুরোনো পচা মড়া দেখতে এত দূর দেশে এলুম নাকি! মড়া যদি দেখাতেই হয়, টাটকা মড়া নিয়ে এসো শিগগির।'

মার্ক টোয়েন কথিত এই ভ্রাম্যমাণ সরলচিত্ত ইয়াঙ্কিদের কাণ্ড-কারখানায় না হেসে পারা যায় না, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই মার্কিন মনোভাব আমদানি করতে পারলে ভালোই হ'তো। বাসি মড়ার প্রতি পক্ষপাত এ-দেশের কোনো-কোনো বিশিষ্ট অঞ্চলে সাহিত্যসেবা নামে কথিত। অর্থাৎ একজন লেখক যতদিন না বেশ সম্ভ্রান্তরকমের বাসি মড়া হ'তে পারলেন, ততদিন সাহিত্যের সরকারি পাণ্ডাদের কাছে তাঁর অস্তিত্ব নেই। এবং এ-যোগ্যতা একবার অর্জন করতে পারলে আর-কিছু দরকার করে না; শুধু এরই জোরে যে-কোনো নিকৃষ্ট লেখক বিদ্বজ্জনের সম্মান ও মনোযোগের অধিকারী হন। জীবন ও জীবিতের প্রতি আমাদের ভয় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তবে সাহিত্যই বোধ হয় তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ-স্থল। এ-পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে 'গবেষণা'র নামে আমরা যা পেয়েছি তা হয় ভাষাতত্ত্বের নয় সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা, নয় তো প্রাক্-মাইকেলী যুগের গ্রাম্যগীতির সংগ্রহ। বাংলা দেশের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়েই গ্রাম্যগীতির খাতির খুব বেশি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বৈষ্ণব কবিদেরও দাম চড়া; বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ আবহাওয়ায় 'বাংলা সাহিত্য' বলতে গাথা, ছড়া ও কীর্তনই বোঝায়, এইরকম একটা ধারণা হওয়া অসঙ্গত নয়। অন্যদিকে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নামে যে-ক্ষীণজীবী প্রতিষ্ঠানটি আছে, তা' কেন আছে, না-থাকলে ক্ষতি কী, তার অস্তিত্বেরই বা কোনো পরিচয় পাওয়া যায় কিনা, সাহিত্যিক মহল থেকে এইরকম একটা প্রশ্ন তোলবার এখন সময় এসেছে। উনবিংশ শতকের কোনো-কোনো লেখকের তৈলচিত্র ঝুলিয়ে রাখলে এবং খানকয়েক পুরোনো বই আলমারিতে সাজিয়ে রাখলেই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-এর মতো বৃহৎ একটি আখ্যালাভের যোগ্যতা হয় কিনা সেটাও ভেবে দেখবার বিষয়। এই প্রতিষ্ঠানের যেটুকু ক্রিয়াকলাপ তাও যথেষ্টরকমের বাসি মড়া নিয়ে, জীবিতের সংশ্রব এ অতি সাবধানেই এড়িয়ে চলে। অপেক্ষাকৃত টাটকা মড়ার সঙ্গেও এর বিশেষ যোগাযোগ নেই; সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্বন্ধে কোনোরকম খোঁজখবরই এই ধূলি-ধূসর, শবগন্ধী প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।

এ-ক্ষেত্রে আমরা যদি মার্কিনি অধৈর্য প্রকাশ ক'রে পুরোনো পচা মড়ার বদলে টাটকা তাজা মড়া দাবি করি, এমনকি, একেবারে অশ্লীলরকম জীবিত সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করি—সেটা কি খুব অন্যায় হয়? এতদিনে নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্যের হামাগুড়ি দেবার, তা-তা-মা-মা বলবার সময় পেরিয়ে গেছে, কিন্তু তাকে সাবালক দেখতে আমাদের এ-ঘোর অনিচ্ছা কেন?

— এককালে আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে মড়াকান্নার প্রথা প্রচলিত ছিলো, সম্প্রতি লক্ষ্য করছি সেটা গেছে। এতে অবশ্য উল্লসিত হবার কিছু নেই। কেননা মড়াকান্না দূর হবার কারণ এ-ছাড়া কিছু নয় যে কোনো সাহিত্যিক মারা গেলে কারুরই কিছু এসে যায় না। এখন আমাদের দেশের সাময়িক পত্রিকাগুলোর মধ্যে কতগুলো তো সিনেমা কোম্পানির রক্ষিত, অন্য কয়েকটি পুরোপুরি রাজনৈতিক, এবং ভালো, অর্থাৎ মানসিক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির পাঠ্য যে দু'একটি আছে, তাদের আবার বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করতে গিয়ে এটা মনে থাকে না যে বাংলাদেশও বিশ্বের অংশ। যদি এমন-কোনো লোক থাকেন যিনি শুধু ঐ শ্রেণীর পত্রিকাই পড়েন তাহ'লে এ-খবরটি তিনি হয়তো না-ও জানতে পারেন যে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন। তিনি যদি অতি তরুণ হন, তাহ'লে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় কে, বা কী-কী বই লিখেছেন, তাও তাঁর অজ্ঞাত থাকা অসম্ভব নয়। এই অবজ্ঞার ভাবটা প্রত্যেক বাঙালি লেখককেই অপমান করে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহৎ লেখক ছিলেন না ব'লে তাঁর মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয় এমন অদ্ভুত মত আশা করি কেউ পোষণ করেন না। এক সময়ে কথাসাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট পসার ছিলো, এবং তাঁর বহু রচনার মধ্যে কতগুলো ছোটো গল্প প্রকৃতই ভালো। জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ যিনি সাহিত্যসৃষ্টিতেই নিয়োজিত করেছেন, রবীন্দ্র-পরবর্তী গল্প লেখকদের মধ্যে যাঁকে নিজস্ব একটা স্থান দিতেই হয়, তাঁর মৃত্যুতে আমাদের প্রশান্ত উদাসীনতায় অবাক না হ'য়ে পারা যায় না। কোনো লেখকের মৃত্যুর পরে তাঁকে নিয়ে কিছু আলোচনা হওয়ার প্রথার মধ্যে বোধ হয় পূর্বপুরুষকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের প্রবৃত্তিই নিহিত; তাছাড়া সেই উপলক্ষ্যে তাঁর সারা জীবনের কীর্তি দেশের লোকের সামনে আবার ভালো ক'রে ধরা হয়, তারও একটা মূল্য আছে। কিন্তু আমরা আজকাল সাহিত্য সম্বন্ধে এতই হৃদয়হীনভাবে উদাসীন যে সাহিত্যিককে এই অতি সাধারণ সম্মান দিতেও আমরা ভুলে যাচ্ছি। টাটকা শব সম্বন্ধেও আমাদের আগ্রহ নেই। এই তো সেদিন আর-একটা আঘাত পেলুম 'রামধনু' সম্পাদক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সম্বন্ধে আমাদের শিশু-পত্রিকাগুলির স্বল্পভাষিতায়। শিশুদের জন্য গল্প মনোরঞ্জনবাবু খুবই ভালো লিখতেন, তা প'ড়ে বড়োরাও যথেষ্ট আমোদ পেয়েছেন। তাঁর 'রামধনু' সম্পাদনাতেও বিবেকবুদ্ধির অভাব ছিলো না; আমাদের দেশে শিশুসাহিত্যের দিকে যাঁরা মন দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মনোরঞ্জনবাবু প্রথম শ্রেণীতে পড়েন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অথচ তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে বিশেষ-কোনো সাড়াশব্দ কোনো অঞ্চলেই শোনো গেলো না। এমন কি, শিশু-পত্রিকাগুলিও দায়-সারাভাবে এক লাইনে খবর দিয়েই নিশ্চিন্ত।

মড়াকান্নার পক্ষপাতী কেউই নয়; কিন্তু এই স্বল্পভাষিতা কি নীরবতা থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে আমাদের জাতিগত আকামি এত দিনে দূর হয়েছে। তবে এটা হ'তে পারে যে সমস্ত আকামি, নির্বুদ্ধিতা ও স্থূলতা এক বাংলা সিনেমা শোষণ ক'রে নিয়েছে ব'লে অন্যান্য ক্ষেত্রে তার চালানিতে টান পড়েছে। সত্যেন দত্তের মৃত্যু যাঁরা মনে করতে পারেন তাঁরা বুঝবেন যে এ-অবস্থা বরাবর ছিলো না। ঐ একটি সাহিত্যিকের মৃত্যু, অন্তত আমাদের স্মরণকালের মধ্যে, সমস্ত দেশকে সত্যি ব্যথিত করেছিলো। এমনকি, সত্যেন দত্ত যে-নিজের জীবনে যে-কোনো মৃত্যুতে কবিতা রচনা ক'রে গেছেন, তার উপযুক্ত পুরস্কারও তিনি পেয়েছিলেন—কেননা রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু ক'রে তাঁর এমন-কোনো কবি-বন্ধু ছিলেন না যিনি তাঁকে স্মরণ ক'রে সে-সময়ে কবিতা না লিখেছিলেন। সত্যি বলতে, বাংলা ভাষায় যতগুলি শোকের কবিতা আছে, তার প্রায় সবই হয় চিত্তরঞ্জন নয় সত্যেন দত্তের উপরে। মনে হয়, মৃত্যু উপলক্ষ্যে সত্যেন দত্তের মতো সম্মান শরৎচন্দ্রও পাননি। তার কারণ কি শুধু এই সত্যেন দত্ত যখন মারা যান, তখন তাঁর খ্যাতির চরম? না কি, সে-সময়ে দেশের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো ছিলো ব'লে শোক নিয়ে বিলাস করবার সময় ছিলো? না কি, তখনও বাংলা সিনেমা গজায়নি, এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের, অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষিত লোকের তখন পর্যন্ত সাহিত্যে অল্পবিস্তর উৎসাহ ছিলো? সম্ভবত শেষেরটাই সত্যি।

মৃত্যুতে আমরা সাহিত্যিককে যে সম্মান দেখাই তার মধ্যে এই আশ্বাসই থাকে যে তাঁর ভাষায় যারা কথা বলে তারা তাঁকে ভুলে যাবে না। সেখানেই এই অনুষ্ঠানের মূল্য। যখন দেখি যে একজন লেখকের মৃত্যুতে প্রায় সকলেই নীরব, তখন মনে-মনে এই ভয়ই জাগে যে দু'দিনের মধ্যেই এঁকে দেশের লোক ভুলে যাবে। বলা যেতে পারে যে স্মরণীয় কিছু থাকলে সেটা থাকবেই, আর না-থাকলে হাজার চেষ্টাতেও বিস্মৃতিকে ঠেকানো যাবে না। কিন্তু ও-কথা যে সত্য নয় তার প্রমাণের অভাব নেই। সুকুমার রায়চৌধুরী মারা গেছেন আজ বছর কুড়ি হবে; তাঁর 'আবোল-তাবোল' আর 'হ-য-ব-র-ল' বই দু'টির সঙ্গে আশা করি সকলেই পরিচিত। কিন্তু এটা হয়তো অনেকেই জানেন না যে তাঁর আরো অনেক কবিতা ও গল্প পুরোনো 'সন্দেশে'র পৃষ্ঠাতেই প'ড়ে আছে, এবং সেখানেই বছরের পর বছর সে-সব আশ্চর্য লেখার উপর কবরের মাটি পড়ছে। এই অসাধারণ লেখকের গদ্য পদ্য অন্য সব লেখা এ-পর্যন্তও বইয়ের আকারে বেরলো না, এতে আমাদের শুধু সাহিত্যিক শুভবুদ্ধির নয়, ব্যবসাবুদ্ধিরও অভাব বোঝা যায়; কেননা সে-সব বই হ'তো উভয় অর্থেই সোনার খনির সামিল। আমরা এত বড়ো বর্বর যে অন্য যে-কোনো সভ্য দেশে যে-সব লেখা অমূল্য রত্ন ব'লে বিবেচিত হতো, সে-সব বইয়ের আকারে প্রকাশ করবার গরজ পর্যন্ত আমাদের নেই। 'বিচিত্রা'র প্রথম বছরের একটি সংখ্যায় 'চলচিত্তচঞ্চরী' নামে সুকুমার রায়ের যে-নাটিকাটি বেরোয়, তার তুল্য হাস্যরচনা বাংলা ভাষায় কমই আছে, যদিও তার সঙ্গে আজ কোনো পাঠকের পরিচিত হবারই উপায় নেই। সন্ধান করলে, সুকুমার রায়ের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিও হয়তো কিছু বেরোতে পারে। একে তো আমাদের দারিদ্র্যের শেষ নেই, তার উপর যেগুলো আমাদের

পরম সম্পদ সেগুলো হেলায় হারিয়ে ফেলতেও আমাদের দ্বিধা নেই। একে ক্রিমিনাল নেগ্‌লিজেন্স বলবো, না কি অপার নির্বুদ্ধিতাই বলবো তা ভেবে পাইনে। পুরোনো মন্দির সংরক্ষণের জন্য আইন আছে, কিন্তু সাহিত্য সংরক্ষণের দায়িত্ব কার? কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, কোনো সাহিত্য প্রতিষ্ঠান, কোনো শাসনতন্ত্রই এ দায়িত্ব নেবে না; আস্তে আস্তে আমাদের সাহিত্যের অনেক কীর্তিই শুধু এই কারণে লুপ্ত হ'য়ে যাবে যে কোনো ব্যক্তি সেগুলো মুদ্রাযন্ত্রের কবলিত করবার পরিশ্রমটুকু করলে না।

এ-রকম আরো আছে। ধরুন, আপনি গোবিন্দচন্দ্র দাস আর দেবেন্দ্রনাথ সেন নামে দু'জন বাঙালি কবির নাম শুনেছেন, অথচ তাঁদের কোনো কবিতা পড়েন নি। এখন, আপনার যদি তাঁদের কবিতা পড়বার ইচ্ছা হয়, তাহ'লে আপনি নিশ্চয়ই কোনো বইয়ের দোকানে গিয়ে তাঁদের বই চাইবেন। কিন্তু আপনি শুনে অবাক হবেন যে সে-দোকানে তাঁদের কোনো বই নেই। তারপর এক-এক ক'রে সমস্ত দোকান ঘুরে, সমস্ত কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট চুঁড়েও তাঁদের বই যখন পাবেন না, তখন আপনি এই ভেবে অবাক হবেন যে কোনো বই প্রকাশিত না ক'রেও এঁদের এতটা নাম হ'লো কেমন ক'রে। কিন্তু ততক্ষণে কোনো-না-কোনা দোকানওলা আপনাকে নিশ্চয়ই জানিয়েছে যে এঁদের বই এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। আসলে এই দুই কবির অনেকগুলিই বই বেরিয়েছিলো, কিছুদিন আগেও কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাতে সে-সব দু' আনা চার আনায় বিক্রি হ'তো, আপনার বরাতজোর থাকলে এখনো খুঁজে-পেতে এক আধখানা বার করতে পারেন, যদিও সে-সম্ভাবনা কম। তাঁদের বইয়ের যে পুনর্মুদ্রন হবে, এমন কোনো আশাই দেখা যাচ্ছে না, এমনকি, স্বয়ং সত্যেন দত্তের 'অভ্র-আবীর' বহুদিন ধ'রে ছাপা নেই ব'লে শুনছি। মৃত কবির কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ করা বোধ হয় প্রকাশকের পক্ষে লাভের ব্যাপার নয়; কিন্তু আমরা যারা পাঠক, আমাদের কি কোনো দাবি নেই? কিন্তু কে-ই বা দাবি করছে, আর কার কাছেই বা করছে! অবশ্য এঁরা ইংরেজ কবি হ'লে এতদিনে এঁদের সম্মিলিত কাব্যগ্রন্থ সস্তা দামে বেরিয়ে যেতো, এবং আমরা আড়াই শিলিং মূল্যে তা কিনে এনে সশ্রদ্ধ আগ্রহে পড়তে বসতুম। গোবিন্দ দাসের অনেক অপ্রকাশিত কবিতা তাঁর ছেলেদের কাছে প'ড়ে আছে, সেগুলি বোধ হয় তোরঙ্গের অন্ধকার থেকেই মহাকালের দরবারে চ'লে যাবে। অন্যের কথা আর কী বলবো, মধুসূদন দত্ত পড়তে হ'লেও বসুমতীর দ্বারস্থ হ'তে হয়; এই মহাকবির এখন পর্য্যন্ত কোনো প্রামাণ্য সংস্করণ বেরুলো না। দীনবন্ধু সম্বন্ধেও সেই কথা। প্রাক্-রবীন্দ্র সাহিত্য, বসুমতী সিরিজে যা নেই, তা পড়বার ইচ্ছে হ'লে শুধু বই সংগ্রহ করতেই আপনাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে।

তাছাড়া যে-সব লেখক অল্প বয়সে মারা যান, ভালো হোক, মন্দ হোক, তাঁদের রচনা লুপ্ত হ'য়ে যাওয়াই নিয়তি। সুকুমার সরকারের কথা ভাবছিলুম। 'কল্লোলে'র সময় ও তার পরে এই যুবকের বহু কবিতা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বেরিয়েছিলো। তাঁর লেখায় প্রতিশ্রুতি ছিলো, আর বিশেষ কিছু বোধ হয় ছিলো না। তবু অনেক কবিতার মধ্যে একটি দুটি

ভালো নেই সেও বিশ্বাস করা শক্ত। এবং সেই একটি দুটির খাতিরেই তাঁর সমস্ত কবিতা বইয়ের আকারে বেরুনো দরকার। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে একটি বই বিজ্ঞাপিত হয়েছিলো, কিন্তু সে-বই কখনো বেরুবে এমন আশা করবার এখন আর কোনো কারণ দেখি না। নীলিমা দাস একসময়ে দু'একটি ভালো কবিতা লিখেছিলেন; তিনি মৃত, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কবিতাগুলিরও পাতালপ্রবেশ। পুরানো মাসিকপত্র ঘেঁটে-ঘেঁটে এঁদের কবিতা উদ্ধার করবার মতো সময় কি উৎসাহ কারুরই নেই; আর যদি বা কারো থাকে সে-সব অধুনালুপ্ত মাসিকপত্র এখন পাওয়াই বা যাবে কোথায়? এতই দুর্ভাগা আমরা যে কলকাতায় সকলের অধিগম্য এমন একটি লাইব্রেরি পর্যন্ত নেই যেখানে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত বই ও সাময়িক পত্র সংরক্ষিত হয়, অথচ আমাদের শাসকরা ছাপাখানা থেকে প্রত্যেক বই ও পত্রিকা তিন কপি ক'রে নিচ্ছেন।

সত্যি যাঁরা সাহিত্য ভালোবাসেন, ক্ষুদ্র লেখকও তাঁদের কাছে তুচ্ছ নন; কেননা ক্ষুদ্র লেখকের রচনা চিরস্থায়ী হয়েছে এর দৃষ্টান্ত মোটেও বিরল নয়। যে-সমাজ আত্ম-সচেতন, বুদ্ধিমান ও মর্যাদাবান সেখানে ক্ষুদ্র-মহৎ নির্বিশেষে সমস্ত লেখকই রক্ষিত হন; এবং ক্ষুদ্র লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা মহৎ লেখকের মহৎ রচনার পাশেই স্থান পায়। ইংরিজি ভাষার কাব্যসংকলন গ্রন্থগুলিতে এমন অনেক কবি পাওয়া যায় যাঁরা একটি কি দুটি পদ্যেই স্মরণীয়, কিন্তু সেগুলোও ওরা লুপ্ত হ'তে দেয়নি; এবং সে-সব কবির সমস্ত রচনার ছাপার অক্ষরে অস্তিত্ব আছে ব'লেই রত্নোদ্ধার সম্ভব হয়েছে। এদিকে আমাদের ভাষায় যা-কিছু লেখা হয়েছে তার মধ্যে অনেক-কিছুই, এবং অনেক শ্রেষ্ঠ রচনাও অনায়াসে হারিয়ে যাচ্ছে, আমরা চুপ ক'রে ব'সে ব'সে দেখছি।

সুতরাং আজকাল যাঁরা লিখছেন, বিশেষ, যাঁরা ভালো লিখছেন ব'লে বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ এই যে তাঁরা যেন দয়া ক'রে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন, এবং জীবৎকালেই তাঁদের সমস্ত রচনার নির্ভুল ও প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশ করেন। আরো অনুরোধ যে তাঁরা যেন প্রত্যেকেই একটি ক'রে আত্মজীবনী লিখে যান; কেননা প্রাণান্ত পরিশ্রম ক'রেও বাঙালি লেখকের জীবন সম্বন্ধে কোনো তথ্য সংগ্রহ অনেক সময় অসম্ভব হ'য়ে পড়ে; এমনকি, অনেকক্ষেত্রে জন্মের তারিখটা পর্যন্ত জানা যায় না। এ-পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের কোনো ইতিহাস কি ঐ জাতীয় অন্য কোনো গ্রন্থ বোরোয়নি যেখানে প্রাচীন থেকে আধুনিক পর্যন্ত সমস্ত লেখকদের আর কিছু না হোক্, জন্মের তারিখটা অন্তত পাওয়া যায়। এইভাবে আর কতদিন চলবে!

গুজরাটের নাটক

বার্ষিক সম্মিলনীর রীতি অনুসারে একদা কোন এক মফঃস্বল কলেজের কয়েকজন থিয়েটার-সম্বন্ধে উৎসাহী ছাত্র ঠিক করেছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের কলেজে একটা নাটক অভিনয়

করবেন। কিন্তু তাঁদের সম্মুখে তখুনি দেখা দিল বিস্তর বাধা: কোন নাটক তাঁরা নির্ব্বাচন করবেন, দৃশ্য-পরিকল্পনা এবং ষ্টেজ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারে কোন পথ তাঁরা অনুসরণ করবেন, স্ত্রী-চরিত্রই বা অভিনয় করবেন কারা?

যে-নাটক তাঁরা পছন্দ করবেন তা যদি উচ্চ শ্রেণীর হয়—উচ্চ শ্রেণীর নাটকের সংখ্যা গুজরাটি সাহিত্যে অবশ্য খুবই কম—তবে শ্রোতারা কি ভাবে তাকে নেবে? তাদের মধ্যে ছাত্ররাই বেশী, তারা সম্ভবত ভাববিলাস ও যৌন আবেদনপূর্ণ নাটকের পক্ষপাতী, তারা ভাল নাটক নিয়ে খুব খুসী হবে না, বরং ঠাট্টাই করবে।

ষ্টেজ ও দৃশ্য-পরিকল্পনা সম্বন্ধে যথেষ্ট বিপত্তি আছে! ভাল ষ্টেজ পাওয়া কঠিন, সেজন্য 'রূপক দৃশ্য-পরিকল্পনার' দিকেই বেশী ঝোঁক পড়া স্বাভাবিক।

তারপর স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে অসুবিধা। কোন মেয়েই পুরুষের সঙ্গে অভিনয় করতে সাহস পাবে না এবং যদিই বা এ অভাবনীয় ব্যাপার সম্ভব হয় তবে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ এটা বরদাস্ত করবেন না।

বিশেষ করে আমাদের সমাজে, যেখানে নাট্য সম্বন্ধে এলিজাবেথিয়ান যুগের ধারণা এখনও টিকে আছে, স্ত্রী-চরিত্রের এ-সমস্যাটি খুবই দুরূহ। স্ত্রী-চরিত্র যে মেয়েমানুষরাই সবচেয়ে সুন্দর ভাবে ফুটাতে পারে এ-কথার যাথার্থ্য এদেশে স্বীকৃত হতে এখনও বহু দেরী।

চন্দ্রবেদ মেহতা বা অধ্যাপক ঠাকুরের কোন উৎকৃষ্ট নাটক এই কারণেই অভিনয় করা অসম্ভব যে তাঁরা তাঁদের বইয়ে সুস্পষ্ট ভাবে লিখে দিয়েছেন স্ত্রীচরিত্র যদি মেয়েদের কর্ত্তৃক অভিনীত না হয় তবে তাঁরা তাঁদের কোন নাটকেরই অভিনয় হতে দেবেন না।

আমাদের দেশে এখনও বালকরা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিণত বয়স্কেরা অত্যন্ত অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গী ক'রে স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় করে। খুব সম্প্রতি কাল পর্য্যন্ত গুজরাটী পেশাদারী-থিয়েটারের এরকম করুণ অবস্থা ছিল।

খুবই কম এ্যামেচার থিয়েটার আছে, বম্বে, এলাহাবাদ ও সুরাটের কয়েকটা থিয়েটার ছাড়া, যেখানে 'মিশ্র-অভিনয়' হয়। কখনও কখনও আরও মজাদার ব্যাপার দেখা যায়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বালিকারা সময় সময় কোন নাটকের সব চরিত্রেই (পুরুষ চরিত্রও) নিজেরা অভিনয় করে—ফলে যা দাঁড়ায় তা সম্পূর্ণরূপে হাস্যকর।

ভাল নাটকের সমস্যা ত' আছেই। প্রাচীনকালের গুজরাটী নাট্যকারেরা সংস্কৃত-নাট্য অবলম্বনে 'Pseudo classic' নাটক রচনা করতেন। উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক বাধার সম্মুখীন হওয়ার পর বাণছদ ভাইরেয় সমাজ-সংস্কারমূলক এবং পার্শীদের কৌতুকমূলক নাটকের আবির্ভাব হয়।

বাস্তব ও ব্যঙ্গমূলক নাটকের আবির্ভাব হয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, কিন্তু সে-সব নাটক প্রধানত সহুরে মধ্যবিত্ত লোকদের নিয়েই লেখা। এবং এ শ্রেণীর নাটকের সংখ্যাও নিতান্ত কম। যাঁরা এ শ্রেণীর নাটক লিখেছেন তাঁদের আঙুলে গুণে নাম করা যেতে পারে। যথা রমণ ভাই, রমণলাল দেশাই এবং সম্প্রতি মিঃ মুন্সী। মুন্সীর লেখার মধ্যে অস্কার

ওয়াইল্ডের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, কৌতুকমূলক ঘটনা ও বুদ্ধিদীপ্ত কথোপকথনের সংমিশ্রণে তাঁর লেখা সত্যিকারের রসসৃষ্টি। যশোবন্ত পাণ্ডে মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত বালিকার যে চরিত্র এঁকেছেন, তার মধ্যেও বাহাদুরী যথেষ্ট। নাদালাশের নাটকগুলো অত্যন্ত কবিত্বময় এবং সে কারণে ষ্টেজের উপযোগী নয়। শেলীর 'The' Cenci' যদি ষ্টেজে অভিনয় করা হয় তবে যা হবে নাদালাশের কোন নাটক ষ্টেজে অভিনয় করলে ঠিক সে-রকম ফলই হবে।

চন্দ্রবদন মেহতার "আগ-গাড়ী" (রেলওয়ে শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে এ নাটক রচিত), "নাগা বাবা" (ভিখারীদের নিয়ে লেখা), "সনাতন-ধর্ম্ম" (অস্পৃশ্যতা এ-নাটকের বিষয়বস্তু) এবং আরও কয়েকখানি নাটক যথার্থই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং প্রশংসা পাবার উপযুক্ত। চন্দ্রবদন নাট্যকার ছাড়াও অভিনেতা ও প্রযোজক। থিয়েটার সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান সাক্ষাৎ এবং নিখুঁত। দক্ষ এ্যামেচার অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাহায্যে যখনই তিনি আগ-গাড়ীর মত নাটক করিয়েছেন, তখনই তা যথেষ্ট সাফল্য অর্জ্জন করেছে। বিষয়বস্তু এবং বর্ণনা পদ্ধতিতে তাঁর কয়েকটা ভাল নাটক 'প্রলেটারিয়ান' পর্য্যায়ভুক্ত কিন্তু 'প্রলেটারিয়ান' শ্রোতৃবর্গকে এ-ধরণের নাটক কি পরিমাণে আনন্দ দেবে সে-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। এ নিয়ে কোন চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয়নি, যদিও হওয়া উচিত।

উমাশঙ্কর যোশীর একাঙ্ক বাস্তব নাটকগুলি উত্তর গুজরাটের নিম্ন মধ্যশ্রেণীর ও কৃষক-শ্রেণীর লোকদের নিয়ে লেখা এবং সে-অঞ্চলের ভাষাতেই রচিত। এ-পর্য্যন্ত তাদের অভিনয় হয়নি। গ্রন্থকার আমাকে একদা বলেছিলেন যে যাদের নিয়ে এ নাটকগুলি লেখা তাদেরকে যখন ঐ নাটকগুলো পড়িয়ে শোনানো হয় তারা খুব পছন্দ করে। কিন্তু এই নাটকগুলির অভিনয় হওয়া দরকার, যাতে ক'রে সর্ব্বসাধারণে বুঝতে পারে।

দুটী গুজরাটী নাটক বম্বে রেডিও ষ্টেশন থেকে ব্রড্‌কাষ্ট্‌ করা হয়েছিলো কিন্তু তারা যথাযোগ্য সমাদর পায়নি। কেন পায়নি তা ঠিক ক'রে বলা মুস্কিল। হয়ত তাদের নির্ব্বাচন খুব সুষ্ঠু হয়নি বা তাদের পেছনে উপযুক্ত পরিমাণে সময় ও যত্ন দেওয়া হয়নি বলেই এ রকম হয়েছে। তাছাড়া রেডিও জনসাধারণের কাছে পৌঁছয়ই বা কতটুকু?

সুন্দরামের "কাদাবিয়ান" একাঙ্ক নাটিকায় ষ্টেজের দিক দিয়ে প্রচুর সম্ভাবনা আছে কারণ এ নাটিকাটি রাস্তায় দু'জন ভিখিরী বালিকাকে অবলম্বন ক'রে রচিত। অন্য কয়েক নবীন লেখকের নাটকও অভিনয় করবার উপযোগী।

সর্ব্বসাধারণের কথা ভাবলে এ চিন্তা মনে আসা স্বাভাবিক যে আজকাল তাদের মধ্যে থিয়েটারের উপযোগী কোন উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা। 'ভাবাই' সম্প্রদায়ের ভ্রাম্যমাণ পুরুষ অভিনেতারা পুরুষ ও নারী উভয় চরিত্রই অভিনয় করত, কিন্তু আজকাল তাদেরও বড় একটা দেখা যায় না। রুচিসম্পন্ন লোক এ-ধরণের অসহ্য ন্যাকামী এক মিনিটের জন্যও বরদাস্ত করতে পারে না এবং ভ্রাম্যমাণ-নাটক সম্প্রদায়ের ওপর সহরে অসভ্যতার ও বীভৎসতার ছাপ যে কত দিক দিয়ে দেখা দিয়েছে তা ভাবলে অবাক ও স্তব্ধ হতে হয়।

উপরোক্ত সম্প্রদায়ের অভিনেতারা খোলা জায়গায় অভিনয় করে—ময়দানে বা রাস্তায়। সকলেরই সেখানে বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার। অভিনয় শেষ হ'লে 'আরতি পাত্রে' জনসাধারণের কাছে অর্থ চাওয়া হয়। গ্রামের বা নগরের কোন মাতব্বর লোকেরা এদেরকে সাধারণত তাঁদের বাসায় থাকতে এবং খেতে দেন।

'শহরে পেশাদারী থিয়েটারের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে। মার্ক্সের ভঙ্গীতে বলা চলে যে তাদের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাও এখন আর খুব বেশী নয়। এদের জায়গায় দেখা দিয়েছে 'ফিল্ম' এবং ফিল্ম দেখতেই আজকাল জনসাধারণেরা বেশী আনন্দ পায়। থিয়েটার যারা দেখে, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই নতুন ধনীর দল—শহুরে কেরানী ব্যবসায়ী। তারা পৌরাণিক কাহিনীমূলক ও সম্ভবত ভাবাবিলাসসম্পন্ন নাটকই দেখতে চায়, তাতে চাই মারামারি কাটাকাটি, চাই অনন্ত প্রেম এবং সুদীর্ঘ হা হুতাশ চাই জড়োয়া গয়না কাপড়, চাই ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ! এখন সিনেমা তাদের স্থান অধিকার করেছে—এই যা তফাৎ। এমন নাটকের প্রচলনও আগে ছিল যেখানে গরীব নায়ক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা ধনী ও সদাশয় কাকা বা জ্যাঠার সন্ধান পেত। গান্ধীবাদের ফলে থিয়েটারের নায়করা কিছুদিন আগে খদ্দর পরা আরম্ভ করেছিলো এবং টাকা পয়সা সম্বন্ধে তারা তৎকালে ঐশ্বরিক উদাসীনতা অর্জ্জন করেছিলো। নিউ-থিয়েটার্সের অধিকাংশ ফিল্মে অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতি যে বিমুখতা দেখা যায় ঠিক সে-রকম বিমুখতাই বম্বের নাট্যশালায় দেখা দিয়েছিলো এবং অনেক সামাজিক সমস্যার যে অর্থনৈতিক রূপ আছে তা তখন সকলেই বেমালুম ভুলে গিয়েছিলো।

গুজরাটের থিয়েটারের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। কয়েক মাস আগে আহমেদাবাদে একটা 'থিয়েটার কন্‌ফারেন্স' হয়ে গেছে এবং সে কন্‌ফারেন্সে গুজরাটী থিয়েটারের সমস্যা-সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনাও হয়েছিলো কিন্তু মাত্র আলোচনাতেই সে-সবের সমাপ্তি।

যদি আমাদের কয়েকজন বুদ্ধিমান নবীন নাট্যকার ও মেধা-সম্পন্ন পেশাদারী অভিনেতা এ-সমস্যার দিকে মন দেন এবং প্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখেন তবে নবীন চৈনিক নাট্যকার ও অভিনেতাদের মত তাঁরাও তাঁদের দেশ ও জনসাধারণকে যথেষ্ট আনন্দ ও শিক্ষা পরিবেশন করতে পারবেন। গুজরাটের থিয়েটারের ভবিষ্যৎ তাঁরাই আশাপ্রদ ও উজ্জ্বল করতে পারেন।

হীরালাল গদিওয়ালা

দুটো সভ্যতা মুখোমুখা এসে পড়লে সাধারণতঃ উচ্চতর সভ্যতা বিকীরিত হতে আরম্ভ করে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার উৎস ক্রমশঃ পেছিয়ে প্রাচীন রোম, গ্রীস, মিশর, ব্যাবিলন এবং প্যালেষ্টাইনের সংস্কৃতিতে অনুসন্ধান করা হয়। আবার একই সভ্যতা বিভিন্ন সময়ে দাতা ও গ্রহীতা হতে পারে—পশ্চিম এসিয়ার কাছে খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতকে ঋণী গ্রীস খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে সেইখানেই কৃষ্টির বাহকরূপে দেখা দিয়েছিল। ভারত ও চীন প্রাচ্য ভূখণ্ডে সংস্কৃতি প্রসারের দাবী করতে পারে যদিও বর্ত্তমানে ভারতীয় সভ্যতা বহুল পরিমাণে ইওরোপ দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ এবং তার নিজস্ব সংস্কৃতির একটা মোটা অংশ ভারতে আসে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মারফৎ।

কিন্তু আদানপ্রদানের রীতি প্রায়ই যে খুব প্রীতিপূর্ণ ও নিঃসঙ্কোচ হয় তা নয়, কারণ অপরের কৃষ্টি স্বীকরণের ক্ষমতা সকলের সমান হয় না। একটা অল্প সভ্য জাতের লোহার ছুরি পর্য্যন্ত ধার করবার যোগ্যতা থাকলেও সেলাইয়ের কল চালানর উপযোগী বুদ্ধিবৃত্তি নাও থাকতে পারে। সুতরাং তার পক্ষে সেলাইয়ের কলে ভৌতিক দুরভিসন্ধি আছে একথা বিশ্বাস করা যেমন স্বস্তিকর তেমনি স্বাভাবিক, আর লোহার ছুরিটাই যে সভ্যতার চরমোৎকর্ষ এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া তার কাছে সমীচীন। কিন্তু এপ্রকার সভ্যতা সভ্যসমাজের একপ্রান্তে বনে-জঙ্গলে কোন প্রকারে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারলেও উচ্চতর সভ্যতার মাঝখানে বাঁচা তার সম্ভব হয় না। হয় সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, নয় সে বিবাহজ সংমিশ্রণ দ্বারা রূপান্তরিত হয়—আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং আফ্রিকার বহুলাংশে ইওরোপীয় ও আদিম সভ্যতার সংঘর্ষণে এর নজির সুলভ।

কিন্তু এসিয়া, ওশেনিয়া এবং আফ্রিকার কোন কোন অংশে মাত্র রাষ্ট্রীয় অধিকার স্থাপিত হয়েছে, কারণ প্রাচ্য সভ্যতা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাময়িক সাহায্য নিলেও নিজের বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হয়নি। এককালে হাঁচি, টিকি ও বিশেষ দিনে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণের উপযোগিতা নিয়ে এদেশে যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়েছিল তা হাস্যকর ও করুণ রসাত্মক হলেও তার মূলে এই আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ছিল যদিও এ উপায়ে উন্নততর ইওরোপীয় বিজ্ঞানকে ঠেকানো যায় নি।

এই প্রবন্ধে সঙ্গীতে সংস্কৃতিগত সংঘর্ষ আলোচ্য হওয়ায় এটুকু অবতরণিকার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু সংঘর্ষের কথা বলতে গেলে সঙ্গীতে কি নিয়ে সংঘর্ষ তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে বর্ত্তমানে সঙ্গীতালোচনা পড়লে গানে কথার সর্ব্বাধিপত্য দেখে অনেক সময় ভ্রান্তি হয় যে সঙ্গীত সাহিত্যের একটা শাখা কিনা। এমন কি বাংলা গানেও যে একটা সুর

আছে এবং সুরের ঢঙে যে কোন বৈশিষ্ট্য বা গুরুত্ব থাকতে পারে একথা প্রায়ই মনে থাকে না। সঙ্গীতে কথা ও সুরের তর্ক তুললে ওস্তাদরা বোঝেন অরসিকের পাল্লায় পড়েছেন, কিন্তু নানাবিধ মননশীল যুক্তির সামনে তাঁরা অপ্রস্তুত হয়ে চুপ ক'রে যান। আমার এক সতীর্থ একদিন কোন এক গানের কথা বুঝতে না পেরে মুসলমান ওস্তাদকে কথার মানে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ওস্তাদ কিছু উষ্মা প্রকাশ ক'রে বললেন "গান শিখতে এসেছেন গান শিখুন, কথার মানে জানার কি দরকার"। কথার প্রতি ওস্তাদের যে মমত্ব ছিল না তা নয়, তিনি এত সুন্দর কথা বলতে পারতেন যে ছাত্রেরা প্রায়ই কোন ছুতোয় ক্লাসে গান বন্ধ ক'রে তাঁর গল্প শুনতেন। কিন্তু গানের কথা নিয়ে তর্কের অবতারণা যে সঙ্গীতালোচনায় অল্পাধিক অপ্রাসঙ্গিক সেকথা বুঝতে বা বলতে তাঁর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয়নি। সেদিন এক সুপ্রসিদ্ধা গায়িকাকে কলকাতার এক আসরে গানে কথার অস্পষ্ট উচ্চারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি অতি বিনীতভাবে বলেন "গানে ত কথা বোঝা যায় না, তবে যদি আপনারা চান, আমি এমনি কথাগুলি বলে যাই" এবং কথাগুলি আবৃত্তি ক'রে শুনিয়ে দেন। প্রচ্ছন্ন রসিকতাটা অবশ্য অল্প লোকের কাছেই ধরা পড়েছিল।

গানে কথা ও সুরের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি (বঙ্গশ্রী, অগ্রহায়ণ, '৪৪)। এখানে এক পরিচ্ছেদে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। গানের কথা আর কবিতার কথা ছাপার অক্ষরে এক ব'লে মনে হয়, কান কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। গানের অক্ষরগুলি (syllables) ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ইচ্ছামত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এর ওপোর তান, তাল এবং মিড় নিরঙ্কুশ হ'তে থাকলে কথার যা দুর্দ্দশা হয় তা অবর্ণনীয়। কাব্যের নিজের একটা সুর আছে যা আবৃত্তি ও অভিনয়ে স্ফুট হ'য়ে ওঠে, কিন্তু গান নিষ্ঠুরভাবে তাকে স্বরলিপির দৌত্যে সরিগমধনি'তে পরিণত করে। রবীন্দ্রনাথের গানেও (রেডিও ও গ্রামোফোনে যা শোনা যায়) সব কথা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়েও ধরা যায় না এবং এ প্রকার মনোযোগী ও অধ্যবসায়ী হওয়া গীতরসিকের লক্ষণ নয়। ১৫০।২০০ বছরের নিতান্ত পুরোনো কথা ওস্তাদী সুরের যুগোপযোগী নতুন ঢঙে, কারুকার্য্যে টিকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু যে কোন আধুনিক গানে সুর যদি পুরোনো হয়, কাব্য তাকে বাঁচায় না। পশ্চিমে এক পদ্ধতিতে গজল গাওয়া হয় যাতে মাঝে মাঝে প্রায় সুর-তাল-বিহীন কথার আবৃত্তি চলে এবং তার পরেই সুর ও তাল নিয়ে কারিগুরি আরম্ভ হয়। কিন্তু এটা কথা ও সুরের সমন্বয় নয়, সাময়িক পৃথকীকরণ বলা চলে।

বর্ত্তমানে কথার উপর অত্যাচার হচ্ছে এ কথা মনে হ'লেও বৈদিক ও পরবর্ত্তী যুগের বৈয়াকরনিকেরা এটি স্বাভাবিক ব'লে সমর্থন ক'রে গিয়েছেন। ইওরোপীয় গানে ভারতীয় তান, আলাপ বা বিস্তারের মত কোন বস্তু নেই, সুতরাং আশা করা যেতে পারে কথার মর্যাদা কিছু থাকবে* কিন্তু সেখানেও এই সমস্যা।

* Plato—In them (Greek music), at any rate, you can hardly deny an ethical character since there the words determine the music.

Philalethes—Not so much as with you, for with us the music is more important than the words. And perhaps that is as well, for, as our songs are sung, we can seldom hear the words at all."

—LOWES DICKINSON—*After Two Thousand Years*, p. 158.

" With us to-day a song is primarily regarded as a musical composition in which the words are a secondary consideration, and the composer is at liberty to give to each syllable any quantity of duration he may choose." —GRAY—*History of Music*, p. 10.

ইওরোপে নানা ভাষার গান রয়েছে, তা নিয়ে সঙ্গীতে ভিন্নত্বের সৃষ্টি হয়নি তার প্রমাণ আছে।

" Up to the end of the eighteenth century, from Lisbon to St. Petersburg, from London to Palermo, one uniform musical speech prevailed and the same composers were appreciated throughout the civilized world without national distinctions or reservations. . . . The uniform musical speech of the eighteenth century gives way to a great extent to idioms or dialects which, if not actually unintelligible to other races, can only be fully appreciated by those who share the same cultural traditions, or else possess a temperamental affinity to them. For example, the music of Schumann can never be completely understood by the average Italian, that of Ravel by a typical German, or that of Vaughan Williams by the ordinary Frenchman. The subtle psychological associations, the intimate suggestions and hidden allusions, so to speak, which largely constitute them various appeals, will inevitably escape the alien listener."—GRAY—*The History of Music*.

কিন্তু এটা উনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপের সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যের কথা। বিংশ শতাব্দীতে রেডিয়োর কল্যাণে জাতীয়ত্ব বজায় থাকবে কিনা এবং থাকলে কি ভাবে বা কতটুকু থাকবে তাও প্রায় ভাববার সময় হ'য়ে এল। দেখে শুনে মনে হয় সঙ্গীতে বিজ্ঞানের মত ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা থাকলেও জাতীয় পরিচয় ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হ'য়ে আসবে।

এইটে যদি মেনে নেওয়া যায় যে সুরের রূপ, রচনা এবং ভঙ্গিই গানের প্রাণ এবং বাংলা গানের উৎকর্ষকে বাংলা ঢঙের দিক দিয়েই বিচার করা উচিত, আমরা প্রাদেশিক গোঁড়ামি ও ক্ষুদ্রতার হাত থেকে নিজেদের স্বচ্ছন্দে মুক্ত রাখতে পারি। আমাদের রাগরাগিণীর সুদূরবর্ত্তী উৎস হ'ল গ্রামগীতি (লেখকের Problems of Hindustani Music দ্রষ্টব্য) এবং সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষে সুরের মধ্যে গভীর ঐক্য ও সাদৃশ্য বর্ত্তমান (দক্ষিণী গায়কের গান শুনলে সমগ্র ভারতব্যাপী একটি অখণ্ড সঙ্গীত সংস্কৃতির পরিচয় সংগ্রহ করা শক্ত হবে না) প্রাদেশিক রুচিবৈচিত্র্য সত্ত্বেও একগোষ্ঠিত্ব নির্ণয়ে, খুব বেশী পরিশ্রম করতে হয় না। সুর দেশ দেশান্তর অতি সহজেই পরিভ্রমণ করে; ইতিহাসে জিপসিরা ছেলে চুরির সঙ্গে সুরও

চুরি ক'রে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যুক্ত প্রদেশের নৌটঙ্কি, রাস বা রামলীলার সঙ্গে বাংলা দেশের যাত্রার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

কিন্তু সংস্কৃতিসাম্য থাকলেও সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধির প্রতি ভারতীয় প্রদেশগুলি সমান মনোযোগ দেয়নি। পশ্চিমে কয়েক শতাব্দী ধরে, এই সুরচর্চ্চা বিশেষ ক'রে তার ঘরোয়ানা গাইয়েদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, তাই হিন্দুস্থানী গান তার সুরে, ষ্টাইলে, কারু-সুরবিন্যাসে, সূক্ষ্মান্তর স্বরপ্রয়োগে অদ্বিতীয় হ'য়ে উঠল। কারণটা নিতান্ত মামুলি, অর্থাৎ প্রতিভার প্রয়োগ, নিষ্ঠা ও সাধনা—ঠিক যে কারণে বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেয়েছে। বাংলা দেশে মাল মসলা থাকতেও তার ব্যবহার ও চর্চ্চা হয়নি এবং দুঃখ হয় এই ভেবে যে যে সব রাগের মূল গ্রাম্যসুর বাংলারই নিজস্ব তাও হিন্দুস্থানী ওস্তাদরা আত্মসাৎ ক'রে সুরসমৃদ্ধিতে লাগিয়েছেন।

এটা ঠিক যে হিন্দুস্থানী ওস্তাদী গানেও ভাষার ব্যবহার আছে এবং এই প্রশ্ন মনে ওঠা অসঙ্গত নয় যে গানে কথার যদি গুরুত্বই নেই তবে ভাষার কথা তোলা কেন। উত্তর এই গত চার পাঁচশ বছর প্রধানতঃ ব্রজ ভাষার আশ্রয়ে হিন্দুস্থানী সুরচর্চ্চা চলেছে। অনবরত ঘষা মাজার ফলে এই ভাষায় শব্দের সাঙ্গীতিক নিয়ন্ত্রণ বা বিকৃতি এত সহজ ও স্বাভাবিক হ'য়ে পড়েছে যে, ব্রজভাষা এখন কথিত ভাষা না হ'লেও আধুনিক হিন্দী ভাষাতেও গান এত সুললিত ও সাবলীল হয় না। সঙ্গীতের ইতিহাসে এ একটা অভিনব ব্যাপার। এক অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত ভাষাকে উচ্চসঙ্গীত এমনভাবে আঁকড়ে রইল, যে মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বাংলা এবং আধুনিক হিন্দী এ ভাষার স্থান পূর্ণ করতে পারল না। অন্যদিক দিয়ে দেখলে এটা প্রাদেশিক ঈর্ষ্যা দূরীকরণে সাহায্যই করবে, কারণ সব প্রদেশেই এ গানের ভিত্তি ও শাখাস্থানীয় জনসঙ্গীত রইল কিন্তু কোন প্রদেশই তার ভাষার একাধিপত্য পেল না।

তাই প্রায় দুশোবছর আগে শ্রদ্ধা ও আনন্দে বাংলাদেশ যখন ওস্তাদী গানের সম্যক পরিচিতি লাভ করতে আরম্ভ করে তখন প্যাক্টের কথাও কেউ ভাবতে পারেনি, কারণ ভাষাগত কোন সংঘর্ষ সেখানে উপস্থিত হয়নি (উচ্চারণের প্রতি একটু মনোযোগ রাখলে ওস্তাদী হিন্দুস্থানী গানে ভাষাশিক্ষার বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই)। সাধনা ও একাগ্রতার ফলে যা বড় হয়েছে তার কাছ থেকে শিখতে লজ্জা হবে কেন? বিশ্বের কৃষ্টিসংহতি স্বীকার করেই রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বড় হয়েছিলেন। আর বর্তমান ভারতীয় কৃষ্টিতে বাংলার দান এত কম নয় যে বাইরে থেকে কিছু নিতে গেলেই লজ্জায় বিবর্ণ হ'য়ে যেতে হবে। পনেরো আনা বিদেশী ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস ক'রে যদি ভারতীয়ত্ব তথা প্রাদেশিকত্ব অটুট থাকে তাহ'লে দুটো সুরপ্রধান হিন্দুস্থানী গানে জাতীয় বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হবে না এটা আশা করা যায়। বাংলা গানে যা কিছু শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে তার প্রায় সমস্তটাই এই বর্ত্তমানে অতিনিন্দিত হিন্দুস্থানী গান থেকে নেওয়া। পশ্চিমের সাধারণ গাইয়ের (যা যে কোনদিন দিল্লী বম্বের ব্রডকাষ্টিং-এ শোনা যায়) বা রাস্তায় পথচারীর গান শুনলে সুররসিকের বুঝতে পারা শক্ত হবে না সুর-মাধুর্য্যের অনুভূতি পশ্চিমী সমাজে কতদূর অন্তঃসলিলা (এমন কি কথোপকথনের ভাষা কত

সুন্দর ও সুঠাম তা শোনা যেতে পারে দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ'র টঙ্গাওয়ালার শব্দবিন্যাসে)। একদিন যখন বাংলা গানের ইতিহাস লেখা হবে আধুনিক বাংলা গানের চালে গহরজান প্রমুখ বাংলাদেশবাসিনী বাইদের দানের যথার্থ মূল্য দিতে পারব আর এটা বুঝতে শিখব যে আইন-ষ্টাইনের বা নিউটনের বই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করলে যেমন ক্লাসিকাল বাংলা বিজ্ঞান হয় না, তেমনি হুবহু হিন্দুস্থানী সুরের রীতি বাংলার কথার সঙ্গে প্রবর্ত্তন করলে সেটা ক্লাসিকাল বাংলা গান না হ'য়ে একটা কদর্য্য ক্যারিকেচারে রূপান্তরিত হয়। বাংলা সুরের নিজস্ব ধারা প্রতিদিন ভারতীয় ও বিদেশী সুরসম্পদে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠছে। কথা ও সুরের সমীকৃত অবস্থা যদিই বা সম্ভব হয় সেটা সঙ্গীত বা কাব্যের কোনটারই উচ্চস্তরে পৌঁছয় না। ভারতীয় সুরকৃষ্টিতে বাঙালী তার চরিত্রের সৌকুমার্য্য ও চালাকি-হীন বুদ্ধির দ্বারা হয়ত যা একদিন দেবে তা তার সৌন্দর্য্য প্রবন্ধ লিখে প্রচার ও প্রমাণ করতে হবে না। বিশেষ ক'রে আজ সাম্প্রদায়িক কলহের দিনে ভাবতেও ভাল লাগে যে সমগ্র হিন্দুস্থান যা উচ্চসঙ্গীত ব'লে মেনে নিয়েছে তাতে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি এমন অবিচ্ছেদ্য ও অন্তরঙ্গভাবে মিশেছে যে তফাৎ করা অসম্ভব তার কতটুকু হিন্দু আর কতখানি মুসলমান।

প্রবন্ধের গোড়ায় সভ্যতা-সংঘর্ষের উল্লেখ করা হয়েছিল। যেহেতু আমরা সকলেই ভারতীয়, আন্তপ্রাদেশিক লেনদেনে কৃষ্টিসংঘাতের আশঙ্কা অতি অল্প। কিন্তু রেডিওপ্রমুখাৎ সর্ব্বলোকের সঙ্গীত প্রতিদিন মনে ও শ্রবণে যে প্রভাব বিস্তার করবে তার সম্বন্ধে এত নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা স্বীকরণে ও আত্মসাতে দক্ষ, তা নইলে বহুপূর্ব্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে প্রাচ্য সংস্কৃতি লুপ্ত হোত। ইওরোপকে স্বীকার ক'রে ইওরোপের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং তা কার্য্যে পরিণত করতে হ'লে পাশ্চাত্য সদ্‌গুণগুলি আয়ত্ত করতে হবে। কিন্তু বর্তমান ভারত যতদিন নিজের কোন ইসম্ না তৈরী করে পাশ্চাত্য বুলির প্রতিধ্বনি মাত্র হবে ততদিন ইওরোপীয়েরা পরিহাস করবেনই। তাঁরাও আমাদের কাছে তাঁদের নকল চান না। উদাহরণতঃ বর্তমান ইঙ্গ ভারতীয় সাঙ্গীতিক জগাখিচুড়ি সম্বন্ধে Sir Richard Temple'র মন্তব্য :

—" You may import a pair of trousers, a social custom or even a wife but not music, as music is the soul of the people and that you cannot import."

ইওরোপীয় সঙ্গীত মিশ্রণের পূর্ব্বে তার সম্যক পরিচয় থাকা দরকার। একমাত্র উপায় ভারতীয়ত্বে ইওরোপকে স্বীকার ক'রে পরে তাকে অতিক্রম করবার সামর্থ্য অর্জ্জন করা এবং সেটা যে বিশেষ সততা, পরিশ্রম ও সাধনাসাপেক্ষ এটা বলা বাহুল্য।

হেমেন্দ্রলাল রায়

সমালোচনা

THE OXFORD BOOK OF LIGHT VERSE. *Chosen by* W. H. Auden.

ইংরিজিতে হালকা কবিতার সংকলন গ্রন্থ এই প্রথম নয়, আর, এম্ লিওনার্ড সম্পাদিত বুক্ অব্ লাইট ভর্স (এটিও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের) ও ননসচ্ প্রেসের অতুলনীয় উইক-এণ্ড্ বুক্-এর সঙ্গে অনেকেই হয়তো পরিচিত। কবিতা যাঁরা ভালোবাসেন, এ দুটি বই তাঁদের নিত্য সহচর হবার দাবি রাখে; ছুটির দিনে শুয়ে শুয়ে, কিংবা রেলগাড়িতে, কিংবা ক্লান্ত স্নায়ুতে ঘুমের আগে পড়বার মতো এমন বই আর হয় না। এ-দুটি বইয়ের সংগ্রহ যেমন অজস্র তেমনি বিচিত্র, সুতরাং আমি যখন প্রথম অডেন সম্পাদিত একটি নতুন বুক অব্ লাইট ভর্সের খবর শুনলুম, তখন এই ভেবেই অবাক লেগেছিলো যে আরো একটি বই হবার মতো উপাদান ইংরিজি হালকা কাব্যদেহে আছে কিনা। কিন্তু অক্সফোর্ড বুক অব্ লাইট ভর্সের পাতা উল্টিয়ে এটাই প্রথমে লক্ষ্য করলুম যে রচনানির্বাচনে পূর্ববর্তী বই দুটির সঙ্গে এর মিল খুবই কম। সেটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে অডেন হালকা কবিতার নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন, সুতরাং তার পরিধিও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে হালকা কবিতা মানে শুধু ঠাট্টা-ইয়ার্কি নয়, ভাবগৌরব তারও থাকতে পারে। শ্রোতার কি পাঠকের সঙ্গে যে-সমাজে কবির সংযোগ প্রত্যক্ষ, সে-সমাজে সব কবিতাই হালকা, কেননা সব কবিতাই সাধারণ লোকের প্রতিদিনের ভাষাব্যবহার অনুসরণ করে। অডেনের মতে, তাই, এলিজাবেথীয় সময় পর্যন্ত সব কবিতাই হাল্কা। ঐ সময়েই প্রথমে দুরূহ ও 'সাহিত্যিক' কবির আবির্ভাব, যেমন শেক্সপিয়র, মিল্টন, ডান– কারণ সেই সমাজবিপ্লবের সময়ে হালকা কবিতা লিখতে গেলে পুরোনো বিশ্বাস আঁকড়ে ধ'রে গতানুগতিক হ'য়ে পড়তে হয়। অষ্টাদশ শতকে সমাজের স্থৈর্য কিছু ফিরে আসে; রীতিনীতির নির্দিষ্ট আদর্শের ফলেই সে-যুগে মহৎ ব্যঙ্গের জন্ম, এবং হালকা কবিতারও তাই কিছু প্রতিপত্তি দেখা যায়। তারপর রোমান্টিক বিপ্লবের সময়ে হালকা কবিতা আর 'বিশুদ্ধ' কবিতা একেবারেই আলাদা হ'য়ে গেলো, কারণ যন্ত্র-যুগের সূত্রপাতে আধুনিক অবজ্ঞেয় জনসাধারণ গ'ড়ে উঠতে লাগলো, এবং কবিতার পাঠক সংখ্যা দ্রুতবেগে মুষ্টিমেয় সংস্কৃতিবানে এসে ঠেকলো। কাজেই পোয়েটিক ডিকশন-এর বিরুদ্ধে সতেজ অভিযান সত্ত্বেও ওয়ার্ডস্বার্থ ও তাঁর কবিবন্ধুদের রচনা সহজবোধ্য নয়, শেলি তো দুরূহতম কবিদের অন্যতম। ব্যতিক্রম এক বায়রন, কেননা বায়রন আসলে আঠারো শতকী মেজাজের উত্তরাধিকারী; তাই কবিতার ভাষা সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্বার্থের মতামতে আস্থা না রেখেও—কিংবা না-রাখবার জন্যেই—তিনিই এমন কবিতা লিখেছেন যা বৃহত্তর পাঠকমণ্ডলের অধিগম্য, এবং যাকে হালকা কবিতা বলা যেতে পারে। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে যেমন সমাজদেহে, তেমনি কবিতায়, শ্রেণীবিভাগ স্পষ্ট ও কঠিন হ'য়ে উঠলো; হালকা কবিতা তখন হ'লো

রচনার আলাদা একটা জাত, সুসভ্য নাগরিকের বুদ্ধির ব্যায়াম, আর সঙ্গে-সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরাট প্রতিপত্তির একটি তির্যক প্রতিফল দেখা দিলো আবোল-তাবোল পদ্যে, লুইস ক্যারল ও এডওঅর্ড লিয়রে, শিশুপাঠ্য ছড়ায়। সমাজের শ্রেণীভেদের ফলে কবির সঙ্গে পাঠকের কোনো যোগাযোগ আর রইলো না, কবির পাঠক হ'লেন, বলতে গেলে, শুধু অন্য কবিরাই, আর তারই ফলে অবশ্য আজকের দিনে সব ভালো কবিতাই কম কি বেশি দুরূহ।

হালকা কবিতার এই নতুন সংজ্ঞা নিয়ে সুরু করেছেন ব'লে অডেন তাঁর বুক অব্ লাইট ভর্স্‌কে সম্পূর্ণ নতুন করতে পেরেছেন। চসর-এর Miller's Tale ও Wife of Bath's Prologue বৈধ অধিকারেই এখানে স্থান পেয়েছে, পোপ্-এর হৃতকুন্তল কাব্যের সর্গ দুটিও চমৎকার মানিয়েছে। বায়রন-এর ডন জুয়ান থেকে উদ্ধৃতি আরো কিছু বেশি থাকলেই বোধ হয় ভালো হ'তো; কেননা ডন জুয়ানেই বায়রনের প্রকৃত পরিচয়, এবং সাধারণ পাঠক-সমাজে ঐ কাব্যের কিছু বেশি প্রচলন হ'লে বায়রনের নষ্ট খ্যাতির পুনরুদ্ধার হ'তে পারে। এ ছাড়া বেনামি গাথা ও নর্সারি ছড়ার ভাণ্ডার থেকে অডেন মুক্তহস্তে নিয়েছেন; এ-বইয়ে বেনামি রচনার সংখ্যা অসাধারণ রকম বেশি। সব চেয়ে আশ্চর্য লাগলো এই দেখে যে বইয়ের শেষের দিকেও বেনামি রচনার অভাব নেই; বিশেষ কোনো-কোনো কবিতা এতই ভালো যে এই আধুনিক যুগেও যে লেখক আত্মগোপন করতে পেরেছেন তা বিশ্বাস করা শক্ত। এর কতগুলো এসেছে আমেরিকা থেকে নিগ্রো-রূপকথার আবহাওয়া নিয়ে; অন্য কতগুলো প্রত্যক্ষ সমাজ-সমালোচনা, যার সারমর্ম এই ক'টি লাইনে পাওয়া যাবে—

She was poor, but she was honest,
    Victim of the squire's whim:
First he loved her, then he left her,
    And she lost her honest name.

* * *

See him in the splendid mansion,
    Entertaining with the best,
While the girl that he has ruined,
    Entertains a sordid guest.

See him in the House of Commons,
    Making laws to put down crime,
While the victim of his passions
    Trails her way through mud and slime.

* * *

Then they drag her from the river,
    Water from her clothes they wrang,
For they thought that she was drowned;
    But the corpse got up and sang:

'It's the same the whole world over;
It's the poor that gets the blame,
It's the rich that get the pleasure
Isn't it a blooming shame?'

এই লাইনগুলিতে এমন একটি সহজ সরলতা আছে যে এর লেখক আত্মঘাতিনী মেয়েটির সমশ্রেণীর হ'লে অবাক হবার কিছু নেই, এবং সেইজন্তেই হয়তো তাঁর নামটা অজ্ঞাত। কিন্তু নিচের উদ্ধৃতির লেখক—বা লেখিকা—সম্ভবত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর, এবং আত্মপরিচয় গোপন করবার কারণও তাই তাঁর যথেষ্ট। কেননা তিনি যখন হাইড পার্কে গাড়ি চ'ড়ে বেড়াতে যান তখন—

And then I come in sight
Of one against the rails
Whose handsome face lights up so bright
As he my presence hails.

সুতরাং

Riding in the Park,
Riding in the Park;
Love may haunt the Row
And no one ever mark.
Love may bend his bow,
Make two hearts his mark,
No one ever know—
Riding in the Park.

বস্তুত, ইংরিজি কাব্য যাঁর বেশ ভালো পড়া আছে, তিনিও এ-বইয়ে এমন কিছু-কিছু রচনা পাবেন যা তিনি আগে কখনো দেখেননি—এই বেনামি রচনাসংগ্রহ সেদিক থেকে প্রকৃতই মূল্যবান। জ্ঞাত ও বিখ্যাত লেখকরাও হয়তো মাঝে-মাঝে তাঁকে চমকে দেবে; তাছাড়া অনেক পরিচিত এপিগ্রাম ও ছড়া সম্বন্ধে স্মরণশক্তি ঝালিয়ে নেবার সুযোগ তিনি পাবেন। সাম্প্রতিক লেখকদের মধ্যে চেষ্টারটন, বেলক ও 'ক্লেরিহিউ'-স্রষ্টা বেণ্টলি এ-বইয়ে যেটুকু জায়গা নিয়েছেন তার চাইতে বেশি নিলেও ক্ষতি ছিলো না, কেননা ইংরেজি কাব্যের উত্তর-সামরিক যুগে হালকা কবিতা বিশেষ আর লেখা হয়নি। ঐ তিনজনের বহু পংক্তিই উদ্ধৃতির যোগ্য, লোভ সামলে গেলুম, কিন্তু বেণ্টলির লর্ড ক্লাইভ-এর জীবনী উদ্ধৃত না করা একেবারেই অসম্ভব—

What I like about Lord Clive
Is that he is no longer alive.
There is a great deal to be said
For being dead.

এ-বইয়ে একটি আধুনিক কবিতা দেখতে না পেয়ে নিরাশ হলুম। কবিতাটির লেখক অল্ডস হক্সলি, এবং যেহেতু অনেক পাঠকের সেটি মনে না থাকতে পারে, সেইজন্য উইক-এণ্ড্ বুক থেকে সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি :

A milion million spermatozoa,
All of them alive:
Out of their cataclysm but one poor Noah
Dare hope to survive.

And among that billion minus one
Might have chanced to be
Shakespeare, another Newton, a new Donne—
But the One was Me.

Shame to have ousted your betters thus,
Taking ark while the others remained outside!
Better for all of us, froward Homunculus,
If you'd quietly died.

হালকা কবিতার বহুল প্রচারে সমগ্র কাব্যকলারই যথেষ্ট উপকার হওয়া সম্ভব; কেননা এটা বোধ হয় সত্য যে শুধু এই জাতীয় কবিতাই সাধারণ পাঠকের অধিগম্য। আজকাল বেশির ভাগ লোকের মুখেই শোনা যায় যে কবিতার তাঁরা কিছুই বোঝেন না; অথচ তাঁদেরই একজনকে হালকা কবিতার এই সংকলনটি পড়তে দিলে কিছু উপভোগ্য বস্তু তাঁরা নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন। কেননা হালকা কবিতার ভাষা সহজ, লয় দ্রুত, এবং বিষয়বস্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবন—অর্থাৎ অতি প্রত্যক্ষরূপে সামাজিক। হাস্যরস ও লোকশিক্ষা হালকা কবিতার প্রধান উপজীব্য, এবং এ দুটিই সাধারণ পাঠকের কাম্য। হালকা কবিতায় 'কবিত্ব' কম, এবং 'কবিত্ব'ই বেশির ভাগ পাঠকের জুজু। সুতরাং আমার প্রস্তাব এই যে এই জাতীয় কবিতার বহুল প্রচলন দ্বারা পাঠকের এই জুজুর ভয় ভেঙে দেওয়া হোক, তিনি দেখুন যে কবিও সাধারণ সুস্থ ভদ্রলোকের মতো কথাবার্তা কইতে পারেন। তারপর যথেষ্ট মেলামেশা ও অভ্যেসের ফলে হয়তো অন্যরকম কবিতাও তাঁর বোধ্য মনে হ'তে পারে, এমনকি 'কবিত্বে'র মুখোমুখি প'ড়ে গেলেও তিনি হয়তো আর ততটা আঁৎকে উঠবেন না। এইভাবে কবিতার পাঠকসংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে, এবং বর্তমানে বাংলা হালকা কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করা বাঙালি কবির পক্ষে জরুরি দরকার মনে করি।

অবশ্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের মতো সম্বল কি উদ্যম আমাদের দেশে নেই বললেই চলে; ইংরিজি সাহিত্য যাঁর প্রিয়, অক্সফোর্ড প্রেসের কাছে তাঁর ঋণের অন্ত নেই। কিন্তু অক্সফোর্ড বুক অব্ বেঙ্গলি ভর্স বা'র করবার বেলাতেই এঁদের সমস্ত উদ্যম মিইয়ে আসে কেন সেটা জানতে ইচ্ছা করে। গত পাঁচ সাত বছর ধ'রে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গুজব শুনছি, এখন বোধ হয় আশা ছেড়ে দেয়াই ভালো।

বুদ্ধদেব বসু

THE ECONOMIC RECOVERY OF GERMANY *by* C. W. Guilleband (Macmillan, 10/6).

১৯৩০-৩২ সালে পৃথিবীময় যে অর্থনৈতিক সঙ্কট, তার দুর্ভোগ অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় জার্ম্মানীকেই সইতে হয়েছে বেশী। ১৯২১ সালের পরে যখন জার্ম্মানীতে মার্কের দর পড়ে যায় তখন দেশের অর্থসঞ্চয়ও লোপ পেয়েছিল, এবং ভবিষ্যতের সম্বন্ধে এমন আশঙ্কা লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে গাঁথে যে বহুদিন পর্য্যন্ত তার জের চলেছিল। তার ওপর ছিল ক্ষতিপূরণের ধাক্কা। কোটি কোটি টাকার দাবী জার্ম্মানীকে মেটাতে হয়েছে, অথচ জার্ম্মানীর বাণিজ্য বাড়িয়ে পণ্য রপ্তানী ক'রে সে টাকা শোধেও মিত্রপক্ষের আপত্তি ছিল। তার ফলে কিন্তু এই দাঁড়িয়েছিল যে বিদেশে টাকা ধার ক'রে সেই টাকা দিয়েই জার্ম্মানী বিদেশীর ক্ষতিপূরণের দাবী মিটিয়েছে। তাতে জার্ম্মানীর আন্তর্জাতিক ঋণভার যতখানি বেড়ে গেছে, দেশের আভ্যন্তরিক শোষণ ততখানি হয়নি। তবু ১৯৩০-৩২ সালের সঙ্কটে জার্ম্মানী এবং অষ্ট্রিয়াকেই ভুগতে হয়েছে বেশী, এবং জার্ম্মানীর আর্থিক দুর্ব্বলতার জন্যই যে সঙ্কট এগিয়ে এসেছিল, সে বিষয়েও বিশেষ কোন মতভেদ নেই।

বিলেতেও অর্থসঙ্কটের ধাক্কা লেগেছিল—বেকারের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বিশ লক্ষ পেরিয়ে গেল। তবে ইংলণ্ডের ছিল প্রচুর অর্থসম্ভার—সমস্ত বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ব্যবসা। তাই স্বর্ণমান পরিত্যাগ ক'রে, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর ঝোঁক দিয়ে টলতে টলতে ইংলণ্ড কোনমতে সামলে নিল। আমেরিকাও ধাক্কা খেয়েছিল—পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় ধনী হয়েও সেদিন আমেরিকার লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারের প্রান্তদেশে এসে পৌছেছিল। একমাত্র রাশিয়াকে সে দুর্য্যোগ স্পর্শ করেনি, তার কারণও ছিল স্পষ্ট। দুনিয়ায় বাকী সব দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে মুনাফার জন্য, তাই অনাহারে লোক মারা যায়, অথচ বছর বছর লক্ষ লক্ষ মণ গম পুড়িয়ে ফেলা হয়, বিনা বস্ত্রে অর্দ্ধনগ্ন নরনারীর দিন কাটে, অথচ কাপড়ের কলে মজুরেরা বেকার, কল বন্ধ। রাশিয়া তাই মুনাফার এই ভিত্তিকেই করেছিল আঘাত, বলেছিল যে সমাজের জন্য যা প্রয়োজন, তার উৎপাদন করতেই হবে, কারণ ব্যক্তির মুনাফার চেয়ে সমাজের সেবাই সমাজ-সংগঠনের যথার্থ ভিত্তি। ইংলণ্ডে দেখা গিয়েছে যে চাষবাস বন্ধ, কাপড়ের কলকারখানা বন্ধ, কিন্তু মদের ভাঁটী চলে পূরোদমে, কারণ তার মুনাফার কমতি নেই।

জার্ম্মানীকে এ সমস্ত বিপদেরই সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৯৩২ সালের শেষে প্রায় সত্তর লক্ষ লোক বেকার, অর্থাৎ সমস্ত দেশের কর্ম্মীর জন্য তিন ভাগের এক ভাগই কর্ম্মহারা। ব্যাঙ্কগুলি জমে গেছে, ব্যবসা-বাণিজ্য অচল, লোকে ভগ্নোৎসাহ। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রথার ভাঙন এককথায় তখন জার্ম্মানীতে স্পষ্ট। স্বর্ণমান ছাড়বার উপায়ও জার্ম্মানীর নেই, কারণ বাইশ তেইশ সালের স্মৃতি তখনও লোকের মনে সজাগ। ব্যক্তিকেন্দ্রিক মুনাফার খাতিরে উৎপাদনের বদলে সামাজিক উৎপাদন প্রথার চল করতে পারলে সেদিন জার্ম্মানীর সঙ্কট মেটে। কিন্তু বিভ্রান্ত বিভক্ত জার্ম্মানীতে সে বিপ্লব আনবার মতন শক্তিশালী মানুষ কই ?

হিটলারের যে বিস্ময়কর অভ্যুদয়, তার পেছনে ছিল জার্ম্মানীর বিক্ষোভ এবং সঞ্চিত দারিদ্র্য। রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করেই চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী হ'ল—তার প্রধান লক্ষ্য বেকার সমস্যার সমাধান এবং জার্ম্মানীতে নতুন ধন উৎপাদনের ব্যবস্থা। হিটলার যে অতখানি শক্তি হাতে পেয়েছিলেন তার কারণ খুঁজতে গেলে নাজিবাদে প্রথম দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদের যে উপাদান তার কথা মনে করতে হয়। সবাইকে কাজ যোগানো রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য—সকলের রুজীর ব্যবস্থা রাষ্ট্রের কর্ম্মপদ্ধতি। একথায় লক্ষ লক্ষ বেকার যে সহজেই আকৃষ্ট হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? একদিকে বেকারসমস্যা সমাধানের এই আশ্বাস, অন্যদিকে রাজনীতি ক্ষেত্রে ভার্সাইয়ের পরে জার্ম্মানীর উপর যেসব অত্যাচার হয়েছিল তা দূর করবার প্রতিজ্ঞা—এ দুইয়ের যুগ্মটানে নাজিবাদের দ্রুত বিকাশ অনিবার্য্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তার উপর জুটেছিল—ইহুদিদের জব্দ করবার মনোবৃত্তি। হিংসা দিয়ে লোককে যত সহজে খেপিয়ে তোলা যায়, যুক্তি দিয়ে অত সহজে তা করা যায় না। তাই সেদিনকার জার্ম্মানীর প্রধান দুটো সমস্যার সমাধানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হিংসাপ্রবৃত্তির এ বিকাশে হিটলার হ'য়ে উঠলেন জার্ম্মানীর সর্ব্বময় কর্তা।

জার্ম্মানীর আভ্যন্তরীণ বেকারসমস্যা যে হিটলার মেটাতে পেরেছেন তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। জোর ক'রে ধরে ধরে সেনাবাহিনী তৈরী হ'ল, অবশ্য স্বেচ্ছায় যারা এসেছিল তাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্তন হ'ল সমাজ এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের দিক থেকে—অবশ্য সে স্বার্থবিচারে মহাজন ধনিকের স্বার্থ যতদূর সম্ভব বাঁচাবার চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্র এবং সমাজের স্বার্থবিচারে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে গতিসঞ্চার হয়, তার ফলে জার্ম্মান অর্থনীতির বিপ্লবকর পরিবর্ত্তন দেখা দিল। জার্ম্মান রাষ্ট্র বুঝেছিল যে শ্রমিককে বেকার বসিয়ে রাখার চেয়ে অকারণ কাজে লাগানোও ভাল। সেরকম কাজের নতুন নামকরণ হ'ল পিরামিডেনবাও অর্থাৎ মিশরীয় পিরামিডের অর্থনৈতিক সার্থকতা যেমন প্রায় শূন্য, তেমনি ধরণের কাজেও রাষ্ট্র হাত দিল। তারই ফলে হ'ল জার্ম্মানীর নতুন পথ পরিকল্পনা। এ সমস্ত ব্যবসার অর্থ যোগাবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হয়েছে—যে খাজনা বা রাজস্ব দেওয়া হ'ল, তার আগাম রসিদকে অর্থহিসাবে ব্যবহার ক'রে দেশের অর্থঅনটনের সমাধানের চেষ্টা হয়। জার্ম্মান রাষ্ট্রপতিরা এ কথা বুঝেছিলেন যে অর্থপ্রসারণে কোন ভয় নেই, যদি তার পেছনে ব্যবসা-বাণিজ্যের এবং উৎপাদনের শ্রীবৃদ্ধি থাকে। ১৯৩৭ সালের শেষাশেষি আবার সুরু হ'ল অস্ত্রসম্ভারের ব্যবসায়—তাতেও দেশে বেকারসমস্যা খানিকটা ঘুচল, যদিও সেই সঙ্গে দেশের জীবিকার মান কমবার নতুন সম্ভাবনাও দেখা দিল।

জার্ম্মানীর প্রথম চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনা যে সার্থক হয়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তার আদর্শ বা উদ্দেশ্য আমাদের কাছে আপত্তিকর, কিন্তু তাই ব'লে তার সাফল্য সম্বন্ধে ভুল রাখলে চলবে না। এবার সুরু হ'ল দ্বিতীয় চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনা। তার ফলে যুদ্ধব্যবসা এবং পিরামিডেনবাও প্রভৃতির বদলে এবার ঝোঁক পড়ল ব্যবহার্য্য দ্রব্যের ব্যবসার দিকে। নতুন চেষ্টা হ'ল যাতে কাঁচামালের জন্যও জার্ম্মানীকে অন্য কার উপর নির্ভর করতে না হয়, এবং সেদিকে যে আজ জার্ম্মানী খানিকটা সফল হয়েছে তাও স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। নতুন

জার্ম্মান অর্থনীতির নামকরণ হ'ল autarchy বা অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য। কেবল যে যুদ্ধের ভয়েই এ চেষ্টা হয়েছিল তা মনে করলে ভুল হবে, কারণ যুদ্ধের কথা মনে থাকলেও তার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ছিল যে কেমন ক'রে দেশের মধ্যে জিনিষের দর ঠিক রাখা যায়। শ্রমিকের মজুরীর হার বেঁধে দেওয়া চলে।

গিলবো সাহেব এর জন্য বাহাদুরী প্রায় সমস্তটাই হিটলারকে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে রাজস্বের আগাম রসিদ প্রভৃতি যে সব উপায়ে দেশের অর্থসমস্যা মেটানো হয়েছিল, তার সুরু প্রাক-হিটলারী আমলে। পাপেনের গভর্মেণ্টের সাধনার ফল পেলেন হিটলার। সেটা তাঁর সৌভাগ্য, কিন্তু তাই ব'লে কৃতিত্ব সবখানি তাঁর পাওনা নয়। তাছাড়া, ১৯৩২ সালের শেষে পৃথিবীর অর্থসঙ্কট শেষ হ'য়ে আসছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের মোড় তখন ফিরেছে, কাজেই হিটলার কোন কিছু না করলেও জার্ম্মানীর অবস্থার যে খানিকটা উন্নতি হ'ল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবু হিটলারের চেষ্টায় খানিকটা যে কাজ হয়েছে, তাও স্বীকার করা যায়, শুধু প্রশ্ন ওঠে যে ক্ষমতা যে পরিমাণে হিটলার পেয়েছেন, তাঁর সে পরিমাণ ব্যবহার কি তিনি করতে পেরেছেন ?

মিষ্টার গিলবোর বইয়ে আর একটা জিনিষ স্পষ্ট হ'য়ে উঠে নি। গিলবো সাহেবের মতে বর্ত্তমানে যুদ্ধ ব্যবসার উপর আর জার্ম্মানীর শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে না—এখন জার্ম্মান ব্যবসা-বাণিজ্য নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে—কাঁচামালের উৎপাদনের ব্যবসায় যত বাড়বে, জার্ম্মানীরও ততই উন্নতি হবে। একটা প্রশ্ন তবু মেটে না। কারণ ব্যবহার্য্য জিনিষের ব্যবসা এবং উৎপাদনের জিনিষের ব্যবসার মধ্যে জাতির ক্ষমতা কিভাবে ভাগ করা হবে, তা নিয়ে গোল বাধা প্রায় অনিবার্য্য। যদি ব্যবহার জিনিষের দিকে ঝোঁক পড়ে, উৎপাদন জিনিষের উন্নতি পড়ে যাবে, তাতে বিপদ আছে। উল্টো পথেও বিপদ কম নয়। ধনিকের স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রেখে এ প্রশ্নের উত্তর চলবে না, তাই জার্ম্মানীতে ধনিককে বাঁচিয়ে রেখে সমাজের তরফ থেকে উৎপাদনের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। হয় নাজিবাদকে এগিয়ে যেতে হবে, ফলে সাম্যবাদে হবে তার পরিণতি, নয় তো পিছিয়ে আবার সেই পুরোণো ধনতন্ত্রের নৈরাজ্য সুরু হ'য়ে যাবে। বর্ত্তমানে নৈরাজ্য নেই, কিন্তু সমষ্টির স্বার্থও পুরোপুরি দেখা হচ্ছে না, এ দু তরফ নেতিবাদের উপর জাতির অর্থনৈতিক জীবন খুব বেশী দিন টিকতে পারে না। হিটলারের বিপদ সেইখানে, কিন্তু জার্ম্মানী এবং পৃথিবীর সভ্যতার ভরসাও তারই মধ্যে।

সমশের আলি

OVERTURES TO DEATH AND OTHER POEMS *by* Cecil Day Lewis (Cape, 5s.)

১৯৩১ সালে মিঃ লুইস্ লেখেন "From Feathers to Iron"; তারপরে তিনি তিনখানা কবিতার বই, একখানি নাটক ও দুখানা উপন্যাস এবং আরও সমালোচনা গ্রন্থ

লিখেছেন। সুতরাং এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় মোটেই হবে না যদি লেখকের রচনার মধ্যে ক্লান্তির স্পষ্ট ছাপ পড়ে। বইখানা পড়ে বিচার করা খুব দুরূহ না হ'লেও সহজ নয় যে তাঁর কবিতার মধ্যে যে আঙ্গিকী পরিবর্ত্তন ঘটেছে সেটা কতদূর পর্য্যন্ত ক্লান্তিপ্রসূত এবং কতদূরই বা স্বেচ্ছাবিকৃত। উৎকট রাজনৈতিক মনোভঙ্গী খুব বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে ব'লে বোধ হয় তাঁর কবিতা আন্তরিক সহানুভূতি নিরালম্ব হয়ে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে ছন্দ বিকৃতি ও স্বাভাবিক বিষয়বস্তুর আনুগত্যহীনতা ঘটেছে।

কবিতার মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার আবির্ভাবকে আদৌ অপরাধের বস্তু ব'লে বিবেচনা করি না বরং ইদানীং সমাজপ্রগতির উন্নত অবস্থার যুগে বহির্বিক্ষুব্ধ জগতের রাজনৈতিক মননের আগমন অনিবার্যই হয়ে পড়ে। কিন্তু কবিতা লেখার অব্যবহিত পরেই ভেবে দেখা অবশ্য প্রয়োজন যে লেখাটার পিছনে যত বলিষ্ঠ বিষয়বস্তুই থাক-না-কেন সেটা কাব্যের আঙ্গিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ অনুসঙ্গ হয়ে উঠেছে কি-না। কবিকে খুব ক্ষিপ্র হতে হবে যেন তার কবিতার পাঠকের অন্তরায়ণকে ভারবৈষম্যে না ফেলে বরং তার খর্বদৃষ্টি ও ভাবপ্রবণতাকে রাজনৈতিক সচেতনার পরিপূর্তির দিকে যেন নিয়ে যেতে পারে। রাজনৈতিক কাব্যলক্ষণের প্রয়োজনীয়তার পরিমিতি নির্ভর করে কাব্যলক্ষণের মনন ও ভাবপুষ্টতার স্বাভাবগতির উপর। বিষয়বস্তুর উপর খুব বেশী লক্ষ্য রেখে অতিরিক্ত বুদ্ধিবৈদগ্ধ্যের সঙ্গে কাব্যিক গতির ভারসাম্য রাখা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। এ-জন্য মিঃ লুইস্‌ও বিফল হয়েছেন। এর থেকে অডেন-ইসারউড আমার ঢের বেশী ভাল লাগে। এ-প্রসঙ্গে উপরোক্ত যুগ্মলেখকের "On the Frontier" উল্লেখ করা যেতে পারে। লুইস্ কিন্তু এ জাতীয় অন্তর্বিরোধের মধ্যে পড়েছেন। যথা :

" No North-West Passage can be found
To sail those freezing capes around
Nor no smooth by-pass ever laid
Shall that metropolis evade."

কিংবা

" The meshes of the imperious blood
The wind-flown tower, the poets word
Can catch no more than a weak sigh
And ghost of immortality."

" The Volunteer "—কবিতায় মিঃ লুইস্ যে নমুনা দিয়েছেন তা-থেকে স্বদেশ প্রেমিক ছড়ার পার্থক্য বিচার করা যায় না।

" Here in a preached and stranger place
We fight for England free
The good our feathers won for her,
The land they hoped to see."

উপরোক্ত একত্রীক ভাব যে আংশিক স্বেচ্ছাপ্রসূত সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু পরিশেষে " Self-criticism and Answer " কবিতায় তিনি অ্যাপলজি দিয়েছেন " that

never was possessed by divine incontinence." এবং একে সাধু ক্রোধের নাম দিয়ে সমর্থন করেছেন। এক্ষেত্রে পাঠকের মন সহসা ভীষণ বাধা পেয়ে মুষড়ে পড়ে। একটা কবিতার শেষে মিঃ লুইস্ বলেছেন: Nothing is innocence now but to act for life's sake. সম্পূর্ণ প্যাসিফিষ্ট লোক এ-কথা সমর্থন করতে পারে কিন্তু যে কোন কম্যুনিষ্ট, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী অথবা ঘোর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীও স্বীকার করতে বাধ্য যে কেবল ঐহিক জীবনধারণ ভিন্ন অন্য কোন মূল্যবান্ জিনিষ মানুষের আছে। মিঃ লুইস্ প্যাসিফিষ্ট কোমল শয্যায় শুয়ে সাম্যবাদী পোষাকী বুলি আওড়াতে ইচ্ছুক। আমাদের অনেক কবির মধ্যে বিষয়বস্তু ও আন্তরিকতার অন্তর্বৈষম্য প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু এতে কোন কাজই সফল হয় না—না-হয় কবিতা, না-হয় বক্তব্য অনুসিদ্ধান্তের সমাধান।

সুধাময় ভট্টাচার্য্য

IQBAL'S EDUCATIONAL PHILOSOPHY *by* K. G. Saiyidain.

ইকবালের কবি-প্রতিভা অবিসংবাদিত। কবি হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। কীট্সের মত তিনি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কেবলমাত্র কবিই নন; দার্শনিকও বটে।

আবেগের নিবিড়তায় ও শব্দের ললিত ঝঙ্কারে ইকবাল ও শেলীর মধ্যে মিল লক্ষ্যযোগ্য, কিন্তু এ দুজন কবি পরস্পর থেকে অন্যান্য দিক দিয়ে খুবই বিভিন্ন।

বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্নতা থাকা সত্ত্বেও শেলী প্রধানতঃ স্বাপ্নিক; তাঁর Sky-lark-এর মত তিনিও পৃথিবীর নির্ম্মম বাস্তবতা ছাড়িয়ে এক আনন্দময় জগতের যাত্রী, যে জগত আলোকে ও পুলকে, সঙ্গীত, জ্যোচ্ছনা ও অনুভূতিতে ভরপুর। সংক্ষিপ্ত কথায় শেলী সর্ব্বতোভাবে রোমান্টিক।

ইকবাল তা নন। অর্থাৎ ইকবাল শেলীর মত এ-জগতের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা ক'রে কোন মায়ালোকের যাত্রী নন। তিনিও নিঃসন্দেহে আদর্শবাদী তবে তাঁর আদর্শ ও কল্পনার জন্ম আমাদের এই মাটীর পৃথিবীতে, কোন অদৃশ্য সুন্দর রহস্যালোকে নয়।

কিন্তু ইকবালের কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আলোচনা আপাতঃ অবান্তর। কারণ যে পুস্তকের সমালোচনাকল্পে এ-সব কথার অবতারণা তা শিক্ষা-বিষয়ে ইকবালের মতামত অবলম্বন ক'রে রচিত। শিক্ষা-বিষয়ে ইকবালের মতামত বুঝতে হ'লে প্রথমেই ব্যক্তিত্ববাদ সম্বন্ধে ইকবালের ধারণা বোঝা দরকার। বার্ণার্ড শ'র Life-Force এবং নীৎসে ও ইকবাল কল্পিত ব্যক্তিত্ববাদের মধ্যে মিল খুঁজবার জন্য খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টির দরকার পড়ে না। অবশ্যি ব্যক্তিত্ববাদ সম্বন্ধে ইকবালের ধারণা শ'র তুলনায় ব্যাপকতর। ক্ষুদ্রকে বৃহতের মধ্যে, খণ্ডকে অখণ্ডের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিবার কল্পনা ইকবালকে উত্যক্ত করে। যে জিনিষটা আপাততঃ এ বাহ্যিক দৃষ্টিতে ক্ষুদ্রতার মধ্যেও ইকবালের মতে অনন্ত সম্ভাবনা আছে।

ইকবাল নির্ব্বাণ কামনা করেন না, তিনি চান ব্যক্তিত্বের অব্যাহত পরিপূর্ণ সার্থক বিকাশ। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ছাড়া শিক্ষার কোন মূল্য নাই।

প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে : এই ব্যক্তিত্ব কি ভাবে গড়ে উঠবে।

প্রথমতঃ, ইকবাল বলেন, প্রত্যেক মানুষের আত্ম-সচেতনতা সৃষ্টিমূলক হওয়া উচিত এবং তার সেই সৃষ্টিমূলক প্রেরণার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকতার জীবন্ত যোগাযোগ থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়তঃ স্বীয় সম্প্রদায়ের (যার সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের নিগূঢ় সম্পর্ক) ঐতিহ্য অবলম্বন করেই 'নিজত্বের' বিকাশ হওয়া উচিত, অন্যথা কৃত্রিমতা আসার ভয়।

শেষতঃ প্রচুর স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ-কল্পনা হাস্যকর, পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। বন্ধনহীন স্বাধীনতার বিস্তর অসুবিধা আছে, সেজন্য এ-বিষয়ে তীক্ষ্ণ সচেতনতা থাকা আবশ্যক।

ব্যবহার ও আদর্শ, শরীর ও মন, বাস্তব ও কল্পনা এদের মধ্যে আদিকাল থেকেই দ্বন্দ্ব চলে এসেছে। ইকবালও চিরন্তন দ্বন্দ্বের একটা সমাধান খুঁজবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বিশ্বাস তরুণ বয়সে স্বভাবতঃই শরীরের (ব্যবহারিক দিকের) প্রভাব সমধিক কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মনেরও দাবী বাড়ে, এবং ক্রমে ক্রমে মনের দাবী শরীরের দাবীকে ছাড়িয়ে ওঠে। পৃথিবীতেই ইকবালের কল্পনার জন্ম কিন্তু তা ধীরে ধীরে উর্দ্ধমুখী, তারও ডানা আছে। ক্রমবিকাশে ইকবাল আস্থাবান। তিনি মনে করেন মানুষের মধ্যেই ক্রমবিকাশের ধারা নিঃশেষিত নয় এবং আমাদের পৃথিবীও প্রাণহীন জড়বস্তু নয়। ব্যক্তিত্ববাদের যদি যথাযথ বিকাশ হয় তবে একদা মানুষ পৃথিবীর নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি ক'রে এক অখণ্ড বিরাট অন্তহীন জীবনের সন্ধান পাবে। শ'র মত ইকবালও ডারউইনের 'Mechanical Evolution'এ বিশ্বাস করেন না। মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে ক্রমবিকাশের ভাবী ধারা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কিন্তু এ ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র বুদ্ধির মধ্যে দিয়েই সম্ভব নয়, কর্ম্মের দুর্ব্বার ইচ্ছাও এর একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ। চিন্তাশক্তি যদি কাজ করতে প্রেরণা না দেয় বা চিন্তাশক্তি যদি সৃষ্টিমুখী না হয় তবে তার মূল্য কতটা ?

চিন্তাশক্তি যখন হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে মিশে গিয়ে কর্ম্মে রূপান্তরিত হয় তখন থেকেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের সূত্রপাত। হৃদয়ের অস্তিত্ব ইকবাল স্বীকার করেন, বুদ্ধি-বৃত্তির প্রতিও ইকবালের শ্রদ্ধা অপরিসীম। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে এ দুটোর কোনটাকেই ইকবাল উঁচু আসন দেন না। এখানেই তাঁর ভাবধারার বৈশিষ্ট্য। শ'র Life-Force বুদ্ধি ছাড়া আর কোন জিনিষকে সদয় দৃষ্টিতে দেখে না কিন্তু ইকবালের ব্যক্তিত্ববাদ বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা সমভাবে স্বীকার করে। বস্তুতঃ, বুদ্ধি-বিলাসের বিরুদ্ধে ইকবাল তাঁর প্রচণ্ড বিদ্রোহ জানিয়েছেন। যে-প্রেমের ভিত্তি বুদ্ধিতে, তীক্ষ্ণ আত্মোপলব্ধিতে ইকবাল তার পূজারী। তিনি বলেন : "Thus it is love, the intuitive perception of the heart, which gives meaning to life and transforms the intellect into a source of blessing for mankind."

তাঁর বিশ্বাস : "In its highest manifestations, then, love brings about an almost incredible concentration and intensification of human powers and enables mortals to overcome death (disintegration of self), and achieve immortality."

অনিবার্য্যভাবে শেলীর কথা মনে পড়ে। শেলী ছিলেন কেবল Pantheist। তিনি সমস্ত মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, মানব-জাতির জন্যে কোন এক নূতন গ্রহে এক অপূর্ব্ব সুন্দর জীবন অপেক্ষা করছে, প্রেমের অন্তরতম মর্ম্মে প্রবেশ ক'রে মানুষ সেখানে পৌঁছতে পারে।

প্রেমের প্রতি ইকবালেরও দৃষ্টি অনেকটা এরকম কিন্তু ইকবাল প্রেম বলতে যা বোঝেন তার উদ্ভব হৃদয় ও বুদ্ধির আদর্শ সংমিশ্রণে এবং তা পৃথিবী ছাড়িয়ে আকাশের দিকে ধাবমান নয়। তাই এখানে ইকবাল যুগপৎ কবি ও দার্শনিক।

ব্যক্তিত্ব-বিকাশের প্রতি ইকবালের এই সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিধ্বনি যশস্বী ইংরেজ লেখক আল্ডস হাক্সলীর মধ্যে পাওয়া যায়। হাক্সলীর 'Eyeless in Gaza' বইয়ের নায়ক Walter Bidlake. প্রথম যৌবনে তার ধারণা ছিল খালি বুদ্ধির বিকৃত চর্চ্চায় ও শরীরের শাসনহীন সুখেই জীবনের একমাত্র সার্থকতা কিন্তু জীবনের সঙ্গে যখন তার পরিচয় ঘনিষ্ট হয় তখন সহসা একদিন সে আবিষ্কার করে যে মানুষের হৃদয় বলেও একটা জিনিষ আছে। ঠিক এই ভাবেরই অনুরণন হাক্সলীর 'Point Counter Point এর Mark Rampion' চরিত্রে দেখা যায়।

ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ক্রমিকধারা এখানেই আপাততঃ স্থগিত।

কিন্তু ব্যক্তিত্ব-বিকাশ অবিকল এই পন্থায় যাতে সম্ভব হয় সেজন্য ব্যক্তিবিশেষের কি কি চারিত্রিক গুণ থাকা দরকার? সিনিকদের পক্ষে এ-প্রশ্ন করা অসম্ভব নয়।

ইকবাল বলেন কর্ম্মপ্রিয়তা ছাড়া ব্যক্তিত্ব-বিকাশ অভাবনীয়, যারা কাজ করতে অপারগ তারা কদাপি স্রষ্টা হতে পারে না এবং সেই কারণে আদর্শ 'নিজত্বের'ও অধিকারী হতে পারে না।

এই কর্ম্মপ্রিয়তা প্রকৃতির রহস্য-উদ্ঘাটন নিমিত্ত প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ জ্ঞানবৃদ্ধির সম্ভাবনা কম, ফলে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য।

এই দুটি গুণকে সফল করবার জন্য প্রধানতঃ চাই নৈতিক সাহস। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অশেষ দুরন্ত অভিযানেই নৈতিক সাহসের বৈশিষ্ট্য। সত্যকে সত্য ব'লে স্বীকার করবার জন্য মনের বল চাই, চাই অদম্য সাহস।

নৈতিক সাহস থাকবার সঙ্গে সঙ্গে সহিষ্ণুতাও থাকা দরকার। নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ-পন্থা যেন অপরের ন্যায্য দাবীকে ধূলিলুণ্ঠিত না করে।

শেষতঃ চাই পার্থিব সমস্ত-কিছু থেকে একপ্রকারের আধ্যাত্মিক বিচ্ছিন্নতা। ধনসম্পদের মোহে যদি কোন মানুষের মন আচ্ছন্ন হয় তবে তার ব্যক্তিত্বের সেখানেই পরাজয়।

ব্যক্তি বিশেষের প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে ইকবালের ধারণা মোটামুটি এই। আদর্শ হিসেবে এর খুঁত ধরা কঠিন কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য কিনা, সন্দেহের কথা।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি যে প্রভূত অনিষ্টকারী এ বিষয়ে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই একমত। কিন্তু কেমন ক'রে এর উন্নতি করা যায় এ নিয়ে এ পর্য্যন্ত অনেক বাক-বিতণ্ডা চলেছে তবুও কোন সন্তোষজনক পন্থা (বোধ হয় ওয়ার্দ্ধা-স্কীম ছাড়া) পাওয়া যায় নি।

ইকবালের পাণ্ডিত্য প্রগাঢ় ও চিন্তাশীলতা গভীর। কিন্তু শিক্ষা-বিষয়ে তাঁর মতামত সম্পূর্ণভাবে আদর্শবাদীর মতামত। তিনি আগের থেকেই ধরে নিয়েছেন যে সব মানুষই নিজের ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সমপরিমাণে উৎসাহী ও প্রত্যেকেই এক একজন দার্শনিক।

শিক্ষা সম্বন্ধে ইকবালের আদর্শ মহৎ, সন্দেহ নাই। খালি চিন্তা হিসাবে এর মূল্যও অসাধারণ ও তাঁর এ আদর্শ-ব্যাখ্যা দর্শন-সাহিত্যকেও অবশ্যি সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু আমাদের এ হতভাগ্য দেশের যা অবস্থা তা দেখে আশঙ্কা হয় যে, ইকবালের শিক্ষা-আদর্শের গূঢ় মর্ম্ম অজ্ঞ ও মূঢ় ভারতবাসী ঠিক বুঝতে পারবে না। তাদের জন্য ওয়ার্দ্ধা-স্কীমই বরং ঢের বেশী কার্য্যকরী।

তা ব'লে এ কথা মনে করলে ভুল হবে, ইকবালের শিক্ষা-আদর্শ চিন্তা জগতে কিছু স্থায়ী দান করতে পারে নাই। দর্শন-সাহিত্যে এর মূল্য স্বীকৃত হবেই এবং যাঁরা প্রকৃত চিন্তাশীল তাঁরা ইকবালের শিক্ষা-আদর্শকে সর্ব্বদাই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবেন। এ দিক দিয়ে এ গ্রন্থের মূল্য যথেষ্ট।

গ্রন্থ-লেখকের ইংরেজী লিখবার ভঙ্গীটি খুব উঁচুদরের না হ'লেও সাধারণের মধ্যে ভাল।

বইটির 'গেট আপ' সুন্দর এবং সে তুলনায় মূল্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

আবু রুশ্‌দ্

অমৃতস্য পুত্রাঃ—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক কাত্যায়ণী বুক ষ্টল। দাম দুটাকা।

সমাজের ভেতরের দিকে ঘুণ ধরেছে প্রায় সব স্তরেই। আর সে ঘুণ যে জায়গায়-জায়গায় কী বীভৎস, মাণিকবাবুর দক্ষ কলম তারই দুঃসাহসিক পরিচয় দিয়েছেন। অথচ বইটি শ্লেষ-সর্ব্বস্ব নয়, উপন্যাস হিসেবেও চমৎকার লাগে। প্রোপাগাণ্ডা হলেই যে আর্ট হবে না এখনো এমন যাদের বিশ্বাস মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস তাঁদের পড়তে অনুরোধ করি।

অবশ্য এই উপন্যাসটি পড়ার পথে বিস্তর বাধা—বাইরের দিক থেকেই ধরা যাক না, মলাট ম্যাড়ম্যাড়ে, বিশ্রী বাঁধাই, নামটাও যেন বৈচিত্র্য হারিয়ে ফেলেছে আর পাতায় পাতায় ছাপার ভুল প্রায় নির্লজ্জ—এক কথায় প্রকাশকের দায়িত্বজ্ঞানের প্রকাশ্য অভাবে অবাক হতে হয়, তা ছাড়াও লেখকের একটা অযথা তাড়াহুড়োর ভাব মাঝে মাঝে পীড়াদায়ক—ফলে, অনেক জায়গায় পূর্ণতর করবার প্রচুর সম্ভাবনাকে সরিয়ে রাখা হয়েছে যেন জোর ক'রে, যেমন সতুর বেলায়। তবুও পাঠক জায়গায় জায়গায় বিবরণের টুকরো কথায় চমকে ওঠে।—শঙ্কর তরঙ্গকে প্রথম দেখল: "নাটকীয় তাহার অকথ্য অবর্ণনীয় ভঙ্গিতে বাঁসন মাজিতে বসা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয়

করিয়া যেন আর কাজ খুঁজিয়া পায় নাই তাই রাগের মাথায় বাসন মাজিতে বসিয়াছে। রাগ কমিলেই সিংহাসনে গিয়া বসিবে।" মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে, বিশেষ ক'রে অস্বাভাবিক ও বিকৃত মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলা সাহিত্যে আছে ব'লে বিশ্বাস করি নে—এই বইটেতেও, অত তাড়াহুড়ো ও প্রকাশ্য অবজ্ঞা সত্ত্বেও, তরঙ্গের বা রামলালের যে ছবি ফুটেছে তা অদ্ভুত। রামলাল আরো বিশেষ ভাবে ভালো লাগ্‌ল তার কারণ সে সৃষ্টির উপাদান মাত্র কটা আঁচড়, টুক্‌রো দু' একটা কথা। আর সাধনার দুঃখ বিপুল ও গভীর —বিরাট আদর্শ আর সেই আদর্শের পেছুনে আপ্রাণ "তপস্যা" এক মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে পড়ার ট্রাজেডি পাঠককে নাড়া দেবেই। জীবনে বড় আদর্শের মূল্য যে টিকসই হয় না এ কথাটা সে হয়ত জান্‌ত, কিন্তু জীবন যে হঠাৎ এত সস্তা হ'য়ে পড়তে পারে সাধনা তা ভাব্‌তেও পারেনি……।

যে সব তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ এসেছে স্বদেশী নেতাদের বিরুদ্ধে তা যেমন জলজ্বলে তেমনি উপভোগ্য, বিশেষ করে মিসেস সেন···চমৎকার। স্বদেশীআনা এঁদের কী পরিমাণে ফাঁপা, কোথায় তার আদত উৎস—এ সব আলোচনায় নীতিকথার শুষ্কতা আসে, কিন্তু শঙ্করের কাছে টাকা আদায়, ডায়মণ্ড হার্ব্বারের পথে তাড়ি খাওয়ার উৎসাহ……এ সবের বিবরণে পাঠক সে শুষ্কতার কথা মনেও আন্‌তে পারে না। আধুনিক সমাজের আদত ফাঁকি যে ঠিক কোথায় তার নিপুণ পরিচয় এ বইতে অনেকবার পাই। তরঙ্গ আত্মহত্যার সময় যে চিঠি লিখে গিয়েছিল তারই একটা অংশ ধরা যাক—"আমি তোমাদের বাড়ীতে থাক্‌বার সময় পাড়ার ভূদেব বাবুদের বাড়ীতে একটা ছেলে পটেসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মরেছিল। তুমি আমায় এসে বলেছিলে ছেলেটার কুৎসিত রোগ হয়েছিল ব'লে সুইসাইড্‌ করেছে তরঙ্গ।……

"আমি মুচ্‌কে হেসে বলেছিলাম, হয় তো তা নয় অমুদা, হয়ত ক' বছর ধরে পরের অন্নজল পেটে দিয়ে দিয়ে মুখ বদ্‌লাতে স্বর্গে গেছে। কুৎসিত রোগ আবার কিসের? দেখতে, উপার্জ্জনের উপায় থাক্‌লে কুৎসিত রোগ নিয়েই বিয়েথা ক'রে ছোঁড়া দিব্বি সংসার কর্ত্ত।…

……জগতের কোথাও একটিমাত্র মানুষ যদি না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করে, সেটাকে আমরা বিভিন্ন স্বতন্ত্র ঘটনা ব'লে গ্রহণ করতে পারি না, তার আত্মহত্যার কারণ সমগ্র জগতে নানা রকম রূপ নিয়ে ছড়িয়ে থাক্‌বেই থাক্‌বে……"

কিন্তু চিঠিতে এত সুন্দর বিশ্লেষণ থাকা সত্ত্বেও তরঙ্গকে শুধু কি একটা বিকৃত মাথার দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়, না তার মাথায় বৃহত্তর মহত্ত্বের কল্পনাই তার বিকৃতির কারণ? সাধনার পাশেই তরঙ্গকে এনে কি মাণিকবাবু দেখাতে চান যে সুস্থ আর ঘরোয়া আদর্শই মেয়েদের একমাত্র আদর্শ, বৃহত্তর মহত্ত্বের চিন্তা তাদের পক্ষে বাড়াবাড়ি? তাঁর "জননী" উপন্যাস ও "বৃহত্তর মহত্ত্বের" ছোটগল্প তুলনা করলেও হয়ত এই কথাটাই বেশী মনে হবে। কিন্তু সে যাই হোক, তরঙ্গের চিঠিটা অদ্ভুত সুন্দর, আরও চমৎকার হয়েছে তার আধখানা চেপে যাওয়ায়। কিন্তু সীতা যেন একঘেয়ে, গতানুগতিক। সে চরিত্রে জৌলুস পেলুম না।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ত্রিশঙ্কু-মদন : মণীন্দ্র রায়

ত্রিশঙ্কু-মদনের কবি নবাগত, আধুনিকদের আসরে। যে বয়সে সাধারণতঃ কবি হন অনুভাবী ও অনুকারী সেই বিশেষ বয়সের লেখা এই কবিতাগুলি। সে হিসাবে এঁর অনেক কবিতাই অনুশীলনমার্গের, সে গুলির ক্রমবিকাশের ইতিহাস পাঠকবর্গের অগোচর থাকলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না। তবে এঁর কয়েকটি কবিতার ভেতর স্বকীয়তার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। ত্রিশঙ্কু-মদনের কবিতাগুলির জন্য মনে হয় সুধীন্দ্র দত্ত ও বিষ্ণু দে-ই মুখ্যত দায়ী।, অবশ্য এটাও বলতে হবে এ গুরুকরণের ভেতর মণীন্দ্র রায়ের রুচি ও বুদ্ধির কৃতিত্ব আছে যথেষ্টই। সেই জন্য মনে হয় কবির স্বকীয়তার পরিত্রাণ ও পূর্ণ বিকাশের পথ এই দুই কবিদের এড়িয়েই। উদাহরণ স্বরূপ হয়ত বলা যায়

আকাশ ছেয়েছে কুন্তল-কাল মেঘে
প্রসন্নতার ভস্মাবশেষ চিতা ;
গভীর ব্যথায় হাসি কি অর্ঘ্য রচে
এখনো তোমার আত্মাহুতির পথে ?—

এই লাইন গুলির চেয়ে

আজো মৃত্যু আসে নাই।
স্মরণের উপত্যকা ম্লান হ'য়ে আসে
বিকালের স্খলিত আলোকে।
পরিত্যক্ত গিরিপথে
নির্ব্বিকার ক্লান্ত চোখে
ভারবাহী পশুর মতন—ইত্যাদি···ইত্যাদি

এর ভেতর মণীন্দ্র রায়ের অপেক্ষাকৃত নিজস্ব ভঙ্গী খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিষণ্ণ সুরই তাঁর সমস্ত কবিতাগুলিতে পরিব্যাপ্ত। আশা করা যায় আরও পরিণত বয়সে ও পরিণত শক্তিতে তাঁর ম্লান, পরিত্যক্ত কাব্য-উপত্যকায় স্বচ্ছ রৌদ্রালোক পৌঁছবে। অন্যান্য কবিতার সঙ্গে, 'অবসান' ও 'চাঁদ' কবিতা দুটিও ভাল লাগলো। মনে হয় বহু অযথা কথার আবহাওয়া, বহু আভিধানিক শব্দের ভ্রূকুটি মণীন্দ্রবাবুর কাছে নিয়তই আবেদনপত্র পাঠায়, এবং অল্প বয়সের ও স্বল্প অভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তারা তাঁর উপর অত্যাচারও করে। এ দুর্ভোগ অবশ্য বিশেষ বয়সে অল্প বিস্তর সব কবিদের ভাগ্যেই ঘটে। তবু এ বিষয়ে মণীন্দ্রবাবুর একটু সবল ও সচেতন হ'লে তাঁর উপকার হবে ব'লে বিশ্বাস করি।

বইএর ছাপা ও বাঁধাই মোটেই মনঃপূত হ'ল না। কবিতা উপভোগের যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটিয়েছে এতে।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

Published and Printed by K. C. Banerjee at the Modern Art Press,
1/2, Durga Pituri Lane, Calcutta, Edited by Humayun Kabir
and Buddhadeva Bose.

চতুরঙ্গ

আষাঢ়,
১৩৪৬

প্রথম বর্ষ,
চতুর্থ সংখ্যা

ভারতবর্ষের ইতিহাস

জহিরুদ্দিন আহমদ

ইতিহাসের সঙ্গে দর্শনের পার্থক্য নিয়ে অনেক সময় আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে সংযোগও কম নয়। ইয়োরোপে দর্শনের অর্থ যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষে দর্শন বলতে বিশ্বদৃষ্টিই বোঝায়, এবং বিশ্বদৃষ্টির জন্য বিশ্বজ্ঞানের দরকার। অন্যপক্ষে বিশ্বদৃষ্টি না থাকলে বিশ্বজ্ঞানেরও সম্ভাবনা নেই, কারণ বিশ্বজ্ঞান বলতে কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা বস্তুর সমষ্টির উপলব্ধি বোঝায় না। কেবলমাত্র তাই নয়, যা ঘটে তার সংখ্যা সীমাহীন, তাদের মধ্যে শৃঙ্খলার যোগ-স্থাপন করতে না পারলে তাদের জানবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ঘটনার প্রবাহকে বিচার না করলে বিশ্বজ্ঞানের গোড়াপত্তন পর্য্যন্ত অসম্ভব থেকে যায়। তাই বিশ্বদৃষ্টি এবং বিশ্বজ্ঞান পরস্পর সাপেক্ষ। সেই কথাকেই ঘুরিয়ে নিয়ে বলা চলে যে দর্শনের ভিত্তি ইতিহাস, আবার ইতিহাসের ভিত্তি দর্শন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে এ সত্যটী যত সহজে ধরা দেয়, অন্যত্র তার পরিচয় মেলে না। তার কারণও স্পষ্ট, কারণ রাজনীতির মধ্যে আবেগের প্রাবল্য সহজেই এসে পড়ে। যতই নিরাসক্ত বুদ্ধি দিয়ে ঘটনার বিচার করতে চাইনা কেন, মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে যা জড়িত, তার আলোচনায় মানুষের সুখদুঃখের অনুভূতি জেগে উঠবেই, এবং সেই মুহূর্ত্তে রাজনীতির বিচার আবেগের রঙে রাঙিয়ে উঠে। আবেগ আমাদের অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ ক'রে তোলে, তাই বিশ্ব-জ্ঞানের উপর বিশ্বদৃষ্টির যে প্রভাব, অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে তা আমাদের দৃষ্টি এড়ালেও রাজনীতির ক্ষেত্রে তা এড়ান যায় না। ইতিহাস রাজনীতির পটভূমি,

তাই ইতিহাসের আলোচনায় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী স্বভাবতই ফুটে উঠে এবং তার ফলে ইতিহাস নিরাসক্ত বুদ্ধিবিচারের পরিবর্ত্তে আবেগের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় ঘটনার চক্রাবর্ত্তে জটিল। ইতিহাসে তাই বিশ্বদৃষ্টি বিশেষ রূপ নেয়, এবং দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের কেবল যে তাৎপর্য্য বদলায়, তা নয়, তার যাথার্থ্যেরও তাতে ব্যতিক্রম ঘটে। বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে যে ঘটনা অবান্তর, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনে তারই মধ্যে মেলে ঐতিহাসিক সত্যের মর্ম্মকথা।

ভারতীয়ের দৃষ্টি দিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা হয়নি, সেকথা বলবার বোধ হয় কোন প্রয়োজন নেই। ভারতীয়ের সংজ্ঞাও বেশী দিন হ'ল স্পষ্ট হয়নি, অনেকে বলবেন যে আজো তার যথার্থ বিকাশ দেখা যায় না। অতীতে ইতিহাস রচনার যে সমস্ত চেষ্টা হয়েছে, তার পেছনে ছিল হয় রাজবংশ বিশেষের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের ইঙ্গিত, অথবা সম্প্রদায়ের জয়গৌরব ঘোষণার প্রেরণা। ব্যক্তি বা বংশবিশেষের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে সূক্ষ্মতারও বিশেষ কোন লক্ষণ ছিল না, খোলাখুলিভাবেই তার ঘোষণায় ইতিহাস মুখর হয়ে উঠেছে। সম্প্রদায়ের জয় ঘোষণার পক্ষেও সে কথা সমানভাবে সত্য। তাই সে ইতিহাসে একদিকে রয়েছে অতিরঞ্জন ও আত্মশ্লাঘা, এবং অন্যপক্ষে রয়েছে সে অতিরঞ্জনের বিঘ্নদায়ক সমস্ত অপ্রিয় ঘটনার নির্ম্মম অবলুপ্তি। ভারতবর্ষের পটভূমিতে যে সমস্ত ঘটনার বিকাশ, তাদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলার সন্ধানও তাই কোনদিন সম্ভব হয়নি, কারণ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের গৌরব কাহিনীকে স্বাভাবিক নিয়মের পরিণতি বল্লে গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। সেজন্যই আমরা বহুবার শুনেছি যে ভারতবর্ষের কোন ইতিহাস নেই, কারণ ইতিহাসের অর্থ সভ্যতার বিকাশ। তার পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষে আমরা পেয়েছি ঘটনার উন্মাদ প্লাবন, সেই প্লাবনের উপর ভেসে উঠেছে কালীদহের কৃষ্ণের মতন অনৈসর্গিক গৌরবের অকস্মাৎ উদ্ভাসনা।

আজ তাই যাদের মনে ভারতীয় বোধ জেগেছে, তাদের বিচার করতে হবে যে ভারতে সভ্যতার বিকাশের কোন লক্ষণ মেলে কিনা। সভ্যতা বলতে বোঝায় সংগঠন, পরস্পরের সাহচর্য্যে এবং সহযোগিতায় জীবনের বিকাশ। ব্যক্তির উৎকর্ষের পরিচয় সব দেশেই মেলে, ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম হয়নি, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমাদের এই কথাই বারে বারে শেখানো হয়েছে যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উৎকর্ষ সাধিত হলেও সমাজের সম্পূর্ণতা বোধের কোন পরিণতি সেখানে মেলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডের ইতিহাসে আমরা রাজনৈতিক সত্তাবিকাশের একটা বিশিষ্ট রূপ দেখতে পাই—সেখানে কি ভাবে রাজার হাত

থেকে ক্ষমতা গিয়ে পড়ল অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে এবং তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিল বণিক সম্প্রদায়, তার পরিচয়েই ইংলণ্ডের ইতিহাস মুখর। বণিক সম্প্রদায়ের হাতেও ক্ষমতা টেকে নাই, দেশের জনসাধারণ ক্ষমতার দাবী এনেছে তার প্রমাণ ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক সাম্য। অবশ্য অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যাঁদের প্রখর, তাঁরা এ বিবরণের মধ্যেও ধনবাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভাব সহজেই খুঁজে পাবেন, এবং সে বিবরণের মধ্যে অসঙ্গতি এবং অপূর্ণতাগুলি সহজেই ধরিয়ে দেবেন। কিন্তু তবু এ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইংলণ্ডের ইতিহাস রচনার চেষ্টা হয়েছে, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

ভারতবর্ষের বেলায় কিন্তু সে চেষ্টা হয়নি। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা শিখেছি, সাম্রাজ্যবাদের সার্থকতা প্রমাণের জন্যই তার উদ্ভব। ইংলণ্ডে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিকাশকে বড় ক'রে তোলা স্বাভাবিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অসাম্য বা গ্লানিকে এড়িয়ে চল্‌লেও তার মধ্যে ঘটনার প্লাবনকে সুসংবদ্ধ করবার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রয়োজন ঘটনার নৈরাজ্যকে বাড়িয়ে তোলা, লোকের মনে এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি যার ফলে সাম্রাজ্যবাদের অভিশাপকেও তারা আশীর্ব্বাদ ব'লে মনে করতে পারে। হয়েছেও তাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাই হিন্দুসভ্যতার বিকাশকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা, হিন্দু মোস্‌লেমের সম্মিলিত সাধনায় ভারতের মধ্যযুগের সভ্যতাকে অস্বীকার করবার প্রয়াস। হিন্দুসভ্যতাকে খর্ব্ব করবার প্রয়োজন তত বেশী নয়, কারণ তাকে প্রাগৈতিহাসিক ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে, আর ঐতিহাসিক ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেও তার সাময়িক দূরত্বে তার প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসতে বাধ্য। কিন্তু মধ্যযুগীয় সভ্যতার প্রয়াস অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাই তার যাথার্থ্যকে ক্ষুণ্ণ করতে না পারলে বর্ত্তমানের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে কল্যাণকর বিশ্বশক্তির নির্দ্দেশ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কেবলমাত্র তাই নয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে উজ্জ্বল ক'রে তুল্লেও ক্ষতি নেই, কারণ সেই সভ্যতার অবলুপ্তির ফলে যে অন্ধকার, তারই পশ্চাদপটে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে বর্ত্তমানের ইতিহাস।

সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, তার মধ্যে এ সম্বন্ধে কোন লুকোচুরি নেই। এককালে রীতি ছিল যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে দুয়েকটী ভাসা ভাসা কথার মধ্যে আটকে রেখে সে যুগের সভ্যতাকে অবহেলার চেষ্টা। ভারতের বিপুল ঘটনাসমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গের মত

ব্যক্তির উদ্ভব, কিন্তু সমুদ্রতরঙ্গের পেছনে থাকে যে বিপুল জলপ্রবাহ, ইতিহাসের বেলায় তার স্বীকৃতিও হয়নি। প্রথম আর্য্য যেদিন এ দেশে আসে, তখন সভ্যতার যে বিকাশ ভারতে হয়েছিল, তার কোন সন্ধান বহুদিন মেলেনি। বর্ত্তমানে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ যেমনভাবে মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে, সে যুগের বিজয় অভিযাত্রী তেমনিভাবে চেয়েছিল প্রাক্‌-আর্য্যিয় সভ্যতার অবলুপ্তি। সে দিক দিয়ে সে যুগের ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে ইউনানের অনেকটা মিল আছে। মাইকিনিয়ান সভ্যতাকে আত্মসাৎ ক'রে গ্রীক সভ্যতার বিকাশ, কিন্তু সেই আত্মসাতের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী সভ্যতার সমস্ত চিহ্ন লোপ করবার চেষ্টা। আজ আমরা জানি যে সামাজিক সভ্যতার বিচারে অভিযাত্রী আর্য্যের স্থান ছিল অপেক্ষাকৃত নীচে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধবিদ্যার উৎকর্ষের বলে তাদেরই হ'ল জয়। ভারতেও যে ঠিক তাই ঘটেছিল, মহেনজোদারোর আবিষ্কারে তার ইঙ্গিত মেলে। দুক্ষেত্রেই কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ভারতের এবং ইউনানের আর্য্য অভিযাত্রীরা ঠিক একই রকমে বেমালুম ভাবে পূর্ব্বতন সভ্যতাকে নিজস্ব ক'রে নিয়েছিল। সে বিচারে বলা চলে যে আর্য্যঅভিযাত্রীরা পূর্ব্বতন সভ্যতাকে ধ্বংস করেনি, আত্মসাৎ ক'রে তার বিকাশের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ইউনানের ইতিহাসে গণতন্ত্রের বিকাশ এবং বুদ্ধির স্বাধীনতা স্থাপনের চেষ্টা পাশাপাশি গড়ে উঠে, অখণ্ড পৃথিবীর মানুষ তা নিয়ে আজও গর্ব্ব ক'রে থাকে। তখনকার অর্থ নৈতিক সংগঠনের সঙ্গে তার নিবিড় যোগ সম্প্রতি ধরা পড়তে সুরু করেছে, কিন্তু সে সম্বন্ধ আবিষ্কারেও প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার মূল্য কমবেনা। ভারতের বেলা কিন্তু তা ঘটেনি। তখনকার অর্থনৈতিক সংগঠনের উপর ভারতে যে গ্রামতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছিল, মানুষের রাজনৈতিক বিকাশের ইতিহাসে তারও মূল্য কম নয়। বুদ্ধির স্বাধীনতার পরিচয়ও সেদিনকার ভারতবর্ষ দিয়েছে, বিচিত্র মতবাদের এ রকম সমাবেশ আর কোথাও সেদিন বিকাশলাভ করেছে কিনা সন্দেহ। বিভিন্ন মতবাদের সমাবেশের মধ্যেও কিন্তু বিপদের ছিল সম্ভাবনা, কারণ পরমতসহিষ্ণুতা যে কোন মুহূর্ত্তে অজ্ঞাতে পরমত উপেক্ষায় পর্য্যবসিত হয়, তার হিসাব রাখা কঠিন। মতের তীব্রতায় মতের প্রতি মমত্ববোধ স্পষ্ট, বহুক্ষেত্রেই সমস্ত মতকে সমান স্বীকার করার অর্থ সমস্ত মতকেই সমান অস্বীকার। তাই পরমতসহিষ্ণুতা হৃদয়ের প্রসার ও বুদ্ধির মুক্তিকে প্রকাশ করতে পারে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ সম্ভাবনাও সমানই প্রবল যে বুদ্ধির অবসাদ এবং পরাজয়ের ফলেই সমস্ত মতের মধ্যে গোঁজামিল দেওয়ার এ চেষ্টা।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কল্যাণে মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের যে বিকৃতি, মুসলমান বাদশাহীর গোড়াতেও তার খানিক খানিক লক্ষণ মেলে। যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদের আকৃতি বদলায়, যদিও তার প্রকৃতির বড় বেশী তফাৎ দেখা যায়না। তাই বিভিন্ন যুগে ইতিহাসের বিকৃতির রূপও ভিন্ন, বাদশাহী আমলের সুরুতে মোসলেম বিক্রমকে বড় ক'রে দেখাবার জন্য অতিরঞ্জনের যে প্রয়োজন হয়েছিল, ইংরিজী আমলেও তার প্রয়োজন কমেনি, কিন্তু দুই যুগের অতিরঞ্জনের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। তারও ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। মোসলেম সাম্রাজ্য স্থাপনের দিনে হিন্দুর মধ্যে বর্ণবিভাগ থাকলেও সে বিভেদ জাতি বিদ্বেষে পরিণত হয়নি, কিংবা হয়ে থাকলেও মোসলেম অভিযাত্রীরা তাকে ব্যবহার করতে পারেনি। সে যুগের মোসলেম অতিরঞ্জনের লক্ষ্য ছিল হিন্দুর মনে ভীতির সঞ্চার। প্রতিহিংসা বা শাস্তিকে তাই তীব্র ক'রে দেখানো হয়েছে, যেখানে শাস্তি ছিলনা সেখানেও কাল্পনিক শাস্তির ভয়াবহ বিবরণে বিজিতের মনে অবসাদ জাগাবার চেষ্টা হয়েছে। ইংরিজি আমলের গোড়ায় ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বিভাগের সঙ্গে মিশেছিল সাম্প্রদায়িক এবং জাতি-গত বিভাগ ও বিদ্বেষ, তাই ইংরেজ ঐতিহাসিকের বিভীষিকা সৃজনের কোন প্রয়োজন হয়নি। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে তীব্রতর ক'রে তুলেই সে ইতিহাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, এবং সে কাজে সহায়তা করেছে মোসলেম ঐতিহাসিকের অতিরঞ্জন।

বিকৃতি এবং অতিরঞ্জন বিজেতার ইতিহাসে মিলবেই, ভারতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু আর এক দিকেও মোসলেম বিজয় এবং ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের মধ্যে অদ্ভুত মিল রয়েছে। সে কথা ভুলে যাই অথবা জানিনা ব'লে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একটা বিশেষ দিক আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনে মুসলমান যে খুসী হয়নি, সে কথা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু সে অসন্তোষে বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে ছিল নিষ্ক্রিয় অসহযোগের মনোবৃত্তি। প্রথম স্তরে বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহই ছিল প্রবল, কিন্তু সে বিদ্রোহের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ক্রিয় মনোবৃত্তির প্রবলতা বেড়ে গেল। ইংরেজের ভাবধারা এবং চিন্তা, ইংরেজের ভাষা এবং সাহিত্য, এমন কি পার্থিব জগতে ইংরেজের বিজয়কে পর্য্যন্ত এড়াবার চেষ্টা মুসলমান সমাজে প্রবল হয়ে উঠেছিল, তার ফলে ইসলামের মতন সন্ন্যাসবিরোধী ধর্ম্মমতে সন্ন্যাস-মনোবৃত্তির সাময়িক জয়লাভ ঘটে। দুনিয়ার পরাজয়কে ঢাকবার জন্য সেদিন আখেরাত বা ভবিষ্যতের গৌরবস্বপ্নে মুসলমান কর্ম্মবিমুখ হ'য়ে উঠেছিল, আজ পর্য্যন্ত তার জের পুরোপুরি

কাটেনি। হিন্দু সমাজের যে তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা, তার সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানের এ আধ্যাত্মিকতার সম্বন্ধ ভুল করবার উপায় নেই। দুই ক্ষেত্রেই সংসারে পরাজয়ের ফলে সংসারকে অস্বীকার করবার চেষ্টা, ব্যবহারিক জীবনের বিড়ম্বনা ভুলবার জন্য পারমার্থিক জীবনের স্বপ্নরচনা।

মোস্‌লেম বিজয়ের প্রাথমিক যুগে এ নিষ্ক্রিয়তা হিন্দুমানসে অবসাদ এনে দিয়েছিল, সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তারই ফলে মায়াবাদ এবং সন্ন্যাস-মনোবৃত্তির ভারতবর্ষে এত প্রাদুর্ভাব। কেবল তাই নয়, সেদিন আত্মার অমরত্ব ও নশ্বর পৃথিবীর তুচ্ছতা প্রমাণের জন্য হিন্দুভারতের যে ঐশ্বর্য্যগৌরব, তাকে অস্বীকার করবারও চেষ্টা হয়েছে। তারই ফলে আজ আমরা ভুলে যাই যে হিন্দুসভ্যতার গৌরবের দিনে ভারতবর্ষে বিপুল রাজসিকতার সমাবেশ হয়েছিল। হিন্দুভারতের ঔপনিবেশিক অভিযান তাই আজ কল্পকাহিনী, তার ঐশ্বর্য্য এবং আড়ম্বরের স্মৃতি ম্রিয়মাণ, সভ্যতার বিভিন্ন বিকাশে সেদিন ভারতবর্ষে মানুষের আত্মার বিজয়সাধনা নিরাসক্তি এবং সন্ন্যাসের ধূসর আচ্ছাদনে অবলুপ্ত।

দুই

মোস্‌লেম ভারতের ইতিহাস রচনায় বিকৃতি এবং অতিরঞ্জনের মাত্রা আরো বেশী। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে বিধাতার আশীর্ব্বাদ ব'লে মানতে হ'লে মোস্‌লেম ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত না করে উপায় নেই, এবং ফলে আমরা পেয়েছি প্রায় সাত আট শো বৎসরের মারামারি কাটাকাটির বিবরণ। সভ্যতার বিকাশের কোন চেষ্টা যে সে যুগে হয়েছিল, সে কথা বিশ্বাস করাও অনেকের পক্ষে কঠিন। কারণ বিভিন্ন রাজবংশের উত্থানপতনের বিরক্তিকর পুনরুক্তিতে মানুষের সাধনার কোন লক্ষণ মেলে না। বর্ত্তমানে হিন্দুমুসলমানের যে মানসিক তিক্ততা, তারও ভিত্তি সেই নিষ্ফলতার ইতিহাস। হিন্দুর মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস যে ভারতে সভ্যতার যেটুকু বিকাশ, হিন্দু যুগেই তার সুরু এবং সারা, তাই ভারতীয় কৃষ্টির অর্থই হিন্দুসভ্যতা। অন্য পক্ষে মুসলমানেরও মনে সন্দেহ এবং আত্মঅবিশ্বাস, কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের সাত আট শো বৎসরে সভ্যতার বিকাশ কতটুকু? তাই অনেক মুসলমানেরই বিশ্বাস যে ভারতীয় অর্থই হিন্দুধর্ম্মগন্ধী, সুতরাং মুসলমানের অস্পৃশ্য। ভারতের কৃষ্টির রচনায় হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত সাধনার

কথা ইতিহাসে ধরা পড়ে নাই বলেই মুসলমানের প্রতি হিন্দুর অবজ্ঞা, এবং হিন্দুর প্রতি মুসলমানের অবিশ্বাস।

অথচ সে যুগের সমস্ত তথ্য ভাল ক'রে না জানা থাকলেও যুক্তির দিক দিয়ে এ ঐতিহাসিক নিষ্ফলতা বিস্ময়কর। হিন্দুসভ্যতার প্রেরণা হয়তো সে দিন কমে এসেছিল, কারণ হিন্দুমানসের অবনতি না ঘটলে মোস্‌লেম বিজয় এত সহজে সম্পন্ন হোত না। কিন্তু হিন্দুসভ্যতার বেগ মন্দা হয়ে এলেও তার পরিমাণ কমবার কোন কারণ ঘটেনি, কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় থেকে সভ্যতার ভাঙ্গন সম্বন্ধে কোন কথা বলা চলে না। উন্নততর প্রাক্‌আর্য্যিয় সভ্যতা আর্য্যদের কাছে সামরিক পরাজয় সহ্য করে, কিন্তু পরাজয়ের মধ্য দিয়েই আর্য্যমানসকে সমৃদ্ধতর ক'রে তুলেছিল। ইউনানেও যে আর্য্য-অভিযানের একই ধারা, তাও আজ সর্ব্বজনসম্মত। মোস্‌লেম বিজয়ের ইতিহাসে তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রবলতর মোস্‌লেম চিত্তবৃত্তি প্রাচীন হিন্দুসভ্যতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করেছে বটে কিন্তু শান্তির ক্ষেত্রে তাকে আত্মসাৎ ক'রে নিজেকেও সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে। ফলে যে কেবল মুসলমানের মানসরূপ বদলেছে, তা নয়, হিন্দুমানসের তাতে আরো বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

হিন্দুভারতের সভ্যতার সাংসারিক আড়ম্বরের মধ্যেও ছিল সন্ন্যাসের অশরীরি ছায়া। গ্রাম্যস্বরাজ ও বুদ্ধির স্বাধীনতায় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ-স্বীকারের মধ্যেও তাই পড়েছিল জাতি এবং বর্ণবিভাগের বাধা। এক দিক দিয়ে হিন্দুভারতের বর্ণবিভাগ বিভিন্ন স্তরের সভ্যতাকে একত্র বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা, তাও যেমন অস্বীকার করবার উপায় নেই, তেমনি অন্য দিকে এই জাতি বিভাগের ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সে কথা অস্বীকারও সমানই অসম্ভব। নৈতিক ও জাতিগত বৈষম্যের যোগাযোগে হিন্দুভারতে শ্রেণীবিভাগ জাতিভেদে রূপান্তরিত হয়—আজকের ভারতবর্ষে ভারতীয় এবং ইংরেজ, অথবা হিন্দু এবং মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যেও বহু ক্ষেত্রেই আমরা তার পুনরাবৃত্তি দেখি। হিন্দু ভারতে কিন্তু এ সমস্যার একটা সাময়িক সমাধান হয়েছিল। আজও যে তথাকথিত অনুন্নত এবং উৎপীড়িত জাতি হিন্দুসমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ করেনি, তার জন্য সেই পুরাতন সমাধানের স্মৃতি অনেকখানি দায়ী। মানুষের অধিকার না পেয়েও মানুষ তৃপ্ত থাকবে, এ অসম্ভব সম্ভব কেমন ক'রে হ'ল, সে প্রশ্নের উত্তর সন্ন্যাস মনোবৃত্তির প্রবলতার মধ্যেই মেলে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে মুসলমান যেমন আখেরাতের লোভে তার ইহকালকে বিসর্জ্জন দিয়েও তৃপ্ত হয়েছে,

হিন্দুভারতেও তেমনিভাবে জীবনের নশ্বরতার বিবেচনায় জীবনের সমস্ত অসাম্য ও অত্যাচারের তীব্রতা অবসন্ন হয়ে এসেছে। প্রতি মানুষের মধ্যেই ব্রহ্মের সত্ত্বা, এবং সে ব্রহ্ম স্থানকালাতীত পারমার্থিক সত্য, কাজেই ব্যবহারিক জীবনে মানুষের হাতে মানুষের অপমানকেও মায়া ব'লে উপেক্ষা করা তাই হিন্দুভারতে সম্ভব হয়ে উঠেছিল।

ইসলামের বিপ্লবকর গণতন্ত্রের সংঘাতে সে মায়াবাদ ঘুচে গেল। বর্ত্তমানে ধর্ম্মান্ধতা যেভাবে আফিমের মত জনগণের মন আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, সে যুগে তা সম্ভব হয়নি। ধর্ম্মাবেগের প্রখরতায় সেদিন অবসাদ কেটেছে, জমে ওঠেনি। তাই সেদিন মানুষের সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের বাণী মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে পৃথিবীর প্রতিদিনকার দেনাপাওনায়, কেবলমাত্র পারমার্থিক নির্ব্বাণের স্বপ্নে সেদিন জনমনকে ভুলিয়ে রাখা সম্ভবপর হয়নি। দক্ষিণ-ভারতে জাতিভেদের যে প্রচণ্ডতা কিছুদিন আগেও আমাদের মনুষ্যত্বকে পীড়া দিয়েছে, উত্তর ভারতে তা কেন লোপ পেল, এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেই উপরের কথাগুলির যাথার্থ্য প্রমাণ হবে। সে প্রভাব যে আরো প্রবল হয়নি, জাতিভেদের বন্ধন যে একেবারে গুঁড়ো হয়ে যায়নি, তারও কারণ ঐতিহাসিক। তখনকার দিনে পথঘাটের সুবিধা ছিল কম, তাতে যে কেবল মানুষের চলাচলেরই বিঘ্ন করেছে, তা নয়, ভাবের আদান প্রদানও তাতে পদে পদে বাধা পেয়েছে। ফলে সহরগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছিল মোসলেম সভ্যতার কেন্দ্র, কিন্তু দেশের বিপুল জনসাধারণের মধ্যে তার প্রভাব আশানুরূপ হয়নি।

মোসলেম বিজয় এবং উত্তর ভারতে প্রথমে পাঠান ও পরে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের পর কি ভাবে নানা ক্ষেত্রে নানা স্তরে ইসলামের সঙ্গে হিন্দু মনোবৃত্তির সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছিল, তারই কাহিনী মধ্যযুগে ভারতের সভ্যতার ইতিহাস। রামানন্দ, কবির, নানক এঁদের কথা তো সহজেই মনে পড়ে, বাঙলা দেশের বৈষ্ণব প্লাবন ও মহারাষ্ট্রের ভক্তিবাদেও সেই একই সমন্বয়ের সাধনা। কেবলমাত্র ধর্ম্মের ক্ষেত্রে নয়, ব্যবহারিক জীবনেও নানান ভাবে নানান দিকে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সাধনা সেদিন সমাজ ও শিল্পসৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। হিন্দু মতবাদের আজ যে রূপ, তার কতখানি প্রাচীন বেদ উপনিষৎ থেকে নেওয়া এবং কতখানি যে ইসলামের দান, সে কথা সঠিক ভাবে বলা কেবল কঠিন নয়, অসম্ভব। ঠিক তেমনি ভাবে ভারতীয় মুসলমানের বিশ্বাসে এবং আচারে, মতবাদে এবং ব্যবহারে হিন্দু প্রভাব সমানই স্পষ্ট। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীত— এক কথায় ভারতীয় জীবনের যতদিকে বিকাশ, তার প্রতি স্তরেই হিন্দুর সঙ্গে

মুসলমানের মনোবৃত্তি আজ এমন ক'রে মিশে গিয়েছে যে, আজ যাঁরা হিন্দুকৃষ্টি বা মোসলেম সভ্যতার অমিশ্র পবিত্রতার গর্ব্ব করতে চান, তাঁরা হয় ইতিহাস জানেন না, অথবা তাঁদের বুদ্ধির গোড়ায় রয়েছে গলদ।

নানান দিক দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এবং মিলনের মধ্যে ভারতের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল—ভারতীয় ভাষাগুলির আধুনিক পরিণতি ও সংগঠনের মধ্যেও তার নিদর্শন পরিষ্কার। সাহিত্যে এ সম্মিলন যে সঞ্জীবন এনেছিল, তারই ফলে আজ ভারতের প্রাদেশিক বুলি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির মধ্যে আসন দাবী করছে। চিন্তা ও অর্থনীতির জগত প্রথম দৃষ্টিতে প্রায় সম্বন্ধহীন, অথচ উভয় ক্ষেত্রেই এ সম্মিলন যে কী ভাবে নতুন নতুন রূপের সৃষ্টি করেছে, তারই দৃষ্টান্ত দিয়ে ভারত ইতিহাসের এ অধ্যায়ের কথা শেষ করা যাক।

সুফীমতবাদের ভিত্তি কোর-আনে, কিন্তু ভারতীয় ভাবধারার প্রভাবে তারও রূপ অনেকখানি বদলে ছিল। খৃষ্টধর্ম্ম ও নিও-প্লাটোনিজমের ছোঁওয়া তাতে লেগেছিল, যরথুস্ত্রবাদ এবং মানিযমের ছায়াও তার মধ্যে মেলে, কিন্তু তার উপর হিন্দুধর্ম্ম এবং বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব বোধ হয় আরো স্পষ্ট। মনোজগতে কিন্তু প্রভাব সর্ব্বত্রই দুতরফা, তাই সুফীমতবাদের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মেরও রূপ অনেকখানি বদলে যায়। শঙ্কর বেদান্তে যে বাইরের কোন প্রভাব রয়েছে, একথা অনেকেই হয়তো স্বীকার করতে চাইবেন না, অথচ সহজ একটী ঐতিহাসিক সত্যের বিচার করলে সে প্রভাব অস্বীকার করবারও উপায় নেই। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে প্রায় অষ্টম শতক পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মমতে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন, নতুন নতুন মতবাদের আবির্ভাব এবং বিবর্ত্তন, তার পরিচয় উত্তর ভারতের মধ্যেই আবদ্ধ। কৃষ্টি ও সভ্যতা, প্রাচীন রীতি এবং নতুন বিদ্রোহ—সব কিছুরই পরাকাষ্ঠা উত্তর ভারতের জীবনে, কিন্তু হঠাৎ অষ্টম শতকে তা বদলে গিয়ে ভারতীয় চিন্তাধারার নেতৃত্ব দক্ষিণ ভারতে চলে গেল। শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বাদিত্য, বল্লভাচার্য্য, মাধব, সবাই দাক্ষিণাত্যের লোক—বৈষ্ণব এবং শৈব মতের উৎপত্তি, দ্বন্দ্ব এবং পরিণতি সেখানে। জাতির জীবনাবেগের এ পরিবর্ত্তন অনেক ঐতিহাসিকের কাছেই বিস্ময়কর মনে হয়েছে, অথচ ভারতে ইসলামের আবির্ভাবের কথা মনে রাখলে সহজেই তার রহস্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই দক্ষিণ ভারতে মুসলমানের আনাগোনা সুরু হয়েছিল, তার ফলে মালাবারের চেরামন পেরুমাল বংশের শেষ রাজা নিজে ইসলাম গ্রহণ ক'রে আরব দেশে চলে যান। রাজার এ ধর্ম্মান্তর সে যুগে ইসলামের প্রভাবের একটী

লক্ষণ, তারই ফলে হিন্দুর সমাজমনে, তার ধর্ম্ম বিশ্বাসে যে সাড়া জাগল, তারই ফলে বৈষ্ণব এবং শাক্তমতবাদের পরিণতি। উত্তর ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস এবং জীবনদৃষ্টি মধ্যপন্থী, শান্ত এবং ভাবগম্ভীর। দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদে যে মনোবৃত্তির বিকাশ, আবেগের প্রাচুর্য্য এবং তীব্রতাই তার প্রধান লক্ষণ। উত্তর ভারতের শান্ত সমাহিত পরমতসহিষ্ণু বুদ্ধিপ্রধান শিথিল মতবাদ অকস্মাৎ দক্ষিণ ভারতে আত্মকেন্দ্রচ্যুত আবেগের প্রাবল্যে বিপ্লবী হয়ে উঠল কেন, সে প্রশ্ন তুললে ইসলামের প্রভাবকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাই শঙ্করের মায়াবাদ এবং ব্রহ্মের ঐক্যস্থাপনের প্রচেষ্টার তীব্রতার মধ্যেও ইসলামের উন্মাদনা কার্য্যকরী, শঙ্করের জীবনের ইতিহাসেও তার আভাস খুঁজে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের ভক্তিবাদ এবং দর্শনের সূত্রগুলির প্রত্যেকটীই হয়তো উপনিষদের মধ্যে মিলবে, কিন্তু তাদের সামঞ্জস্যের যে ভঙ্গী, তা প্রতিপদে ইসলামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনেও হিন্দু-মোসলেমের সংঘর্ষ এবং মিলন সভ্যতার নতুন নতুন রূপের পত্তন করেছে। ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের সামাজিক মূল্যনির্দ্ধারণের চেষ্টা সে যুগে হয়তো সময়োপযোগী হয়নি, তাই আলাউদ্দীনের চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু তবু সেই চেষ্টাই সাক্ষ্য দেয় যে সে যুগেও সমাজমানস ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়কে অতিক্রম ক'রে সমাজের সমগ্রতাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিল। মোহম্মদ তোগলকের চামড়ার টাকা চালাবার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়, কিন্তু আলাউদ্দীনের মতন তাঁরও চেষ্টার মূলে ছিল সামাজিকবোধ, অর্থের যে কোন নিজস্ব মূল্য নেই, বেচা-কেনার বাহন হিসাবেই তার সার্থকতা, এই সত্যটীর অস্পষ্ট উপলব্ধি। নানান কারণে অর্থনীতি ও রাজনীতির সম্বন্ধের তাৎপর্য্য সেদিন ধরা পড়েনি, কিন্তু সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির উপর রাজনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠার পরিচয় একেবারে দুর্ল্লভ নয়। ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে জাতীয়তাবোধের অভ্যুদয়ের সংযোগ ইতিহাসের দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু ভারতবর্ষে আকবর তাঁর শাসনতন্ত্রে আসন্ন ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের পথ খোলাসা ক'রে দিয়েছিলেন, সেকথা ইংরেজের রচিত ইতিহাস আমাদের শেখায় না। আকবরের আমলে ভূমিব্যবস্থার পরিবর্ত্তনেও সামন্ততন্ত্রের অবসানের নির্দ্দেশ রয়েছে, কিন্তু ধনতন্ত্রের ভিত্তি যে প্রাকৃতিক শক্তির শৃঙ্খলন, সেদিন তা সম্পন্ন হয়নি ব'লে আকবরের ভারত-স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। প্রতাপ সিংহের বিদ্রোহ আপাতদৃষ্টিতে পরাজিত হ'ল, কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে

ভিত্তি ক'রে সামন্ততন্ত্রের এ বিদ্রোহ যে নিষ্ফল হয়নি, তার প্রমাণ আওরঙ্গজেব এবং শিবাজী। তাঁরা দুজনেই ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী আবির্ভাবকে পিছিয়ে দিলেন, খণ্ডিত সম্প্রদায় প্রীতির খড়্গে জাতিয়তাবাদ জন্মাবার আগেই নিহত হ'ল।

তিন

ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবের ইতিহাস বলা চলে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গ্রামতন্ত্র এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশের ইতিহাস, তার ফলে কিন্তু মানুষের বিশ্বাস এবং ব্যবহার হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন, আচারের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বিশ্বাসের নৈরাজ্য সামাজিক যোগসূত্রকে ক'রে দেয় শিথিল। কৃষিপ্রধান আর্থিক সংগঠনে এ পরিণতি প্রায় অনিবার্য্য, কারণ কৃষিকর্ম্মে সামাজিক সংযোগের স্থান গৌণ, ব্যক্তির চেষ্টা এবং অদৃষ্টের লীলাই সেখানে জীবনের রঙ্গমঞ্চ অধিকার ক'রে থাকে। ঠিক এই একই কারণে ভারতবর্ষ এবং চীনে মানুষের সমাজসত্ত্বা পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি, রাজনীতির ক্ষেত্রে তাই তাদের হয়েছে বারে বারে পরাজয়। মধ্যযুগের সামন্ত-তন্ত্রে আচারের সঙ্গে বিশ্বাসের এ সম্বন্ধচ্যুতি মেটাবার চেষ্টা হয়েছিল, তার ফলে সংকীর্ণ হলেও নতুন সমাজসত্ত্বা গড়ে উঠ্ল। মানুষের ব্যক্তিত্ব তখন আর কেবলমাত্র বুদ্ধির ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী রইল না—আচার এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তার স্বকীয় মর্য্যাদাবোধ সেদিন জাগল। তারই ফলে মানুষকে কেন্দ্র ক'রে নতুন নতুন ভাবপ্রবাহ, জাতিবন্ধনের শিথিলতা এবং অর্থনৈতিক সংগঠনে সমস্ত দেশকে একীভূত করবার সাধনা।

সেই সাধনার স্বাভাবিক পরিণতিতে ইয়োরোপে ধনতন্ত্রের আবির্ভাব, এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে তারই বিকাশ জাতীয় রাজ্য গড়ে তুলল। ভারতবর্ষে কিন্তু তার এ স্বাভাবিক পরিণতি হয়নি, কারণ সামন্ততন্ত্রের ভাঙন সম্পূর্ণ হবার আগেই এ দেশ স্বাধীনতা হারাল। ইয়োরোপের সঙ্গে সংঘাতে ভারতের যে পরাজয়, তার কারণ খুঁজতে বেশী দূর যেতে হয় না। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আসন্ন ধনতন্ত্রের সংঘাতের ফলে ইয়োরোপে সামন্ততন্ত্র ভেঙে পড়ল, কিন্তু ভারতবর্ষের কৃষিপ্রধান আর্থিক সংগঠনে ধনতন্ত্র ও জাতিয়তাবাদের জয় অত সহজে সম্ভব হয়নি। আওরঙ্গজেব এবং শিবাজীর সার্থক অভিযান সামন্ততন্ত্রের শেষ আস্ফালন। তাই ইয়োরোপ যখন ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে হাজির হ'ল, তখনও ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্রের

রেওয়াজ চলছে। সেদিক দিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইয়োরোপের আবির্ভাব বিপ্লবকর। নতুন পরিবর্ত্তনের বাহন হিসেবেই ইংরেজ এ দেশে অবতীর্ণ হ'ল।

ইংরেজের এ বিপ্লবী ভূমিকা কিন্তু বেশীদিন টেকেনি। ইংরেজের সংঘাতে ভারতের সামন্ততন্ত্র ভাঙতে সুরু করল, কিন্তু তার অবশ্যম্ভাবী বিবর্ত্তন যে ধনতন্ত্র, তারি আবির্ভাবের পথে নতুন বাধারও সৃষ্টি হ'ল। প্রথম যুগে তাই ইংরেজ পুরোনো সামন্ততন্ত্র ভাঙল এবং যেহেতু ইংরেজের সাম্রাজ্যপত্তন বাংলা দেশে, সেখানেই এ ভাঙন তাই সব চেয়ে বেশী দূর এগিয়েছিল। সে যুগে বাংলার সামন্ততন্ত্রে মুসলমানের ছিল প্রাধান্য, তাই সে প্রাধান্য ভাঙবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অর্থনৈতিক কারণ হয়তো ছিল, কিন্তু তার প্রধান কারণ যে রাজনৈতিক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কর্ণওয়ালিশ সাহেব নিজেও সেকথা স্বীকার ক'রে গিয়েছেন। ভূমির অধিকার কৃষকের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নতুন এক জমিদারী শ্রেণীর সৃষ্টি হ'ল—তাদের স্বার্থই ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচিয়ে রাখবার যন্ত্র। কেবল তাই নয়,—১৮২০ সালের লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার মধ্যেও ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদের ইঙ্গিত পরিষ্কার। ১৮৩৩ সালে আকস্মিক রাজভাষা পরিবর্ত্তনও এ সাম্রাজ্যনীতির অঙ্গ। তার ফলে মুসলমান সামন্তসম্প্রদায় হ'ল ধ্বংস, কিন্তু তাদের জায়গায় ধনতন্ত্র অথবা নতুন সামন্ততন্ত্রের বদলে গড়ে উঠ্‌ল হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ যদি সেদিন ভারতবর্ষে সম্ভব হ'ত, তবে তার ফলে জাতীয় স্বাধীনতা হয়ে দাঁড়াত অনিবার্য্য। তাই নতুন হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সৃষ্টি ক'রে মোসলেম প্রাধান্য ধ্বংসই ছিল সেদিন ইংরেজের লক্ষ্য, এবং সে লক্ষ্য যে অনেকখানি সফল হয়েছিল, সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ভূমিসংগঠনের ও রাজভাষার পরিবর্তন সে উদ্দেশ্যে কি ভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, তা আমরা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু ইংরেজের ব্যবসারীতিও এ কাজে সমান সহায়তা করেছে। সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষভাবে এ দেশের শিল্প ধ্বংস ক'রে ব্যবসায়ের কাজে দালাল সৃষ্টিই ছিল ইংরেজের বাণিজ্যনীতির লক্ষ্য, তারও ফলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়াল। সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদের উপর নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করবার জন্য ইতিহাসের বিকৃতি এবং অতিরঞ্জন যে কী ভাবে ব্যবহার হয়েছিল, সে কথাও আমরা আগে লক্ষ্য করেছি। তার ফলে নতুন হিন্দু মধ্যবিত্তের মনে ইংরেজের জন্য প্রীতি এবং মোসলেমের প্রতি বিদ্বেষমনোবৃত্তি হয়ে উঠ্‌ল স্বাভাবিক। প্রায় সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীই

এ মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। হিন্দুর স্বাজাতিকতা এবং জাতীয়তার মধ্যে সেদিন কোন পার্থক্য তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মতন প্রতিভারও চোখে ধরা পড়েনি। সিপাহী বিদ্রোহের যে পরাজয়, তারও প্রকৃত কারণ মুসলমান সামন্ততন্ত্রের সে বিদ্রোহে হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর সহানুভূতি এবং সহযোগিতার অভাব।

ইংরেজের এ সাম্রাজ্যনীতিতে কিন্তু একটা ভুল রয়ে গিয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী চিরদিন মধ্যবিত্ত থাকতে পারে না,—সামন্ততন্ত্রের পরিণতিতে ধনতন্ত্র এবং জাতিয়তাবাদের আবির্ভাব অনিবার্য্য। জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠা তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন, কারণ এই প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই মধ্যবিত্ত হিন্দু শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ইংরেজ দেখল যে যে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তারা ভেবেছিল অর্থনৈতিক এবং ভাবের জগতে ইংরেজের দালাল, তারাও স্বাধীন ভাবে সমগ্র ভারতের হয়ে স্বাতন্ত্রের দাবী করতে পারে। আবার সাম্রাজ্যনীতির মোড় ফিরল,—ধ্বংসপ্রায় মুসলমানের মধ্য থেকে আবার নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি ক'রে হিন্দুর শক্তি খর্ব্ব করবার চেষ্টা সুরু হ'ল, আজও তার পর্য্যায় চলছে। তবে হিন্দুকে যেটুকু ক্ষমতা দিয়ে ইংরেজ একবার ঠকেছে, মুসলমানের বেলায় তা শোধরাবার জন্য তাদের আপ্রাণ চেষ্টা। তাই নবোদ্ভূত মোসলেম মধ্যবিত্তকে ক্ষমতা দিতে তাদের প্রাণ সরছে না, কেবলমাত্র ক্ষমতার খোলস দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টাই আজ ইংরেজের সাধনা।

তবু ইংরেজের প্রথম যুগের বিপ্লবী ভূমিকা ভারতবর্ষের সভ্যতার বিকাশে সাহায্য করেছে। ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ে নৈসর্গিক ক্ষমতার যে শৃঙ্খলন, সে কাজও খানিকটা এগিয়েছে, যদিও যতদূর এগোনো প্রয়োজন ও সম্ভব ছিল, তা হয়নি। শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এবং ভাবধারার আদানপ্রদানের সুবিধাও বেড়ে গেছে। তার ফলে যে সমস্ত বিপ্লব সংকীর্ণ সীমার মধ্যে ছিল আবদ্ধ, আজ সমস্ত ভারতবর্ষে তাদের পরিব্যাপ্তির সম্ভাবনা বেশী। বিভিন্নধর্ম্মী সভ্যতার সংঘাতে জাতির জীবনাবেগও পেয়েছে নতুন তীব্রতা, সভ্যতা বিকাশের নতুন সম্ভাবনা তাই আজ এসেছে, কিন্তু তার পরিমাণ বিচারের সময় আজো আসেনি।

আজ্‌কের এই সকাল

হেমচন্দ্র বাগচী

ভেবেছি গুন্‌গুন্ ক'রে গান কর্‌ব
আর কাজ কর্‌ব প্রসন্ন মনে।
কালের পদক্ষেপ যখন শুন্‌তে পারি
বুঝ্‌তে পারি কি করুণভাবে
চলেছে এই পৃথিবী তা'র ধ্বংসের দিকে,
বুঝ্‌তে পারি কি অদ্ভুত আবর্ত্তন
আর পরিবর্ত্তনের লীলা,
বুঝ্‌তে পারি কি অদ্ভুত উদাসীনতা তোমার
আর কি অসামান্য গাম্ভীর্য্য,
কি সুন্দর সুডোল তোমার ছন্দ
জানি তিল তিল কালকে নিয়েই ত মহাকাল
তাই, তাকিয়ে থাকি তা'র গম্ভীর করুণ পদক্ষেপের দিকে!

ভোর চলেছে সকালের দিকে
সকাল ঢ'লে পড়্‌ছে দু'পহর বেলায়
দু'পহর এলিয়ে পড়ে বৈকালে,
বৈকালের মাধুর্য্য শেষ সন্ধ্যার ঘনগাম্ভীর্য্যে
সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হ'ল যামিনীতে।
অপরূপা যাদুকরী যামিনী
আর, মানুষের স্বপ্নবিহ্বল মন!
ঘর-সংসার, কথাবার্ত্তা, বিবাদ-বিসম্বাদ,
মানুষের সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম্ম—
হায় মানুষের স্বপ্নবিহ্বল মন!

অতি নিঃশব্দ আর অতি করুণ এই মহাকাল—
অতি ধীরে চলেছে তা'র চক্র ঘুরে ঘনগম্ভীরে
অতি ধীরে !
তাই ভেবেছি গুন্ গুন্ ক'রে কর্‌ব গান
আর কাজ কর্‌ব প্রসন্ন মনে !

শাশ্বত

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রুক্ষ মাটির গেরুয়া-বিলাসী-সজ্জা
স্বরূপরক্ষী আকাশের নব কৌতুক
বর্ষোচ্ছ্বাসে উন্মেষী নদী-লজ্জা
কুমারী ধরার সেই তো অনাদি যৌতুক।

তীর-মৃত্তিকা গড়ে তোলে দ্বীপ জলমাঝে
কেন্দ্র-আকুতি দূরে ফেলে দেয় বালুরাশি,
প্রথম যেদিন চাঁদ উঠেছিল নীল সাঁঝে
কালো পৃথিবীর মুখে ফুটেছিল ক্রূর হাসি।

পুরানো পাহাড়-কোলে পড়ে রয় কালো পাথর
তারে ঘিরে আঁকে সবুজ নরম আল্‌পনা
গূঢ় মানসের গুহা-মানুষের কথা কাতর
চেতন প্রয়াসে প্রকাশে উগ্র কল্পনা।

তোমার ও-রূপ কতো না দেখেছে মূঢ় আঁখি
পরিচিত স্মিত, আলুলিত কালো কেশপাশ,
তবু তো কথিতা সেই আলোছায়া নেয় মাখি'
আদিম সত্তা জাগায় অদ্ভুত রসভাস।

সারথি

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ কোন্ পর্ব্বতে আমাদের ঘুম ভাঙ্‌লো, সারথি ?
হিম আর কুয়াশা জড়ানো কালো রাত্রির
পঙ্কিল পথাতিবাহনের শেষে
এ কোন্ আদিম গুহার নিঃশ্বাসে ভারি
নিদারুণ উপত্যকা ?
আরো কতো দূরে আমাদের উদয়-তোরণ ?
আরো কতো দূরে আমাদের পথনির্দ্দেশের সংকেত
এ কোন্ পর্বতে আমাদের ঘুম ভাঙ্‌লো সারথি ?

অশ্ব-বল্লাকে দৃঢ়তরো করবার নির্মম সাধনা
আর রথ-চক্রের বেগের নিচে স্থূল এবং কঠিন
প্রস্তর-সংঘাতের বেদনানুভূতি,
তোমারই, সারথি !
কিন্তু এ কার শোভাযাত্রা ?
কোন্ মৃত্যু-দেবতার অবিশ্রান্ত জয়ধ্বনি ?
—আদিম বর্বর নারীর সেই উচ্ছৃঙ্খল বেশ,
রক্ত-লোলুপতায় উৎসর্গীকৃত তোমার চক্ষু,
তোমার স্ফীত পেশীবহুল বাহুর আভাষ ?

এখানে হিম, এখানে রাত্রি,
এখানে পাথর, আর নীল নদের বন্যার অভিশাপ !
দূর পর্বতপ্রান্তে বুদ্ধের গম্ভীর ছায়া ;
তোমার রথের চাকায়-চাকায় জড়ানো দীর্ঘ কেশজাল,
আর, তোমার এই পঙ্গু নিঃশব্দ মৃত্যু-অভিধানের
দীর্ঘ প্রতীক্ষা !

আরো কতো দূরে আমাদের উদয়-তোরণ, সারথি ?
আরো কতো দূরে দেখা যাবে দিগ্বলয়রেখা ?
—দেখা যাবে আলো-দেবতার রত্নমুকুট ?
আর প্রত্যূষের প্রসন্ন নির্মল অঙ্গুলিসংকেত ?
—এ কোন্ পর্বতে আমাদের ঘুম ভাঙ্‌লো, সারথি ?

ক্যাশিয়ার

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মধ্যাহ্ন-দুঃস্বপ্ন শেষ হল,
সারস্বত ব্রত আজ লক্ষ্মীর পূজারী
দেখো দূরে মায়াবী আকাশে
এ সন্ধ্যার অন্ধকার-ঝারি।

যৌবন কটাক্ষবাণে দ্বিধাগ্রস্ত তুমি কি হয়েছো ?
আজো কি দুরন্ত স্বপ্ন আচম্বিতে দিয়ে যায় হানা ?
শ্লথ-বেণী বসন্তের যুবতী দিনেরা
কুসুম শয়নে শুয়ে তোমাকে কি করে নি ছলনা ?

জীর্ণ বাস্-এ গৃহমুখী। কতক্ষণ, আর কতক্ষণ ?
অনাগত বসন্তের আজ আর নেই কোনো মানে,
ছেঁড়া-হাতা জামা প'রে কুবের-ভাণ্ডারী
রেডিয়োয় গান শোনো পানের দোকানে।

প্রহরী প্রহরগুলি এখন তো নেই।
ঘর্মক্লান্ত দেহ শান্ত এক কাপ্ চা-এ
কানা-ভাঙা ফাটা পেয়ালায়।
বাইরে দুরন্ত সন্ধ্যা উন্মত্ত অধীর,
তবুও তো শান্তি আছে ছিন্ন তাকিয়ায়।

অভিযান

হুমায়ুন কবির

জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার সামাল তরী।
নোঙ্গর তোল, মেলে দাও পাল ত্বরা.
বন্দরে বসি' কাটাইবে কাল কেমন করি ?
নবীন আবেগে গতিচঞ্চল
ফুলে ফুলে ওঠে ফেনাভরা জল,
থরথর করি কাঁপে পুরাতন বসুন্ধরা।
নোঙ্গর তোল, মেলে দাও পাল ত্বরা।

লক্ষযুগের সুপ্ত জীবন সহসা জাগে,
ভেঙে পড়ে তার বাঁধন আছিল যত,
উদ্দাম বেগে লক্ষ্যবিহীন ছুটিছে আগে।
করে না বিচার করে না ভাবনা,
আজি তার শুধু ভাঙার সাধনা,
প্রলয়ঙ্কর প্রগতি তাহার অপ্রতিহত।
ভেঙে পড়ে তাই বাঁধন আছিল যত।

শঙ্কিত ভীরু হৃদয় কাঁপিছে হরষে ত্রাসে।
নতুন দিনের অনাগত সুখ চাহে,
আবার ডরায় অতীতের চির সর্ব্বনাশে।
অভ্যাসে বাঁধা জীবনের ধারা
প্রলয় আগুনে পুড়ে হ'ল সারা,
উন্মদ মন নবজন্মের কি গান গাহে।
নতুন দিনের অনাগত সুখ চাহে।

মানুষের মন জীবনের খোঁজে মৃত্যুমুখে
নোঙ্গর-তোলা তরী সম উদ্‌গ্রীব,

ঝাঁপায়ে পড়িতে ঝঞ্ঝা-উতলা সাগরবুকে।
পথসন্ধানী, দুঃসাহসিক
অজানা সাগরে কোথায় নাবিক
ধ্বংসের মাঝে নতুন স্রষ্টা চিরঞ্জীব ?
নোঙর-তোলা তরী সম উদ্‌গ্রীব ?

হতাশা বেদনা অন্যায় গ্লানি অসন্তোষ
মৃত্যু ফুকারে বজ্রগরজ রোলে ;
সাগরের জলে কল্লোল জাগে কী নির্ঘোষ !
উদ্বেলি উঠে অন্ধ বাসনা।
ভোলায় লক্ষ্য, ভোলায় সাধনা,—
বিভ্রান্ত শশী মেঘআবৃত গগনে দোলে।
মৃত্যু ফুকারে বজ্রগরজ রোলে।

লক্ষ্যের পানে অচপল হিয়া কাহারা চলে
দিকভ্রান্তির চরম সর্ব্বনাশে,
জনসমুদ্রে তরণী ভাসায়ে জোয়ার জলে ?
শত মানুষের মনের স্বপন
নবীন ভুবনে করে রূপায়ণ
নব আনন্দ, নবীন সাধনা, নূতন আশে ?
দিকভ্রান্তির চরম সর্ব্বনাশে !

জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার, সামাল তরী,
নোঙর তোল, ফেলে দাও পাল ত্বরা;—
বন্দরে বসি ডোবাবে তরণী এমন করি ?
পিছনে ঘনায় মৃত্যুর মেঘ
জীবনে জাগিছে নবীন আবেগ,
ধ্বংসবাঁধনে বাঁধা পুরাতন বসুন্ধরা।
নোঙর তোল, মেলে দাও পাল ত্বরা।

সুপ্রতিম মিত্র

বুদ্ধদেব বসু

রূপলালের আস্তানা থেকে বেরিয়ে ম্যালের রাস্তা ধরলুম। ভাটিয়ারা মানুষ নয়, ওদের আত্মা নেই। এই রূপলালের দারজিলিং-এ দশখানা বাড়ি, কিন্তু নিজে এসে থাকে বাজারের উপরে দু'খানা ছোট্ট খুপরি ভাড়া নিয়ে। দশখানা ভুল বললুম; এতদিন দশখানাই ছিলো বটে, আজ থেকে ন'খানা। অন্য বাড়িটি আজ থেকে আমার, এইমাত্র আগাম টাকা দিয়ে দলিল সই ক'রে এলুম।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত ক্লো ভিলা কিনেই ফেললুম। যতবার দারজিলিং-এ আসি, ঐ বাড়িটিই ভাড়া ক'রে থাকি, রূপলালের নামে মোটা-মোটা চেক্ কম কাটিনি এ-পর্যন্ত। এবারে অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট একটি চেক কেটে বাড়িটিই আমার ক'রে নিলুম, চেয়ার-টেবিল বাসন-কোষন সব সুদ্ধ। তেইশ হাজার এক টাকা থেকে অনেক ঝকাঝকি ক'রে কুড়ি হাজার নিরানব্বুই টাকায় রফা করেছি: ঠকিনি।

ক্লো ভিলা এলিসি রোডে, 'শহর' থেকে দূরে, বেশ একটু খাড়াইও বটে, সেইজন্যে অনেকের হয়তো পছন্দ হয় না। কিন্তু বাড়িটি বেশ। অনেকগুলো ঘর, অনেকখানি জমি, আর নিম্নবর্তী দারজিলিং শহরের লাল ছাদগুলো পার হ'য়ে মনে হয় কাঞ্চনজংঘাই নিকটতম প্রতিবেশী। শোবার ঘর খাবার ঘর বসবার ঘর এমনকি দু' একটা নাবার ঘর থেকে মেঘ আর তুষারের খেলা চোখে পড়ে। বাড়িটি বেশ লাগে আমার, বেশ লাগে।

তখন ঠিক তিনটে, হোটেলে চায়ের ঘণ্টাখানেক দেরি। হোটেলে ফিরলেই হয়তো ঘুমিয়ে পড়বো, আর ঘুমিয়েই যদি সময় নষ্ট করলাম, তাহ'লে আর পাহাড়ে আসা কেন? এবারে অল্পদিনের জন্য একা এসে মাউন্ট্ এভারেস্টেই উঠেছি। কালই ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়; বম্বে ইউনিভার্সিটির কনভোকেশনে এবার আমাকে না নিয়েই ছাড়বে না, তার বক্তৃতা লেখা এখনো বাকি; তাছাড়া সামনের সপ্তাহেই ইয়েল-এর প্রোফেসর প্যাট্রিজ আসছেন কলকতায়, তিনি আবার আমারই অতিথি হবেন।

* এই গল্পের সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক। কোনো জীবিত ব্যক্তির চরিত্র-চিত্রণ এতে নেই; কি কোনো জীবিত ব্যক্তির প্রতি উল্লেখও নেই।

বেলা তিনটেয় চৌরাস্তা প্রায় খালি, ছায়া-ঢাকা বেঞ্চিগুলোয় দু'চারটে পাহাড়ি উদাস আলস্যে ব'সে ব'সে সিগারেট খাচ্ছে, এই যা। চৌরাস্তা পিছনে ফেলে হনহন ক'রে হাঁটতে লাগলুম—যদিও আমার বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, কি পাহাড়ে, কি সমতলে, আমার সঙ্গে হাঁটতে হ'লে অনেক ছোকরাই হাঁপিয়ে পড়ে। পার্কে গিয়েই বসবো।

পার্কও জনশূন্য, শুধু আমার সঙ্গে কয়েকটি শ্বেতচর্ম শিশু, আর ঐদিকে গাছের আড়ালে কোনো তরুণ যুগল যদি থাকে। গাছের নিচে একটি বেঞ্চিতে ব'সে চারদিকে তাকালুম, চিরপুরোনো দারজিলিং হঠাৎ যেন নতুন হ'য়ে চোখে লাগলো। অক্টোবরের শেষে প্রায়ই ঘন কুয়াশায় আকাশ ও পৃথিবী মুছে যায়, কিন্তু আজকের বিকেলটি টলটলে উজ্জ্বল, আর হাওয়ায় সেই বিশিষ্ট পাহাড়ি শৈত্য যা জীর্ণ দেহে নবজীবন আনে। আজকের রোদে যেন একটি নতুন আভা, আজকের আকাশ যেন অন্য সবদিনের আকাশের চাইতে নীল। বেশ বিকেলটি।

হয়তো আজ দারজিলিং-এ একটি বাড়ির মালিক হয়েছি ব'লেই এখানকার প্রকৃতিকে এত সুন্দর লাগছে। তা-ই যদি হয়, তাতে আমি লজ্জিত হবার কোনো কারণ দেখিনে। কৃতী হ'তে, সার্থক হ'তে কে না চায়? কে না ভালোবাসে? তিরিশ টাকার ইস্কুলমাষ্টারিতে আমার জীবনপ্রবেশিকা। অকপটেই বলছি, আমার অসাধারণ বুদ্ধি কি প্রতিভা নেই; কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই দুটি জিনিস আমার ছিলো : দারুণ উচ্চাশা ও সংকল্পের দৃঢ়তা। তারই জোরে ইস্কুলমাষ্টারি করতে-করতে এম-এ পাশ করেছিলুম। তারপর বাগেরহাট কলেজের নিষ্ঠুর নির্বাসনে ব'সে ব'সে পি-আর-এস্-এর থীসিস দিলুম, প্রথমবারে ফেরৎ এলো, দ্বিতীয়বার শ্রম ও নিষ্ঠা হ'লো পুরস্কৃত। তার দু' বছর পরই পি-এইচ্-ডি। সেই ঈশ্বর-পরিত্যক্ত বাগেরহাটে হারিকেনের লণ্ঠন জ্বেলে গভীর রাত্রি পর্যন্ত আমার ঘর্মক্ষরণের কথা ভাবতে এখন অদ্ভুত লাগে। আজ সে-সব দিন স্বপ্নের মতো মনে হয়।

আমার আসল নাম যদি বলি, তাহ'লে শিক্ষিত বাঙালি সকলেই আমাকে চিনবেন। আচ্ছা, ধরা যাক—ধরা যাক্ আমার নাম মহিম তালুকদার। অন্যান্য দু' একটা তথ্যও অল্প বদ্‌লে দিচ্ছি, কেননা নিজের কথা নিজের মুখে বলতে অসুবিধে লাগে। সংক্ষেপে এটুকু জেনে রাখুন যে এখন আমি কলকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধানতম অধ্যাপক, বেশ বড়ো দরের একটি চেয়ার গত দশ বছর ধ'রে দখল ক'রে আছি। সারা ভারতবর্ষ অতিক্রম ক'রে বিদেশেও

আমার নাম পৌঁচেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচে প্রথমবার ইয়োরোপে গিয়ে ডি-লিট ডিগ্রি আহরণ করেছিলুম, তারপর সেবার লণ্ডন, প্যারিস ও রোমে 'ভাষাতত্ত্ব ও বিশ্বসভ্যতা' বিষয়ে বক্তৃতা ক'রে এসেছি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস সেগুলো গ্রন্থাকারে ছেপেছে। ইয়োরোপ বাদ দিয়ে, আমেরিকা, জাপান, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ ও ঈজিপ্ট আমি ঘুরে এসেছি, মরবার আগে আর-একবার পৃথিবী ভ্রমণ করবার ইচ্ছা আছে, এবং আমি যা ইচ্ছা করি, সাধারণত তা-ই হয়।

এখানেই যে শেষ, সে-কথাই কি কেউ বলতে পারে? গত পাঁচবছর ধ'রে একটু-আধটু পলিটিক্সও করছি—অবশ্য খুব সাবধানে, নানারকম হিসেব ক'রে—আমার বিচক্ষণতায় আমি নিজেই মাঝে-মাঝে অবাক হ'য়ে যাই, এবং বিচক্ষণতা, যাকে আমরা বুদ্ধি, মেধা কি মনীষা বলি, তার চেয়ে ঢের বেশি দরকারি জিনিস। মন্ত্রীমহাশয়দের সঙ্গে আমার দহরম-মহরম যথেষ্ট, আবার বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার বইটি সুভাষ বোসকে উৎসর্গ করেছি, গোপনে হিন্দুমহাসভাকে চাঁদা দিলেও সাম্প্রদায়িকতা আমার মধ্যে একেবারেই নেই, কেননা গণ্যমান্য মুসলমান প্রায় সকলেই আমার বন্ধু। ছাত্রসমাজেও আমার প্রতিপত্তি বেশ, কেননা আমার মতামত একেবারেই রক্ষণশীল নয়—এমনকি, আমি সোশ্যালিজ্‌ম-এর পক্ষপাতী, যদিও রুশদেশে সেটার প্রয়োগ যেভাবে হচ্ছে সেটা আমার অ-মানুষিক মনে হয়। আমি ভেবে দেখেছি সোশ্যালিজম্ আর ফাশিজ্‌ম্ আসলে একই বস্তু, যদিও ছাত্রদের সভায় সে-কথা বলিনে—কেননা ওরা তো কোনো জিনিস ভালো ক'রে বুঝে ছাখে না, কেবল হুজুগে মাতে, আর চল্‌তি হুজুগের বিপরীত কোনো কথা শুনলেই চ'টে যায়।

আমার বিশ্বাস, সব রকম দল, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় আমাকে পছন্দ করে। যদিও নিজের মুখেই বলছি, তবু এ-কথা সত্য যে সকলের সঙ্গেই আমার ব্যবহার খুব ভদ্র। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কারো পাঁচ মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হয় না। প্রার্থীদের জন্য যথাসাধ্য করি। নিজে যদিও সিগারেট খাইনে, বাড়িতে সিগারেট রাখি, এবং ছাত্ররা বাড়িতে এলে তাদের দিকেও রূপোর বাক্সটি প্রসারিত করি। ওরা খায় না, কিন্তু খুব খুসি হয়। ছাত্রদের জন্য খাটতে আমার আলস্য নেই; যেদিন লেক্‌চার থাকে সেদিন সকালে অন্তত দু' ঘণ্টা পড়াশুনো এখনো করি। লোকে বলে, কষ্টে যারা মানুষ হয় অবস্থা ফিরলে তারাই হয় কৃপণশ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমি পয়সার মায়া ক'রে নিজেকে কিংবা আমার স্ত্রী-পুত্রকে কোনো সুখ থেকে বঞ্চিত করেছি এ-কথা কেউ বলতে পারবে না।

দু'হাতে রোজগার ক'রে দু'হাতেই আমি খরচ করি—কেননা পরের জন্য খরচ করতেও আমি যে কুণ্ঠিত নই তা আমার বন্ধু-বান্ধব, যারা প্রায়ই আমার বাড়িতে ভোজে নিমন্ত্রিত হয়, তারাই বলবে। তাছাড়া বারো মাসে ছত্রিশ চাঁদা তো লেগেই আছে।

যে-লোক প্রিয়কারী, তার উপর কার্যকরী, তার উপর সহজেই প্রভাবশীলদেরই নজর পড়ে। এই তো সেদিন কিট-ক্যাট ক্লবের বার্ষিক ভোজে বাংলার একজন মন্ত্রী আমার পাশে বসেছিলেন। 'কী হে, তালুকদার, মন্ত্রী-টন্ত্রী হবার সখ হয়?' কথায়-কথায় তিনি বললেন। আমি হেসে বললুম, 'আপনাদের দয়া হ'লে আজকালকার দিনে সবই সম্ভব।' তারপর তিনি দু'একটা কথা বললেন—অবশ্য পরিহাসচ্ছলে—কিন্তু ইঙ্গিতগুলো স্পষ্ট। বর্তমান ক্যাবিনেটে যদি কোনোরকম গোলমাল হয়—এবং হবারই সম্ভাবনা—তাহ'লে শিক্ষামন্ত্রীর পদটা হয়তো তার কাছেই আসবে, তিরিশ বছর আগে যে তিরিশ টাকার ইস্কুল-মাষ্টার ছিলো। যাঁর কাছ থেকে টিপ্‌টা পেলুম সে-ভদ্রলোক মন্ত্রী হবার আগেই তাঁর জামাইকে আমি আমার ডিপার্টমেণ্টে লেকচারার করেছিলুম। আমার দূরদৃষ্টি আছে—এবং দূরদৃষ্টি মনীষার চাইতে মূল্যবান।

মন্ত্রীত্বের কথা না-হয় ছেড়েই দিলুম। রাজনীতি বড়ো অস্থির নদী, কথায়-কথায় সেখানে নৌকোডুবি হয়, তার মধ্যে ঝাঁপ দেবো কিনা এখনো ভেবে স্থির করতে পারিনি। বরং আসামে ইউনিভার্সিটি হ'লে তার ভাইস-চান্‌স্‌লার হওয়া ভালো, সে-প্রসঙ্গেও আমার নাম উল্লিখিত হ'তে শুনেছি। তাছাড়া এলাহাবাদ আছে, অন্ধ্র আছে, ঢাকা আছে···দু'চার বছরের মধ্যে হয়তো একটা ভাইস-চান্‌স্‌লার হ'য়ে যেতে পারি, কে জানে! এলাহাবাদের উপরেই নজর রাখা ভালো, সেখানে এখন কংগ্রেস-মন্ত্রীত্ব, আর গত বছর লক্ষ্ণৌ গিয়ে জওহরলালের সঙ্গে আমার একটানা চার ঘণ্টা কথাবার্তা হয়। ভদ্রলোকটি বেশ, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে আমার বইখানা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : দশ টাকা : এখন পর্যন্ত এ গ্রন্থই প্রামাণ্য) প'ড়ে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। কাল গবর্নর লাঞ্চে ডেকেছেন, কায়দা ক'রে কথাটা একবার পাড়তে হবে।

তাছাড়া, এখানেই যদি শেষ হয়, এর ঊর্ধ্বে আমার ভাগ্যরেখা আর যদি না গিয়ে থাকে, তাহ'লেই বা ক্ষতি কী? আমার পক্ষে, আমার মতো মানুষের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে—যথেষ্ট—তারও বেশি। তলিয়ে দেখতে গেলে আমি কী? সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন একজন বাঙালি—এই তো? কোনোদিকে বিশেষ কোনো

ক্ষমতা নিয়ে আমি জন্মাইনি—নিছক পরিশ্রম ও সততার দ্বারাই জয়ী হয়েছি। জন্মেছিলুম নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে, বাপ ছিলেন—ব'লেই ফেলি—বাপ ছিলেন মাদারিপুরে মোক্তার, তাঁর ইচ্ছে ছিলো—হায়রে উচ্চাশা!—আমি মাদারিপুরেই বি-এল্ পাশ-করা উকিল হই (সেকালে বি-এল্ পাশ না ক'রেও উকিল হওয়া যেতো।) ইস্কুলমাষ্টারিতেই আমার জীবন শেষ হ'তে পারতো—কি ব্যাঙ্কের, কি পোষ্টাপিসের কেরানিগিরিতে; কৃশ, ক্ষুধিত ও কাংস্যভাষী গ্রাম্য উকিল হ'তে পারতাম আমি; হ'তে পারতাম ব্যাকুল ও উদ্‌ভ্রান্ত বীমার দালাল—কিন্তু সে-সব কিছুই না হ'য়ে আমি হলাম ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের একজন দিকপাল! রাসবিহারী এভিনিউর উপরে আমার কম্পাউণ্ডওলা বাড়িটি অনেকেই চেনে, আজ থেকে দারজিলিং-এও আমার নিজের বাড়ি হ'লো। এটা কেউ-কেউ লক্ষ্য করেছে যে আমার সমপদস্থ অনেকের চাইতেই আমার আর্থিক অবস্থা ভালো মনে হয়। কথাটা আমি নিজেও মানি। তবে আসলে ব্যাপারটা হয়তো এই যে অন্যদের তুলনায় আমি খরচ করি বেশি ও সঞ্চয় করি অল্প; আর তাছাড়া একটু অবহিত হ'লে ও হাতে কিছু থাকলে টাকা আজকালকার দিনে সহজেই বাড়ানো যায়—ঐ রূপলাল লোকটাই কি আমাকে ভালো-ভালো শেয়ারের কম খোঁজ দিয়েছে!

সুতরাং আমি যদি মনে-প্রাণে সুখী না হই, তাহ'লে ভাগ্যের প্রতি নেহাৎ নেমকহারামি হবে। আমার ধারণা, যে যতটা যোগ্য, জীবনে সে ততটাই পায়; কিন্তু এ-ধারণা সত্য হ'লেও আমি আমার দুর্ভাগা জন্ম ও বাল্যের প্রতিকূল প্রতিবেশ সত্ত্বেও যে এতটা যোগ্য হ'তে পেরেছি, তার মধ্যে অদৃষ্টের খানিকটা হাত মানতেই হয়। আমার বাল্যের ও যৌবনের সঙ্গী ও সমকক্ষরা আজ অকৃতী, অজ্ঞাত, দরিদ্র, নামহীন জনগণের মধ্যে নিশ্চিহ্ন। তাদের মধ্যে আমারই মতো হয়তো অনেকে আছে। আমারই মতো? কিন্তু ঠিক আমার মতো হ'লে তারাই কি আজ নিচে প'ড়ে থাকতো! নিশ্চয়ই আমার এমন-কিছু আছে যা তাদের নেই, যার জোরে আমার এই আশ্চর্য উত্থান। হয়তো অধ্যবসায়, হয়তো নিষ্ঠা, হয়তো সুবুদ্ধি···সে যা-ই হোক, তারই জোরে আমি উঠেছি, উঠেছি, ধাপে-ধাপে সমাজের সিঁড়ি বেয়ে যে-উঁচু চূড়ায় আমি আজ আসীন, আমার পুত্র-পৌত্র বিনা আয়াসেই তার চেয়েও উঁচুতে উঠে যেতে পারবে। হাজার হোক্, আমি একজন বড়োলোক চাকুরে মাত্র, কিন্তু আমার ছেলেমেয়ে ও তাদের ছেলে-মেয়েরা—তারা হবে বড়ো ঘর। এবং এই বড়ো ঘর আমারই সৃষ্টি।

আমার সহধর্মিণীও সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়ে। বি-এ পাশ করবার অল্প পরেই আমার বিবাহ হয়েছিলো, এবং তখনকার আমার পক্ষে ভালো স্ত্রীই হয়েছিলো। সুন্দরী, লেখাপড়া বিশেষ শেখেননি, কিন্তু সব মেয়েরই যেমন থাকে, সাধারণ বুদ্ধি প্রবল। কত যে প্রবল, তা টের পেলুম প্রথমবার বিলেত থেকে ফিরে এসে। সেই তিন বছরে তিনি চলনসইরকম ইংরিজি শিখে নিয়েছিলেন···তারপর কালক্রমে সাজসজ্জা, আদব-কায়দা, হাব-ভাব, যখন যেমন দরকার, আশ্চর্য সহজে আয়ত্ত ক'রে নিলেন। কষ্টেসৃষ্টে দীনজীবন যাপন করতে হবে এই জেনেই তিনি আমার ঘরে এসেছিলেন, কিন্তু লাটের বাড়িতে খানা খাবার ডাক এলো যেদিন, সেদিনও তিনি চমৎকার চালিয়ে নিলেন। আশ্চর্য জীব এই মেয়েরা। জন্মান্তর এদের স্বভাবগত; পিতৃগৃহ থেকে স্বামীগৃহে আসবার দ্বিজত্ব এদের রক্তেই আছে, বোধ হয় সেইজন্যেই জীবনের যে-কোনো বিরাট পরিবর্তন এরা যত সহজে মেনে নিতে ও নিজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে, পুরুষরা ততটা পারে না। সত্যি বলতে, অতীতকে আমার স্ত্রী যে-রকম নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছেন, আমি সে-রকম পারিনি। আমার কথায় এখনো পূর্ববঙ্গীয় আভাস পাওয়া যায়, দুঃস্থ আত্মীয় সাহায্য প্রার্থনা করলে দয়াই হয়, পুরোনো ও সামাজিক হিসেবে নগণ্য কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'লে ভালোই লাগে। কিন্তু আমার স্ত্রী, যিনি জীবনের কুড়ি বছর পর্যন্ত (অর্থাৎ আমি যতদিন ইস্কুল-মাষ্টার ছিলুম) একটা সব্‌-ডিপটিকেও মহৎ ব্যক্তি ব'লে ভেবেছেন, তাঁর যোগ্য বন্ধু-বান্ধব আজ কলকাতার শহরেও খুব বেশি নেই। মেয়েরা আশ্চর্য জীব, সত্যি।

ঐ ইস্কুলমাষ্টারের ঘরেই একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মেছিলো, তারপর আর সন্তানলাভের সৌভাগ্য আমার হয়নি। পিতৃনির্বাচনই ওদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, তারপর আর ভাবতে হয়নি। ছেলে গাইনকলজিস্ট, রোটণ্ডার ডিগ্রি নিয়ে ভিয়েনা ও আমেরিকায় শিক্ষা শেষ ক'রে ফিরেছে, ডক্টর সুহৃৎ সোমের মধ্যমা কন্যাকে বিবাহ ক'রে অল্পদিনের মধ্যেই প্র্যাকটিসে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। বাঙালির মধ্যে আই-সি-এস্‌-এর সাম্প্রতিক স্বল্পতা ও বিবাহযোগ্যা সুকন্যাদের বহুলতা সত্ত্বেও মেয়ে যে একটি বাঙালি আই-সি-এস্‌-কেই বিয়ে করতে পেরেছে এ-জন্য তার মা-কেই ধন্যবাদ দিতে হয়। জামাইটি তুখোড়, এখন পূ—গঞ্জে এস্‌-ডি-ও। পুত্রকন্যা উভয়েরই ছেলেপুলে হয়েছে ও হচ্ছে; মেয়ের চিঠিপত্র প্রায়ই পাই, সুখে আছে।

এই আমি যদি মনে-প্রাণে সুখী না হই, তার চেয়ে ঘোরতর নেমকহারামি আর কী হ'তে পারে? যা-কিছু আমি চেয়েছিলুম, সবই হয়েছে; দারজিলিং-এর এই বাড়িটি পর্যন্ত। যা ছিলো আমার পক্ষে উন্মত্ত দুরাশা, তা-ও ব্যর্থ হয়নি। আমি কৃতী, এবং আমার কৃতিত্ব আমি উপভোগ করি—আমার অবস্থায় কে না করতো? আমার সহকর্মী প্রতুল চ্যাটার্জি, ইয়োরোপীয় ক্ল্যাসিক্‌স্‌-এ সম্ভবত ভারতবর্ষের একমাত্র পণ্ডিত, প্রায়ই আমাকে বলে, 'ওহে মহিম, তোমার গা দিয়ে যে সুখ চুঁইয়ে পড়ছে, মোটা লোকের গা দিয়ে যেমন ঘাম চুঁইয়ে পড়ে।' ঠাট্টা ক'রেই বলে, কিন্তু আমি কিছু মনে করি না, বরং খুসিই হই। কেননা ঠাট্টার পিছনে হয়তো একটু ঈর্ষা আছে, এবং ঈর্ষিত হ'তে ভালোই লাগে। প্রতুল চ্যাটার্জি পণ্ডিত লোক সন্দেহ নেই, কিন্তু কে ওর নাম জানে! চাকরিটি নিয়ে মুখ বুজে প'ড়ে আছে, কাজে উৎসাহ নেই, কোনো উচ্চাশা নেই। কলকাতার বনেদি ঘরের ছেলে, এককালে বিষয়সম্পত্তি ভালোই ছিলো, বিয়ে করেছে ঠাকুরবাড়িতে, হয়তো এই চাকরিটাকে বিশেষ কিছু মনে করে না, মনে-মনে তুচ্ছ করে। এখন, যে-কাজে উপজীবিকা, তাকে তুচ্ছজ্ঞান করলে কিছুতেই উন্নতি হয় না, এ আমি বার-বার দেখেছি। যার যে চাকরিই হোক্‌, সেটাকেই দেশের শ্রেষ্ঠ চাকরি মনে ক'রে নিতে হবে, এমনকি তাতে পৃথিবীর যথেষ্ট উপকার হচ্ছে তাও বিশ্বাস করতে হবে, উন্নতির এই হ'লো ভিত্তি।

আসলে প্রতুল আমাদের দেশের ক্ষীয়মাণ আভিজাত্যেরই প্রতিমূর্তি; বাঁচবার বায়লজিকাল তাগিদটাই ওর নেই। একজন লোকের সঙ্গে হেসে দুটো কথা বললে যদি হাজারটা টাকা পকেটে আসে, ও তা-ও করবে না। ধুতির দীর্ঘ কোঁচা সামলাতে-সামলাতে ধীরে-ধীরে আসে, ক্লাশটি নিয়ে চ'লে যায়, কথাবার্তা যা বলে তার মধ্যে ঠাট্টা-বিদ্রূপই বেশি, জগতের কোনো জিনিসই যেন ওর পক্ষে যথেষ্ট ভালো নয়। একে মুমূর্ষু ছাড়া কী বলে? ওকে দেখেই বুঝতে পারি যে আমাদের দেশের আভিজাত্যের কাল ঘনিয়ে এসেছে।

পার্কের বেঞ্চিতে ব'সে সবুজ-সোনালি বিকেলের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে এ-কথাগুলি ভাবতে বেশ ভালোই লাগছিলো। এমন নির্জন, নির্লিপ্ত অবসর আজকাল আমার জীবনে বড়ো একটা আসে না; এই বিকেলের আলোয় নিজের জীবনগ্রন্থের পাতাগুলি উল্‌টিয়ে গভীর তৃপ্তি পেলুম। কিন্তু খানিকক্ষণ থেকে আমার উপর অদৃষ্টের অন্যতম প্রধান আশীর্বাদ সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছিলুম—সচেতন হচ্ছিলুম জঠরের গহ্বরে। কেননা যদিও আমার বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি

তবু আমার যথাসময়ে বেশ ভালোরকমই খিদে পায়; আমি যতটা খাবো, এবং খেয়ে হজম করবো, আজকালকার অনেক যুবকই তা পারবে না এ-কথা জোর ক'রে বলতে পারি। অত্যন্ত দুঃখের সহিত নিবেদন করছি যে অদ্যাবধি আমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, ডায়াবেটিস বা ব্লাড-প্রেশার কোনোটাই হয়নি; রাত্রে আমি দিব্যি ঘুমোই, এবং দিনে চারবার স্বাভাবিক ক্ষুধাবোধ করি। তার উপর এই দারজিলিং-এর হাওয়া! দেড়টার সময় বেশ ভারি লাঞ্চ খেয়ে বেরিয়েছি, এর মধ্যেই শূন্যজঠর কাৎরিয়ে উঠছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, এতক্ষণে সাড়ে তিনটে। উঠি এবার, আস্তে-আস্তে হোটেলে গিয়ে পৌঁছতেই ওদের চা প্রস্তুত হবে। আচ্ছা, আর পাঁচ মিনিট যাক্‌।

একজন লোক আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'Excuse me, have you got matches?'

আমি মাথা নেড়ে অন্যদিকে তাকালুম।

লোকটি আবার বললে, 'দেশলাই আছে?'

বিরক্ত হ'য়ে লোকটার দিকে তাকালুম। বেশভূষা বড়োই জীর্ণ, ঠিক ভিখিরি না হোক, ভদ্রলোকের মতো দেখায় না। ব্রাউন ওভারকোটটার দু'তিন জায়গায় গর্ত, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড্‌ কেনা মনে হয়, দীর্ঘাকৃতি লোকটির পক্ষে একটু খাটোও বটে। ট্রাউজর্স তো রীতিমতো হ্রস্ব, তার গোল সীমান্তদ্বয় বহুদিনের ধুলো কাদায় মলিন, জুতোটা বীভৎস। গলায় একটা ভারিপশমি মফ্‌লর জড়ানো, আর মাথায়—আশ্চর্যের বিষয়—একটা চকচকে নতুন সবুজ ফেল্টের টুপি।

আমি বেশ একটু রূঢ়ভাবেই বললুম, 'না, দেশলাই নেই।'

'দুঃখিত। তুমি যে সিগারেট খাও না তা ভুলে গিয়েছিলুম।'

বলে কী! পাগল নাকি লোকটা? অবাক হ'য়ে ওর মুখের দিকে তাকালুম—তাকিয়েই চিনতে পারলুম। এর আগের বারে শুধু ওর পোষাকই লক্ষ্য করেছি, ওর মুখ ভালো ক'রে দেখিনি। এ-মুখ ভুল করবার নয়।

আন্তরিক উৎসাহের সহিতই বললুম, 'আরে, সুপ্রতিম যে।'

'চিনতে পেরেছো তাহ'লে?'

'বাঃ, চিনতে পারবো না! কিন্তু কতদিন পর দেখা বলো তো! সেই সাতাশ সালে শিশির ভাদুড়ীর নাট্যমন্দিরে দেখা হয়েছিলো—না? "ষোড়শী"

হচ্ছিলো সেদিন। অভিনয়ের পরে ভাদুড়ীর ড্রেসিংরুমে দেখা—মনে পড়ে ? বারো বছর পরে দেখলুম তোমাকে।'

আমি একটু গর্বের সঙ্গেই এ-সব খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত বললুম ; তারিখ ও স্থান, মানুষের মুখ ও নাম সমস্ত বিষয়েই আমার স্মৃতিশক্তি ভালো, কখনো ভুল হয় না। কি সিণ্ডিকেটে, কি ব্যাঙ্ক অব্‌ বেঙ্গল-এর ডিরেক্টরদের মীটিঙে (জোর ক'রেই ওরা আমাকে ডিরেক্টর করেছে) আমাকে সকলেই সমীহ ক'রে চলে—কারণ ছোটোবড়ো যে-কোনো তথ্য দরকার হ'লেই আমি মনে করতে পারি।

'হ্যাঁ, মনে পড়ে', একটু ক্লান্তভাবে এ-কথা ব'লে সুপ্রতিম আমার পাশে ব'সে পড়লো। সঙ্গে-সঙ্গে আমি যে একটু স'রে বসলাম সেটা নেহাৎই রিফ্লেক্স অ্যাকশন, পর-মুহূর্তেই লজ্জিত হ'য়ে আবার ওর একটু কাছে স'রে এলাম, কেননা সত্যি-সত্যি আমি স্নব নই। সুপ্রতিম বোধ হয় কিছুই লক্ষ্য করলে না।

বললুম, 'কী খবর তোমার ? কেমন আছো ?'

'সম্প্রতি বড়ো খারাপ আছি। দেশলাইর অভাবে সিগারেট খেতে পারছি না।'

প্রশ্নটা না-করলেই পারতুম, কেননা আমার এই বন্ধুটি (হ্যাঁ, এই পতিত দুর্ভাগাকে বন্ধু বলতে আমার দ্বিধা তো হয়ই না, বরং গর্ব হয়) যে ভালো নেই তার ছিদ্রময় ওভারকোট আর বিবর্ণ জুতোই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সুপ্রতিম যে জীবনে কিছু করতে পারবে না তা অনেক আগেই বুঝেছিলুম, কিন্তু তার এতখানি দুর্গতি কখনো দেখতে হবে তাও ভাবিনি। অথচ এমন একদিন ছিলো যখন আমাদের সকলেরই মনে হ'তো যে এই পৃথিবী সুপ্রতিম মিত্রের জয় করবার পক্ষে যথেষ্ট বড়ো নয়।

কলেজে ওর সঙ্গে চার বছর পড়েছিলুম। জিনিয়স ছাড়া ওকে আর যে কী বলা যায় তা তো জানি না। ওর সঙ্গে অন্য সকলের প্রতিভার ব্যবধান এত স্পষ্ট ছিলো যে ওর শ্রেষ্ঠতা আমরা সহজে ও সানন্দে মেনে নিয়েছিলুম। সমস্ত বিষয়েই ওর যেন স্বাধীন ও অবাধ অধিকার, অথচ ওর চাইতে ঢের বেশি পড়াশুনো অনেক ছেলেকেই করতে দেখতুম। আসল কথা, অল্প একটু জেনে বাকিটা নির্ভুল অনুমান ক'রে নেবার সৃজনীপ্রতিভা ওর ছিলো। এই ক্ষমতাই তো কবির, কথাশিল্পীর, কেননা জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে-কোনো ব্যক্তিরই অতি পরিমিত হ'তে বাধ্য, অথচ জগতের সমস্ত ঘটনাই কবি নির্ভুল বর্ণনা করেন, সেখানেই তাঁর মহত্ত্ব। আমার বরাবর মনে হয়েছে যে সুপ্রতিমের মন আসলে শিল্পীর মন।

অথচ কুড়ি বছর বয়েসে, কলকাতায় ব'সে, ও তিন-চারটে ইয়োরোপীয় ভাষা শিখেছিলো, সংস্কৃত জানতো ভালো, বিজ্ঞানে দখল ছিলো, এবং যে-বিষয় মোটেই জানতো না, অর্থাৎ দর্শন, সেটা পরীক্ষা উপলক্ষ্যে পড়া হবে ব'লে তাতেই অনার্স নিয়েছিলো। ঐ শাস্ত্রটার উপর আমার কিঞ্চিৎ অনুরাগ ছিলো, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই আমি বিচক্ষণ, তক্ষুনি ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে বসলুম, কেননা সুপ্রতিমের সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতার কোনো কথাই ওঠে না। অনার্স-এ, ও ইংরিজির এম্-এতে, ও যে-সব খাতা লিখেছিলো, পরীক্ষকরা তা প'ড়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলেন—তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এমন খাতা তাঁরা কখনো পাননি। বি-এর পরে আমি তো পেছিয়ে প'ড়েছিলুম, কিন্তু খোঁজ-খবর রাখতুম, তাছাড়া মাষ্টারি করতুম বারাসতে, প্রায়ই কলকাতায় সকলের সঙ্গে দেখাশোনা হ'তো। আর যদিও সুপ্রতিম সমস্ত বিষয়েই আমার অনেক উপরে—বোধ হয় সেইজন্যেই—ওর সঙ্গেই বেশি ক'রে মেশবার আমার ঝোঁক ছিলো, আর এ-কথাও বলবো যে আমার প্রতি ওর একটুও অবহেলা কি পিঠ-চাপড়ানোর ভাব ছিলো না—সত্যি বলতে, সকলের সঙ্গেই ও অতি অনায়াসে মিশতো, সেটা আবার আমার পছন্দ হ'তো না।

সুপ্রতিমের প্রতি তখন আমার শ্রদ্ধা যে অসীম ছিলো, আমার তারুণ্য ও দারিদ্র্য বোধ হয় তার আংশিক হেতু। সুপ্রতিমের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলো, বই কিনে ও থিয়েটার দেখে অনেক টাকা ও ব্যয় করতো, আমি মনে মনে তাকে অপব্যয়ই বলতাম, যদিও এটা স্বীকার করবো যে ওর বৈষয়িক সচ্ছলতা ওর দীপ্ত মনীষার মতোই আমাকে আকর্ষণ করতো। তার মানে এ নয় যে আমি ওর মাথায় হাত বুলোতে সচেষ্ট ছিলাম—উচ্চাভিলাষী দরিদ্রের উগ্র আত্মসম্মানবোধ ছিলো আমার। কিন্তু নিজের আর্থিক অবস্থা ভালো করতে আমি এতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে অন্যের সচ্ছলতাকেও আমি শ্রদ্ধা ও উপভোগ করতাম; পূর্ণপকেট আমার মনে হ'তো সুন্দর একটি ছবি বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতোই রূপবান। হ্যাঁ, হয়তো আমার অনভিজ্ঞতার দরুণ সুপ্রতিমকে আমি বড্ড বেশি উঁচুতে বসিয়েছিলুম, কিন্তু এ-ও সত্য যে আমার পরবর্তী জীবনের বহু ও বিবিধ অভিজ্ঞতাতেও ঠিক ওর মতো মানুষ আর চোখে পড়লো না। বোধ হয় কাঁচা বয়েসে মনে যে-ছাপ গভীরভাবে পড়ে, সহজে তা মুছে যায় না; কিন্তু তেমনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মোহমুক্তিও তো সর্বদাই ঘটছে। ইস্কুলে পড়বার সময় যে-শিক্ষককে সর্বশক্তিমান দেবতুল্য মনে হয়, কয়েক বছর যেতেই কী তুচ্ছ, কী

দারুণ অবজ্ঞেয় মনে হয় তাকে। আর প্রথম যৌবনের পূজ্যপাদদের ছাগপদ বেরিয়ে পড়তেও তো দেরি হয় না। কিন্তু এই সুপ্রতিমের কখনো ছাগলের পা বেরুলো না, ওর মধ্যে এমন-কিছু আছে যা শক্ত, স্বচ্ছ, হীরার মতো অকলুষেয়। শুধু সাংসারিক সামাজিক হিসেবে নয়, নৈতিক হিসেবেও ও আজ পতিত, তা জেনেও এ-কথা বলছি। ওর জীবনের ঘটনা সব জানিনে, কিন্তু মনে-মনে জানি যে এ-কথা সত্য, আজ বারো বছর পরে ওর পাৎলা, ডিমের ছাঁদের, ম্লান মুখ দেখে এই কথাই বুঝলাম।

আমি ধ'রে নিয়েছিলুম যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুপ্রতিম শিক্ষাক্ষেত্রের একজন মহারথী হ'য়ে উঠবে, কিন্তু দু'বছর, পাঁচ বছর, দশ বছর গেলো, সে-রকম কোনো লক্ষণই দেখলুম না। প্রথমে ও দিল্লিতে এক কলেজে কিছুদিন পড়ালো, তারপর শুনলুম নৈনিতালের এক শ্বেতাঙ্গ বিদ্যাপীঠে ফরাসির টিউটর হ'য়ে গেছে, তারপর বুঝি বরিশাল না মৈমনসিং না রংপুরের কলেজে কাটালো কিছুকাল, তারপর এলো প্রেসিডেন্সি কলেজে। আমি ভাবলুম, এবারে ওর উত্থানের সুরু, অদূর ভবিষ্যতে ইংরিজির প্রধান অধ্যাপকের পদ ওর মারে কে! কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনলুম, ও চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। আস্ত পাগল দেখছি! বলা নেই, কওয়া নেই, অকারণে এমন একটা চাকরি ছেড়ে দেয়া!

সে-সময়ে কলকাতায় একদিন ওর সঙ্গে দেখা। আমি তখন বাগেরহাটে ব'সে প্রাচীন বাংলার লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টায় প্রাণান্তকর ঘামছি। ও থাকতো ধরমতলার এক চারতলায়, শহরের হট্টগোলেই নাকি ওর মাথা খুলতো। গিয়ে দেখি অজস্র বইয়ের মাঝখানে একটি ইজি-চেয়ারে ব'সে পাইপ টানছে। 'কী হে, তুমি নাকি চাকরি ছেড়ে দিলে?' 'দিলুম।' কথাটায় কোনোরকম অভিযোগ বা অহঙ্কার, দুঃখু বা রাগ ছিলো না, এটা যে কোনো অর্থেই মূঢ়ের মতো বা বীরের মতো কাজ হয়েছে, এমন কোনো ইঙ্গিতই ওর কণ্ঠস্বরে কি মুখের ভাবে নেই, যা না করলেই নয়, তা-ই করেছে, এইরকম ওর ভাব। 'কেন, ছাড়লে কেন?' 'এ আমার কাজ নয়', খুব সহজভাবে ও বললে। আমি সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞেস করলুম, 'কী ক'রে চালাবে?' 'তা খানিকটা অসুবিধে তো হবেই।' আমি জানতুম যে ওর ছাত্রজীবনের সচ্ছলতা আর নেই, একমাস ব'সে খাবার সংস্থানও আছে কিনা সন্দেহ, তাই ওর এই সহজ হাসিখুসি ভাবটা বড়োই বিসদৃশ ঠেকলো। ও অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্তা বললো—নৈনিতাল থাকতে ইতালিয়ান শিখেছিলো মূল দান্তে পড়বার জন্যে, এইবার সুরু করবে পড়া;' আপাতত আবার সফোক্লিস

পড়েছি, কীট্‌স্‌ এখন আর ভালো লাগে না ; বঙ্কিমচন্দ্র একেবারেই অপাঠ্য, কিন্তু মধুসূদন আশ্চর্যরকম ভালো লিখতেন। সবার শেষে বললে, 'আমি নাটক লিখছি, জানো, এবারে নাট্যকার আর অভিনেতা হবো।'

সত্যি-সত্যি সুপ্রতিম কয়েকমাস কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছিলো। এতে অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই, কেননা ও কথাবার্তা বলতো চমৎকার, আবৃত্তি করতো ভালো, এবং একটু-আধটু গাইতেও পারতো। ওর অভিনয় আমার একবার মাত্র দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিলো, কেননা সে-সময়টায় আমি পি-এইচ্‌-ডির থীসিস নিয়ে মারাত্মকরকম ব্যস্ত। গিরিশ ঘোষের কী এক নাটকে অর্জুন করেছিলো, ভালোই করেছিলো, যদিও ওর কথা বলা, হাব-ভাব যথেষ্ট 'পৌরাণিক' হয়নি। তবে এটা আমার মনে আছে যে গিরিশ ঘোষের অতি দরিদ্র পদ্যেও ওর মুখে কবিতার আবেগময় কল্লোল এসেছিলো। অভিনেতা ও হয়তো ভালোই হ'তো, কিন্তু শুনতে পাই ওর লেখা নাটক থিয়েটারের ম্যানেজার নেয়নি, এবং সেই সূত্রে ঝগড়া ক'রে ও ওর নব-লব্ধ পেশা পরিত্যাগ করে।

তাহ'লেও থিয়েটারের সঙ্গে ও একেবারে সম্পর্কচ্যুত বোধ হয় হয়নি ; এবং শিশির ভাদুড়ী প্রথম যখন নাট্যমন্দির গঠন করলেন, ও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই সংশ্লিষ্ট ছিলো ব'লে শুনেছি। বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে যে-সব অপবাদ জড়িত, সেগুলো সুপ্রতিম এড়াতে পারলে না, এবং ক্রমশ ওর জীবনযাপনের প্রণালী উচ্ছৃঙ্খল ও নিম্নগামী হ'তে লাগলো। কিছুকালের মধ্যে এমন হ'লো যে কলকাতায় ওর দেখা পাওয়াই শক্ত, কখন কোথায় থাকে কেউ জানে না ; কেউ বলে কালিঘাটে একটা খোলার ঘরে থাকে, কেউ বা তার চেয়েও খারাপ কথা বলে। ও যাকে একবার 'অসুবিধে' বলেছিলো তা যে এখন ওর বিশেষভাবেই হচ্ছে, তা অনুমান করা অবশ্য শক্ত নয় ; কী ওর আয়, এবং তার পথই বা কী, আমি তো তা কল্পনাও করতে পারতুম না। তবে ওর সঙ্গে দেখা যখন হ'তো, কিছুই বোঝা যেতো না ; ঠিক আগের মতোই আছে, মুখে-চোখে কি বেশভূষায় কিছুমাত্র মলিনতা নেই, এমনকি বয়েস বেড়েছে ব'লেও মনে হ'তো না।

অবশ্য ওর সঙ্গে আমার দেখাশোনাও কদাচ হ'তো, কেননা ততদিনে আমি ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হ'য়ে এসেছি, বিলেত গেলুম কিছুদিন পরেই, এবং ফিরে এলে নিজের কাজেই লিপ্ত হ'য়ে পড়লুম। মাঝে-মাঝে ওর সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত গুজব কানে আসতো, কিন্তু বিশেষ মন দেবার সময় আমার ছিলো না, তাছাড়া, ওর সম্বন্ধে উৎসাহও অনেকটা ক'মে এসেছিলো। গত দশ-বারো বছর

ধ'রে ও আমার জগৎ থেকে একেবারেই অন্তর্হিত, কেননা ওর কলেজজীবনের বিজয়পর্বের পরে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, ওকে নিয়ে এখন আর কোনো আলোচনাও হয় না, যাদের ঘিরে রসালো গুজব ও কুৎসা রটানো যায় এমন ব্যক্তিও নতুন-নতুন দেখা দিয়েছেন। সমাজ-সংসার এতদিনে সুপ্রতিম মিত্রকে ভুলে গিয়েছে, আমিও ওকে ভুলে গিয়েছিলুম।

এই সুপ্রতিম মিত্র, সমসাময়িকদের মধ্যে যার শ্রেষ্ঠতা নিঃসন্দেহ, ভাষাবিদ্, পণ্ডিত ও শিল্পী, বিরল প্রতিভার অধিকারী, সে কিনা আজ একটা ফিরিঙ্গি ভিখিরির মতো দারজিলিং-এর পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকের কথায় কোনোদিনই কান দিইনি– লোকে কী না বলে! হয়তো ও কোনো-কোনো বিষয়ে একটু বাড়াবাড়ি করেছে, কিন্তু তাই ব'লে ওর এতখানি অধঃপতন কোনোদিন দেখতে হবে তা ভাবিনি। ওর এত সব মূল্যবান গুণ—তার পরিণাম কিনা এই! অধ্যাপক হিসেবে ও অসাধারণ প্রভাবশালী হ'তে পারতো, হ'তে পারতো প্রথম শ্রেণীর লেখক, বিদ্যানুশীলনের একটা উদাহরণস্থল হ'তে পারতো—কিন্তু হ'লো—কিছুই না, কিছুই না। ওকে দেখে এ-কথা না ভেবে উপায় থাকে না যে সমস্ত গুণ কি শক্তির চাইতে চরিত্রই মূল্যবান। কোনো সঙ্কীর্ণ, লৌকিক অর্থে চরিত্র বলছি না—এ-সব বিষয়ে আমার মতামত সংস্কারমুক্ত ও উদার—স্ত্রী-সংসর্গে বা সুরাপানে যে 'চরিত্র' নষ্ট হয়, তার কথা নয়; কিন্তু একটা-কিছু নিশ্চয়ই আছে যার অভাবে সমস্ত সহজাত গুণ ও অর্জিত বিদ্যা ব্যর্থ হ'য়ে যায়। সেটা আর কিছুই নয়, সেটা স্বকর্মে অবিচল নিষ্ঠা ও সততা, বিশেষ-কোনো উদ্দেশ্যের দিকে একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হবার ক্ষমতা—চরিত্র বলতে আমি এই বুঝি। এর অভাবেই সুপ্রতিমের আজ এ দশা। কেননা এর অভাবে কোনো ক্ষেত্রেই কোনো মহৎ ফল লভ্য হয় না—না পাণ্ডিত্যে না শিল্পকলায় না ব্যবসায়। পয়সা করতে হ'লেও এই চরিত্রবল দরকার।

২

আমি বললুম, 'একটু হাঁটলেই একটা দেশলাই কিনতে পাবে বোধ করি। উঠবে নাকি?'

'বেশ তো আছি এখানে', অলসভাবে বললে সুপ্রতিম। ঢিলে শরীরে বেঞ্চির পিছনে হেলান দিয়ে লম্বা পা দুটো বাড়িয়ে দিলে ঘাসের মধ্যে। ওর জুতো দুটো নিষ্করুণ স্পষ্টতায় আমার দৃষ্টিকে যেন খোঁচাতে লাগলো। নিজের অজ্ঞাতেই আমার বিলিতি পেটেন্টে মোড়া পা দুটো বেঞ্চির তলায় লুকোলো।

'আজ বেশ শীত—না?' ব'লে সুপ্রতিম ঈষৎ যেন শিউরে উঠলো। রোদে-ধোয়া কনকনে বিকেলটি আমার ভারি ভালো লাগছিলো সে-কথা আগেই বলেছি, কিন্তু আমি কোনো মন্তব্য করলুম না। আমি মূঢ় কি অভদ্র নই; শীত ব্যাপারটা যে আচ্ছাদন অনুসারে আপেক্ষিক আমি তা জানি। ওর ওভারকোটটা নেহাৎ বাজে কাপড়েরই হবে বোধ হয়।

একটু চুপ ক'রে থেকে সুপ্রতিম আবার বললে, 'এই রোদ্দুরটা বেশ।' তারপর হঠাৎ, যেন এ-দুটো কথায় কোনোরকম সংশ্রব আছে, বললে, 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ও-বইটা না লিখলেই পারতে।'

আমি হেসে বললুম, 'তোমার পড়বার জন্যে তো ও-বই নয়।'

'যার উপর নিজেরই শ্রদ্ধা নেই তা লিখতে পারো কেমন ক'রে?'

আমি জবাব দিলুম, 'পাঠকরাই লেখক সৃষ্টি করে। যে-দেশে বেশির ভাগ পাঠকই নিকৃষ্ট, সে-দেশে…'

সরু, তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'নিকৃষ্ট লেখক হ'য়েই তুমি তাহ'লে খুসি?'

আমি কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম, 'লেখক আমি কোনোশ্রেণীরই নই। মাষ্টারি করি, আর মাঝে-মাঝে…উঠবে নাকি এখন? চলো, চা খাওয়া যাক্ কোথাও গিয়ে।'

আমি উঠে দাঁড়ালুম। যখন কোনো বিষয়ে মন স্থির করি, সময় নষ্ট করা আমার ধাতে নেই।

ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়ালো।—'একটু আস্তে হাঁটো, মহিম। এত তাড়াহুড়ো কিসের?'

গতি শ্লথ ক'রে বললুম, 'সুপ্রতিম, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? কিছু মনে করবে না?'

'আমি সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় এ-দুর্দশায় উপনীত হয়েছি, অন্য কেউ এ জন্যে দায়ী নয়,' গম্ভীরস্বরে এ-কথা বললে, তারপর হেসে উঠলো। মোটেও তিক্ত নয় সে-হাসি, বিদ্রূপে বক্র নয়; সরল ফূর্তিরই হাসি, যেন বিকেলের জানলা থেকে দেখা সবুজ মাঠের মধ্যে দাঁড়ানো কোনো কিশোরী মেয়ের হঠাৎ হেসে ওঠা।

'ভালো করোনি।'

'এ না হ'য়ে উপায় ছিলো না।'

'তুমি কি তা'হলে অদৃষ্ট মানো?'

'এটা অদৃষ্ট একেবারেই নয়। আমি প্রথম থেকেই সমস্তটা দেখতে পেয়েছিলাম। যে রকম ভেবেছিলাম সে-রকমই সব ঘটেছে। অপ্রত্যাশিত কিছুই নয়।

কথাটা ভালো ক'রে বোঝবার জন্য ওর মুখের দিকে তাকালুম। কিন্তু ওর মুখ নামানো, হাত দুটো পিছনে একত্র করা, পিঠ একটু বাঁকানো। রাস্তাটা এখানে খুব আস্তে উঠে গেছে, এতে কোনো সুস্থ লোকের কষ্ট হওয়া উচিত নয়। হ্যাঁ, একটু জোরেই পড়ছে ওর নিঃশ্বাস। ওর কি কোনো অসুখ? ও কি মুমূর্ষু— রিক্ত, নিঃসঙ্গ আর মুমূর্ষু?

চৌরাস্তার সমতলে এসে ও একটু দাঁড়ালো। চুপ ক'রে রইলো একটু, যতক্ষণ না স্বাভাবিক নিঃশ্বাস ফিরে এলো। তারপর চোখ তুলে তাকাতেই হলদে একটি রোদের রেখা ওর কুঞ্চিত কপালে এসে পড়লো, আর ওর চোখ উঠলো ঝকঝক ক'রে, যেন চোখের পিছনে লুকোনো কোনো আলো হঠাৎ জ্ব'লে উঠেছে। সে-দীপ্তি নিষ্ঠুর, জীবনের সবুজ আবরণ ছিঁড়ে গিয়ে যেন শ্বাপদ-মৃত্যুর জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখা যাচ্ছে।

নিশ্চয়ই ওর কোনো অসুখ। যক্ষ্মা?

আমি লক্ষ্য করলুম যে এতদিনে ওর চেহারায় ওর বয়েস সহজেই ধরা পড়ছে। ওর মুখের রঙ্গমঞ্চে যে-সব সূক্ষ্ম রেখার লীলাভিনয় এখন চলেছে অনেকদিন পর্যন্ত তারা নেপথ্যেই ছিলো, এখন এই পঞ্চমাঙ্কে ওরাই জাঁকিয়ে বসেছে। কিন্তু ও একটুও মোটা হয়নি, বরং আগের চাইতে আরো একটু রোগা যেন—পিছন থেকে দেখলে হঠাৎ তরুণ ব'লে ভুল হ'তে পারে। আর ও যখন ঠোঁট বাঁকিয়ে মুচকি একটু হাসলো, তা যেন কোনো বালিকার হাসির মতোই অকপট ও মধুর।

হেসে বললে, 'সেদিনও অবজারভেটরি হিল্-এ লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতুম। শরীরটা গেছে।'

আমি সহানুভূতির সুরে বললুম, 'আমাদের বয়েসে পাহাড়ে বেশি হাঁটাহাটি না করাই ভালো। চলো—চা দেবী ডাকছেন—ভারি ভালো লাগছে আজ তোমার দেখা পেয়ে।'

৩

প্লিভাতে জানলার ধারে একটি টেবিল নিয়ে বসলুম। সুপ্রতিম ওর সবুজ টুপিটা খুলে ফেলতে একটু চমকে উঠলুম: ওর চুলগুলো বেশির ভাগই সাদা,

আমার চুলের চাইতে ঢের বেশি সাদা। কিন্তু ডিম্বের ছাঁদের, পাংলা সেই মুখ তার প্রাক্তন লাবণ্য অনেকটা বাঁচিয়ে রেখেছে।

'কিছু মনে কোরো না, ওভারকোটটা প'রেই থাকি।' গলার স্বর নামিয়ে বললে, 'আসল কথা, ওর নিচে আর কোনো কোট নেই।'

এ-রকম সন্দেহ আগেই করেছিলুম; কথা না ব'লে টেব্‌ল্‌ ক্লথটার উপর নখ দিয়ে আঁচড় কাটতে লাগলুম।

সুপ্রতিম চেয়ারে হেলান দিয়ে বললে, 'তুমি কিন্তু বেশি বুড়ো হওনি হে। গুপ্ত মন্ত্রটা কী বলো তো? নো স্মোকিং? হ্যাঁ, ঠিক কথা—'

ইসারায় একজন পরিচারককে ডেকে দেশলাই চেয়ে নিয়ে এতক্ষণে ধরালো বাঞ্ছিত সিগারেট। ধোঁয়া উঠলো পেঁচিয়ে ওর ধোঁয়ার রঙের অগোছাল চুল জড়িয়ে; মুহূর্তের জন্য মনে হ'লো ওর মুখ যেন রূপান্তরিত, যেন হাড়-মাংসের চাইতে স্বচ্ছ ও সাবলীল কোনো বস্তু দিয়ে ও-মুখ তৈরি। উজ্জ্বল ই-পি এন্‌-এস্‌-এর পাত্র থেকে অনিন্দ্য চীনেমাটির বাটিতে চা ঢালতেই একটি মনোহর সৌরভ আমাকে অভিবাদন করলো। এদের চা-টা ভালো।

তারপর চায়ের বাটি সামনে নিয়ে দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ। জানলার পরদা সরানো, ঝকঝকে কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো দিক্‌প্রহরীর মতো কাঞ্চনজংঘার উজ্জ্বল. উদ্ধত চূড়া; তারপর আমরা তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই বিকেলের হলদে-সবুজ আভা মুছে গেলো; কোঁকড়া মেঘ, ধূসর-নীল, তুষার আড়াল ক'রে নামলো নীল যবনিকার মতো, আর একটু প'রই কুয়াশার সর্বব্যাপী অস্থিহীন শরীর শুষে নিলো বন্ধুর পৃথিবীর শ্যামল-স্বর্ণিল প্রদর্শনী।

সুপ্রতিম বললে, 'হঠাৎ কী ঘন কুয়াশা! হয়তো এ কোনো দেবতারই কারসাজি, পৃথিবীর চোখ থেকে তাঁর উদ্দাম প্রণয়লীলা গোপন করবার জন্যেই এই কুয়াশা রচনা করলেন। পরাশর আর সত্যবতী।'

আমি বললুম, 'তুমি কিছু খাচ্ছো না যে?'

'খাচ্ছি।' একখানা স্যাণ্ডুইচ তুলে মুখে দিলো, তারপর চার-পাঁচ মিনিট নিঃশব্দে শুধু খেলো, আমিও অবশ্য তাতে যোগ দিলুম। সুপ্রতিমের খাওয়ার ধরণটা দ্রুত, যথেষ্ট চিবোবার অপেক্ষা রাখে না, যদিও ওর দাঁতগুলো দেখলুম চমৎকার রয়েছে। আধ পেয়ালা চা জলের মতো এক চুমুকে খেয়ে ওভারকোটের পকেট থেকে মস্ত সিল্কের রুমাল বার ক'রে মুখ মুছলো, তারপর আর-এক পেয়ালা চা ঢেলে নিলে।

আগেকার কথার জের টেনে বললে, 'সেকালের মুনিঋষিরাও প্রেমিকপুরুষ কম ছিলেন না—রাজা-রাজড়াদের কথা ছেড়েই দিলুম। প্রাচীনরা রিয়ালিস্ট ছিলেন বটে।'

'—যদিও আধুনিক রুচির পক্ষে একটু—একটু—পিচ্ছিল।'

সুপ্রতিম বললে, 'আমাদের কাছে যেটা অশ্লীল লাগে সেটা ওদের উগ্র পুত্রাকাঙ্ক্ষা। শূকরের মতো বংশবৃদ্ধি। কিন্তু প্রিমিটিভ সমাজে এ-রকম না হ'য়ে উপায় নেই।'

সুন্দর বিকেলটিকে ধূসর শীত-সন্ধ্যা তার স্পঞ্জের মতো থাবা বুলিয়ে-বুলিয়ে নিঃশেষে শুষে নিলে। বোয় এসে টেনে দিয়ে গেলো ভারি নীল পরদা। ইলেকট্রিক আলো জ্ব'লো উঠলো।

সুপ্রতিম বললে, 'দৃষ্টিভঙ্গিটা সুস্থ, যা-ই বলো। ন্যাকামিহীন। কিন্তু আধুনিক মানুষের পক্ষে অচল। যন্ত্রের যুগে পশু ও পুত্রসংখ্যা গৌণ। স্ত্রীলোককেও তাই এখন আমরা অন্য চোখে দেখি। এটাই যে সভ্যতা তার একটা প্রমাণ হিটলারএর উচ্ছেদ করতে উঠে-প'ড়ে লেগেছে।'

আমি হেসে উঠলুম।

সুপ্রতিম বললে, 'তুমি কি প্রগতিতে বিশ্বাস করো?'

'সে আবার কী?'

'মানে—তোমার মতে মানবজাতি এগোচ্ছে, না পেছোচ্ছে, না কি একটা স্থির কেন্দ্র ঘিরে অবিশ্রান্ত ঘুরছে?'

'আপাতত তো মনে হয় এগোচ্ছে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি আর কতটুকু!'

সুপ্রতিম বললে: 'অনন্তকালের কথা ভেবে লাভ নেই, ইতিহাসের সময়ের মধ্যেই দৃষ্টিকে আবদ্ধ করা ভালো। ছাখো, আমাদের এই আধুনিক যুগ একটা ভারি অদ্ভুত জিনিস সৃষ্টি করেছে—স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটা নতুন রকমের সম্পর্ক।'

'সেটা কী?' এক খণ্ড কেক চিবোতে-চিবোতে আমি জিজ্ঞেস করলুম।

'প্রাচীনদের চোখে প্রেম ও কাম অভিন্ন ছিলো—এটাকে খানিকটা পেগান মনোভাব বলা যায়—মধ্যযুগের ধার্মিকরা এ দুটোকে সম্পূর্ণ আলাদা, এমনকি বিপরীত মনে করতেন—যে-জন্য দেখবে সে-যুগের প্রেমের কবিতা সবই 'পরস্ত্রীকে নিয়ে—আধুনিক যুগেই এ দুটো আবার এক হ'লো, কিন্তু ঢের ব্যাপক ও গভীরভাবে। এই তো প্রগতির একটা উদাহরণ।'

প্রগতির এই প্রমাণ আমার নিজের বিশেষ গ্রাহ্য মনে হ'লো না; বললুম, 'যা-ই বলো বৈষ্ণব কবিরা বুদ্ধিমান ছিলেন। পরকীয়া প্রেমই শ্রেষ্ঠ, কেননা তাতে মোহভঙ্গ হবার আশঙ্কা নেই।'

'মধ্যযুগের কথা এটাই বটে, কেননা বিবাহে তখন প্রেমের স্থান ছিলো না, কুল শীল সম্পত্তিই ছিলো বিবাহের ভিত্তি—এখনও অবশ্য মোটের উপর তা-ই আছে, কিন্তু সম্পত্তির শাসন সে-সময়ে ঢের বেশি কঠিন ছিলো—মুক্ত ইচ্ছার বিবাহ, অন্তত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে, প্রায় হ'তোই না। সেই জন্যেই, যাকে কখনো পাওয়া যাবে না, তাকে ঘিরেই চলতো কল্পনার উদ্দাম লীলা। আধুনিক যুগে আমরা সে-শৃঙ্খল ভাঙবার চেষ্টা করছি—ভেঙেওছি খানিকটা—যদিও সম্পূর্ণ মুক্ত প্রেম আরো দূরের কথা। যার সঙ্গে প্রতিদিন ঘুমুচ্ছি তার মধ্যেই অফুরন্ত মোহ, এমন দুঃসাহসী কথা আধুনিক মানুষই বললে। স্ত্রীর উপর তার দাবিও এইজন্যে সর্বগ্রাসী। এ-কথাটা আমার স্ত্রীকে কখনো বোঝাতে পারিনি।'

'তোমার স্ত্রী!'

চায়ের পেয়ালায় নাক ডুবিয়ে সুপ্রতিম আমার দিকে তাকালো।—'বাঃ! তুমি কি ভেবেছিলে আমি কখনো বিয়ে করিনি?'

'আমি ভেবেছিলাম—আমার ধারণা ছিলো—আমি জানতাম না—' তিনবার চেষ্টা ক'রে থেমে গেলাম।

'কারো জানবার কথাও নয় অবশ্যি, খুব চুপচাপ বিয়ে হয়েছিলো। আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে প্রাণপণে ধূমপান করছি, আর রোজ একটা নতুন নাটকের খসড়া করছি। এমন সময় ইলা আমাকে খবর পাঠালো—"হয় আমাকে এক্ষুনি বিয়ে করো, নয় তো আমি বুবুল চাটুয্যেকেই—"'

'ইলা কে?'

'ছিলো এক ইলা। বাপ সরকারি স্বর্গের অন্যতম কেষ্ট-বিষ্টু। এই দারজিলিং-এই প্রথম আলাপ। একদিন ভোরবেলা এসেছিলুম দু'জনে অবজার-ভেটরি হিল্-এ। বাজি রেখে পাহাড়ে চড়েছিলুম। গেলো সে মিলিয়ে বনের মধ্যে সবুজ হাওয়ার মতো। নতুন পাতা ভরা গাছ যেন পাখা পেয়েছে, সবুজ শাড়ি-পরা তার শরীর। আমি রুদ্ধশ্বাস, কেননা আমার ঘাড়ে তার কোট, ব্যাগ ও ছাতার হ্যাণ্ডিক্যাপ চাপানো।

'উঠলুম উপরে। ঐ পাহাড়ে তখন একটি প্রাণীও আর নেই। উত্তর জোড়া তুষার-দেবতার জ্বলন্ত নগ্নতা। সেই পুঞ্জ-পুঞ্জ তুষারের দিকে তাকিয়ে বললে, "বাজিতে জিৎলুম, এখন প্রতিজ্ঞারক্ষা করো।" '

আমি বললুম, 'তখনই কেন ওকে বিয়ে করলে না ?'

সুপ্রতিম বললে, 'হ্যাঁ, আমি ওকে বেশ তীব্রভাবেই আকর্ষণ করেছিলুম। তার কারণ বোধ হয় শুধু এই যে ওর সমাজে আমার মতো মানুষ একজনও ছাখেনি।'

'আর তুমি ?'

'আমি ? আমি ওর শরীরের লাবণ্যে মজেছিলুম। প্রেমে পড়েছিলুম সন্দেহ নেই, কিন্তু খুব বেশি ভালো লাগতো না ওকে। অবশ্য সে-বিরোধ ব্যক্তিগত নয়, শ্রেণীগত। কাজেই দিন যেমন কাটে, কাটতে লাগলো। এখানে-ওখানে ঘুরলুম। আবিষ্কার করলুম, শিক্ষকতা আমার কাজ নয়। আরো একটা আবিষ্কার করলুম – সেটা এই যে আমি লিখতে পারি।'

'কিন্তু তোমার কোনো বই কি বেরিয়েছে ?'

মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে একটু অসহিষ্ণুভাবে বললে, 'না, বেরোয়নি। ওহে, তোমার টী-পটে আর চা নেই।'

'আরো দিতে বলি।'

'চা ? বরং একটু শেরি খাওয়া যাক্।'

ওর জন্যে শেরি আর আমার নিজের জন্যে চা দিতে বললুম। বাইরে জোরালো হাওয়া উঠেছে, কাচের ভিতর দিয়েও তার গোঙানি শুনতে পাচ্ছিলুম। কুয়াশা কেটে একটু পরেই আকাশে তারা ফুটবে।

৪

শেরির গেলাসে চুমুক দিয়ে সুপ্রতিম বললে, 'তারপর একদিন ইলা সশরীরে আমার সেই ধরমতলার চারতলায় এসে উপস্থিত। আমি বললুম, "এ কী কাণ্ড! তোমার কি মাথা-খারাপ হ'লো ?" ইলা বললে, "তোমার উপেক্ষা অনেক সহ্য করেছি, আজ এলুম বোঝাপড়া করতে।" আমি বললুম, "প্রত্যেক বাঙালি ভদ্রলোকের যা থাকে, আমার তা নেই, আর কোনোদিন হবেও না।" "কী সেটা ?" "চাকরি।" ইলা হাসলো—"ওঃ!" "হাসির কথা নয়, আমার একেবারেই টাকাকড়ি নেই।" "আছে বইকি, আমার সব টাকা কি

তোমার নয় ?” (ওর বাবা ওর নামে কুড়ি হাজার টাকা লিখে দিয়েছিলেন।) আমি বললুম, “কিন্তু তোমার বাবা ?” ইলা একটা ইংরিজি শপথ-বাক্য উচ্চারণ করলে। বুঝলুম, মন ওর একেবারে স্থির। মনে হয়, প্রেসিডেন্সি কলেজের মোটা-সোটা চাকরিটি ছেড়েছি শুনেই আমার প্রতি ওর আকর্ষণ অবাধ্যরকম উদ্দাম হ'য়ে উঠেছিলো। বোধ হয় ভেবেছিলো আমি জিনিয়সগোছের জীব; দুঃস্থ, ও সম্ভবত ভ্রান্ত, প্রতিভাবানের উদ্ধারসাধনই তখন ইলা রায়ের জীবনব্রত, মহৎ হবার এত বড়ো একটা সুযোগ ও কিছুতেই ছাড়বে না।'

এখানে আমি একটা মন্তব্য করলুম, 'হয়তো ভুল বুঝেছিলে, হয়তো তিনি তোমাকে সত্যি-সত্যি—'

'হ্যাঁ, সত্যি-সত্যিই তো। প্রথম যেদিন আমাকে দেখেছিলো, সেদিন থেকেই আমাকে ভালোবেসেছিলো। আমি ওকে মুগ্ধ করেছিলুম; ও অনায়াসে ধ'রে নিয়েছিলো যে আমি এতই মহান যে আমার তুলনায় সব, সব তুচ্ছ। আমি যেন ওরই আবিষ্কার, আর সুযোগ ও সময় পেলে ও আমাকে সৃষ্টিও করবে। আমার সম্বন্ধে ওর গর্ব ছিলো অফুরন্ত।'

সুপ্রতিম ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলো।

'রাঁচিতে আমাদের বিয়ে হ'লো, দু'জন বন্ধু সাক্ষী হ'লেন। তারপর মোরাবাদি পাহাড়ের তলায়, নীল উপত্যকার গহ্বরে, লাল টালির ছাদের একটি কুটিরে কাটলো আমাদের তিন মাস। তখন বর্ষা। চারদিকের আঁকাবাঁকা নীল পাহাড় ঝাপসা ক'রে দিয়ে ঝেঁকে-ঝেঁকে বৃষ্টি আসে, দুপুরবেলায় নামে ঝমঝম, বিকেলের রোদ্দুর পৃথিবীকে হলুদ কাপড় পরিয়ে দেয়, তারপর রাত্রি আসে তারা-ঝরা, গম্ভীর। একদিন দু'জনে পাথরে লাফিয়ে-লাফিয়ে তীব্র একটি পাহাড়ি নদী পার হচ্ছিলুম, ইলা পা পিছলে হঠাৎ জলে প'ড়ে গেলো। তক্ষুনি আমার হৃৎপিণ্ড যেন পাথর হ'য়ে গেলো, ভাবলুম ও গেছে। আশা করিনি উদ্ধার করতে পারবো, কিন্তু পারলুম। আমার কাঁধে মাথা রেখে সেই নির্জন মাঠের মধ্যে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো।...অপরূপ ওর শরীর। তিনমাস ডুবে ছিলুম ওর লাবণ্যের নদীতে।

'কলকাতায় ফিরে বাসা নিলুম রডন স্ট্রিটে—বলা উচিত, ইলা নিলে, আমিও সেখানে উঠলুম। ইলা আমার নামে বেশ ভারি একটা ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্ট ক'রে দিয়েছিলো, টাকার দরকার হ'লে একটা কাগজের উপর সই করলেই হ'তো।

পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে ওর পৈতৃক সম্পদের বেশির ভাগই আমি উড়িয়ে-ছিলুম—ইলা রায় তার প্রতিভা-পূজার দাম দিয়েছিলো যথেষ্ট।'

সুপ্রতিম হাসলো।

'কলকাতায় এসে ইলা খুব খুসি। সগৌরবে দেখা দিলে বন্ধুমহলে, তারা-ভরা আকাশে যেন চাঁদ উঠলো। ওর আনন্দ অফুরন্ত, ওর গৌরব অন্তহীন। সাংসারিক সুখসম্ভোগ উপেক্ষা ক'রে আমার মতো প্রতিভাবান, কৃতবিদ্য দরিদ্রকে ও যে বরণ করেছে এই গর্ব ওর মনে নেশা ধরিয়ে দিলে। এমন আর কে করেছে! এখন ও আমাকে ফোটাবে, আমাকে ফলাবে, আমার সৃষ্টিকে সৃষ্টি করবে···ওর শরীর দিয়ে, ওর স্নেহ দিয়ে, ওর অর্থ দিয়ে। বন্ধুমহলে জিনিয়সটিকে উপস্থিত করলে, ফল বিশেষ সুবিধের হ'লো না। ওর সমাজের প্রতি আমার ঘৃণা ও অবজ্ঞা মেশানো মনোভাব দু'দিনেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। আর ওরাও চোখ টেপাটেপি করলে—কেউ বা দীর্ঘশ্বাস ফেললে ইলার ভবিষ্যৎ ভেবে।

'আমি ব্রিজ জানি না, টেনিস জানি না, ঘোড়দৌড়ে যাই না, পক্ষীশিকারে উৎসাহ নেই; বিভিন্ন মোটরগাড়ির আপেক্ষিক সুবিধের কথা যখন ওঠে, তখনও চুপ ক'রে থাকি। কাজেই ওরা ভেবে নিলে আমি ঠিক মনুষ্যপদবাচ্য নই। আর আমার পক্ষে ওদের সংসর্গ তো নিছক যন্ত্রণা। একদিন—ওরা দশ-বারোজন স্ত্রী-পুরুষ ব'সে ঘোড়দৌড়ের গল্প করছে—আমি হঠাৎ উঠে একটি কথা না ব'লে সোজা বেরিয়ে চ'লে এলুম। আশা করলুম আমার এই ইচ্ছাকৃত অভদ্রতা কেউ মার্জনা করবে না।

'ইলা একটু হতাশই হ'লো। ভেবেছিলো, কলকাতায় বেশ জমবে, জমলো না। আমাকে বললে, "ওদের মধ্যে গিয়ে অমন ম্লান হ'য়ে থাকো কেন? তোমার তুলনায় ওরা তো সব বাঁদর।" আমি শুধু বললুম, "তবে তো বোমোই।" তারপর বললুম, "ও-সব আড্ডায় আমাকে আর দেখবে না কখনো, আর ওরা কেউ এ-বাড়িতে এলে তুমিই দেখা কোরো।" ইলা চুপ ক'রে মেনে নিলে কথাটা, কিন্তু মনে-মনে দুঃখিত হ'লো।

'কিন্তু সে-দুঃখ অতি ক্ষীণ। ও পূর্ণ হ'য়ে ছিলো আমাতেই। আমি যদি ওকে ও-সংসর্গ ছাড়তে বলতুম, তাও ও ছাড়তো হাসিমুখে। কিন্তু তখন আমি ও-কথা বলিনি।'

সুপ্রতিম তার শেরির গেলাস আবার ভ'রে নিলে। আমি ওর এই উপাখ্যান সাগ্রহে শুনছিলুম। আগেই বলেছি, একটা সময়ে ওর সম্বন্ধে নানা-

রকম গুজব কানে এসেছে, কিন্তু সে-সব কথায় কান দিইনি, মন দেবার তো সময়ই ছিলো না। ও যে কোনোকালে বিয়ে করেছিলো তা পর্যন্ত আমি জানতুম না।

'তারপর ?'

সুপ্রতিম বোধ হয় আমার কথাটা শুনতে পেলো না। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'আমিও ওর প্রতি গভীরভাবে আসক্ত ছিলুম, খানিকক্ষণ চোখের আড়াল হ'লেই ভালো লাগতো না। রডন ষ্ট্রীটের ছোট্ট ফ্ল্যাটটিতে খুব সুখেই ছিলাম। লেখকের পক্ষে আদর্শ জীবন একেবারে। বইগুলো ছিলো, ছিলো প্রচুর সময়, আর এমন স্ত্রী! তাছাড়া যে-অর্থাভাব রক্ত শুষে নেয়, বুদ্ধিকে বিকৃত ও প্রতিভাকে পণ্য করে, তাও নেই। অর্থোপার্জনের দায় থেকে মুক্ত হ'তে পেরে আমি খুসিই হয়েছিলাম। মনে-মনে ভাবলুম, এখন যদি আমার কলম থেকে উৎকৃষ্ট লেখা না বেরোয় তাহ'লে কখনোই বেরোবে না।

'অনেক কাগজ, অনেক কালি, অসংখ্য সিগারেট খরচ ক'রে একটা নাটক লিখলুম। অ্যাপোলো থিয়েটারের কর্তার সঙ্গে আলাপ ছিলো, নিয়ে গেলুম তাঁর কাছে। আধ-বুড়ো মানুষ, চোখে প্যাঁশনে, ভারি হাসি-খুসি। আমার পিঠে এক চড় কষিয়ে বললেন, "চমৎকার লিখেছো, কিন্তু শেষটা বদ্‌লে দিতে হবে ভাই।" আমি তো স্তম্ভিত। শেষটা যদি বদলাবোই তাহ'লে ও-রকম লিখবো কেন ? আমি বদলাতে রাজি নই শুনে ভদ্রলোকটিকে অবাক হ'তে দেখে আমি আরো বেশি অবাক হলাম। তিনি অনুনয় করলেন, বললেন একটু মোড় ফিরিয়ে দিলেই নাটকটা চলবে ভালো, এতে পয়সা আছে, যদি লেগে যায় চাইকি দু'তিন হাজার টাকাও অথর্স রয়্যালটি···। কিন্তু সদাশয় ভদ্রলোকটিকে দুঃখিত ক'রে আমি বিদায় দিলুম।

'শুনে ইলা বললে : "দাও না বদ্‌লে, একবার যদি ভালো চলে পরে তুমি যা লিখবে তা-ই ওরা নেবে, তখন ওরাই তোমার হুকুম মেনে চলবে। আমি তো প'ড়েই বলেছি, চমৎকার হয়েছে, একবার স্টেজে হ'লে কলকাতার শহরে হৈ-হৈ প'ড়ে যাবে। দাও না ওরা যেমন চায় তা-ই ক'রে।" আমি বললুম, "ওটা থাক্‌, আর-একটা লিখছি।" রঙ্গমঞ্চের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হবে ব'লে কয়েকদিন অ্যাপোলোতে অভিনয় করলুম। কিন্তু আমার দ্বিতীয় নাটক প'ড়ে কর্ত্তা মাথা নাড়লেন। সান্ত্বনার সুরে বললেন, "যদি একটা পৌরাণিক নাটক লেখো, কি গীতি-নাট্য···হ্যাঁ, আমাকেই দিতে হবে কিন্তু ব'লে দিলাম। তোমার

মধ্যে জিনিস আছে হে। আমাদের কথামতো চললে এতদিনে ফেমাস হ'য়ে যেতে। দেখবে নাকি আর-একবার···আচ্ছা, এসো।”

'ইলা মনে-মনে ভাবলে এটা বোকামি করলুম, যদিও মুখে কিছু বললে না। কিন্তু বৃহত্তর মূঢ়তা হ'লো একটি মাসিকপত্র বের করা। পত্রিকাটির অর্ধেক আমিই লিখতুম নানা নামে, বাকি অর্ধেকে যে-সব যুবকের লেখা থাকতো, তাঁরা আজ বিখ্যাত লেখক তো বটেই, এমনকি কেউ বা বিস্মৃত। 'গ্রাহক হয়েছিলো পঞ্চান্নজন, এবং ঠিক এক বছর চলেছিলো আমার এই নির্বোধ উদ্যম। তারপর আর ইলার টাকা নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলায় বিবেকের সায় পেলুম না। আমার লেখা ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে শুধু ঐ পত্রিকাটিতে।

'এ-সব দুর্ঘটনায় আমি সামান্যই বিচলিত হতাম। মনে আমার আনন্দের অন্ত ছিলো না। আমার কাজ আমি পেয়েছি, আমার জীবন আমি পেয়েছি। রাজার মতো ছিলুম। মানুষ যখন নিজের প্রকৃত কাজটি পেয়ে যায়, তখনই সে রাজা। সেই কাজই তার রাজত্ব। লেখা, পড়া, দু'একজন মনের মতো বন্ধু, মাঝে-মাঝে কলকাতার বাইরে বেড়ানো···আর-কিছু আমার কাম্য ছিলো না। সাধারণ সাময়িক পত্রে লেখা প্রকাশ করবার কোনো প্রয়োজনই বোধ করতুম না, কিন্তু দু'একটি বই বার করবার আয়োজন করছিলুম। সত্যি বলছি, আমার লেখা দিন-দিনই ভালো হচ্ছিলো।'

সুপ্রতিম হাসলো। ইলেকট্রিক আলোয় ঝকঝক ক'রে উঠলো তার সুন্দর, সুরক্ষিত দাঁত। কথা বলতে-বলতে প্রায়ই সে আঙুল চালিয়ে দিচ্ছিলো তার দীর্ঘ, ধূসর চুলের মধ্যে; আর তার মাথা-ঝাঁকুনির সঙ্গে-সঙ্গে চুলগুলো দুলে উঠছিলো বাতাসে-কেঁপে-ওঠা কোনো জীর্ণ গাছের শুকনো পাতার মতো।

'হ্যাঁ, আমি বেশ ভালোই ছিলুম; কিন্তু ইলার নৈরাশ্য লক্ষ্য ক'রে মাঝে-মাঝে আমার মন খারাপ লাগতো। তার জিনিয়স তাকে হতাশ করেছে। তার কোনো সন্দেহ ছিলো না যে তার স্বামী হবে কীর্তিমান, হবে জয়ী, হবে সকলের বরেণ্য; স্বামীর অদম্য ঊর্ধ্বগতি ফেলে আসবে কত, কত নিচে তার নিজের শ্রেণী ও সমাজ। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না এখনো—অথচ সবই হ'তে পারতো। তাকে ভারি ভাবিত দেখতাম এক-এক সময়ে।

'একদিনের কথা শোনো। আবার এসেছি দারজিলিং-এ, আবার দু'জনে দাঁড়িয়েছি অবজারভেটরি হিল্‌-এ ভোরবেলা। 'স্বচ্ছ আলোয় কাঞ্চনজংঘার পুঞ্জ-পুঞ্জ তুষার যেন অনেক কাছে স'রে এসেছে। সেদিকে তাকিয়ে বললুম,

"আমি বাজিতে হেরে গেলুম, এবার তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো।" আমার হাতের উপর গাঢ় চাপ দিয়ে বললে, "এই নাও আমার প্রতিশ্রুতি।" আমি বললুম, "এবার কলকাতায় গিয়ে বরং একটা চাকরির চেষ্টা করি—এখনো হয়তো সময় আছে।" "পাগল! তুমি কেন চাকরি করবে!" তারপর বললে, "তুমি কত বড়ো তা কি আমি জানি না! কিন্তু কেন তুমি প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছো—তোমার এ দীন ছদ্মবেশ আমি তো সইতে পারি না! মহান হও তুমি, দেখা দাও তোমার নিজের জ্যোতির্ময়রূপে—ওরা চেয়ে দেখুক।" আমি মুখ ফিরিয়ে বললুম, "শেষের কথাটা ভালো বললে না।"

'কলকাতায় ফিরে নিজেকে একেবারেই বন্দী করলুম ঘরের মধ্যে। এত কঠোর পরিশ্রম জীবনে কখনো করিনি। ইলা খুসি হ'লো—আবার হ'লোও না। আমাকে প্রায়ই এখানে-ওখানে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইতো। এ-রকম দিনযাপন স্বাস্থ্যকর নয়, ওর মতে। এ তো ইচ্ছে ক'রে জেলখানা বানানো, তাছাড়া কী। এদিকে আমি একটি লম্বা-চওড়া উপন্যাস ফেঁদেছিলুম, তার সব ঘটনা, পাত্রপাত্রী আগুনের সহস্র শিখার মতো আমাকে চারদিক থেকে যেন ঘিরে ধরেছিলো, সেই আগ্নেয় পরিমণ্ডলে আমি আবদ্ধ।...এমনকি, সে-সময়টায় ইলাকেও যে বিশেষ লক্ষ্য করতুম তা নয়। ওর এটা ভালো লাগছে না বুঝতে পারতুম, কিন্তু ঐ জ্বলন্ত, স্পন্দমান কাজ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে আনা অসম্ভব ছিলো। আমি লক্ষ্য করতুম, যেখানে অনেক মেয়েরা আসে ও আমাকে সেখানেই নিয়ে যেতে চায় : ওর ইচ্ছে অন্য মেয়েদের সঙ্গে আমি একটু-আধটু ফ্লার্ট করি, তাহ'লেই ও আমাকে আবার ফিরে পাবে।

'কিন্তু আমি কখনো কোথায় যাইনি।

'একদিন বিকেলবেলা ইলা সাজগোজ ক'রে বেরুচ্ছে, আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কোথায় যাচ্ছো?" আগে কখনো এ-প্রশ্ন করিনি, ওর অবাধ স্বাধীনতাতেই আমি সুখী ছিলাম। কিন্তু সেদিন আমার মনে হচ্ছিলো ও না বেরলেই ভালো হয়। "মীনাদের বাড়ি যাচ্ছি," ও বললে। "ও, সেই মেনিমুখো মেয়েটার বাড়ি, যে ইংরিজি অ্যাক্সেন্ট দিয়ে বাংলা বলে?" ও বললে, "তোমার তাতে কী? তোমার সঙ্গে তো কারো সম্পর্ক নেই।" "রক্ষে করো! শোনো—তোমার আজ বেরুনো হবে না।" অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকালো। "কথা দিয়েছি যে—" "ব'য়ে গেছে—আজ বাড়িতেই থাকো। আমি চাই যে তুমি থাকো।" তখন ইলা বললে, "তুমি যদি তা-ই চাও, তবে আমি সারা বছর বাড়ি ব'সে কাটতে

পারি, কিন্তু তুমি তো চাও না আমাকে।” “শুধু তোমাকেই চাই।” ও বললে, “তুমি তো কেবল পিঠ ফিরিয়ে ব’সে লেখো, সারাদিনে একটা কথাও বলো না আমার সঙ্গে। বন্ধু-বান্ধব আছে ব’লে তবু সময় কাটে।” “কথা না-ই বললাম, তুমি না-থাকলে আমার চলে না।” “বা রে, আমার সঙ্গে একটা কথা বলবে না, তবু আমাকে চুপ ক’রে ব’সে থাকতে হবে! আমি কি তোমার দাসী নাকি?” আমি বললুম, “হ’লেই বা দাসী।”

‘সেদিন ইলা গেলো না, কিন্তু তার পরে যেদিনই ও কোথাও যেতে চাইতো আমি বাধা দিতুম। ওর প্রতি আমার আসক্তি কেমন যেন উন্মাদ হ’য়ে উঠলো। আমি ব’সে ব’সে লিখবো—আর ও থাকবে। ও কাছে না থাকলেই যেন মনের কলকব্জা বিগড়ে যাবে, কাজ এগোবে না। আমার মনের মধ্যে যত ছায়ামূর্তি একটু-একটু ক’রে রক্ত-মাংসে ভ’রে তুলছি, ইলাই যেন তার বিস্তীর্ণ পটভূমিকা। ও স’রে গেলে সব ভেঙে পড়বে। কাজে-কাজেই আমি অন্ধ, বেপরোয়া নিষ্ঠুর হ’য়ে উঠলুম, ওর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বই যেন থাকতে দেবো না, আমার মধ্যে ওকে মিশিয়ে ফেলবো। উপন্যাসের মধ্যে যে একটি জীবন্ত জগৎ সৃষ্টি ক’রে চলেছিলুম, তার সচেতন শক্তিতে আমি দৃপ্ত হ’য়ে উঠেছিলুম, সত্যি নিজেকে মনে হচ্ছিলো জয়ী, রাজা। আর ইলাকে হয়তো নির্বিবেকে দাসীর মতোই ব্যবহার করতুম।

‘এই সময়ে ইলা আমাকে যতখানি, ও যত শান্তভাবে, সহ্য করেছিলো, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। অত যোগ্যতা আমার মধ্যে ছিলো না নিশ্চয়ই। ও প্রাণপণে আমার মরজি মেনে চলতো, বেরুনো বন্ধ ক’রে দিলে, আমার যখন যা দরকার সব এনে দিতো হাতের কাছে। প্রথম থেকেই অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে ও আমাকে নষ্ট করেছিলো, এখন আমার হাতে মিললো তারই প্রতিদান।

‘হয়তো আমিও খুব অন্যায় করিনি। আমার পক্ষে ও ছিলো সব, সব··· ওর উপর আমার দাবি তাই অফুরন্ত। কখনো, লিখতে-লিখতে কলম রেখে দিয়ে ভাবতুম, এটা শেষ হ’লেই দু’জনে যাবো সমুদ্রের ধারে, দক্ষিণের কোনো নগণ্য জনপদে, যেখানে আর-কেউ যায় না। একা, ওকে নিয়ে একা। যথেষ্ট ক’রে ওকে যেন পাওয়াই হ’লো না এখনো। সমুদ্রের ধারে ছোট্ট বাড়ি, ভৃত্যহীন, ইলাই রান্নাবান্না করবে, ওর সাদা হাত দুটির মধ্যেই জীবনের সীমান্ত।

‘হয়তো স্বার্থপরের মতোই এ-সব ভাবছিলুম, সবই ঠিক আমার ইচ্ছেমতো হবে এটা যেন ধ’রেই নিয়েছিলুম। কিন্তু ভাগ্যিস এ-সব কথা ওকে বলিনি।

কেননা আমার সেই প্রসিদ্ধ উপন্যাস শেষ হবার আগেই একদিন হঠাৎ যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলুম। বুঝতে পারলুম, এর পরেই চুরমার।'

টেবিলের উপর কনুই ও তুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সুপ্রতিম বলতে লাগলো। ওর চোখ যেন কাচের মতো; তাতে দ্যুতি আছে, আভা নেই; আর ও আস্তে-আস্তে কথাগুলো বললে, যেন ঠিক কথাটি খুঁজে পাচ্ছে না।

'সংক্ষেপে বলি। কাঞ্চনকুমার টাট্‌কা বিলেত-ফেরৎ ইঞ্জিনিয়র। সুপুরুষ, ওস্তাদ খেলোয়াড়, ফুর্তিতে উচ্ছল। ইলার বছর তু'একের ছোটো। প্রথম ওদের কোথায় দেখা জানি না, কিন্তু একদিন দেখি আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত। ইলা ব্যস্ত হ'য়ে আমাকে বললে, "এক্ষুনি বিদায় ক'রে আসছি ওকে।" বসবার ঘর থেকে তু'একবার ভেসে এলো কাঞ্চনের উচ্চহাসি। তারপর ঘন-ঘনই সে-উচ্চহাসি শোনা যেতে লাগলো।

'শোনো, মহিম: ইলার তখনকার মনের অবস্থাটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তখনই পেয়েছিলুম, যদিও এমন সময়ে পেয়েছিলুম যখন আর সময় নেই। শিল্পীর যে-শক্তিতে তুই বিপরীত ও প্রতিকূল চরিত্র সমান নৈপুণ্যে ফোটে, আমি মনে করি সেই শক্তিই আমাকে সাহায্য করেছিলো। ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়িয়ে আমি ওকে দেখতে পেয়েছিলুম; যেন ও আমারই উত্তপ্ত মস্তিষ্কের ভাবমণ্ডলে ভ্রূণ হ'য়ে আছে, আমারই যত্ন ওকে কালির আঁচড়ে রক্তে মাংসে জন্ম দেবে। মনে করো একজন মেয়ে পৃথিবীর সঙ্গে বাজি রেখেছিলো যে তার স্বামী হবে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের অন্যতম; সব সে দিয়েছিলো তার জন্য, তার সমগ্র স্ত্রী-সত্তা, কিছু বাকি রাখেনি। শেষ পর্যন্ত নিজের চির-পরিচিত সংসর্গও ত্যাগ করেছিলো। কিন্তু ক্রমশ তার মনে হ'তে লাগলো যে স্বামীর পক্ষে সে বাহুল্য হ'য়ে গেছে, সে যেন ঘরের কোনো আসবাব, কি কোনো প্রিয় পরিচারিকা, যার অনুপস্থিতি ক্লেশকর, কিন্তু কাছে থাকলেই যাকে অনায়াসে ভুলে থাকা যায়। আর এ কী জীবন তার, দিনের পর দিন এই নিঃশব্দ অবরোধ, কিছু করবার নেই, কোনো দরকার নেই তাকে দিয়ে: সে না হ'লেও নাকি চলে না, অথচ তার থাকাটাও একান্ত নিষ্ফল। অকর্ম্মণ্য দীর্ঘ দিন—ব'সে-ব'সে ভাবতে-ভাবতে নানা কথাই মনে হয়, সেগুলো সত্য কিনা যাচাই ক'রে দেখবার শক্তি লোপ পায়। তাই একদিন সে এ-ও ভাবলো যে তার স্বামী যে আজও কীর্ত্তিহীন তার কারণই সে, অবাধ স্বাধীনতাতেই শিল্পী ফোটে, এই যত্ন এই অপরিমিত স্নেহই বোধ হয় তাকে আড়ষ্ট ক'রে রেখেছে।

কেননা যদিও তার স্বামী তখনও নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি, এবং ইলা সেজন্যে গভীর ভাবেই ব্যথিত, তবু সুপ্রতিম মিত্রের জ্যোতির্ময় স্বরূপ একদিন যে প্রকাশ পাবেই সে-বিষয়ে ওর সন্দেহ ছিলো না। "বোধ হয় আমি ভুল করেছি," মনে-মনে ও ভাবলে।

'এদিকে কাঞ্চনকুমারের উচ্ছ্বসিত কলভাষণে ও যেন শুনলো মুক্তির কল্লোল, তার ভিতর দিয়ে যেন নতুন ক'রে দেখতে পেলো জীবনের অজস্র বিচিত্রতা, রঙের ছায়া, ভঙ্গির লীলা, দিন-রাত্রির ঢেউয়ের ওঠা-পড়া, অন্তহীন। জীবনের এই ময়ূরকণ্ঠী আঁচল একদিন তো ওকে ছুঁয়েছিলো, আজ আবার দিগন্তে ঝিলকিয়ে উঠছে। যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ইলা সেই রঙিন দিন-রাত্রির দিকে এগোতে লাগলো। গভীর মোহ নেমেছে তার মনে, নিজের উপর আর তার শাসন নেই। একদিন কাঞ্চনকে দেখলুম নীল ওভারঅল প'রে ইলার গাড়ি সারাচ্ছে—মিস্ত্রিকে এ-সব কাজ সে করতে দেবে না—ইলা দেখছে সিড়িতে দাঁড়িয়ে। গাড়ির তলা থেকে কালিঝুলি মেখে উঠে এসে দরজা না খুলে লাফিয়ে ঢুকলে গাড়ির মধ্যে, তার হাতের চাপে এঞ্জিন গোঁ-গোঁ ক'রে উঠলো। "It's all right" ব'লে মাথা ঝেঁকে অকারণেই হেসে উঠলো হো-হো ক'রে। লোকটা একটা ফুর্তির ফোয়ারা, বেঁচে আছে এই খুসিতে উপচে পড়ছে।

'মনে আছে সেদিন চৈত্র মাস। সন্ধেবেলা দক্ষিণের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুয়ে আনা কারেনিনা পড়ছি। আলো ক'মে এসেছে; উঠে ঘরে যাবো, না কি বই পড়া থামিয়ে ঐখানেই ব'সে থাকবো ভাবছি, এমন সময় ইলা এসে দাঁড়ালো দরজার ধারে। অল্প আলোয় ওর মুখ দেখলুম, সঙ্গে-সঙ্গে মনে হ'লো ও কিছু বলতে চায় যা বলা সহজ নয়। চুপ ক'রে ভাবতে লাগলুম আমি কিছু বললে ওর বলা সহজ হয় কিনা, এমন সময় ও হঠাৎ কথা বলতে আরম্ভ করলো। ঐখানে, দরজার ধারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই। ওর কণ্ঠস্বর ভোরবেলা আধো-ঘুমে শোনা পাখিদের ডাকাডাকির মতো। তারপর সন্ধ্যা নামলো, ওর মুখ আর দেখা যায় না; অন্ধকারই যেন কালো শাড়ি হ'য়ে ওর গা বেয়ে উঠলো। তখন মনে হ'লো ওর কথাগুলো যেন রাত্রিশেষে কালো জলের কলস্বর। কি যেন অনেকদূর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে, স্তব্ধ রাত্রির হৃদয়ে শব্দের সুরঙ্গ খুঁড়ে। ট্রেন চ'লে গেলো, ও থামলো। আমি চুপ ক'রে রইলুম। ও বললে, "তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেলুম।"। আমি বললুম, "তোমার

মুক্তি তুমি ছিনিয়ে নাও, আমার কথা ভেবো না ” ও বললে, “তোমাকে আমার চিরকাল মনে থাকবে।”

অনেকক্ষণ ও শেরির গেলাসে চুমুক দিতে ভুলে গিয়েছিলো; তলায় অল্প যে-টুকু প’ড়ে ছিলো সেইটুকু পান ক’রে মস্ত সিল্কের রুমালটা আবার বার ক’রে ঠোঁট মুছলো।

আমি বললুম, ‘তারপর ?’

‘কোনো মুস্কিলই ছিলো না। রেজিস্ট্রি ক’রে আমাদের বিয়ে হয়েছিলো, তাছাড়া ছেলেপুলেও হয়নি, সহজে, নিঃশব্দে হ’য়ে গেলো। কোনো হৈ-চৈ হ’লো না, কাগজেও বেরুলো না খবরটা।’

‘তারপর ?’

‘তারপর—এই তো দেখছো। কিন্তু সে-উপন্যাসটা আমি শেষ করেছিলুম তাছাড়াও অনেক লেখা লিখেছি। ভাবছি এবারে বইগুলো ছাপবার চেষ্টা করি। বয়েস তো হ’লো, আর শরীরটাও বিশেষ ভালো যাচ্ছে না।’

৫

বাইরে রাস্তায় কনকনে ঠাণ্ডা, তীব্র উত্তুরে হাওয়া হা-হা ক’রে ফিরছে। ওভারকোটের গলাটা তুলে দিয়ে সুপ্রতিম বললে, ‘শীত।’

আমি ঘড়ির দিকে তাকালুম। ডিনারের এখনো দেরি আছে। জিজ্ঞেস করলুম, ‘এখানে তুমি কোথায় থাকো ?

‘বারো মাসের জন্যে একটা ঘর আছে আমার। খুব অল্প ভাড়ায় পেয়েছি। শরীরটা ভালো নেই, তাই এখানেই থাকি বেশির ভাগ—কলকাতার চাইতে শস্তাও পড়ে মোটের উপর।’

‘চলো তোমার বাড়ি দেখে আসি।’

‘বাড়ি!’ সুপ্রতিম হাসলো।

যদিও সবে সন্ধে হয়েছে, রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। অক্টোবরের শেষে অনেকেই পাহাড় থেকে নেমে গেছে, তাছাড়া শীতটা আজ সত্যি বেশি। আমি বুঝতে পারছিলুম, ওভারকোটের তলায় সুপ্রতিমের শরীরটা থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলুম, তাকে প্রায় দৌড় বলা চলে। এই উত্তুরে হাওয়া বইতে সুরু করলে এ ছাড়া উপায় থাকে না।

কার্ট রোড ধ'রে স্টেশন ছাড়িয়ে কাকঝরার বস্তির মধ্যে এসে পড়লুম। তাও ছাড়িয়ে গিয়ে সুপ্রতিম বললে, 'এদিকে।' সারা রাস্তা আমরা কেউ কোনো কথা বলিনি, হাঁটতেই ব্যস্ত ছিলুম।

বাঁ দিকে একটা রাস্তা এঁকে-বেঁকে উপরে উঠে গেছে, ইলেকট্রিক আলোয় তার দুটো প্যাঁচ দেখা গেলো যেন শূন্য হৃদয়ের কাৎরানি। বিষম খাড়াই রাস্তা, কোনো বাড়িঘর নেই; কিন্তু মিনিট দশেক বুক-ভাঙা আরোহণের পর গাছের আড়ালে একখানা ঘর চোখে পড়লো। সুপ্রতিম বললে, 'ভিতরে আসবে নাকি ?'

'চলো।'

দরজায় ধাক্কা দিয়ে সুপ্রতিম হাঁক দিলে, 'কাঞ্চী।'

দরজা খোলবার শব্দ হ'লো; তারপর হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে যে-মেয়েটি এগিয়ে এলো তাকে আমি প্রথমে বাঙালিই ভেবেছিলুম, কিন্তু একটু পরেই বুঝলুম সে নেপালি। কিন্তু তার মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে অবাক হ'য়ে গেলুম—"এত দেরি করলে যে ? তোমার ওষুধ খাবার সময় পেরিয়ে গেলো।'

সুপ্রতিম বললে, 'আমার সঙ্গে এক বন্ধু এসেছেন।'

মেয়েটি ঈষৎ অপ্রস্তুত হ'য়ে স'রে দাঁড়ালো; সুপ্রতিম তার হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে আমাকে বললে, 'এসো।' কাঞ্চীকে যেন লক্ষ্যই করলে না।

একটি মাত্র ঘর নিয়ে বাড়িটি, সঙ্গে অতি ক্ষুদ্র স্নানের ঘর ও রান্নাঘরও আছে। ঘরের মধ্যে একটি খাট, একটি টেবিল ও চেয়ার, আর যেখানে সেখানে ছড়ানো কতগুলো বই। আর কিছু নেই।

টেবিলের উপর লণ্ঠন রেখে চেয়ারটি দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'বোসো।' নিজে দাঁড়ালো টেবিলে হেলান দিয়ে, বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ ক'রে। বাঙালি মেয়ের মতো শাড়ি পরা মূর্তিটি চকিতে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। আমার চোখ যেন ঝলসে গেলো, এত সুন্দর।

আমি গলা নামিয়ে বললুম, 'একে কোথায় পেলে ?'

'পেয়েছিলুম পাহাড়ি রাস্তায় কুড়িয়ে। বারো বছর আগে—ও তখন ছেলেমানুষ। ওর স্বামী মারা গিয়েছিলো বসন্ত হ'য়ে, আর-কেউ ছিলো না, আমি আশ্রয় দিয়েছিলুম। বেশি ইচ্ছে ছিলো না—কিন্তু কেমন দয়া হ'লো।'

'অমন মুখ দেখলে কার না দয়া হয়।'

সুপ্রতিম ভুরু কুঁচকে বললে, 'মেয়েটা আস্ত বোকা। ওর স্বজাতীয় যুবকরা বিয়ে করবার জন্যে কত সাধাসাধি করে—কারো কথায় কান দেবে না। আমাকে ছেড়ে নাকি যাবে না কোথাও। সেই থেকে র'য়েই গেছে। দিব্যি বাংলা শিখেছে, কিছু ইংরিজি শিখিয়ে কলকাতার সমাজে ছেড়ে দিতে পারলে এখনো একটা জলজ্যান্ত আই-সি-এস্ পাকড়াতে পারে—কী বলো?' সুপ্রতিম উচ্চস্বরে হেসে উঠলো।

নিজের জামাইয়ের কথা ভেবে রসিকতটা খুব বেশি উপভোগ করতে পারলুম না। চুপ ক'রে রইলুম।

সুপ্রতিম আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি হয়তো ভাবছো আমি যা চেয়েছিলুম তা-ই পেয়েছি—স্ত্রীতে স্ত্রী, দাসীতে দাসী?'

'সে-রকম কিছুই আমি ভাবছিলুম না।'

'ভাবলে বিশেষ ভুল করতে না যদিও। অর্থনৈতিক কারণেই এ-ব্যবস্থা। ওর জন্যে আর-একটা ঘর আবার পাবো কোথায়? দাসীর চাইতে স্ত্রী-ই সস্তা আমার পক্ষে।'

সুপ্রতিম আবার হেসে উঠলো।

আমার একবার লোভ হ'লো বলি, 'ইচ্ছে করলেই তুমি যে-কোনো উপায়ে যথেষ্ট টাকা তো রোজগার করতে পারতে, সেটা কেন করলে না?' কিন্তু পরমুহূর্তেই মনো হ'লো এ-প্রশ্ন বৃথা। ওর জীর্ণ ঘরের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে ও সব ছেড়েছে, কিন্তু ওর রাজত্ব ছাড়েনি; নিজেকে একদিনের জন্যেও ভাড়া খাটায়নি, রাজা হ'য়েই জীবন কাটিয়েছে—শেষ পর্যন্ত; ওর চরিত্রধর্ম থেকে মুহূর্তের জন্যেও ভ্রষ্ট হয়নি। তবে কি নির্মমরকম চরিত্রবান হবার জন্যেই ওর এই অধঃপাত?

একটু পরে মেয়েটি ছোট্ট একটা ওষুধের গেলাস নিয়ে এসে সুপ্রতিমের কাছে দাঁড়িয়ে বললে, 'খাও।' কথা না ব'লে সুপ্রতিম ওষুধটা খেয়ে ফেললো। —'তোমার জন্যে এ-বেলা রুটি করবো, না লুচি?'

সুপ্রতিম বললে, 'ভাত।'

'তোমার বন্ধু—ঐ ভদ্রলোক—উনি কি চা খাবেন?' আমার দিকে না-তাকিয়ে কাঞ্চী জিজ্ঞেস করলে।

'কী হে, খাবে নাকি চা?'

'না, থাক—কিছু মনে করো না—এখন আর চা খাবো না। উঠি এখন।'

সুপ্রতিম আমার সঙ্গে ঘরের দরজা পর্যন্ত উঠে এলো। ঐ ছোট্ট ঘরে লণ্ঠনের ঘোলাটে আলোয় ওকে যেন দীর্ঘতর, কৃশতর দেখালো, আর ওর মুখ যেন পুরোনো মূর্তির মতো ম্লান ও স্থির। নিজের দুর্দশা প্রসঙ্গে প্রথমে ও যে বলেছিলো, 'এ না হ'য়ে উপায় ছিলো না', তার মানে এখন বুঝতে পারলুম। ওর দারিদ্র্য নিয়ে ও লজ্জিত নয়, গর্বিত নয়, সে-বিষয়ে সচেতনই নয়, বলা যায়: ও জানতো যে এ-রকমই হবে, কেননা ও যে ওর কাজ পেয়ে গেছে, আর সে-রাজত্ব ও কিছুতেই ছাড়বে না।

শেষ পর্যন্ত সুপ্রতিম ওর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে।

বাইরে এসে একটু দাঁড়ালুম। দরজায় সুপ্রতিম ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলুম, 'ইলার আর খবর জানো?'

'একবার দেখেছিলুম চৌরাস্তায়—অনেকদিন আগে। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো, আমিও একটুখানি দাঁড়ালুম, তারপর যে যার পথে। দিঘির মতো চোখ। ওর দুই ছেলে ছিলো সঙ্গে—কাঞ্চনও ছিলো, একটু দূরে। আর উত্তর-জোড়া সেই তুষাররাশিও ছিলো—ওরা চিরন্তন, কিন্তু ওরা বোবা।'

'তুমি আজকাল তাহ'লে এখানেই…'

'হ্যাঁ, একরকম তা-ই। …আচ্ছা, বেশ কাটলো সময়টা তোমার সঙ্গে।'

৬

পরের দিন সকালে উঠেই পাঁচশো টাকার একখানা চেক আর এই চিঠিটি হোটেলের চাকর দিয়ে সুপ্রতিমকে পাঠিয়ে দিলুম—

'প্রিয়, সুপ্রতিম,

আজই চ'লে যাচ্ছি কলকাতায়, তোমার সঙ্গে আর দেখা করবার সময় নেই। সঙ্গের এই চেকটি দয়া ক'রে গ্রহণ কোরো। এ কিছুই নয়: কিন্তু আমার অনুরোধ কিছু নতুন জামাকাপড় করিয়ে নিয়ো। কিছু মনে কোরো না।

কলকাতায় এলে অবশ্য দেখা কোরো। আমার ঠিকানা উপরে রইলো।

মহিম।'

ভৃত্য ফিরে এলো একখানা চিঠি আর পুরোনো রং-ওঠা একটা সুটকেস নিয়ে। চিঠিতে সুপ্রতিম লিখেছে—

'মহিম,

তোমার টাকা রাখলুম, কেননা টাকার আমার দরকার। কিন্তু তোমাকে কিছু না দিয়ে এটা নিতে পারি না। আমার সমস্ত লেখার পাণ্ডুলিপি এই বাক্সে আছে। আমি আর বই বার করতে পেরে উঠবো ব'লে মনে হয় না—তুমি যদি কখনো প্রকাশ করো তাহ'লে আর্থিক ক্ষতি তোমার হবে না, হয়তো লাভও হ'তে পারে।

কলকাতায় গেলে দেখা করবো নিশ্চয়ই।

সুপ্রতিম।'

স্যুটকেসের ডালা তুলে দেখলুম, রাশি-রাশি কাগজ সাজানো, সুপ্রতিমের অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে ভর্তি। পাঁচশো টাকা পেয়ে এতগুলো বই দিয়ে দিলে ও! একদিন হয়তো এ থেকে হাজার-হাজার টাকা আসবে—সুপ্রতিম এ কী কাণ্ড করলে। কলকাতায় এসেই বাক্সটা ভালো ক'রে খুলে বসলুম। গোটা চারেক নাটক, দুটো বিরাট উপন্যাস, তাছাড়া অনেকগুলো ছোটো গল্প ও প্রবন্ধ। নানা কাজের ফাঁকে সময় ক'রে নিয়ে একটা উপন্যাস আগাগোড়া প'ড়ে ফেললুম। তারিখ দেয়া ছিলো—বুঝলুম, ইলা ওকে ছেড়ে যাবার আগে এই উপন্যাসটিই লিখছিলো। জিনিয়সের লেখা বই, সন্দেহ নেই। এটা নিশ্চিত বলতে পারি যে সুপ্রতিম মিত্র অসাধারণ লেখক। কিন্তু এ-বই এখন বাংলা দেশে ছাপানো যায় না। আমি অন্তত এ-দায়িত্ব নিতে পারিনে। আপনাদের সকলকেই বলছি, যদি কেউ সাহস ক'রে ওর বইগুলো প্রকাশ করবার ভার নেন—আমি বিনামূল্যে সব পাণ্ডুলিপি দেবো ; লাভের অর্ধেক সুপ্রতিমকে দেবেন, তাহ'লেই হবে। যিনি এ-ভার নেবেন, হয়তো একটা সোনার খনিই তিনি পেয়ে যাবেন।

মুসলিম সংস্কৃতির হেরফের

সৈয়দ মুজ্‌তবা আলী

মুসলমান ধর্ম আরবে যে যুগে জন্মগ্রহণ করিল তাহাকে আরব ঐতিহাসিকেরাই বর্বর (জাহিলিয়া) যুগ নাম দিয়াছেন। মহাপুরুষ মুহম্মদের সমসাময়িক ও তৎপরবর্তী ঐতিহাসিকদের বর্ণনা হইতে দেখা যায় আরবদেশ মহাপুরুষের সময় সভ্যতার দ্বিতীয় স্তরে মাত্র পৌঁছিয়াছে। কৃষ্টি বলিতে আরবদের সে-যুগে একমাত্র গৌরব ছিল কবিতা রচনা। সে কবিতাকেও ব্যাপক কাব্য বলা চলে না ; প্রেম, মৃত্যুশোক ও শৌর্যবীর্য লইয়াই তাহার কারবার। দ্বিতীয়তঃ যে সব কবিতা জাহিলিয়ার নামে চলে তাহার কতটুকু ধর্মে-পরাঙ্মুখ, নামে মুসলমান ওম্মাই বাদশাহদের উৎসাহে পরবর্তী যুগে রচিত হইয়াছিল আর কতটুকু খাঁটি জাহিলিয়া সে লইয়া পণ্ডিতদের তর্কবিতর্ক এখনও চলিতেছে।

কিন্তু এই আরবেরাই যখন পরপর পারশ্য, সিরিয়া, ফিলস্তিন, মিশর, স্পেন, তুর্কিস্তান, এশিয়ামাইনর, তুর্কী, আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষ জয় করিল তখন বিজিত জাতিদের লইয়া তাহারা যে সভ্যতা গড়িয়া তুলিল তাহা যে শুধু সে যুগের মুসলমান, অমুসলমান পণ্ডিতদের চমৎকৃত করিয়াছিল তাহা নহে, এখনও তৎকালীন মুসলমান সভ্যতার সঙ্গে সমসাময়িক ইয়োরোপীয় সভ্যতার তুলনা করিয়া আশ্চর্য হই।

আরবরা রুমি (বাইজান্‌টাইন্) দিগের নিকট হইতে স্থপতিবিদ্যার বর্ণশিক্ষা করিল ও তাহার সঙ্গে পারসিক, মিশরী ও ভারতবর্ষীয় গঠনপ্রণালী মিশাইয়া যে অপূর্ব মসজিদ, সমাধিমন্দির, রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিল তাহার চিহ্ন স্পেন হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিদ্যমান। তুর্কিস্তানে সে স্থপতির যে আশ্চর্য বিকাশ হইল তাহার ইতিহাস লেখা আজও শেষ হয় নাই। বাগদাদী খলিফাদের উৎসাহে ইহুদিরা গ্রীক দর্শনের তর্জমা আরম্ভ করিল ; কিন্দি, ফারাবি, ইবনে সিনা তাহার সমৃদ্ধিসাধন করিলেন ও তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের প্রসারতা করিলেন। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্ধ পৃথিবীর বিদ্যাকেন্দ্র ছিল বাগদাদ ও কাইরো।

কিন্তু ইসলামের বিজয় অভিযানের আদ্যোপান্ত বর্ণনা ও তাহার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ভারতবর্ষে ইসলাম কি-রূপ নিয়া প্রবেশ করিল, বাঙালী মুসলমান সে ধর্ম হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে কি পাইয়াছে ও বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বলিতে কি বুঝায় এখানে তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

নিতান্ত অশিক্ষিত বর্বর দেশগুলি বাদ দিয়া ইসলামের জয়যাত্রার অনুসরণ করিলে আরব ছাড়িয়া প্রথমেই পারশ্যে আসিতে হয়। পারসিকরা তখন আরবদের অপেক্ষা অনেকগুণে সভ্য, তাহাদের স্থপতি, কলা, অলঙ্কার, রাজসভার ঐশ্বর্য্য, জীবনযাপনের তৈজসপত্র, রণসম্ভার সভ্য বাইজান্টাইন্‌দিগের অপেক্ষা কোন হিসাবে নিকৃষ্ট তো ছিলই না বরং অনুমিত হয় পারসিকদিগের প্রভাব তখন বাইজান্টাইনের সভ্যতাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তৎসত্বেও অশিক্ষিত অসভ্য আরব শুধু যে সেই পারসিকদের পরাজিত ও বশীভূত করিল তাহা নহে, আরবের সরল, দৃঢ় একেশ্বরবাদের সম্মুখে পারসিক দ্বৈতবাদ পরাজিত হইল। ধর্মের ইতিহাসে সে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। পারসিকদিগের ধর্ম প্রাচীন, মার্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন ছিল কিন্তু মনে হয়, সে ধর্ম সত্য ও অসত্য দুইকে চিরন্তন ও শাশ্বতরূপে স্বীকার করিয়া নিয়াছিল বলিয়া পারসিক জনসাধারণ তাহাদের উপরে ধনিক ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের যে অত্যাচার যুগ যুগ ধরিয়া চলিতেছিল তাহা হইতে নিষ্কৃতির পথ পাইতেছিল না। অসত্য যদি সত্যেরই মত শাশ্বত হয় তাহা হইলে উৎপীড়নের অসত্য হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবে কোন নীতি, কোন মহাপুরুষ, কোন ধর্ম ?

মুসলমানরা বলিল অত্যাচার অসত্য, ভগবান অসত্য নষ্ট করেন—মানুষের কর্তব্য অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। সত্যাসত্যের দ্বন্দ্ব ও তাহার সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক কি সে লইয়া চুলচেরা শাস্ত্রীয় তর্ক সে যুগে হয় নাই,—ধর্মের ইতিহাসে দেখিতে পাই আপামর জনসাধারণ এরূপ তর্কে যোগদান করে না—উৎপীড়িত প্রজাকুল মুসলমান ধর্মের আশ্বাসে উৎসাহ পাইল। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে মুসলমানের সাম্যবাদ পারসিক সভ্যতাতে নূতন প্রাণ আনয়ন করিল। ক্রমে ক্রমে বাগদাদ পারসিক ও আরবী সভ্যতার সম্মিলিত কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হইল।

পারসিক পণ্ডিতমণ্ডলী সরল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন কিন্তু তাঁহাদের ধার্মিক মন শুধু শরিয়ত (ক্রিয়াকাণ্ড) মানিয়া তৃপ্ত হইল না। এখানে স্মরণ

রাখা আবশ্যক যে আজ মুসলমান ধর্ম বলিতে আমরা যে সুস্পষ্ট সংজ্ঞাবদ্ধ বিশ্বাস ও আচরণের ফিরিস্তি পাই তখনও তাহা গড়িয়া উঠে নাই। শুধু যে চারি ইমাম, মালিক, হন্‌বল্, হনীফা ও শাফীর মতবাদ তখন নানারকমের তর্কজাল সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা নহে অন্যান্য নানা সম্প্রদায় তাঁহাদের সমস্ত চিন্তাশক্তি এই তর্কযুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কালামীরা গ্রীক দর্শন দিয়া কুরানের বাক্য বিশ্লেষণ ও সমর্থনে নিযুক্ত হইলেন, মুতাজিলারা ঈশ্বরের স্বরূপ, স্বর্গনরক, কর্মফল নিয়া তর্ক জুড়িলেন, কদরী ও জবরীরা কর্মে মনুষ্যের স্বাধীনতা পরাধীনতার আলোচনা করিলেন ও কিরামিতারা একেশ্বরবাদকে এতই উচ্চ আসন দিলেন যে কাবার কৃষ্ণপ্রস্তরকে সম্মানপ্রদর্শন পৌত্তলিকতা বলিয়া প্রচার করিলেন। শীয়া মতবাদ মদীনায় জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তাহার পরিপুষ্টি হইল পারশ্যে। গণতান্ত্রিক আরবের মধ্যে মহাপুরুষ মুহম্মদের বংশধরগণের বিধিদত্ত অধিকার স্বীকৃত হইল না, কিন্তু প্রাচীন ইরাণে ভূপতিকে ঈশ্বরের অবতাররূপে স্বীকার করা হইত বলিয়া আলী ও তাঁহার বংশধরগণ সেখানে ঐশী শক্তির আধার রূপে স্বীকৃত হইলেন। পারশ্যে তাই আলী ও তাঁহার বংশধরগণ শুধু যে রাজনৈতিক সমর্থন পাইলেন তাহা নহে, ধর্মক্ষেত্রেও স্বীকৃত হইল যে তাঁহাদের বাণী আপ্তবাক্য। কুরান যেরূপ অভ্রান্ত ইঁহাদের বাণীও সেইরূপ পূত, তাঁহাদের জীবন নিষ্কলঙ্ক। সুন্নিরা বলিল কোন মানুষই অভ্রান্ত হইতে পারে না—ধর্মক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে বিশেষ কোনও অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না—সেখানেও গণতন্ত্র। একমাত্র পণ্ডিতদের সর্ববাদী মতই অভ্রান্ত হইতে পারে—কারণ মহাপুরুষ বলিয়াছেন আমার বংশধরেরা কোন বিষয়ে একমত হইলে তাহা ভুল হইতে পারে না। ইহাই মুসলমানের স্মৃতিতে 'ইজমা' রূপে গৃহিত।

ইহার মধ্যে আরেক ভাবতরঙ্গ আসিয়া পারশ্যের ধর্মজগৎকে আলোড়িত করিল। নিওপ্লাতনিজমের রহস্যবাদ ইস্কন্দরিয়ায় পুষ্টিসাধন করতঃ আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল। দুই একজন আরব সাধু এই রহস্যবাদের (সুফী বা ভক্তি-মার্গের) দিকে আকৃষ্ট হইলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন ইহা ইসলামে সম্পূর্ণ নূতন নহে। কুরানের 'নূর' অধ্যায়ে আল্লার যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে রহস্যবাদের উৎস পাওয়া যায়। আল্লা যদি নূরই (জ্যোতিঃ) হইলেন, তাহা হইলে শুধু শরিয়তের বিধান মানিয়া তাঁহাকে কি করিয়া পাইব? মানুষের ভিতর যে নূর আছে তাহাকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের তমসান্ধকার কাটাইয়া সেই বিশ্বনূরের সহিত মিলিত হইতে হইবে। তাহার জন্য কৃচ্ছ্রসাধন দরকার—ধ্যানের প্রয়োজন।

আর কে না জানে মহাপুরুষ ঐশী বাণী প্রাপ্ত হইবার পূর্বে মাসের পর মাস হিরার পর্বত কন্দরে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। সূফীরা বলিলেন শাস্ত্রের তর্কজালে বন্দী হইয়ো না ; স্বয়ং মহাপুরুষ যে মার্গ গ্রহণ করিয়া নূর পাইয়াছিলেন সেই পথ ধরো।

পারশ্যে সূফীসাধনা প্রসার করিল। তাহার মূল তত্ত্ব হইল শরিয়ত অনুসরণ করিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংযম করিবে। সেবাদ্বারা গুরুকে (মুরশিদ) তুষ্ট করিবে, তিনি দিবেন জ্ঞান—পূর্বেই বলিয়াছি শীয়ারা ইমাম ও হুজ্জৎকে (গুরু) অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন। আর সর্বশেষে ভক্তির সাধনা। ঈশ্বরকে রসস্বরূপে আরাধনা করিয়া সমাধিস্ত হইবে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের কর্মদ্বার রুদ্ধ হইবে ও তাহার চরম পরিণতি পরমালোকের সহিত মানবের ক্ষুদ্র আলোকের সম্মেলন—"কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃসমুদ্রেই।" হর্তেন প্রভৃতি জর্মন পণ্ডিতদের মতে সূফীর 'আনা ল্ হক্' (আমিই ঈশ্বর) ভারতবর্ষীয় প্রভাবে গঠিত হইয়াছিল—হয়ত বৌদ্ধ নির্বাণও তাহাতে যুক্ত হইয়াছিল। মাসিঁন্ন প্রভৃতি ফরাসী পণ্ডিতগণ আপত্তি করিয়া বলেন, সূফীমার্গের এই চরম ফল পারশ্যের নিজস্ব সম্পত্তি। সে তর্ক এখানে অবান্তর।

সূফীমার্গের সাধনা পারশ্যের চতুর্দিকে বিস্তৃতিলাভ করিল। প্রাচীনপন্থীরা ঘোর প্রতিবাদ তুলিলেন কিন্তু তাহার সমাধান করিলেন সাধু গজ্জাল। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, শাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিত ও সূফী। তাঁহার অপূর্ব লেখনীর বলে সূফীমতবাদ পাংক্তেয় হইল ও সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত বহু মত সূফীধর্মের ভিতরে আসিয়া আশ্রয় লইল।

এখানে ফারসী ভাষার কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন।

আরবেরা বহু দেশ জয় করিয়াছে, সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আরবী চালাইয়াছে। ফলে সিরিয়া, ফিলস্তীন, মিশর, সুদান, লিবিয়া, মরক্কো, সাহারা, স্পেন সর্বত্রই আরবী ভাষা মুসলমান জ্ঞানবিজ্ঞানের বাহন হইল। শুধু তুর্কী, ইরান, আফগানিস্তান, চীন ও ভারতবর্ষে আরবী চালাইতে পারিল না। কিন্তু তৎসত্বেও মুসলিম কৃষ্টি ইসলাম জগতে অক্ষুন্ন রাখিতে বিশেষ অসুবিধা হইল না।

ফারসী ভাষা আর্যবংশীয়া কিন্তু আরবী সেমিতি। তথাপি আরবী ফারসীকে শব্দসম্পদে এমনি অভিভূত করিয়া ফেলিল যে ইংরিজির সঙ্গে লাতিনের যে সম্পর্ক, ফারসী-আরবী, উর্দু-আরবী ও তুর্কী-আরবীতে আজ সেই সম্পর্ক। দৈনন্দিন কথাবার্তা লাতিন-বর্জিত ইংরাজিতে যদি বা দুই চারিটি বলা চলে

মনোজগতে প্রবেশ করিয়া কোনও ভাব বা সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশ করিতে হইলেই লাতিনের দরকার। আরবী-বর্জিত ফারসীতে যদি বা নাম-ধাম-সাকিন জিজ্ঞাসা করা যায়, দর্শন, ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা আরবী-বর্জিত ফারসীতে অসম্ভব। তুর্কী, উর্দু ও সিন্ধি ভাষাতেও তাই। বাংলা ও গুজরাতি বহু আরবী (ও ফারসী) শব্দ গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু চিন্তার জগতে তাহারা শব্দ ঋণ করে সংস্কৃত মহাজনের নিকটে। কিন্তু সে আলোচনা পরে হইবে।

কাজেই যদি বা ইরানে ফারসী প্রচলিত রহিল তাহার রূপ যা হইল তাহা আবেস্তা পণ্ডিত নিজেরই মাতা বলিয়া চিনিতে পারিবেন না। ফারসী আরবীর শব্দভাণ্ডার গ্রহণ করিয়া ধনী হইল—ভাষার মাধুর্য তাহার পূর্বেই ছিল। সূফী কবিরা সেই মধুর ও গম্ভীর ভাষাতে অপূর্ব রসধারার সৃষ্টি করিলেন। ধর্মপণ্ডিতদের তাড়নার ভয়ে ভীত না হইয়া ফারসী জনসাধারণ একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল সূফী কবি মওলানা জালাল উদ্‌দীন রূমীর কেতাব ফারসীর কুরান। ফিরদৌসির মহাকাব্য, সাদীর নীতিকবিতা, হাফিজের সুরা ও সাকীর গজল, এমনকি উমরে খাইয়ামের অজ্ঞেয়বাদ সমস্তই ফারসী-সাহিত্যকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসমাজে সভাসদ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে আরবী শব্দভাণ্ডারের গুণে ইসলামি চিন্তাধারার স্রোত ফারসী সাহিত্যে প্রবাহমান রহিল।

মুসলমানেরা এদেশে আসিল প্রধানতঃ আফগানিস্তানের উপর দিয়া। এখানে আফগান সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন কারণ আফগান সংস্কৃতিনামক কোনও পদার্থ নাই। আফগানরা পশতু ভাষায় কথা বলে কিন্তু সে ভাষাতে তাহারা লেখাপড়া করে না। পারসিক সভ্যতাই আফগান সভ্যতা। কাবুল বা গজনীর কবি ফারসীতেই কবিতা লিখেন, মসজিদ নির্মাণে পারসিক ইমারতের সাদৃশ্যেই গঠিত হয় আর আফগান সূফী ও ইরানি সূফীর ধর্মবিশ্বাসে কোনও পার্থক্য নেই। ভারতবর্ষে যখন মোগলরা রাজত্ব করিত তখন আফগানিস্তানের পূর্বার্ধ তাহাদের হাতে ছিল। কাবুল গজনী হইতে কবিরা আসিয়া দিল্লীর রাজদরবারে ফারসী কবিতা শুনাইতেন ও হিরাতের কবিরা যাইতেন ইরানে। দুইদলের লেখাতে কোনও পার্থক্য নাই।

মুসলমানরা ভারতবর্ষে আসিয়া ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করিবার জন্য যে ভাষা নির্মাণ করিলেন তাহার নাম উর্দু। আরবরা ইরানে যে রকম পারসিক কাঠামোর উপর আরবীর কাদা রঙ লাগাইয়া ফারসী ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন

ঠিক সেইরূপ মোগলেরা উত্তর ভারতবর্ষে প্রচলিত দেশী ভাষার কাঠামো লইয়া উর্দু গড়িলেন। পার্থক্য এইমাত্র যে ফারসীতে শুধু আরবী যোগ করা হইয়াছিল, উর্দুতে আরবী ও বিস্তর ফারসী শব্দ লাগানো হইল। ফলে ইরানে যাহা হইয়াছিল উত্তর ভারতবর্ষে তাহাই হইল। দৈনন্দিন কথাবার্তা যদি বা আরবী-ফারসী-বর্জিত উর্দুতে বলা চলে চিন্তার জগতে সে ভাষা লইয়া পদক্ষেপ করিবার উপায় নাই। এক কথায় আরবী ছাড়া যে রকম ফারসী অচল ঠিক সেইরূপ আরবী ফারসী ছাড়া উর্দু অচল।

উর্দু ভাষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতবর্ষে মুসলমানদের ভিতরে দুই চিন্তাজগতের সৃষ্টি হইল। একদল কুরান, হদীস, ফিকা ধর্মশাস্ত্রের উর্দু তর্জমা করিতে লাগিলেন, তাহার নূতন টিকাটিপ্পনি, নূতন আলোচনা, নূতন তর্কবিতর্ক। ইঁহাদের উৎসাহ ইরানিদের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল কারণ ইরানিরা শীয়া। তাঁহারা আরব মুসলমানদের অধিকাংশ সুন্নি ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না। শুধু কুরান আর কিছু হদীস লইয়া তাঁহারা শীয়াধর্ম গড়িয়া তুলিয়াছিলেন অথবা সুফীতত্ত্বে মগ্ন হইয়া শাস্ত্রালোচনা উপেক্ষা করিতেছিলেন। ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা সুন্নি ধর্মগ্রহণ করিলেন বলিয়া তাঁহারা খাঁটি আরবী ধর্মশাস্ত্রের উপর জোর দিলেন বেশী। ভারতবর্ষ ধর্ম ও দর্শনের মহাদেশ কাজেই মুসলমান শাস্ত্রচর্চা এদেশে এমন উৎসাহ পাইল যে বহু নূতন আরবী কেতাবও লেখা হইল, অনেক আরবী পুস্তকের প্রথম মুদ্রণ এদেশেই হইল; আজ পর্যন্ত হয়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ও লখণৌয়ের নওল কিশোর প্রেসে ছাপা আরবী বই মিশর, দমস্কস, বাগদাদ ও ইয়োরোপের পণ্ডিতমণ্ডলীতে সমাদৃত। এইসব শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রলিখনে মুসলমানদের ভাষার দিক দিয়া কোনোই অসুবিধা হইল না, কারণ পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি যে উর্দু এমন ভাবে গড়া হইয়াছিল যে তাহাতে যদৃচ্ছা আরবী শব্দ ব্যবহার করা যায়। ইহার আরেকটী তুলনা দেওয়া যাইতে পারে—দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলি দ্রাবিড় কিন্তু সেগুলিতে সংস্কৃত শব্দ এত অধিক মাত্রায় প্রবেশ করিয়াছে যে আর্য সংস্কৃতি তাহাতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় ধারা হইল সুফীতত্ত্বের প্রচার ও প্রসার। কিন্তু তৎপূর্বে এইখানে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের কিঞ্চিৎ ইতিহাসের প্রয়োজন।

সকলেই জানেন বৌদ্ধধর্মের পূর্বে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেতর জাতির শাস্ত্রে অধিকার ছিল না। বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহার ধর্ম বর্ণের কৌলীন্য স্বীকার করে নাই। আপামর জনসাধারণকে

ধর্মে পূর্ণাধিকার দিবার জন্য বুদ্ধ সে ধর্ম পণ্ডিতি সংস্কৃতে প্রচার না করিয়া শরণ লইলেন তৎকালীন প্রচলিত ভাষার।

পরবর্তী যুগে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হইল। দলে দলে বৌদ্ধেরা হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু এবারে তাঁহারা ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে ধর্মে পূর্ণাধিকার দাবী করিল কারণ ধর্ম বদলাইলে মানুষের মন বদলায় না; বৌদ্ধধর্মে তাহারা যে অধিকার পাইয়াছিল হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আসিয়া সেই অধিকারই দাবী করিল। তখন হইল ভক্তিমার্গের প্রচার। একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষে ভক্তির সাধনা ছিল না। কারণ বেদের বরুণ মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, মহাভারতের শান্তিপর্বে, গীতায়, ভাগবতে, পাঞ্চরাত্রে, নারদ শাণ্ডিল্যাদির সূত্রে ভক্তির যথেষ্ট পরিপুষ্টি হইয়াছিল কিন্তু ভক্তির পূর্ণ প্রসার হইল বৌদ্ধধর্মের লোপের পর, মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ও তাহার পর আজ পর্যন্ত ভক্তির বিজয় অভিযান এখনও পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে। এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভক্তিমার্গের ব্যাপকতম প্রসার হইল গৌণতঃ মুসলমান ধর্ম প্রচারের ফলে। পূর্বেই বলিয়াছি বৌদ্ধধর্ম হইতে প্রত্যাবর্ত হিন্দুরা ধর্মে অধিকার লাভের জন্য আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের পক্ষে আরেকটী যুক্তি হইল প্রতিবেশী মুসলমানের ধর্মে পূর্ণাধিকার। যে শূদ্র দুইদিন পূর্বে মন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশ করিতে পাইত না সে কিনা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া মসজিদে অবাধে প্রবেশ করিতে লাগিল। হিন্দুরা দেখিয়া বিস্মিত হইল যে সেই নও-মুসলিমের ধর্মবিশ্বাস, ক্রিয়াকর্মে ও মুসলিম পণ্ডিতের ক্রিয়াকর্মে কোনও পার্থক্য নাই।

অস্পৃশ্য ও শূদ্রেরা সম্ভবতঃ এ উদাহরণ তর্কস্বরূপ ব্রাহ্মণদের দরবারে পেস করে নাই কিন্তু গণ আন্দোলন তর্ক ও যুক্তির পাকা রাস্তা দিয়া চলে না। প্রতিবেশীর উদাহরণ, দৃষ্টান্ত ক্ষণে ক্ষণে নানা পথ দিয়া আসিয়া শাস্ত্রবন্ধনের বেড়ার উপর ধাক্কা লাগায়—বাঁধন টুটিতে থাকে।

ভক্তির চারি আচার্য তবু শূদ্রকে শাস্ত্রে অধিকার দেন নাই। তাহাদিগকে ধর্মে পূর্ণ অধিকার দিবার চেষ্টা করিলেন বাঙলা দেশের মহাপুরুষ—শ্রীচৈতন্য। তিনি সে-যুগে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন যে ইসলামের বিজয় অভিযান যদি রুদ্ধ করিতে হয় তবে চণ্ডালকে, শূদ্রকে, এমনকি যে হিন্দু মুসলমান হইয়া গিয়াছে তাহাকে, এক কথায় আপামর সর্বসাধারণকে ধর্মে পূর্ণাধিকার দিতে হইবে। বল্লভ নিম্বার্ক যে সাহস দেখাইতে পারেন নাই মহাপ্রভুর দ্বারা তাহা

সম্ভব হইল। কিন্তু চৈতন্যের উদার ধর্ম পাণ্ডিত্যাভিমানি ব্রাহ্মণের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না। যে উদ্দেশ্য লইয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রচার হইল তাহা সফল হইল না সত্য, তবু হিন্দুসমাজে প্রচুর উদারতা প্রবেশ করিল।

এই উদারতার দরুণ সুফীদের প্রচারকর্মের সুবিধা হইল। পূর্বেই বলিয়াছি ভক্তি ও সুফীতত্ত্ব দুইই প্রেমরসাত্মক। শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রীয় মুসলমান ধর্মে মিলন হইল না—সে মিলনের চেষ্টা রাজপুত্র দারা শিকুহ্‌র মত দুই একজন পণ্ডিত চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু প্রেমের গঙ্গা যমুনার মিলন হইল। উত্তর ভারতবর্ষে কবীর, দাদূ; মহারাষ্ট্রে সন্তোজী, মুহম্মদ উভয়ধর্মের শাস্ত্রের শাসনকে উপেক্ষা করিয়া মধুর কণ্ঠে প্রেমের গান গাহিলেন। সে-গান মসজিদে মন্দিরে প্রবেশ করিল না কিন্তু ধর্মপিপাসার্ত লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে সুধাবর্ষণ করিল। আজিও উত্তর ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া ধর্মে উদার গুজরাত ও কাঠিয়াওয়াড়ে সে গান গীত হয়।

হিন্দুমুসলমানের মিলনের এই চেষ্টা সাধুরা করিয়াছিলেন প্রেমের দ্বারা। আরেক দল চেষ্টা করিলেন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সম্মেলন দ্বারা। তাহা হইতে খোজাদের ধর্ম্মের সৃষ্টি হইল (আগাখান এই দলের ইমাম বা গুরু)। খোজারা শীয়া কিন্তু বিশ্বাস করে যে বিষ্ণু নয়বার পৃথিবীতে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শুধু যেখানে বৈষ্ণবরা বিশ্বাস করে ভবিষ্যৎকালে বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন সেখানে খোজারা বিশ্বাস করে যে আলী (শীয়াদের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম) কল্কিরূপে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মা তাঁহার পুত্র হাসান, তৎপর হুসেন ও বংশানুক্রমে অবতীর্ণ হইয়া আগাখানে আসিয়াছে। আগাখান তাই শুধু পীর বা ইমাম নহেন তিনি সাক্ষাৎ কল্কি। খোজারা তাই কুরান পড়ে না, তাহাদের সর্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ তাহাদেরই এক পীর কর্তৃক গুজরাতিতে লেখা "দশাবতার"। খোজারা জকাত দেয় না—আগাখানকে "দশোন্দ" দেয়, হজে যায় না, আগাখানকে প্রদর্শন করে—তাই তাঁহাকে প্রায়ই বোম্বাই আসিতে হয়। রমজান মাসে উপবাস করে না ও নমাজ পড়ে তিনবার, তাও আরবীতে নয়, হয় কচ্ছী নয় গুজরাতীতে। পাঞ্চরাত্রে যে সব দেব দেবীর উল্লেখ আছে তাঁহাদের নাম উপাসনার সময় স্মরণ করে। বিষ্ণুর নয় অবতারকে বিশেষ ভক্তি নিবেদন করে আর আগাখান ত স্বয়ং বিষ্ণু।

নওসারীর মতিয়া গুজরাতিরাও হিন্দুমুসলমানের একতার চেষ্টার ফল। তাহারা রমদানে উপবাস করে, কিন্তু নমাজ পড়ে না। বিবাহে ব্রাহ্মণকে

ডাকে, কিন্তু মৃতদেহ দাহ করে না, গোর দেয়। সে সময় ডাকা হয় মোল্লাকে। মতিয়াদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচার ব্যবহারের ইতিহাস ও বর্ণনা এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

মালেকানারা রাজপুতরা আধা হিন্দু আধা মুসলমান। একই পরিবারে কাহারো নাম আশরফ উদ্দীন্ কাহারো নাম প্রতাপ সিং। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের ধর্ম্ম নিয়া তামাম হিন্দুস্থানে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

এইবার বাঙলাদেশে ইসলাম কিরূপে প্রকাশ পাইল তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

উর্দু ভাষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতবর্ষে মুসলমানদের ভিতরে দুই চিন্তাজগতের সৃষ্টি হইয়াছিল পূর্বেই বলিয়াছি। উর্দু ফারসীর ন্যায় আরবী শব্দভাণ্ডার গ্রহণ করায় শাস্ত্রালোচনায় তাহার কোনও বিঘ্ন হয় নাই—ইসলামি চিন্তাধারা উর্দুতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছিল। বাঙলাদেশেও এই দুই চিন্তাধারার সৃষ্টি হইল অর্থাৎ (১) উর্দুর দ্বারা কুরান, হদীস, ফিকা ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা ও (২) সুফীমতের প্রসার।

(২) সূফীমত তাহার নানা শাখাপ্রশাখায় কাদেরিয়া, কদমিয়া, নকশাবন্দী নানা সম্প্রদায় এদেশে প্রসার লাভ করিল। বাঙালী সূফীরা জিক্‌র্ বা ভজন করেন, বারম্বার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 'হাল' বা দশা প্রাপ্ত হন, সেতার বা একতারা যোগে মধুর গান করেন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সমাধিস্থ হন। এক কথায় বাঙালী সূফী ইরান ও উত্তর ভারতবর্ষের সূফী ঐতিহ্য সঞ্জীবিত রাখিলেন।

কিন্তু ইঁহাদের প্রভাবে অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুমুসলমানের ভিতর যে রসধারার সৃষ্টি হইল তাহা অপূর্ব ও আধ্যাত্মিক জগতে তাহাদের যে মিলন হইল পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার স্থান পাওয়া উচিত। আউল, বাউল, মুরশীদিয়া, দরবেশী, সাঁই, মরসীয়া, জারীগান, গাজীর গীত সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে উঠিয়াছে তথাপি সে গীতে বাঙালী ভক্তের আধ্যাত্মিক অনুভূতির যে পরিচয় পাই তাহার সহিত কোন দেশেরই—ইয়োরোপের বলুন আর এশিয়ার বলুন—লোক-সাহিত্যের তুলনা হয় না।

এ সম্পদের সম্পূর্ণ আহরণ এখনও হয় নাই। যেটুকু সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার বিশেষ লক্ষণ তাহাতে সর্বধর্মসমন্বয়। তাহারই দুই একটী নিদর্শন দেওয়া গেল।

বেদান্তের আত্মা পরমাত্মার অনন্যতা, মায়াবাদ, মনসুর অল-হল্লাজের "আনা'ল হক" বহু গীতে অতি সরল ভাষায় অভিজ্ঞতার অন্তস্থল হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে ;

আপনার আপনিরে মন না জানো ঠিকানা
পরের অন্তর কেটে সমুদ্দুর কি যে যাবে জানা ?
পর অর্থে পরম ঈশ্বর, আত্মারূপে করে বিহার
দ্বিদল বারামখানা, শতদল সহস্রদল অনন্ত করুণা,
সিরাজ সাঁই বলেরে লালন গুরুপদে ডুবে আপন
আত্মার ভেদ জেনে নে না ;
আত্মা আর পরমাত্মা নিত্য জেনে নে না।

(মতিলাল দাস, বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৪১)

অশিক্ষিত হাসন রাজার তত্ত্বজ্ঞান ও 'স্পর্ধা' দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়

আমি হইতে আল্লা, রসুল আমি হইতে কুল।
পাগল হাসন রাজা বলে তাতে নাই ভুল।
আমি হইতে আসমান জমীন, আমি হইতেই সব
আমি হইতে ত্রিগজৎ, আমি হইতে রব।[১]
আক্কেল হইতে পয়দা হইল মাবুদ আল্লার
বিশ্বাসে করিল পয়দা রসুল[২] আল্লার
মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন
কর্ণ হইতে পয়দা হইছে, মুসলমানী দীন[৩]
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদবয়,
আমি হইতে সব উৎপত্তি হাসন রাজায় কয়।
মরণ জীয়ন নাইরে আমার, ভাবিয়া দেখ ভাই
ঘর ভাঙ্গিয়া ঘর বানানি, এই দেখতে পাই।

(হাছন উদাস, ৮৫)

(১) রব (আরবী)=আল্লা। (২) রসুল (আরবী)=প্রেরিত পুরুষ মুহম্মদ (৩) দীন (আরবী)=ধর্ম।

অক্ষরে না ধরে নাম শ্যাম বিনোদিয়া
দেখ, ভোলা মন আপন ঘরে আছে ছাপাইয়া ॥ [১]
চুরি করো ধারি করো আপনার লাগিয়া
আপনাব নামে আসবে শমন সব যাবে পলাইয়া ॥
আল্লা আদম দুইদম একদম করিয়া
আদমপুবের বাজারে গোলাঘর বাঁধিয়া ॥
সাবাল আলী কহিল মুবশীদ চরণে ধরিয়া
অক্ষরে না ধরে নাম তাই দেও বাতাইয়া ॥

(সৈয়দা হবীব উন-নিসার সংগ্রহ)

"আল্লা" আব "আদম" (মানুষ) আদমপুবে (মানুষেব ভিতবে) গোলাঘর বাঁধিয়া বসিয়া আছেন, সাবাল আলী তাই মুবশীদকে চবণ ধবিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহার পূর্ণ নাম, পূর্ণ স্বরূপ কি ?

সাঙ্খ্য দর্শনের স্থান মুসলমান ধর্মে নাই– ইহুদী ও খৃষ্টানদের মত মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে আল্লা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া তাহাতে আদম ও পরপর মহাপুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন কিন্তু শীয়া ও সূফী বাতিনিয়াবা (ইঁহারা বিশ্বাস করেন কুবানেব এক বাহ্য—জাহির—অর্থ ও আরেক গুহ্য--বাতিন—অর্থ আছে) বলেন যে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আল্লা ও নূর (জ্যোতিঃ) দুই চিরন্তর সত্বা বিরাজিত ছিলেন। সেই নূব আদমে প্রকাশিত হইয়া তাহাব পুত্রে সঞ্চারিত হয়। যুগ যুগ ধরিয়া সেই জ্যোতি নানা মহাপুরুষের ভিতর দিয়া আসিয়া মহাপুরুষ মুহম্মদের পিতামহে দুই অংশে বিভক্ত হয়, তাহার এক অংশ মুহম্মেব উদ্ভাসিত (জাহির) হয় ও অন্য অংশ আলীতে গোপন (বাতিন) থাকে। মুহম্মদের নূব তাঁহার কন্যা ফাতিমাতে যায় ও আলীর ঔরসে ও ফাতিমার গর্ভে যে সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের ভিতর সেই খণ্ডিত নূর সংযুক্ত হয়। বাতিনিয়াব এই বিশ্বাস যে আল্লা-নূর আবাহমান কাল হইতে বিদ্যমান সাঙ্খ্যের পুরুষ-প্রকৃতিতে সাড়া পাইয়াছে—

অপারের কাণ্ডার নবিজী আমার
ভজন সাধন বৃথা গেল নবি না চিনে।

(১) ছাপাইয়া (শ্রীহট্টের ভাষায়) লুকাইয়া।

নবি আউয়াল[১] ও আখির[২]
জাহির ও বাতিন
কোন্ সময় কোন্ রূপ
ধারণ করে কোন্ খানে।

আসমান জমীন জলধি পবন
নবীর নূরে করিলেন সৃজন,
তখন কোথায় ছিল নবীজীর আসন
নবী পুরুষ কি প্রকৃতি আকার।

আল্লা নবী দুটী অবতার
আছে গাছ বীজেতে যে প্রকার,
গাছ বড় না ফলটী বড়,
তাও নাও হে জেনে।

আত্মতত্ত্বে ফাজিল[৩] যে জনা
সেই জানে সাঁইয়ের নিগূঢ় কারখানা,
হলেন রসূলরূপে প্রকাশ রব্‌বানা[৪],
অধীর লালন বলে দরবেশ সিরাজ সাঁইয়ের গুণে।

(মনসুর উদ্দীন, হারামণি, ৪৯)

মুসলমান সৃষ্টিতত্ত্বে বৈষ্ণবের লীলার স্থান নাই কারণ ভগবান মানুষের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার স্তব করিবার জন্য কিন্তু বাঙালী সূফীরা আত্মতত্ত্বে লীলার স্থান দিয়াছেন—

লীলায় নিরঞ্জন আমার
আধ লীলে করলেন প্রচার,
জানলে আপনার জন্মের বিচার,
সব জানা যায়

(মনসুর উদ্দীন, হারামণি, ৫৯)

আর লালনেরই মত পূর্ববঙ্গের কবি সৈয়দ শাহ নূর আপনার শরীরে (ওজুদ) বৈষ্ণব "লীলার কারখানা মৌজুদ" দেখিয়াছেন। তাই উপদেশ দিলেন বৈষ্ণব প্রেমের দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের মোহ কাটাইয়া সত্বরসে পরিপূর্ণ হইতে—তাহাই ফানা।

---

(১) প্রথম। (২) শেষ। (৩) পণ্ডিত। (৪) আমাদের আল্লা।

রসিক চাইয়া প্রেম করিয়ো যার দিন ফানা,
অরসিকে প্রেম করিলে চোখ থাকিতে কানা।
অজুদে মজুদ হইয়া লীলার কারখানা,
সৈয়দ শা নূরে কইল দেখলে তনু ফানা।

(সৈয়েদা হবীব উন-নিসার সংগ্রহ)

শ্রীচৈতন্যের উদার ধর্ম মুসলমান কবির হৃদয় স্পর্শ করিল, 'বিধর্মি' রূপ-সনাতনকে 'ফকীর' উপাধি দিয়া পাঙক্তেয় করিল—

প্রেমের দেশে প্রেমের মানুষ,
জানে তারা আগম নিগম,
প্রেমুন তারা রূপ সনাতন,
ফকির হল ভাই দুজন।

(হারামণি, ৭৯)

পারস্যের সুফী গুরু জলাল উদ-দীন রূমীর প্রভাবই এই সাধকদের উপর সর্বাপেক্ষা প্রসার পাইয়াছিল। মসনবীতে জলাল তোতা কাহিনীর অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন তোতা মরার ভাণ করাতে মনীব তাহাকে পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল, তাহাতে তাহার মুক্তি লাভ হইল। সেইরূপ মৃত্যু আসিবার পূর্বেই যদি মরার মত হইতে পার তবেই তোমার ফানা, মোক্ষ। তাই রূমী বলিলেন গস্‌সালের (মৃতদেহকে যাহারা গোসল দেয়) হাতে মৃতের যে আচরণ তাহাই অভ্যাস কর। বাঙালী সুফী ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন—জীবিতের বেশ তাজ (টুপি) ও তহবন্দ (লুঙ্গি) ত্যাগ করিয়া মৃতের বেশ খিলকা-কাফন গ্রহণ কর, যেন গস্‌সালের হাতে নিজকে সমর্পণ করিয়াছ—

মরার আগে ম'লে শমন জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে সে মরা কেমন, মুরশিদ ধরে জানতে হয়॥
যে জন জেন্দা লয় খেলকা কাফন
দিয়ে তার তাজ তহবন,
ভেক সাজায়॥
মরার আগে মলে শমন জ্বালা ঘুচে যায়॥

(হারামণি, ৯)

দাদূও বলিয়াছেন,

দাদূ মেরা বৈরী মৈঁ মুবা মুঝে ন মারৈ কোই।

"হে দাদূ, আমার বৈরি সেই 'আমি' মরিয়াছে, আমাকে কেহই পারে না মারিতে"। (অধ্যক্ষ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, দাদূ, ১০৯)

কবীরও বলিয়াছেন—

তজ অভিমানা সীখো জ্ঞানা
সতগুরু সঙ্গত তরতা হৈ ॥
কহৈঁ কবির কোই বিরল হংসা
জীবত হী জো মরতা হৈ ?

"অভিমান ত্যাগ কর, জ্ঞান শিক্ষা কর, সদগুরুর সঙ্গে এই সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কবীর কহেন, 'জীবনের মধ্যেই মৃত্যুকে লাভ করিয়াছেন বিরল তেমন সাধক।'" (অধ্যক্ষ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, কবীর ২য় খণ্ড, ১৯ পৃঃ)

সাধনা ও ধ্যানের ক্ষেত্র ব্যতীত লোক-সাহিত্যেও হিন্দু-মুসলমানের অনুভূতি সম্মেলিত হইয়াছে। হাসন-হোসেনের শোকগাথায় কবি রামলক্ষ্মণের অযোধ্যা ত্যাগের হৃদয়বিদারক দৃশ্য স্মরণ করাইয়া শ্রোতার সহানুভূতি জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—

হানেফ বলে আয়রে কোলে জয়নাল বাছাধন
ওরে যে না পথে দিছিরে দুই ভাই জোড়ের হোসেন হাসান
সেই না পথে যাবোরে আমি করো আমার গোর কাফন।
রামলক্ষ্মণ গেছেরে বনে অযোধ্যা ছেড়ে,
এই রকম গেছেরে দুই-ভাই মদিনা শূন্য করে।

(হারামণি, ৮৯)

সাধনার গভীরতম সার্বজনীন সত্য ইঁহাদের হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে উঠিয়াছে। নানাদেশের সাধু নানাকালে যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন মনে হয়, ইঁহারা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাহারই সন্ধান পাইয়াছেন। অন্তরতর যদয়মাত্মা, উপনিষদের বাণী ইঁহাদের মুখে "মনের মানুষ"রূপে বাহির হইল—(রবীন্দ্রনাথ, "হারামণি"র আশীর্বাদ, পৃঃ ৵৹)।

আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা।
অতি নির্জনে বসে বসে দেখছে খেলা।
কাছে রয়ে, ডাকে তারে, উচ্চস্বরে কোন পাগলা ;
ওরে যে যা বোঝে, তাই সে বোঝে থাক্ রে ভোলা।

যে জন দেখে সে রূপ, করিয়ে চুপ রয় নিরালা,
ও সে লালন ভেঁড়োর লোক জানান হরি বলা।

(হারমণি, ১)

তারে কেউ ধরিতে না পারে
সকল রঙ্গের মানুষ একটী থাকে মোর ঘরে ॥
ঘরে থাকে বাইরে থাকে থাকে সে অন্তরে
তার লাগিয়া পাগল হইয়া হাসান রাজায় ফিরে !
রঙ্গ করে ঢঙ করে আরো করে খেলা
সেই মানুষে লাগাইয়াছে ভবার্ণবের মেলা ॥
হাসান রাজা হইছে পাগল দেখিয়া তার লাগি,
তারে যদি ধরতে চাও রাত্রি থাকিয়ো জাগি ॥

(হাছন উদাস, ১৩৮)

"সে দূরে নয়", "সে দূরে নয়", তাই শিরাজ লালনকে বলেন

কে কথা কয়রে দেখা দেয় না,
নড়ে চড়ে হাতের কাছে,
খুঁজলে জনমভর মিলে না।
খুঁজি যারে আকাশ জমিন,
আমারে চিন না আমি
সে বড় বিষম ভ্রমের ভ্রমি,
সে কোন জন আমি কোন জনা ॥
হাতের কাছে হয় না খবর
খুঁজতে গেলাম দিল্লী শহর
সিরাজ কয় লালনরে তোর
তবুও মনের ঘোর গেল না ॥ (হারামণি, ১৭)

তাহারই যেন স্পষ্ট প্রতিধ্বনি গ্যোটের

রারুম ইন ডি ফের্ণে শ্বুয়াইফেন
সী, ডাস গ্ল্যুক লীগট্ সো না
(দূরে দূরে তুমি কেন খুঁজে মরো
শান্তি সে তো হাতের কাছে।)

গুরু প্রশস্তিতে আবার হিন্দু-মুসলমানের ভক্তি স্তোত্র মিলিত হইয়াছে। ইরানি কবি হাফিজ বলিয়াছেন, 'মুরশিদ যদি আদেশ দেন তবে আমি মদ দিয়া আমার জায়নামাজ রাঙা করিব। পূর্ববঙ্গের হিন্দু কবি গাহিয়াছেন :

গুরু জগৎ উদ্ধার
আমারে কাঙাল জানিয়া পার কর।
আকাশেতে থাক তুমি, পাতালে বাস কর
রমণীর রূপ ধরিয়া গুরু, পুরুষের মন হর।
সর্প হইয়া দংশ তুমি, ওঝা হইয়া ঝাড়ো।
বুঝিতে না পারি তোমার মহিমা অপার ॥
ভেবে রাধারমণ বলে এই পারো, সেই পারো,
সকলরে তরাইলায় গুরু, আমারে পার করো ॥

আর পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান কবি গাহিয়াছেন :

মুরশিদের চরণ সুধা		পান করিলে যাবে ক্ষুধা
করো না দেখে দ্বিধা		যেহি মুর্শিদ, সেহি খোদা।
আপনি খোদা আপনি নবি,		আপনি সে আদম ছবি
অনন্তরূপ করে ধারণ,		কে বোঝে তার নিরাকরণ
নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন মুর্শিদ রূপ ভজন পথে।

(ম, দাশ, বসুমতী, ১৩৪১)

(১) উর্দুর মারফতে মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের চর্চা।

মুসলমানেরা বাঙলা দেশে দেশজ ভাষার কাঠামো লইয়া উর্দু জাতীয় কোনও নূতন ভাষা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করে নাই। তাহার প্রধান কারণ আরবী-ফারসী-বর্জিত তৎকালীন উর্দুর কাঠামো ও বাঙলার কাঠামোতে তফাৎ অতি অল্প ছিল অর্থাৎ বাঙালী মুসলমান অনায়াসে সাধারণ উর্দু শিখিতে পারিত। দ্বিতীয়তঃ তখনকার দিনের বাঙলা দেশের মুসলমান ঔপনিবেশিকদের অধিকাংশ ছিলেন উর্দু ভাষাভাষী, তৃতীয়তঃ বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র ছিল দিল্লী, রামপুরের আশেপাশে, সে সব জায়গায় মিডিয়ম অব ইনস্ট্রক্‌শন্ ছিল উর্দু।

কোন চেষ্টা হয় নাই বলা ভুল কারণ অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে বিস্তর ইসলামি ধর্মগ্রন্থ বাঙলাতে প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলিতে আরবী ফারসী শব্দের প্রাধান্য। কিন্তু প্রধানতঃ অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য লিখিত বা গীত

হইয়াছিল বলিয়া সেগুলি ঠিক ইসলামি শ্রুতি, স্মৃতি বলা চলে না, তাহাদের ধরণ অনেকটা পৌরাণিক। নানারকম গল্পগাথাও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রসার পূর্ব বাঙলায় এখনও আছে।

আরেক চেষ্টা হইয়াছিল শ্রীহট্টাঞ্চলে। সে ভাষাকে 'সিলটী নাগরী' বলা হয় ও এখন জীবন্মৃতাবস্থায়। তাহার প্রধান লক্ষণ যে তার হরফ দেবনাগরী নয়, বাঙলাও নয়, মাঝামাঝি ; ই কার উ কারে হ্রস্বদীর্ঘ নাই ; ঔ কার ঐ কার নাই, এক শ-তে তিন শ-এর কাজ চালায়, অন্ত্যস্থ য নাই, সংযুক্ত বর্ণ বিলকুল নাই, পাঁচ রকম অনুনাসিকের বালাই নাই আর শব্দের ভাণ্ডারে আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, উর্দু ও খাস সিলেটী শব্দের আন্তরিক দহরম মহরম।

কিন্তু এই সব চেষ্টার সঙ্গে মুসলমান পণ্ডিতমণ্ডলীর যোগাযোগ ছিল না—তাঁহারা উর্দুর মারফতে শাস্ত্র চর্চায় মশগূল—, তাই উর্দুজাতীয় কোন সবল ভাষার সৃষ্টি হইল না।

তাহারি ফলে আজ বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতির ও শিক্ষার দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। এ দ্বন্দ্ব বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত মুসলমান বলিলে আরবী, ফারসী, উর্দু শিক্ষিত মুসলমানকে বুঝাইত। তাঁহার শিক্ষা দীক্ষায় কোনও দ্বন্দ্ব ছিল না ; তিনি বাঙলা জানিতেন না অথবা এত অল্প জানিতেন যে হিন্দু-চিন্তাধারা তাঁহার ইসলামি জগতে প্রবেশ করিত না। আরব, পারশ্য, উত্তর ভারতবর্ষের ইসলামি চিন্তা ও ভাব জগতের সঙ্গে তাহার যোগসূত্র ছিল।

বিংশ শতাব্দীতে কলহের সৃষ্টি হইল। হিন্দু সমাজেও এ কলহ ক্ষণস্থায়ী-রূপে তাহার পূর্বে দেখা দিয়াছিল। সে যুগে পিতা ছিলেন ইংরিজি অনভিজ্ঞ খাঁটি হিন্দু, পুত্র ইংরাজি শিক্ষিত 'নাস্তিক'। পিতার পশ্চাতে হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্য, পুত্রের পশ্চাতে মিল, কঁৎ আর ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস। আজ পিতাপুত্র উভয়ই ইংরিজি শিক্ষায় গঠিত—কষ্টেসৃষ্টে হয়ত মেঘদূত পড়িতে পারেন—আর পণ্ডিত হইলেও ভেনিস ষ্টেশনে মুর্গী খান ও লাল মদ্য 'খাদ্য' হিসাবে গ্রহণ করেন ; কলহের অবসান হইয়াছে। মুসলমান সমাজে এই দ্বন্দ্ব আজ উগ্র মূর্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের ধর্মের প্রতি টান বেশী—মধুসূদন, লালবিহারী, কৃষ্ণমোহনের দৃষ্টান্ত মুসলমান সমাজে নাই—তাই পিতার তিরস্কারে পুত্র লজ্জিত হয়, বিদ্রোহ ঘোষণা করে না। পিতা বলেন "আরবী ফারসী জানো না, ধর্মকর্ম ভুলিয়া গিয়াছ।" পুত্র ভাবিয়া দেখে

হক্‌ কথা, দোষ দেয় তাহার শিক্ষাকে—ইসলামি কায়দায় কেন সে শিক্ষিত হইল না। ইহার পর দ্বন্দ্ব আরও কঠোর হইল। ভারতবর্ষের মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে। সিকন্দর হায়াত বাঙলা দেশে আসিয়া উর্দুতে বক্তৃতা দেন, দাওয়াতে-খানা-পিনাতে উর্দু বলেন, ফারসী বয়েত ঝাড়েন, আরবী কোটেশন ঠোকেন, তাঁহাদের সঙ্গে মৌলানা আকরম অক্লেশে কথা বলেন, কলিকাতার দুই একজন ঔপনিবেশিক উর্দু বলিয়া লজ্জা রক্ষা করেন কিন্তু কলেজে শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান নেতা তখন ভাষণ না করিয়া শোভা পাইবার চেষ্টা করেন। যদিবা কষ্টেসৃষ্টে কথার স্রোত ঘুরাইয়া ইংরিজি জমির উপর দিয়া চালান তখন ধরা পড়ে মুসলমান কৃষ্টিতে তাঁহার অভ্রভেদী, পাতালস্পর্শী অজ্ঞতা। বীরের তুলনা দিতে গেলে তাঁহার মনে ভীষ্মার্জুন, প্রেমিক প্রেমিকার কথা বলিতে গেলে রাধাকৃষ্ণ, দার্শনিকের নাম করিতে শঙ্কর-রামানুজ। হাসন-হোসেন, লায়লী-মজনু, ইবনি সিনা-গজ্জালীর নাম শুনিয়াছেন—পরিচয় নাই। ব্যাপার আরও মর্ম্মন্তুদ হয় ঐ বাঙালী মুসলমান নেতারই পলিটিক্‌স্‌-ইকনমিক্‌স্‌-সোসিয়লজি-লীগ-কংগ্রেস অনভিজ্ঞ "ওল্ড্‌ফেশন্‌ড্‌" পিতা যখন মজলিসে উপস্থিত হইয়া অক্লেশে উর্দু বলেন, সিকন্দরের বয়েত শুনিয়া "শাবাশ্‌" বলেন, কায়দা মাফিক উল্টা বয়েত ঝাড়েন।

উর্দু বলিতে পারা বাঙালী মুসলমানের চরম মোক্ষ নহে। উর্দু না বলিয়াও মুসলমান সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রাখা সম্ভব; যেমন আজ সংস্কৃত না জানিয়াও হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে মোটামুটি সম্বন্ধ রক্ষা করা যায়। সংস্কৃতে লিখিত হিন্দু সভ্যতার প্রায় সব প্রধান গ্রন্থ বাঙলাতে তর্জমা হইয়াছে, বিস্তর টিকাটিপ্পনি ও নূতন কেতাব লেখা হইয়াছে। 'বসুমতী,' 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসীর' পিয়েস দ্য রেজিজ্‌স্‌তাঁস এখনও গুরুগম্ভীর বৈষ্ণবতত্ত্ব, তান্ত্রিক মতবাদ বা উপনিষদের জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। এ সমস্ত বাঙালী হিন্দুর মাতৃভাষায় লেখা, তাহার সঙ্গে পরিচয় থাকিলে সে অনায়াসে পুনাতে হিন্দুমণ্ডলীর ভিতরে বসিতে পারে—যদিও তাহার পক্ষে সেখানে সংস্কৃত উচ্চারণ (জার্গ্‌বল্ক!) না করাই প্রশস্ত। কিন্তু বাঙলাতে মুসলমানদের সেরকম কিছু নাই।

সংস্কৃতির এই দ্বন্দ্বে যে শুধু বাঙালী মুসলমানই দিশাহারা হইয়াছে তাহা নহে—উত্তর ভারতবর্ষের উর্দু ভাষাভাষী হিন্দুরাও এই বিপদে সগোত্র। তেজবাহাদুর কিসনের বান্‌সরী মাত্রই শুনিয়াছেন, জওয়াহির লাল বৃহৎ তকলীফ করিয়া হিন্দী লেখা মকশো করিয়াছেন কিন্তু পিতা মোতিলাল এসেমব্লিতে গালাগাল

দিতেও “মন তুরা হাজী মীগুয়্যম, তুমরা কাজী বগো” বলিয়াছেন। ইঁহাদের সমস্যার কিন্তু সমাধান আছে, উর্দু না শিখিয়া হিন্দী শিখিলেই বাঙালী হিন্দুর মত হিন্দু সংস্কৃতির সহিত সংযুক্ত হইবেন।

কিন্তু বাঙালী মুসলমান যায় কোথায়?

উত্তর হইতে পারে—

(১) হিন্দু মুসলমান দুই সংস্কৃতি বাদ দিয়া শিক্ষা লাভ করো; উত্তরে নীচ্‌শে সাহেব বলিয়াছেন নেম্‌ট্‌ নূর ডি প্রীষেন, সাম্‌ট্‌ ডের ফিলোসফী উনট্‌ ডের কুন্‌স্‌ট্‌ বেক্: অন বেলেধর লইটর বল্‌ট্‌ ঈর নথ্ ত্‌সুর বিলডুন্‌ক্ এম্‌পর্‌ষ্টাইগেন?” টিপ্পনি অনাবশ্যক, দুই মই-ই যদি কাড়িয়া লওয়া হয় তবে বাঙালী মুসলমান চড়িবে কোথায়

দ্বিতীয় উত্তর হইতে পারে বাঙলার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া উর্দু শিখা। কিন্তু সে অসম্ভব। যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের উর্দু হিন্দীর ন্যায় বাঙলা দেশে উর্দু বাঙলার নূতন সমস্যা সৃষ্টি করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না।

তৃতীয় উত্তর হইতে পারে বাঙলাতে মুসলমান সংস্কৃতির আলোচনা ও সাহিত্য-সৃষ্টি—হিন্দুরা যেরূপ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা বাঙলাতে গত একশত বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন। ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য অত্যধিক বাক্যব্যয় না করিলেও চলিবে। মাতৃভাষাতে ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোচনা না করার বিষময় ফলের চমৎকার দৃষ্টান্ত পশ্চিম ভারতবর্ষের পার্সী সমাজ। মাতৃভাষা তাহাদের গুজরাতি। অধিকাংশ পার্সীই মাতৃভাষা ভালো করিয়া জানে না ও গুজরাতিতে পার্সী ধর্ম ও সংস্কৃতির পুস্তক সংখ্যা নগণ্য। ফলে পার্সীরা সংস্কৃতিহীন—অনুকরণশীল।

মুসলমানি যুগে তাহারা মোগলাই খানা খাইয়াছে, ফারসী ভাষা শিখিয়াছে, কিন্তু কোনও সাহিত্য সৃষ্টি করে নাই। গত একশত বৎসর ধরিয়া তাহারা ইংরিজি কায়দায় উঠে বসে ও খাঁটি অক্‌স্‌ফোর্ডী উচ্চারণ করিতে পারা চরম মোক্ষ বলিয়া ধরিয়া নিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে ধর্মে সঙ্কীর্ণতা এবং তাহার প্রধান কারণ ধর্মালোচনার সুবিধা মাতৃভাষাতে নাই বলিয়া। পার্সী বাল্যকাল হইতে ধর্ম বলিতে বোঝে কয়েকটি ক্রিয়াকাণ্ড। হিন্দুর মত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের আদর্শ ও ত্যাগের আবহাওয়ায় গড়িয়া উঠে না। এই অজ্ঞতাই তাহাকে ধর্মের রাজ্যে অন্ধ করিয়া তোলে,—ভাবে যাহা জানা নাই তাহা চক্ষু বন্ধ করিয়া মানিয়া লওয়াই প্রশস্ত। তাই সেদিন যখন এক পার্সীর

উইলের কথা জানাজানি হইয়া গেল যে তিনি মৃত্যুর পরে যেন তাহার দেহ টাওয়ার অব সায়লেন্সে না রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন তখন তামাম পার্সী সমাজ হুঙ্কার দিয়া উঠিল—তাহার নাপিত ধোপা বন্ধ করিয়া দিল। প্রতিবেশী ইসমাঈলীয়া শীয়া বোহরা সমাজেরও ঐ অবস্থা। জাতে মুসলমান, মাতৃভাষা গুজরাতি, সে ভাষাতে মুসলমানী কিছু নাই। তাহাদের মত ধর্মে অজ্ঞ ও তাহারই ফলস্বরূপ ধর্মে অন্ধ জাতি পৃথিবীতে কম। আরবীতে লেখা তাহাদের বহু প্রাচীন ধর্ম পুস্তক 'মোটা-মোল্লাজী'র বাড়ীতে পোকায় কাটিতেছে। ইংরিজি ও আরবী শিক্ষিত এক বোহরা যুবক তাহারই একখানি মুদ্রণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভদ্রলোকের নাকের উপর সমাজ তাহার দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে এ সাহিত্য রচনা করিবে কে? যাঁহারা ভালো বাঙলা জানেন তাঁহারা ইসলাম চিনেন না, যাঁহারা ইসলামের পূর্ণ সংস্কৃতির খবর রাখেন তাঁহারা বাঙলা জানেন না। কাজেই এই ব্যাপক সাহিত্য একদিনে গড়িয়া উঠিতে পারে না—বহু লেখকের, বহু দিবসের, বহু তপস্যার প্রয়োজন। এই সব লেখকের নির্মাণ করিব কি করিয়া? শিক্ষাপ্রণালীর সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া—অর্থাৎ বাঙালী মুসলমানকে সনাতন বাঙলা শিখিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের পূর্ণ সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইতে হইবে। কেহ কেহ হয়ত আপত্তি জানাইয়া বলিবেন "শিক্ষা দ্বিখণ্ডিত হইবে"। তাহাতেও ভীত হইবার কারণ নাই—সুইজারল্যাণ্ডে (ও নাৎসি অবতরণের পূর্বে জর্মনীতে ও এখনও কিয়ৎ পরিমাণে) বহু বালকবালিকা প্রটেস্টনট্ ও ক্যাথলিকদের জন্য বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক স্কুলে যায়। দুই বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন এক, শুধু ধর্মশিক্ষা স্বতন্ত্র। বিশ্ববিদ্যালয়েও ক্যাথলিক থিয়লজি ও প্রেটেস্টনট্ থিয়লজির দুই বিভাগ। সেখানে শুধু ধর্ম্ম শিক্ষা হয় না, ছাত্রেরা ক্যাথলিক ও প্রটেস্টনট্ স্ব স্ব সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হয়। অথচ পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে এমন কোন বিচ্ছেদ এ যাবত হয় নাই যাহার জন্য এ শিক্ষা নিন্দার কারণ হইয়াছে। তর্ক উঠিতে পারে, দৃষ্টান্তটী ঠিক হইল না কারণ প্রটেস্টনট্ ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পার্থক্য হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য অপেক্ষা কম। সত্য আজ কম কিন্তু মধ্য যুগে এই দুই সাম্প্রদায় শুধু ধর্মের জন্য যে রক্তারক্তি করিয়াছে ভারতবর্ষে সেইরূপ তাণ্ডব নৃত্য কখনও হয় নাই; অথচ শিক্ষার দিক দিয়া আমরা ত এখনও মধ্যযুগে।

আমাদের বক্তব্য এই, মুসলমানকে ধর্মে ও সংস্কৃতিতে অজ্ঞ রাখিলে ক্রমে ক্রমে সে উদার হইবে এ আশা দুরাশা। সে তাহার ধর্ম ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় পুষ্ট হউক, বাঙলা সাহিত্য ও হিন্দু কৃষ্টির সঙ্গে সংযুক্ত থাকুক, তবেই সে উদার হইবে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথে অগ্রসর হইবে।

রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন "মানব সংসারে জ্ঞানালোকের দেয়ালি উৎসব চলিতেছে; প্রত্যেক জাতি আপন বাতি উঁচু করিয়া ধরিলে এই উৎসব সমাধা হইবে।"

পুস্তকাবলী :—(১) মৌলবী মনসুরউদ্দীন, 'হারামণি' ;
(২) অধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহন সেন, ; দাদু' 'কবীর'।

নতুন বাসা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শীর্ণ কঙ্কালসার বেড়ালছানাটা পাশের নর্দ্দামা থেকে সারা গায়ে কাদা মেখে কোন মতে রাস্তার ধারে উঠে এসে কাতরভাবে ডাকছে। গলা তার অবশ্য এখন অত্যন্ত ক্ষীণ—একেবারে থেমে যাবার আর দেরী নেই।

অমল নোংরা সরকারী কলতলার পাশ দিয়ে সরু গলিটায় ঢোকবার আগে এক মুহূর্ত্তের জন্যে বুঝি একটু থমকে দাঁড়ায়। গত দুই রাত বেড়াল ছানাটা বড় জ্বালিয়েছে—কোথা থেকে কে ছানাটাকে এই নর্দ্দামায় ফেলে দিয়ে গেছল কে জানে—সারা দিনরাত তার কাতর একঘেয়ে ডাকে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

কিন্তু অমলের অস্বস্তিটা শুধু বিরক্তির দরুণ নয়, মনের কোথায় একটা অক্ষমতার গ্লানিও যেন তাকে বিঁধেছে। সেটা আমল দেবার জিনিষ নয় অমল বুঝেছে—একটা আধমরা নোংরা বেড়াল ছানা, অমল তার কি করতে পারে। কিছু করতেই বা তাকে হবে কেন? যতই কাতর ভাবে সেটা চেঁচাক, তাকে বাঁচান ত আর অমলের দায় নয়!

নর্দ্দামার ধারের জানলাটা ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়ে অমল কাল রাত্রে শুয়ে পড়েছিল। তাকে ঘুমোতে হবেই। সকাল থেকে তার অনেক কাজ। কিন্তু তবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম কিছুতেই আসেনি।

বেড়াল ছানাটার দিকে একবার তাকিয়েই অমল আবার হনহন ক'রে এগিয়ে যায়। একটা আধমরা বেড়াল ছানার কথা ভাবলে তার চলবে না।

বাইরের দরজাটা ঠেলে উঠোনে পা দিতেই পিসিমা চেঁচিয়ে ওঠেন—হ্যাঁরে, ক'টা মুটে আর একটা গরুর গাড়ী ডাকতে এই এত দেরী! কখন জিনিষপত্র তোলা হবে, আর কখনই-বা সেখানে গিয়ে ঘর-দোর গুছোব!

গরুর গাড়ী পাইনি, একটা লরী ঠিক করে এসেছি—ব'লে অমল উঠোন পার হয়ে তাদের দিকের রকে গিয়ে ওঠে।

লরী!—পিসিমা প্রথমটা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান, লরী—সে যে অনেক ভাড়া!

অনেক ভাড়া নয়! তোমার এই রাজ্যের মাল ত আর একটা গরুর গাড়ীতে হ'ত না—লরীতে এক খেপেই হয়ে যাবে, তাড়াতাড়িও হবে!—দুটো টাকা বেশী তাতে লাগলই বা।

অন্যদিন হ'লে পিসিমা বোধ হয় এত সহজে প্রবোধ মানতেন না। দুটো টাকা যে কতখানি, কতদিক সামলে কি পরিশ্রমে, কি ভাবে দুটো টাকা যে তাঁকে সংসারে সঞ্চয় করতে হয়, কি সামান্য আয় থেকে কি ভাবে তিনটি অনাথ ভাইপোকে তিনি মানুষ ক'রে তুলেছেন, সমস্ত সুদীর্ঘ ইতিহাসই হয়ত অমলকে শুনতে হ'ত। কিন্তু আজ তাঁর মেজাজটা অত্যন্ত প্রসন্ন, তিনি একটু উদারভাবেই বলেন,—তা বেশ করেছিস, তাড়াতাড়ি গিয়ে ওঠা যাবে ত'!

পাশের ঘরের ভাড়াটেদের বৌ মানদা কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা টেনে, এঁটো বাসন-কোষন হাতে নিয়ে কলতলায় যেতে একটু কৌতূহলভরে থেমে দাঁড়িয়েছিল, তাকে উদ্দেশ ক'রে পিসিমা বলেন—গরুর গাড়ীর যা ঢিমে চাল—সেই এবেলা আর ওবেলা, তাতে কি আর আজকের মধ্যে ঘর-দোর গুছোন হ'ত। যেমন তেমন দুটো খুপরি ত নয়, যে এখানকার মত জিনিষ-পত্র ঠাসাঠাসি ক'রে রাখলেই হবে—পাকা ঘর, অঢেল জায়গা, ভালো ক'রে একটু গুছিয়ে না বসলে পাড়াপড়শী বলবে কি!

নতুন ভাড়া করা বাসার গুণ বর্ণনা একবার সুরু হলে আর শেষ হবে না জেনে মানদা তাড়াতাড়ি সরে পড়ে। এ কয়দিন পিসিমার কাছে নতুন বাসার বর্ণনা সবিস্তারে শুনতে এ বাড়ীর কোন ভাড়াটের বাকী নেই। সে যে এমন টিনে ছাওয়া কাঁচা গাঁথুনীর পাঁচ ভাড়াটে একত্র করা বাড়ী নয়, দস্তরমত ভালো রাস্তায় ভদ্র পাড়ায় একখান আলাদা পাকা বাড়ী,—তার আশে পাশে এমন নোংরা নর্দ্দামা যে নেই—যত রাজ্যের উড়ে খোট্টা ছোটলোকের সঙ্গে সেখানে যে সরকারী কলতলায় জল নিতে যেতে হয় না, ইত্যাদি সকল সংবাদই তারা পেয়েছে।

পিসিমার কাছে বাড়ী বদল একটা বাহাদুরীর ব্যাপার,—প্রতিবেশীদের একটু ঈর্ষ্যা, একটু বিস্ময় জাগাতে পেরেই তিনি সুখী। কিন্তু অমলের কাছে সত্যিই এই বাড়ী বদল একটা মুক্তি—একটা পরিত্রাণ!

এই আবেষ্টনের মধ্যেই সে মানুষ হয়েছে সত্য, কিন্তু তবু এখানে সে হাঁপিয়ে ওঠে, এর চেয়ে বিস্তৃত মুক্ত জীবনের স্বাদ তার মনে আছে।

তাদের তিনটি অনাথ ভাইকেই পিসিমা কোন রকমে মানুষ করেছেন। ভাইএরা সাবালক হ'তে না হ'তেই কাজে ঢুকেছে, তাদের রোজগারে ও পিসিমার

হিসাবী পরিচালনাতেই এ সংসার দিন দিন উন্নতি করেছে। অমলকে তাই আর পড়াশুনা ছেড়ে অল্প বয়সে রোজগারের চেষ্টা করতে হয়নি, সে কলেজে পড়ে।

একটি ছোট খুপরীর মত ঘর তার জন্যে এ বাড়ীতে নির্দ্দিষ্ট। একটি প্রমাণ তক্তপোষেই ঘরটি জুড়ে যায়, জামা কাপড়ের আলনাটা থেকে কাপড়-চোপড় তার বিছানার ওপরই ঝুলে থাকে। বই কাগজ রাখবার একটা চৌকি আছে এক পাশে। পড়াশুনা তাকে তক্তপোষের ওপরে করতে হয়।

ঘরে একটি মাত্র জানলা। পেছনের খোলা নর্দ্দামার দুর্গন্ধের দরুণ সেটা অধিকাংশ সময়েই বন্ধ রাখতে হয়। দুর্গন্ধ যখন না আসে তখনও নিস্তার নেই। পাশের বাড়ীর একটি কলহপ্রবণ দম্পতীর প্রতিদিনের ঝগড়া লেগেই আছে।

নতুন যে বাড়ীতে তারা উঠে যাচ্ছে, সেখানে একটি চমৎকার ঘর সে নিজের জন্যে ঠিক ক'রে নিয়েছে। দোতালার ওপর প্রকাণ্ড বড় বড় দু'টি জানলা সমেত ঘর। একদিকের জানলা দিয়ে আবার পাশের বাড়ীর সাজান একটি বাগান পেরিয়ে কাদের রাস্তাটুকু দেখা যায়।

সে ঘরটুকুই যেন এই দুঃসহ আবেষ্টন থেকে মুক্তির প্রতীক। অন্ততঃ সে ঘরে গভীর রাত্রে দেয়াল ভেদ ক'রে পাশের কুঠুরির অসহায় মেয়ের রুদ্ধ কান্না ত' শোনা যাবে না।

পাশের ঘরের এই চাপা কান্নায় কতদিন তার ঘুম ভেঙে গেছে গভীর রাত্রে। এ যেন কোন একজন বিশেষ মানুষের নয়, সমস্ত নোংরা দরিদ্র দুর্ব্বল বস্তিটারই রুদ্ধ আক্ষেপ।

কান্না যেদিন বাড়ে সেদিন এখানে অস্থিরভাবে তাকে পায়চারী ক'রে বেড়াতে হয় নিজের ঘরে। কি করতে পারে সে! কিছুই না। পৃথিবীতে এত অবিচার এত দুঃখ এত শোক—তার তা নিয়ে অস্থির হয়ে লাভ কি!

কার বেকার স্বামী দেনার দায়ে স্ত্রী-পুত্র ফেলে পলাতক হয়েছে, কোন্ হতভাগিনী সারাদিন মুখ বুঁজে পরের বাড়ী দাসীগিরি ক'রে কোনমতে ছেলে-মেয়ের মুখে অন্ন দেবার চেষ্টা করে, গভীর রাত্রে নির্জ্জনে নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারে না—তা নিয়ে তার মাথা ঘামাবার কি দরকার।

মেয়েটিকে সে দিনের বেলায় ভালো ক'রেই দেখেছে। প্রতিবেশী হিসেবে ভাল ক'রেই তাকে জানে। অত্যন্ত ঝাঁজালো তার মুখ,—তার দিনের বেলার সে উগ্র চেহারা দেখে মনে হয় না গভীর রাত্রে তার কণ্ঠ থেকে অমন কাতর কান্না বা'র হতে পারে।

হয়ত নিষ্ঠুর পৃথিবীর সামনে এই মুখোস তুলে ধ'রে মেয়েটি ভালোই করেছে। কিন্তু এই মুখোস দিয়েই সে পার পেয়ে যাবে কি! এ বাড়ীর লোকেরা তার সম্বন্ধে বলাবলি করে—তার চাল-চলন নাকি ভালো নয়।

হবেও বা। কিন্তু কি দরকার তার এ সব দুর্ভাবনার। সে এই আবেষ্টন থেকে সরে যেতে চায়—যেখানে এসব ভাবনা তার দরকার হবে না—

—যেখানে প্রতিদিন বাড়ীর দরজা দিয়ে বা'র হ'তে রুগ্ন অবিনাশের সঙ্গে দেখা হবে না।

লাঠিটায় ভর ক'রে প্রতিদিন সকালে প্রৌঢ় অবিনাশ গলিটার মুখে পৈঠেটার ওপর গিয়ে বসে হাঁপায়। তার বেশী তার যাবার ক্ষমতা নেই।

কলেজে যাচ্ছ বুঝি অমল—ব'লে অবিনাশ কাশতে থাকে।

অমলের সত্যি এই রুগ্ন লোকটার পাশে দাঁড়াতে কেমন একটা অস্বস্তি হয়। কি রোগ তার কে জানে।

কিন্তু তবু তাকে দাঁড়াতে হয়।

অবিনাশ কাশি থামিয়ে বলে,—তোমার সেই ডাক্তারের কাছে আর ত নিয়ে গেলে না ভাই!

অমল একদিন তার দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে নিজে থেকেই এ প্রস্তাব করেছিল। তার পর আর সময় হয়নি।

অমল নিজের ত্রুটিটাকে চাপা দেবার জন্যেই বলে—আপনাকে নিয়ে গিয়ে লাভ কি বলুন, আপনি ত অত্যাচার ছাড়বেন না। অত কুপথ্যি করলে রোগ সারে?

কুপথ্যি, বল কি অমল! আমার মেয়েটা বুঝি লাগিয়েছে।—অবিনাশের কাশির বেগ অত্যন্ত বেড়ে ওঠে। অমলকে ধৈর্য্য ধ'রে তবু দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

অনেক্ষণ পরে নিজেকে সামলে অবিনাশ বলে—পথ্যিরই পয়সা জোটে না তা কুপথ্যি করব কোথা থেকে বল!

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, অমল জানে।

আচ্ছা এবার ঠিক নিয়ে যাব। বলে সে চলে যাবার উপক্রম্ করতেই অবিনাশ তার জামার প্রান্তটা নোংরা জীর্ণ আঙ্গুলে ধ'রে ফেলে।

একটু ভালো ওষুধ হ'লেই আমার এ রোগ সেরে যায়, প্রেসের চাকরীটা এখনো তাহ'লে করতে পারি। আমায় না হয় একটা হাসপাতালেই ব্যবস্থা ক'রে দাওনা ভাই।

হাসপাতালে কি সহজে যাকে তাকে নিতে চায়।—অমল জামার প্রান্তটা একরকম জোর ক'রে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু অবিনাশ নাছোড়বান্দা। এবার গলা যথাসাধ্য নামিয়ে আসল প্রস্তাবটা সে ক'রে ফেলে,—চারটে খুচরো পয়সা তোমার কাছে হবে ভাই। আমি কালই দিয়ে দেব।

অমলের কাছে কলেজে যাবার ট্রাম ভাড়ার বেশী পয়সা সত্যিই থাকে না। পিসিমা সে দিকে অত্যন্ত সাবধানী। তবু অবিনাশের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই সে চারটে পয়সা তাড়াতাড়ি বা'র করে দেয়। হপ্তা খানেক অন্ততঃ অবিনাশ আর তাহ'লে তাকে বিরক্ত করবে না সে জানে। এক হপ্তাই বা তার আর পরমায়ু।

রাস্তায় বেড়িয়ে প'ড়ে অমলের মনে হয় রাস্তার কলে হাতটা ধুয়ে ফেল্লে হয়। পয়সা দেবার সময় অবিনাশের ঘর্ম্মাক্ত ভিজে ঠাণ্ডা হাতটার স্পর্শ লেগে কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ হ'তে থাকে।

কিন্তু অমলের হাত ধোয়াও হয় না। কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হয়। নিজের সম্বন্ধে কেমন একটা লজ্জা।

* * * *

লরীতে সমস্ত মাল বোঝাই ক'রে অমলই সবার শেষে এ বাড়ী ছেড়ে যায়। পিসিমা আর সকলের সঙ্গে ঘর দোর গুছোবার জন্যে আগেই নতুন বাসায় গিয়ে উঠেছেন।

শেষ মালপত্র তুলে, বোঝাই করা লরীর ড্রাইভারের পাশের সীটে উঠে ব'সে সে হুকুম দেয়, 'চালাও'।

পিছন ফিরে আর সে তাকাতেও চায় না। এখানকার কোন ভাবনা তার মনে অস্বস্তি যেন না জাগায়, তার নতুন পাওয়া মুক্তির অনুভূতি যেন ক্ষুণ্ণ না করে।

আসবার সময় সকলের কাছে সে নেহাৎ আলগাভাবে বিদায় নিয়ে এসেছে।

সকলের সঙ্গে অবশ্য দেখা হয়নি। দিনের বেলাকার মুখোস খুলে গভীর রাত্রে যে মেয়েটি লুকিয়ে কাঁদে, সে তখন সম্ভবতঃ নিজের কাজের ধান্দাতেই বাড়ী ফেরেনি। শুধু রুগ্ন অবিনাশ মানা সত্ত্বেও জোর ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে গলির মুখ পর্য্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে চার আনা পয়সা ধার চেয়ে নিয়েছে, ডাক্তার দেখাবার কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতেও ভোলেনি।

অমল কোন উত্তর দেয়নি। সত্য মিথ্যা কোন উত্তরই সে আর দিতে চায় না। এখানকার সঙ্গে সকল সম্পর্ক তার শেষ। এ আবেষ্টন থেকে সে মুক্তি পেয়েছে এইটুকু শুধু সে মনে রাখতে চায়।

এ ভাড়াটে বাড়ীর জীবনযাত্রা আবার এমনি ক'রেই চলবে সে জানে। তাদের খালি করা ঘরে আবার আর কোন দুঃস্থ পরিবার এসে কালই হয়ত আশ্রয় নেবে···কি দরকার এ সব ভাবনার—ভেবে সে কিছু করতে পারে।

লরীতে ষ্টার্ট দেওয়া হয়। সশব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে লরীটা যাত্রা করবার সঙ্গে সঙ্গে অমলের দৃষ্টি হঠাৎ আপনা থেকে রাস্তার ধারে গিয়ে পড়ে।

কাদামাখা বেড়াল ছানাটা কখন সেখানে ম'রে প'ড়ে আছে।

ইংরাজি সাহিত্য

বর্তমান যুগে সাহিত্যের প্রসার বিস্ময়কর। দুশো বছর আগেও কোন বিশেষ ভাষার সাহিত্যের বিষয় বিস্তৃত আলোচনা কঠিন হলেও অসম্ভব মনে করা চলত না—বাংলা সাহিত্যের গত পঞ্চাশ বৎসরের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের হয়তো মনে আছে যে তখনকার দিনে অনেকেই হয়তো বলতে পারতেন যে উল্লেখযোগ্য বাংলা বই একখানিও আমার অপাঠ্য নেই। আজ কিন্তু বাংলা সাহিত্যসম্বন্ধেও সেকথা বলা কঠিন—বিভিন্ন বিষয়ের সমস্ত বাংলা বই পড়েছেন এরকম লোক খুঁজে পাওয়া একেবারে অসম্ভব না হলেও প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি। ইংরিজি সাহিত্যের বেলায় কিন্তু বোধ হয় জোর ক'রেই বলা চলে যে আজ সেরকম লোক নেই, থাকতে পারে না। কারণ ইংরিজি সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রসার পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায়ও বিস্ময়কর। ডিকেন্স থ্যাকারের যুগেও ইংরিজি সাহিত্যের সমগ্রতার খোঁজ রাখা হয়তো সম্ভব ছিল, কিন্তু আজকের দিনে সে কথা ভাবাও কষ্টকল্পনা।

প্রধানত দুইটী কারণে বর্তমানে সাহিত্যের এ সম্প্রসারণ ঘটেছে। একদিকে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের সংখ্যা অসম্ভবভাবে বেড়েছে, অন্যদিকে মুদ্রনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিপুল পাঠক-সম্প্রদায়কে তুষ্ট করবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পুরাকালে সাহিত্য ছিল অভিজাতের বিলাস সামগ্রীরই অন্যতম, কিন্তু গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদানের স্তরে উঠে এসেছে। এই দুইটী বিপ্লবকারী পরিবর্তনের ফলে নানাদিকে সাহিত্যের পরিধি বেড়েছে। নানা লোকের নানা রুচি, এবং পূর্ব্বে সমাজের কেবলমাত্র একটী স্তরের জন্য যে সাহিত্য রচিত হ'ত, সে সাহিত্যে বৈচিত্র্যের প্রয়োজন এত উগ্র হয়ে উঠেনি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনন্ত পার্থক্যের মধ্যেও শ্রেণী বা স্তরগত মনোভাবের ঐক্য সুস্পষ্ট। তাই অতীত সাহিত্যে বিষয়ের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে ছিল দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য। আজ কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে জটিলতর ক'রে তুলেছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শ্রেণীবিভাগ, এবং তার ফলে সাহিত্যের সে সমদৃষ্টি আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে অসম্ভব। উপন্যাসের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যে এ গণতন্ত্রের অভিযান সুরু হয়েছিল, আজ ছোট গল্প এবং দর্শনবিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের আলোচনার মধ্য দিয়ে সে গণতন্ত্র আরো ঢের বেশী দূর এগিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আরো একটী পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানের সঙ্কোচমান জগতে দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির এবং ভাষার সঙ্গে ভাষার দূরত্ব দিন দিন কমে আসছে, এবং তার ফলে সাহিত্যে কেবলমাত্র একটী দেশের মনীষা প্রকাশ পায় না—পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত মনীষির সৃষ্টিই আজ প্রত্যেক সাহিত্য নিজস্ব ক'রে নিতে চায়।

সাম্প্রতিক জগতে সমাজ ও সাহিত্যের সম্বন্ধ নিয়ে যে আলোচনা, তারও মূল এখানে মেলে। সমাজের আভ্যন্তরীন এবং নিগূঢ় ঐক্য আবহমান কাল থেকেই স্বীকৃত হয়েছে,

কিন্তু মার্কসের বিশেষত্ব এইখানে যে সে ঐক্যকে তিনি বিজ্ঞানসম্মত ও পরীক্ষাসাপেক্ষ রূপ দিয়েছেন। অতীতে সে ঐক্য অনির্ব্বচনীয় সত্তার দাবী করেছে, কিন্তু তার মধ্যে যুক্তি বা বিচারের স্থান ছিল না, অর্থনৈতিক সংগঠনের উপর তার ভিত্তি গেঁথে মার্কস্ অনির্ব্বচনীয়কে প্রামাণ্যের মধ্যে আনবার চেষ্টা করেছেন। সে প্রচেষ্টা যে আমাদের সামাজিক সংস্কারের মূলে নাড়া দিয়েছে, বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতার মধ্যেও তার প্রমাণ মেলে। Harry Kemp সম্পাদিত Left Heresy in Literature and Life'র বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যেও এ ইঙ্গিত তাই স্পষ্ট। বর্ত্তমান যুগে সভ্যতার ভাঙন ধরেছে, নতুন সমাজ সংগঠনের আদর্শ এবং প্রেরণার মধ্যেই তাই আজ সাহিত্যিকের মুক্তি—বামপন্থীদের এই দাবী অপ্রমাণ করবার জন্য যে সমস্ত যুক্তির ব্যবহার, তার প্রয়োগ কিন্তু দুমুখো, কারণ সাহিত্যের সামাজিক প্রয়োজন স্বীকার ক'রে নিয়েই কেম্প প্রমুখ লেখকেরা বামপন্থীদের আক্রমণ করেছেন। প্রচার এবং সাহিত্যের মধ্যে সীমানির্দ্দেশও সর্ব্বত্র সহজ নয়, কারণ অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য সাহিত্যের ভিত্তি এবং সে বৈশিষ্ট্যের মূলে দৃষ্টিকোণের বৈচিত্র্য। বিশেষ দৃষ্টিকোণের সঙ্গে আবেগ মিশলে সাহিত্য এবং প্রচারের মধ্যে কোনটী আত্মপ্রকাশ করবে, বহু ক্ষেত্রে তার একমাত্র বিচারক কালপ্রবাহ।

ফ্রয়েডের Moses and Monotheism-এর মধ্যেও এ নিগূঢ় সামাজিক সত্তার পরিচয় রয়েছে। ইহুদীদের নবী মুসা নিজেই ইহুদী নন—মিশরীয়, এই হ'ল ফ্রয়েডের প্রতিপাদ্য, এবং ইতিহাসের যুগান্তরের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে ইহুদী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সূত্র ফ্রয়েড এই সত্যের মধ্যে খুঁজেছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে শেখান হয় যে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া হিসাবেই মানুষের সৃষ্টি, কিন্তু মানুষের কল্পনায়ই যে ঈশ্বরের কার্য্যকারিতা, সে কথাও সমানই সত্য। তাই মিশরীয় মুসা—তাঁর নামে পর্য্যন্ত ইহুদীত্বের কোন লক্ষণ নেই—সেদিনকার ইহুদীদের সামনে সর্ব্বশক্তিমান একক ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা ক'রে ইহুদী জাতিকেই মহিমান্বিত ক'রে তুলেছিলেন। গৌরবের বোঝা অনেক সময় হয়ে উঠে দুঃসহ, তাই সে বিরাট বোঝা বইতে না পেরে ইহুদীরা করল বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহে মুসা প্রাণ হারালেন, কিন্তু মৃত্যুতেই তাঁর জয় নিশ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। নতুন ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে ইহুদীরা নতুন ক'রে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিল, এবং তাঁকে হত্যা করেছিল বলেই তাঁর প্রতি ভক্তির পরিমাণ হয়ে উঠ্‌ল বেশী। ঈসাকে যে সমস্ত ইহুদী সহজে মেনে নিয়েছিল, তাদের মনোবৃত্তির উপর মুসাহত্যার স্মৃতির প্রভাব কম নয়, কিন্তু মুসা এবং ঈসা দুয়েরই মৃত্যুর মধ্যে ফ্রয়েড খুঁজেছেন আদিম মানবস্মৃতির নতুন তাৎপর্য্য। ফ্রয়েডের মতে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে বর্ত্তমান সমাজ সংগঠনের সুরু, এবং সে বিদ্রোহ নানা ভঙ্গিতে নানান স্তরে আজও বারে বারে আত্মপ্রকাশ করে। সমস্ত মানব সমাজের গভীরতর ঐক্য সন্ধানের সাধনা চিরদিন ফ্রয়েডকে অনুপ্রাণিত করেছে, কিন্তু নতুন বইখানিতে আমাদের সবচেয়ে বেশী স্পর্শ করে ফ্রয়েডের ব্যক্তিগত আবেদন। নাৎসি অত্যাচারে দেশত্যাগী ফ্রয়েড নিজের সমস্ত ভাগ্যবিড়ম্বনার মধ্যেও সত্যের সাধনাকে যেভাবে অব্যাহত রেখেছেন, তার পরিচয় মানুষের ভবিষ্যতে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনে, 'দুঃখের মধ্যেও গৌরব বোধে মন ভরে উঠে। আমাদের অনেক বিশ্বাসে ফ্রয়েড আঘাত করেছেন—বর্ত্তমানেও সে

বিপ্লবী রোগ তাঁর যায়নি, এবং তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে তাঁর স্বজাতি ইহুদীদের কাছে তাঁর প্রতিপাদ্য যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন, স্বদেশ বা স্বজাতি প্রেমের চেয়েও সত্যের দাবী বড়।

হ্যাভেলিক এলিসের মৃত্যুতে এমনি একজন সত্য পূজারীকে পৃথিবী হারিয়েছে। সাহিত্যিক, কবি বা প্রবন্ধকার হিসেবে ইংরিজি সাহিত্যে হয়তো এলিসের স্থান প্রথম শ্রেণীতে নয়, কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদ হিসাবে সে দাবী তিনি করতে পারেন। মৌলিকতার দিকে আমাদের স্বাভাবিক ঝোঁক আছে, এবং তাতে আশ্চর্য্য হবারও বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু হ্যাভেলিক এলিসের কৃতিত্ব এইখানে যে জ্ঞানের বিভিন্ন দিককে সুসংবদ্ধ ক'রে তিনি তাকে সাধারণের গোচর করেছিলেন। সত্যানুসন্ধিৎসা এবং সাহসের জন্যও তাঁর স্মৃতি উজ্জ্বল থাকবে, কারণ তাঁকে যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সে সম্বন্ধে ভাবাই হয়তো আমাদের পক্ষে আজকের দিনে কঠিন। কেবল সামাজিক বাধা এবং ভ্রূকুটী যে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, তা নয়—তারও চেয়ে বেশী বাধা নিজের মনের সংস্কার, এবং সেই সংস্কারের বিরুদ্ধেই তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। আজ যে সামাজিক অনেক সংস্কার ভেঙেছে, তার জন্য হ্যাভেলিক এলিসের দান কম নয়, এবং অন্ততপক্ষে সেই জন্যই তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অজেয় সাহস এবং সমাজের বিভিন্ন দিকের নিগূঢ় ঐক্যবোধ—এই দুটী গুণের কথাই আজকার দিনে বেশী ক'রে মনে পড়বে।

সমাজকে অস্বীকার করতে চাইলেও যে পারা যায় না, James Joyce-এর রচনা বারে বারে তাই প্রমাণ করেছে। জয়েস প্রচলিত ভাষাকে স্বীকার ক'রে নিতে চাননি, প্রতিদিনের ব্যবহারে তাদের আবেদন হয়েছে শিথিল, তাদের মধ্যে আবেগের তীব্রতা শ্লথ। সামাজিক আচারের অস্পষ্টতাই তাতে প্রকাশ পায়, ব্যক্তির প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অনুপমতা প্রকাশের অবকাশ সেখানে নাই, তাই ভাষাকেও তিনি ভেঙেচুরে নূতন নূতন কথা তৈরী ক'রেও নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তা সত্ত্বেও তাঁর রচনার আবেদন সামাজিক, এবং ভাষার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে তিনি পারেননি। ইউলিসিসে সামাজিক ঐক্যবোধ আরেকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, কারণ ব্যাপারতো মোটে একটী লোকের ২৪ ঘণ্টার জীবনের ইতিহাস। কিন্তু তারই মধ্যে পদে পদে তার সামাজিক যোগসূত্র, তাই তার জীবনের ইতিহাস কেবলমাত্র তারই জীবনের ইতিহাস নয়—একটী সমগ্র দেশ, এবং মহাদেশের সভ্যতার ইতিহাসও তারই মধ্যে লুকোনো। তাই জয়েসের নতুন বই Finnegan's Wake আবার নতুন ক'রে প্রশ্ন তুলেছে—ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবার চূড়ান্ত সাধনার মধ্যে বারে বারে সামাজিক মূল্য বোধ করেছে আত্মপ্রকাশ। বারান্তরে তার বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ রইল।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে যে ডেলা মেয়রের স্বপ্নবিলাসও বুঝি বা সমাজনিরপেক্ষ। জয়েস মুক্তি চেয়েছিলেন ব্যক্তির প্রচণ্ড বিদ্রোহে, তার ফলে সমাজের বন্ধন অজ্ঞানে অস্বীকার করবার চেষ্টা। ডেলা মেয়রের মুক্তি বিদ্রোহের প্রচণ্ডতায় নয়,—স্বপ্নের শিথিলতায় সমস্ত সামাজিক বন্ধন কখন আলগা হয়ে আসে, সে সম্বন্ধে নিজেরই হয়তো খেয়াল থাকে না।

কিন্তু স্বপ্নের সেই প্রকাণ্ড মুক্তির মধ্যেও যে সমাজ বন্ধনের সহস্র শিকড় জড় মেলেছে; Behold the Dreamer-এ সে কথা স্বীকার না ক'রে ডেলা মেয়র পারেননি। চিত্তের সঙ্গে কল্পনার সম্বন্ধ কেবল স্বপ্নেই মেলে না, জাগ্রত মনের বিলাসেও তার প্রভাব সমান স্পষ্ট। তাই স্বপ্ন কেবলমাত্র কাব্যের উপাদান নয়, কাব্যের স্জনরীতির মধ্যেও স্বপ্নালুতার আভাস মেলে। বস্তুত জাগ্রত এবং স্বাপ্নিক অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য বোধ হয় ক্রমগত, গুণগত কোন বিভেদ তাদের মধ্যে মেলা কঠিন; কিন্তু সেকথা স্বীকার করলেই আবার ব্যক্তি এবং সমাজের সম্বন্ধ হয়ে দাঁড়ায় সভ্যতার একমাত্র সমস্যা। সাহিত্যে, রাজনীতিতে এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণে সেই একই সমস্যার বিভিন্ন সমাধানের চেষ্টা তাই আজ এত মুখর, বর্ত্তমান ইংরিজি সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের বিকাশে সামাজিক ঐক্যবোধের আবেদন এতখানি প্রবল।

ইবনে বতুতা

ভারতীয় সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা ভাষা

দু'মাস আগে আমরা রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের উৎসব করেছি। এবার তাঁর বয়েস আটাত্তর হ'লো। আমাদের ভাগ্যক্রমে এই মহাকবি যে-দীর্ঘজীবন পেয়েছেন তা আরো দীর্ঘ হোক্ প্রত্যেক বাঙালিরই এই প্রার্থনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জীবনে বাংলা সাহিত্যের অনেক যুগ পার হ'য়ে এসেছেন এ-কথা বললে একটুও অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতে আজ আমরা যা বুঝি, রবীন্দ্রনাথই তার চরম উৎস, সাহিত্যের এই আধুনিকতম যুগ সম্বন্ধেও কোনো কথা বলতে গেলে তাঁকে দিয়েই আরম্ভ করতে হয়। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সব চেয়ে বড়ো কথা এই যে আধুনিক সাহিত্যের ভাষা তাঁরই সৃষ্টি; আজ আমরা যে-ভাষায় কথা বলি, যে ভাষায় মনের ভাব ও চিন্তা লিপিবদ্ধ করি তা আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথেরই কাছ থেকে। এ-কথা বলবার মানে অবশ্য এ নয় যে তাঁর আগে বাঙালি বড়ো লেখক কেউ ছিলেন না। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো প্রতিভা কালে-ভদ্রে দেখা যায়। কিন্তু, যে কারণেই হোক্, মধুসূদনের কোনো শিষ্যদল গ'ড়ে ওঠেনি, তাঁর পরে আর কেউ তাঁর ধরণে লেখবার চেষ্টা করেনি। এদিকে বাংলা গদ্যও সংস্কৃত ব্যাকরণের চাপে নেহাৎ আড়ষ্ট, জবুথবু হ'য়ে ছিলো। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে হাতেখড়ি সংস্কৃতের উপরেই মক্সো ক'রে, কিন্তু শেষের দিকে তাঁর ভাষা অনেকটা প্রাঞ্জল হ'য়ে এসেছিলো। গদ্যে বঙ্কিম যেখানে শেষ করেন, রবীন্দ্রনাথের সেখানে সুরু। কবিতার ব্যাপারে তিনি মাইকেলের ধার-কাছ দিয়েও গেলেন না, আবার ঈশ্বর গুপ্তের টুংটাং অনুপ্রাসকেও দূরে রাখলেন—বাংলার বাউল গান ও বৈষ্ণব কবিতার ছাঁচে তৈরি করলেন নতুন ভাষা, নতুন ছন্দ। তাঁর দীর্ঘ ও অক্লান্ত সাধনায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্য ও পদ্য দুটিকেই গ'ড়ে তুলেছেন, আজ এ-কথা ঐতিহাসিক সত্যে দাঁড়িয়ে গেছে।

সাহিত্য ভাষা দিয়েই রচিত হয়। সুতরাং যে-কোনো সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা করতে হ'লে তার ভাষার ইতিহাসটিও আলোচ্য। বাংলায় দু'রকমের গদ্যরীতি এখনো প্রচলিত: সাধুভাষা ও চলতি ভাষা। আধুনিক সাহিতের প্রধান একটা লক্ষণ এই যে বেশির ভাগ লেখক চলতি রীতিতেই গদ্য লিখছেন। অবশ্য সাধুভাষার মায়া এখনো অনেকে একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেননি, কিন্তু কোনো-কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি যতই আপত্তি করুন, চলতি ভাষা সাধুভাষাকে ক্রমেই হটিয়ে দিচ্ছে, এবং এমন দিন আশা মোটেও অসম্ভব নয়, যখন চলতি ভাষা ছাড়া আর-কিছু থাকবেই না। বাংলা খবরের কাগজগুলো এখনো সাধুভাষায় লেখা হচ্ছে,

রেডিয়ো বক্তৃতার অংশ। অল-ইণ্ডিয়া রেডিয়োর সৌজন্যে

কিন্তু সাধুভাষায় চিঠিপত্র লেখা অনেক ক'মে গেছে। আজকাল চলতি ভাষায় গল্প উপন্যাস শুধু নয়, গুরুতর প্রবন্ধ লেখাও সম্ভব হচ্ছে। এবং তা-ই দেখে অনেকে আপত্তি তুলছেন যে এ-দুয়ে তফাৎ তো শুধু ক্রিয়াপদের; শক্ত-শক্ত কথা বজায় রেখে 'যাইতেছে'-র বদলে 'যাচ্ছে' আর 'হইল'-র বদলে 'হ'লো' বললেই কি চলতি ভাষা হ'য়ে গেলো! আমি বলি, তা হ'লো বইকি—কেননা 'রাম যাইতেছে'-র বদলে 'রাম যাচ্ছে' বললে কথাটার মেজাজই বদ্‌লে যায়। তাই ব'লে বিষয়বস্তুর জন্যে দরকার হ'লে শক্ত কথা ব্যবহার করতে তো কোনো দোষ নেই। তাছাড়া, চলতি ভাষার সুবিধে এই যে তাতে নেহাৎ আটপৌরে ঘরোয়া কথাও মানায়, আবার বাছা-বাছা সংস্কৃত কথাও বেমানান হয় না; কিন্তু সাধু ক্রিয়াপদ বজায় রেখে ঘরোয়া বুলি বসাবার বিপদ পদে-পদে—এ-পর্যন্ত এক শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, অর্থাৎ পরশুরামই বোধ হয় তা পেরেছেন।

যদিও 'আলালের ঘরের দুলালে' প্রথম চলতি ভাষার ব্যবহার পাওয়া যায়, তবু 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'ই বাংলায় প্রথম পুরোপুরি চলতি ভাষার বই; কিন্তু এটা লক্ষ্য করবার যে হুতোমের ভাষার সঙ্গে আধুনিক চলতি ভাষা খুব বেশি মেলে না; আজকালকার ভাষা নানাদিকেই এর চেয়ে উন্নত, যদিও এ-কথা বলার মানে কালীপ্রসন্ন সিংহের অসামান্য ক্ষমতাকে কিছুমাত্র খাটো করা নয়। আসল কথা, ইংরিজিতে যাকে স্ল্যাং বলে, অর্থাৎ যা মানুষের মুখের প্রতিদিনের চলতি বুলি, কালীপ্রসন্ন বিনা দ্বিধায় তার প্রচুর ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যে স্ল্যাং-এর ব্যবহার (নাটকীয় কথোপকথনে ছাড়া) স্থায়ী হ'তে পারে না, কেননা যুগে-যুগে মানুষের মুখের বুলি বদলায়, হুতোম প্যাঁচার অনেক রংদার কথাই আজ আমাদের কাছে ফিকে হ'য়ে এসেছে। চলতি ভাষাকে ঠিক সাহিত্যের স্তরে তুলতে কালীপ্রসন্ন পারেননি—হুতোম প্যাঁচার পরে ও-ভাষায় আর কেউ কোনো বই লেখেননি, এমনকি রবীন্দ্রনাথও লেখেননি, যতদিন না শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সবুজ পত্রে'র ভিতর দিয়ে চলতি ভাষাকে চলতি করলেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রমথবাবুর অতুলনীয় স্থান। এককালে তিনি নিজের নামে ও বীরবল ছদ্মনামে নানারকম লেখায় বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র দখল ক'রে ছিলেন; লেখক তৈরি করবার অদ্বিতীয় ক্ষমতা তাঁর ছিলো। রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়েছেন, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও এমন কোনো বাঙালি লেখক বোধ হয় হননি; প্রমথ চৌধুরীই একমাত্র, যিনি বয়োকনিষ্ঠ হ'য়েও রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই চিঠিপত্র চলতি ভাষায় লিখেছেন; কিন্তু যে-লেখা ছাপা হবে তা তিনি বহুকাল পর্যন্ত সাধুভাষাতেই লিখে এসেছেন, তা গল্প, উপন্যাস কি প্রবন্ধ যা-ই হোক্। 'ঘরে বাইরে' তাঁর প্রথম চলতি ভাষার বই, এবং সেটি তিনি প্রমথবাবুর উদ্দীপনাতেই লেখেন, 'সবুজ পত্রে'ই সেটি প্রথম ছাপা হয়। প্রমথবাবু একবার যে তাঁকে চলতি ভাষা ধরালেন, তার পর থেকে তাঁর অভ্যেসই বদলে গেলো; 'ঘরে বাইরে'র পরে তিনি আর সাধুভাষায় একটি ছত্রও লেখেননি। প্রমথবাবু নিজে একজন অপরূপ গদ্য লেখক; তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় যে

পরিচ্ছন্ন স্বল্পভাষিতা, যে-ঋজুতা ও সংহতি, সর্বোপরি যে দ্যুতিময় হাস্যচ্ছটা পাওয়া যায়, বাংলা সাহিত্যে সত্যি তার তুলনা নেই। কিন্তু চলতি বাংলার চরম বিকাশ হ'লো রবীন্দ্রনাথেরই হাতে; এ-ভাষাকে তিনি ক'রে তুলেছেন বিশালতম কল্পনা ও গূঢ়তম চিন্তা প্রকাশের উপযুক্ত বাহন, গদ্যে যে কবিতা লেখা যায় তা-ও তিনিই প্রথম দেখালেন, কেননা তাঁর 'লিপিকা'র অন্তত প্রথম দিককার রচনাগুলি যে কবিতাই সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বু. ব.

হিন্দী সাহিত্য

অজস্র রক্তপাতের পর যখন মহাযুদ্ধের সমরাগ্নি নির্ব্বাপিত হ'ল, তখন পৃথিবীর বিরাট সভ্যতায় নতুন ক'রে আগুন লাগল। বিবর্ত্তনের স্রোতে রাজনীতি, সাহিত্য, ধর্ম্ম, বিজ্ঞানে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হ'ল। পুরোনো আচার ব্যবহার, সংস্কার ভেঙ্গে চুরে এক অভিনব সভ্যতার জন্য আগামী যুগ লালায়িত হ'য়ে উঠলো। পৃথিবীর কোনও সাহিত্য এই আগুনের ছোঁয়াচ থেকে রেহাই পায়নি। জীর্ণ সংস্কার, একঘেয়ে নিয়মকানুনের-সঙ্গে বিদ্রোহ ক'রে যে তেজস্বী, নির্ভীক সাহিত্য সৃষ্টি হ'ল, সে সাহিত্যের যুগ Post-war literature নামে অভিহিত। ভারতবর্ষের একটি সাহিত্য এই পরিবর্ত্তনকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলো এবং একান্ত সাধনার ফলে সেই সাহিত্য শুধু ভারতবর্ষেই নয় পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ব'লে গণ্য হ'ল—সে সাহিত্যের ভাষা বাঙলা। আজ বাঙলা সাহিত্যকে সকলেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। হিন্দীও ভারতবর্ষের একটি প্রসিদ্ধ ভাষা। তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিস্মিত ও অবাক হ'তে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, এর সাহিত্য তুলসীদাস, কবীর, সুরদাস ও রহিমের যুগ থেকে মূলগত কিছুই বদলায়নি; যা পরিবর্ত্তন হয়েছে তা' আঙ্গিকের, এবং এই আঙ্গিকের পরিবর্ত্তন-কারী, ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র। ইনি পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বন ক'রে কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। গদ্য রচনা এঁর সময় ততো পুষ্ট হয়নি, তবুও ইনি গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং অনেকাংশে সাফল্যলাভ করেন। বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন শ্রদ্ধেয় ও সাহিত্য সম্রাট ব'লে ঘোষিত, হিন্দী সাহিত্যে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র তেমনি পূজিত ও সম্মানিত। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের পর যিনি গদ্য রচনায় উৎসাহী হ'য়ে উঠেন, তিনি আচার্য্য পণ্ডিত মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী। এঁকে হিন্দী সাহিত্যের আলোক স্তম্ভ বললেও অত্যুক্তি হয় না। যে ভাষা প্রাচীন যুগ থেকে এক পা-ও নড়েনি, তাঁকে দ্বিবেদীজী বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে দেন। এঁর কয়েকটি ঐতিহাসিক ও তৎকালীন সামাজিক নাটক ও কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারপর এলেন মৈথিলী শরণজী গুপ্ত প্রেমচান্দ্‌জী ও গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী। মৈথিলী শরণজী ও গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর রচনা প্রাচীন যুগেই যেন আবার ফিরে গেল। অতীত ও বর্ত্তমান সাহিত্যকে অনুকরণ ক'রে এঁরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তা' শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকই

হয়েছে। হিন্দী সাহিত্যের বিশেষ কিছু উপকার হয়নি। যা' হয়েছে তা সমষ্টিগত রচনার স্তূপ মাত্র। তবুও মৈথিলী শরণজীর "ভারত ভারতী"ই একমাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা।

এর পর প্রেমচান্দ্‌জী আকস্মিকভাবে হিন্দী সাহিত্যে আবির্ভূত হন। প্রথমে প্রেমচান্দ্‌জী উর্দ্দু ভাষায় সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করেন, এবং অনেক গল্প কবিতা দ্বারা উর্দ্দু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। কিন্তু খ্যাতি যশের আকাঙ্ক্ষী প্রেমচান্দ্‌জী মোটেই তৃপ্তি পাননি, তাই তিনি হিন্দী ভাষায় মনোযোগ দেন, এবং নিজের চেষ্টায় "হংস্" নামক একটী পত্রিকা প্রকাশ করেন। হিন্দী সাহিত্যকে প্রেমচান্দ্‌জী একটু বিশেষরূপে আলোকিত করেন। কারণ এর আগে গল্প সাহিত্য ব'লে বিশেষ কিছু ছিল না হিন্দী ভাষায়। প্রেমচান্দ্‌জী হিন্দী ভাষাকে গল্পের দিকে বিশেষ ক'রে এগিয়ে দেন। এঁর উপন্যাসের মধ্যে "সেবাসদন"ই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ। প্রেমচান্দ্ যখন মারা যান, স্মরণ থাকতে পারে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ক্ষেদোক্তি করেছিলেন যে, প্রেমচান্দ্‌জীর মৃত্যুতে হিন্দী সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। আর প্রেমচান্দ্ নাকি গোর্কী, শরৎচন্দ্র ও টলষ্টয়ের সমতুল্য। তাঁকে প্রশংসা ক'রে কবিগুরু ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়েছেন, কারণ তাঁর এমন সব অর্থহীন ও সস্তা রচনা আছে, যা সত্যই নিন্দনীয়।

তাঁর মৃত্যুর পর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেনি। অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেই, জি, পি, শ্রীবাস্তব ও ধর্ম্মরাজ জৈনের নাম করা যেতে পারে। শেষোক্ত লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রায় অধিকাংশ বইয়েরই অনুবাদ করেন, তাঁর অনুবাদ কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। জি, পি, শ্রীবাস্তব হাস্যরসের উপন্যাস, গল্প রচনা ক'রে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। বাজপেইর উপন্যাস হিন্দী সাহিত্যে বিশেষ ক'রে সমাদৃত। কিন্তু সে উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের যথেষ্ট অভাব। ঘটনাবহুল ও অসংযত চরিত্রের ভীড়ে এঁর উপন্যাস ভারাক্রান্ত। এঁর কবিতার ও বর্ণবিন্যাস আঙ্গিক চমৎকার কিন্তু ভাব সেই প্রাচীন যুগেরই।

আধুনিক যুগের কবিদের মধ্যে ভগবতীচরণ, অঞ্চল কবি, শ্রীজয় শঙ্কর প্রসাদ, গুলাবজী ও শ্রীমতী সূর্য্যদেবী দীক্ষিত (ঊষা) বিশেষ প্রসিদ্ধ। হিন্দী সাহিত্যের গত অধিবেশনে মৌলিক রচনার জন্য জয়শঙ্কর "প্রসাদ"কে 'কামায়িনী' কাব্য গ্রন্থের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। দুঃখের বিষয় পুরস্কার ঘোষণা হবার মাস কয়েক আগেই এঁর মৃত্যু হয় এবং শ্রীমতী সূর্য্যদেবীকেও 'নির্ঝরিণী' কাব্য রচনার জন্য পুরস্কৃত করা হয়। এঁদের মধ্যে ভগবতীচরণই প্রতিভাবান লেখক ব'লে আমার বিশ্বাস। নবোদিত কবিদের অগ্রণী অঞ্চল কবির "মধুপিকা" কাব্য গ্রন্থ অভিনব না হ'লেও রোমান্টিক্ কবিতার দিক দিয়ে মন্দ নয়। যেমন—

"কঁহা ছিপাউ অর্দ্ধরাত্রি কি
যহ্ নির্ব্বন্ধ পিপাসা,
অন্ধ-অন্ধ্ উন্মত্ত দৃগোঁ কি
হিল্লোলিত অভিলাষা।
ধূনী সি জল্ উঠি হৃদয় মে
সুলগ্ উঠা ময়্ পাপী,

তীব্র অশান্তি দাহ পুঞ্জিত

যহ্ মধুমায়া অভিশাপী।"

বর্ত্তমান গল্প লেখকদের মধ্যে উষাদেবী "মিত্রা" ও নগেন্দ্রনাথগুপ্তর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁদের রচনার মধ্যে উৎকর্ষতা ও অভিনবত্ব নেই। শিমলায় গত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তবিংশ অধিবেশনে শ্রীসত্য নারায়ণ সিংহ বলেন—

লেকিন্ ময়্ য়হ্ দেখ্ রহা হুঁ কি হমারী কবিতামে আধুনিকতাকে নামপর্ বাস্তবিকতাকি পরিধি কম্ হোতি যা রহি হ্যায়্, ঔর্ হমারি অধিকাংশ কবি এয়া তো শরাবকি এক্ বুন্দ্ কে লিয়ে জান হোমে দে রহে হ্যায়, এয়া এক্ চুম্বন্, এক্ ঝলক্‌কে লিয়ে! অধিকাংশ কবিয়োঁকো আলিঙ্গনকী চাহ্ হ্যায়্, অধরোঁকী প্যাস্ হ্যায়্—ঔর্ ও ভী এ্যাসে শব্দোমে—যো অপাঠ্য হ্যায়। ………ক্যা কারণ হ্যায় কি হম্ হিন্দীমে এক্ ভী নজরুল ইস্‌লাম এয়া ইকবাল্ পয়দা নহি কর্ সকে?"

শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণের এই উক্তি সমর্থনযোগ্য। কিন্তু সত্যিকার সাহিত্যিক প্রতিভা হিন্দী-সাহিত্যের সাহিত্যিকদের মধ্যে বিরল। এর জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রয়োজন। হিন্দী সাহিত্যে সে শিক্ষা ও কৃষ্টির সত্যিই অভাব। যেদিন সংস্কার মুক্ত হয়ে হিন্দী সাহিত্য সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টি করবে সেদিন শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সিংহ দু'একটী নজরুল ইস্‌লাম বা ইক্‌বালের দর্শন পেতে পারেন।

গত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের অধ্যক্ষ, "আজ"-এর সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীবাবুরাও বিষ্ণু পরাড়কর সভাপতির অভিভাষণে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন—"হমারি পরাধীনতা কি কারণ অভাগিনী নাগরী সর্ব্বগুণ আগরী হোনে পর্ ভী অপ্‌নেহি দেশমে উপেক্ষিত্ হো রহি হ্যায়।"

রাষ্ট্রভাষা না হওয়ার দরুণ পরাড়করজী বিক্ষুব্ধ হয়ে উল্লিখিত উক্তি করেন। কিন্তু পরাড়করজীর জানা উচিত যে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটি জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। যে হিন্দী সাহিত্য রাষ্ট্রভাষা হবার স্পর্দ্ধা রাখে সে সাহিত্য যথেষ্ট অপরিণত এবং তার এখনও কিশোর অবস্থা।

রাসবিহারী লাল

চিত্রকলা

মার্কা-মারা আর্ট

তখন কলকাতায় মুস্‌লিম্ সাহিত্য সম্মিলন বসেছিল। কথা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুকে জিজ্ঞাসা করলুম, "মুস্‌লিম্ সাহিত্য সম্মিলনের অর্থ কি?" উত্তরে সরোজিনী দেবী বললেন: "কেন বুঝতে পারছ না? এটি শুধু মুস্‌লিম্ সাহিত্যিকদেরই সম্মেলনী।" উত্তরটা শুনে ভাবলুম বোধ হয় আমার বুদ্ধি একটু মোটাই হবে, তা না হোলে বোঝা উচিত—সম্প্রতি সাম্প্রদায়িকতার যেরকম বাড়াবাড়ি চলছে তার ফলে হয় তো বা সাহিত্যেরও এই ভাবে বাঁটোয়ারা করার দিন এসেছে। এ দুর্দ্দিনেও বিশ্বাস হোতে চায় না যে সাহিত্য, রস-শিল্প বা চারুকলাকে সাম্প্রদায়িক মার্কা মেরে যাচাই করতে হবে। ট্রেনে চড়ে যখন কলকাতা থেকে দিল্লী যাই, ষ্টেসনে-ষ্টেসনে 'হিন্দু' চা ও 'মুস্‌লিম্' চা'র স্বকীয় ধ্বনিটা খানিকটা কান-সওয়া হয়ে গেছে সেটা মানি—কিন্তু সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের 'হিন্দু' ও 'মুস্‌লিম্' মার্কার আলাদা চেহারাটি জাগ্রত-চৈতন্যে, ধ্যানে, কি যে-কোনো মানসিক অবস্থাতেই এখন পর্য্যন্ত কল্পনা করতে পারছি না। সরোজিনী দেবীর কবিতা যদি এখন থেকে 'হিন্দু' সাহিত্যের পংক্তিতে ও আসরেই একমাত্র সচল হয় সেটা সরোজিনী দেবীর দুর্ভাগ্য ততটা নয় যতটা তাঁর আর্টের।

যে সংস্কৃতির আওতায় এতদিন ধরে রয়েছি তার কাছ থেকে শিখেছি যে আর্ট জাতিহীন ও গোষ্ঠীহীন—না হিন্দু না মুসলমান—তার সার্থকতা ও মূল্য ধর্ম্ম ও জাত বিচারের বাইরে। তার প্রকাশ ও বিস্তৃতি জন্মগত ও জাতিগত ব্যবধান মেনে চলে না—চলে শুধু মানুষের বন্ধনহীন প্রাণের স্বচ্ছন্দ প্রেরণায়। সে প্রেরণার অভিব্যক্তিকে যদি আজ সাম্প্রদায়িক ছাপ পরিয়ে লোক দরবারে হাজির করতে হয়, তা হোলে তাতে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের বিকৃত বিশেষত্ব হয়তো ফলে, কিন্তু তাতে হয় না সাহিত্যের সত্যিকারের নমাজ।

নানা ধর্ম্ম-জাতি-বিভক্ত এই ভারত ভূমিতেও যে-আর্ট তার স্বকীয় সত্তা বজায় রেখে এসেছে তার আধুনিক দৃষ্টান্ত যদিও নৈরাশ্যপূর্ণ তার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আজ এ প্রসঙ্গে শুধু একটি দৃষ্টান্তই বিচার করা যাক্—মোগল চিত্র-শিল্প। ভারতের মধ্যযুগে মোগল সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতাতেই মোগল চিত্র-শিল্পের উদ্ভাবনা ও সৃষ্টি হয়। এই চিত্র-শিল্পের বিশিষ্ট ধারার গোড়াপত্তনের মূলে ছিল সম্রাট আকবরের সাম্প্রদায়িক উদারতা ও নির্লিপ্ততা। এই চিত্র-শিল্প যখন বিলুপ্ত হোলো তার মূলে আবার ছিল সম্রাট আওরঙ্গ-জেবের সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধতা ও গোঁড়ামি।

দেখছি যে মোগল চিত্র-শিল্পীরা সবাই মোগল বা মুসলমান ছিলেন না। এঁদের মধ্যে অল্প কিছু শিল্পী পারস্য দেশ থেকে এসেছিলেন; আর অল্প কিছু ছিলেন মোগল বা

ভারতীয় মুসলমান। কিন্তু এঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন হিন্দু। যে শিল্পীরা 'আইন-ই-আকবারি' চিত্রিত করেছেন তাঁদের মধ্যে পাই এই নামগুলি—লাল, কেশু, মধু, মুকুন্দ, তারা, জাগান, রাম, হরবংশ, শাঁওলা, ক্ষেমকরণ। যদি তাই হবে, তবে এই দলের শিল্পীদের মোগল আখ্যা দেবার অর্থ কি? অর্থ এই যে দলটির গঠন হয়েছিল মোগল দরবারের আওতায়। শিল্পের ঐতিহাসিক যুগ বা যে-কোনো একটা বিশিষ্ট ধারাকে সহজে বোঝাবার জন্যই তার আলাদা নাম সব দেশের ঐতিহাসিকরাই দিয়ে এসেছেন। তার মানে এই নয় যে, যে-কোনো উঁচু দরের আর্টকে তার নাম জাতি ও কালের পর্য্যায় ভাগ করেই কেবল তার গুণ বিচার করতে হবে।

এক সময় মোগল চিত্র-শিল্প ইণ্ডো-পার্সিয়ান্ নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু এই চিত্রকলাতে পারস্য চিত্রকলার ধারার সমাবেশ খুবই কম দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় পারস্য চিত্র-শিল্পীরা সম্রাট আকবরের দরবারে আসেন তখনকার মোগল চিত্রে পারস্য রীতির ছাপ কিছু কিছু পড়েছিল। কিন্তু পারস্য রীতির নিয়ম-কানুন থেকে মোগল শিল্পীদের মুক্তি পেতে বেশী দিন লাগেনি। তার কারণ, এই দুই চিত্রকলার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। যদিও পারস্য চিত্র সুনিপুণ হাতের আঁকা ও বিচিত্র রঙের সমাবেশে সজ্জিত, তবু এ চিত্র-শিল্পের সৃষ্টিই হয়েছে শুধু পুস্তক-রঞ্জন করার উদ্দেশ্যে। পুস্তক-রঞ্জন মোগল চিত্রের একটা দিক মাত্র—এ দলের শিল্পীদের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। সুতরাং মোগল চিত্রের একটি নিজস্ব রূপ ও বিশেষত্ব অল্পদিনের মধ্যেই পরিস্ফুট হোতে পেরেছিল।

আরো দেখেছি যে সমসাময়িক রাজপুত চিত্রের সঙ্গে মোগল চিত্রের সাদৃশ্যই ছিল বেশী। যে টুকু তফাৎ এই দুই দলের শিল্পীদের ভেতর দেখতে পাই তা বিষয়বস্তু ও ভাবে—অঙ্কন প্রণালীতে নয়। রাজপুত শিল্পী চেয়েছে জাতির ভাবধারা প্রকাশ করতে রঙে ও রেখায়, তাই তাদের চিত্র এত ভাববহুল ও লীলায়িত-গতিসম্পন্ন এবং তাই থেকে লোক-শিল্পের এমন সহজ উচ্ছ্বাস উপচে পড়ছে। ইতিহাসের বিরাট শূন্যতা পড়ে আছে অজন্তা, বাঘ প্রভৃতি গুহা চিত্র ও রাজপুত চিত্রের মাঝখানে। কিন্তু এই রাজপুত শিল্পীরাই সেই অজন্তা ও বাঘ গুহা শিল্পীদের সত্যিকারের উত্তরাধিকারী। যদিও অজন্তা ও বাঘ গুহা চিত্রের কলেবর বিরাট ও রাজপুত চিত্র ছোট, তবুও রূপরেখার সাবলীল ভঙ্গী ও ভাবের অজস্রতা দুইয়েতেই সমানভাবে পাওয়া যায়।

মোগল চিত্র ছিল দরবারী শিল্প। লোক-শিল্পের সহজ ভঙ্গীর কিছু অভাব এতে আছে সত্য, কিন্তু এদের চিত্র-সজ্জা কী সুন্দর, কী মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক, কত সূক্ষ্ম! এদের ছবির মাল-মসলা ছিল বেশীর ভাগই মোগল দরবারকে ঘিরে। আশে-পাশে তাদের চোখে যা কিছু পড়েছে তার ওপর তাঁরা কল্পনার রঙ চড়িয়ে ফুটিয়ে তুলেছে তাদের চিত্র; কিন্তু তারা কখনও ভর করেনি অবাস্তব ভাবালুতার ওপর।

সম্রাট আকবরের দরবারে সব চেয়ে খ্যাতিমান শিল্পী ছিলেন দুইজন—বাস্ওয়ান্ ও দশওয়ানথ্। দশওয়ানথ্ রাজদরবারের এক পালকী বেহারার সন্তান; কিন্তু শিশুকাল থেকেই ছবি

আঁকার ওপর তাঁর ছিল অসম্ভব ঝোঁক। যে কোনো খালি জায়গা—সে দেয়ালেই হোক আর মেঝেই হোক—সেখানটা তিনি ছবি দিয়ে ভর্ত্তি না ক'রে থাকতে পারতেন না। তাঁর এই প্রতিভার খবর একদিন সৌভাগ্যক্রমে সম্রাটের কাছে পৌছয়। সম্রাট তখন তাঁকে পাঠিয়ে দেন পারস্য শিল্পী আবহস্ সামাদের কাছে। এই কৃতী শিল্পী আবহস্ সামাদ ছিলেন সম্রাটের পিতৃবন্ধু। কালে দশওয়ানৎ হয়ে উঠেন রাজদরবারের শ্রেষ্ঠ-শিল্পী; কিন্তু যখন তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো ঠিক সেই সময়টাতেই তিনি পাগল হয়ে যান ও কিছু দিন পরে আত্মহত্যা করেন।

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে মোগল চিত্রের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়। এ-অধ্যায়ের মোগল চিত্র পরবর্ত্তী অধ্যায়ের চিত্রগুলির চেয়ে কিছু নিকৃষ্ট; কারণ এ-সময়ের শিল্পী তখনও পারস্য প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠিতে পারেননি এবং সেই জন্তেই এঁদের ছবির মধ্যে একটা আড়ষ্ট ভাব পাওয়া যায়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালকে মোগল চিত্রের মধ্য অধ্যায় বলা যেতে পারে। সম্রাট জাহাঙ্গীর শিল্পীদের উঁচুদরের কাজের জন্য সব সময় মুক্তহস্ত ছিলেন। জাহাঙ্গীর ছিলেন উঁচুদরের চিত্রামোদী ও বিচক্ষণ সমালোচক, কাজেই তাঁর আমলে চিত্র-শিল্পের এত উৎকর্ষ দেখা যায়। এই সময় থেকেই 'পোট্রেইচারের' দিকে মোগল শিল্পীরা মনোনিবেশ করতে আরম্ভ করেন। সেই সময়কার এমন কোনো বিশিষ্ট লোক ছিলো না যাঁর ছবি এঁরা বাদ দিয়েছেন। সম্রাট সাহজাহানের আমলেও মোগল শিল্পীরা সমান ভাবেই সমাদর পেয়েছেন। কিন্তু এই অধ্যায়কেই আমরা মোগল চিত্রের শেষ অধ্যায় বলতে পারি; কারণ সম্রাট আওরঙ্গজেব যদিও চিত্র-শিল্প নিষিদ্ধ করেননি, তবু চিত্র-শিল্পের প্রতি তাঁর বিরুদ্ধভাব থাকার দরুণ তাঁর দরবারে চিত্র-শিল্পীর বিশেষ সমাদর ছিল না।

উদার মতাবলম্বী আকবর যে শিল্পের গোড়াপত্তন করেছিলেন এবং পরবর্ত্তী মোগল দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় যে শিল্প এতদিন বেঁচে ছিল, সেই শিল্পেরই মরণ হোলো আওরঙ্গজেবের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায়। আজ সাম্প্রদায়িক বাঁটওয়ারার কোলাহলে বোধ হয় আমরা আর্ট ও সাহিত্যের গোড়াকার কথাটাই ভুলতে বসেছি।

নীলিমা দেবী

যে কোন বিষয় গুছিয়ে লেখাই তার সমালোচনা এবং স্তরভেদ স্বীকার করেও প্রত্যেক সমালোচনাকে সৃষ্টিমূলক বলা যায়। "রাস্তায় একটা লোক মোটর চাপা পড়েছে" এটা ঘটনাবিশেষের ইতিহাস কিন্তু একেও নানাদিক থেকে দেখা যায়। মোটরচালকের অনবধানতা, পথিকের অসতর্ক হওয়া, পথনির্ম্মাণবৈশিষ্ট্যে দুর্ঘটনার সম্ভাব্যতা, কি কি কারণে মানুষ অন্যমনস্ক হয়, যন্ত্রকে আরও বিপদপ্রতিষেধক করা যায় কি না ইত্যাদি অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীর দ্বারা এই ঘটনার প্রাথমিক ইতিহাস পুষ্ট হতে আরম্ভ করে। যে সমস্ত আনুষঙ্গিক বিষয় ক্রমশঃ উপস্থিত হতে থাকে, রাস্তার মোটরচাপার সঙ্গে তাদের সঙ্গতি রক্ষা করতে হয় এবং সেগুলির বিন্যাস ঐতিহাসিকের কল্পনাশক্তি ও সামঞ্জস্যজ্ঞান পরিস্ফুট করে। অবশেষে সমালোচনা ও ইতিহাসে কোন গুরুতর প্রভেদ থাকে না এবং দুইয়েরই উদ্দেশ্য দাঁড়ায় আলোচনা দ্বারা এমন একটা পারিপার্শ্বিক সম্ভব করা যার সাহায্যে মানুষ ভবিষ্যতে মোটর চাপা না পড়ে।

সাহিত্যের কাজও একই প্রকার, তবে তার ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ। উপন্যাসে যদি মানুষ একান্তই মোটর চাপা পড়ে ত দুর্ঘটনা নিবারণ করার প্রতি লেখকের লক্ষ্য প্রায়ই থাকে না। সেটা ব্যবহারিক বুদ্ধির কাজ। লেখক সাহিত্যে দেখাতে পারেন কি ক'রে সুন্দর ও কমনীয় ভাবে (বা কোন কোন স্থলে বীভৎস ভাবে) লোকে মোটর চাপা পড়তে পারে। এমন জায়গায় দেখা যায় প্রায়ই একজন তরুণী ও যুবক অকুস্থলে উপস্থিত থাকেন, কিন্তু আহত হলেও মারা যান না এবং পরে তাঁদের প্রেমসঞ্চার রোমাঞ্চকর পটভূমিকায় ভালোই লাগে। খবরের কাগজে আমরা যে সব মোটর চাপার বৃত্তান্ত পড়ি, তাদের পরিণতি প্রায়ই বিয়োগাত্মক হয়; তবু ঔপন্যাসিকের ঘটনাসংস্থানের উপর এই কারণে রাগ করতে পারি না, যে এরকম ঘটনা সাধারণতঃ না ঘটলেও একেবারে যে ঘটতে পারে না একথা জোর করে বলা যায় না। সাহিত্যিক ঘটনাগুলির ব্যবহারিক সঙ্গতি রেখেও তাদের সাজাবার সুবিস্তৃত স্বাধীনতা পান। সাবিত্রীর মত মেসের ঝি সংসারে সুলভ না হতে পারে, কিন্তু থাকাও একেবারে অসম্ভব নয় এবং সৌন্দর্য্যের ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে সেটা পরম লাভ। সাহিত্যে লেখক জীবনের সমালোচনায় একটি সুন্দর পরিবেশই শুধু সৃষ্টি করেন না, অধিকন্তু সৌন্দর্য্যের প্রভাবে সংসারে নরনারীর প্রেম রচনার রীতিও নিয়ন্ত্রিত করেন।

বিজ্ঞানে মনে হতে পারে আমরা যা ঘটে তাই বলি, কিন্তু একটু মনোযোগ দিলে দেখা যায় যে এখানেও কল্পনার বিশেষ স্থান আছে। 'সূর্য্য পৃথিবীর চারিপাশে ঘোরে' এইটাই আমরা প্রথমে লক্ষ্য করেছিলাম, কিন্তু পরে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ঘটনার আলোচনা থেকে প্রতিপন্ন হ'ল পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। তারপর বর্ত্তমানে সময় ও গতির নানাপ্রকার ধারণা,

এমন কি মানুষের মন পর্য্যন্ত আলোচনায় তাদের অংশ দাবী করছে। এই সমস্ত সামঞ্জস্য ক'রে যিনি সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন, তাঁরই কথা থাকবে। কিন্তু কি কি বিষয় এই সিদ্ধান্তে কাজে লাগবে, সেটা ব্যক্তিগত কল্পনার উপর অনেকখানি নির্ভর করে এবং এই কারণে ইতিহাস, সাহিত্য ও বিজ্ঞান ঘটনার এক এক প্রকার সমালোচনা বলা যায়।

সঙ্গীত সংক্রান্ত সমালোচনাকে মোটা-মুটি দুই ভাগে ভাগ করা চলে—শাস্ত্রীয় ও গায়কীয়। প্রথমটিতে সঙ্গীতের ইতিহাস ও প্রকৃতি আলোচিত হয় ও দ্বিতীয় সাঙ্গীতিকের বৈশিষ্ট্যে নিবদ্ধ থাকে। যদিও দুইভাগের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, তবু বিশ্লেষণের সৌকর্য্যার্থে পৃথকীকরণে সুবিধেই হয়। সঙ্গীত জগতে যা ঘটে তাতে শৃঙ্খলার অবতারণার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী অল্পবিস্তর বদলে যায় এবং সে কারণে ব্যাকরণ রচনায় সৃষ্টির অংশ বড় একটা কম থাকে না।

বর্ত্তমান কালে ভারতে সাধারণতঃ নাদব্রহ্মের মহিমা, গায়কদের অলৌকিকত্ব, ভারতীয় কৃষ্টি নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক উচ্ছ্বাস ও সংস্কৃত শ্লোকের অসম্বন্ধ উল্লেখকে শাস্ত্রীয় আলোচনা বলা হয়। নাদব্রহ্মের যথাস্থানে আলোচনা প্রাচীন শাস্ত্রকার করতেন তবে যুক্তির পরিবর্ত্তে নয়। উচ্ছ্বাস কিছু না কিছু সমস্ত সৃষ্টির মূলেই থাকে, কিন্তু যেখানে বলার বিশেষ কোন কথা নেই, দেশ ও প্রদেশ নিয়ে অপরিমিত আবেগে বিষয়বস্তু আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সব চেয়ে অসহনীয় ব্যাপার মূলগ্রন্থ না পড়ে সংস্কৃত শ্লোকের অকারণ ও অস্থানে আবৃত্তি, এমন কি ওস্তাদরাও কোন রকমে দু-একটি নিতান্ত মামুলি ও পেটেন্ট শ্লোকের উল্লেখ করতে পারলে খুসি হন এবং এই সব দেখেই Fox Strangways লিখেছিলেন :

"We spoke of Indian musical theory as a jungle. So it is, and so it will be until the thinking minds of that country attach it seriously and critically, and cease to waste time over pious beliefs and mathematical tricks, to repeat *slokas*, often out of their proper connection, instead of to examine problems."

এর প্রতিকার গুটিকয়েক প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থের প্রামাণ্য সংস্করণ সঠিক অনুবাদ সমেত বার করা (দুবছর আগে Problems of Hindustani Music-এ এই কথার উত্থাপন করেছিলাম, কিন্তু দেশ থেকে কোন কর্ম্মপ্রসূ অনুমোদন পাইনি)। সঙ্গীত বিষয়ে জ্ঞাতব্য বিষয় প্রায় সমস্তই কয়েকটি পুস্তকেই পাওয়া যাবে, কারণ অধিকাংশ সংস্কৃত পুঁথি প্রধান গ্রন্থগুলির পুনরাবৃত্তি মাত্র। সংস্কৃত গ্রন্থের পারিভাষিক আবরণ ভেদ ক'রে অর্থ গ্রহণ করা বিশেষ সময় ও শ্রমসাধ্য এবং সাধারণে যে সহজে এতে স্বীকৃত হবেন এমন মনে হয় না। কিন্তু হাতের কাছে সঠিক অনুবাদ থাকলে অনেকের পক্ষে শাস্ত্রচর্চ্চা সুগম হবে। সাধারণকে প্রত্যেক বিষয় সহজ ক'রে দেওয়ার প্রথা এ-দেশে প্রচলিত হয়নি, তাই ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে হয় আমাদের বিদেশের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়, নয় সাধারণ্য বহির্ভূত কতিপয় বিশেষজ্ঞের দেশে আবির্ভাব হয়। উদাহরণতঃ গ্রীক ও য়ুরোপীয় দর্শনগ্রন্থগুলির ইংরাজী সুলভ সংস্করণ আছে, কিন্তু ভারতীয় দর্শনের অধিকাংশ বই পড়তে হ'লে অপ্রচলিত ভাষা শিক্ষা ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু অতীতের বিধি বিধান দিয়ে জীবন্ত ও চলমান সঙ্গীতকে বেঁধে রাখা যায় না। ঋষিদের বা তানসেনের গান বর্ত্তমানে আমরা করি না, এমন কি ২৫ বছর আগেকার সঙ্গীতও এখন অচল, এই সামান্য কথা বার বার বলেও এদেশে বোঝান শক্ত। প্রতি যুগের শিল্পসূত্র তার সাময়িক আবেষ্টনের ফল। তবে বর্ত্তমান খাপছাড়া নয়, অতীতের যোগসূত্র টেনেই তার অর্থ পরিস্ফুট হয়। সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ অতীতের সাহায্য ছাড়া নিরূপিত হয় না এবং সঙ্গীতের ধারার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে বর্ত্তমানের ব্যাকরণ রচিত হওয়া অসম্ভব। আর এখন ধুতিচাদর পরলেও আমরা ভারতে থেকেও মানুষ হই য়ুরোপীয় পরিবেশে এবং সে ভাবধারা এতই আমাদের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে যে আমরা তার সম্বন্ধে খুব একটা সচেতনও নই। এটুকু আশা রাখি হাজার সাহেব বনলেও ভারতীয় দৃষ্টিবৈশিষ্ট্য কিছু থাকবেই। এখন নানা সঙ্গীতের সংঘাতে পুষ্ট ভারতীয় সঙ্গীতে শৃঙ্খলা নিয়ে আসতে হ'লে পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালী গ্রহণ অপরিহার্য্য।

গায়কীয় সমালোচনার অবস্থা কিছু কম শোচনীয় নয়। প্রবুদ্ধ জনমতের অভাবে এখানেও যথেচ্ছাচার চলছে। অল্প-স্বল্প গান জেনে কয়েকটি ভাড়াটিয়া লেখক যোগাড় করতে পারলে যত খুসি বড় ওস্তাদ হওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যেও কিছুদিন পূর্ব্বে এই অবস্থা ছিল কিন্তু সাহিত্যরসিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারস্পরিক অতিরঞ্জিত প্রশংসা বা নিন্দার প্রভাব অনেক কমে গিয়েছে। ফুটবল খেলায় হাজার অনুকূল আলোচনা দিয়েও যেমন খারাপ খেলোয়াড়কে দাঁড় করান যায় না, তেমনি সঙ্গীত সমাজেও একদিন পক্ষপাতশূন্য বিচার স্বাভাবিক ও সহজ হয়ে উঠবে।

এইখানে বলা ভাল ওস্তাদী গানের প্রতি যাঁদের কোন অনুরাগ বা মমতা নেই, তাঁরা প্রায়ই বিদ্রূপ বর্ষণ ক'রে সমালোচনারূপ কর্ত্তব্য শেষ করেন। ওস্তাদী গানের এবং ওস্তাদের ন্যায্য আলোচনা তীব্র হ'লেও ক্ষতি নেই, কিন্তু তার লক্ষ্য যেন না হয় ওস্তাদী গান নিঃশেষে লোপ করা। সর্ব্ববিষয়ে ওস্তাদ থাকা সামাজিক শ্রীবৃদ্ধিই সূচনা করে। ধ্বংসমূলক ও অনভিজ্ঞ আলোচনায় মুমূর্ষু বাঙালী ওস্তাদের দল যে প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে একথা বুঝতে দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। ওস্তাদের উপজীবিকা বর্ত্তমানে দাঁড়িয়েছে বালিকাদের ছমাসের মধ্যে বিবাহোপযোগী গান শিক্ষা দেওয়া এবং কনফারেন্স, রেডিয়ো ও গ্রামোফোনে কোনরকমে একবার উপস্থিত করিয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন। আবদুল করিম ও নাসিরুদ্দিন ওস্তাদদের নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতেন ব'লে সকলের ক্ষেত্রে সে অধিকার বর্ত্তায় না। কারণ ওস্তাদী গান যদি উঠে যেত আবদুল করিম বা নাসিরুদ্দিনের বেঁচে থাকবার কোন বিশেষ অর্থ থাকত না; উল্লিখিত সমালোচকদের মাত্র পরিহাসযোগ্য বিষয়-বিশেষের অভাব ঘটত।

হেমেন্দ্রলাল রায়

সিনেমা

য়ুরোপ বা আমেরিকার মত বাংলাদেশ সিনেমা-দ্বারা এখনও অতি-ভুক্তের অবস্থা প্রাপ্ত হয়নি। সে-সব দেশে সম্প্রতি সিনেমা-বিমুখতা সুস্পষ্ট, অন্ততপক্ষে যাদের সেখানে কিঞ্চিন্মাত্র চিত্তপ্রকর্ষের অভিমান আছে তারাই এই যান্ত্রিক আমোদ-ব্যবস্থার পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করছে। পাশ্চাত্য-বৃত্তির সমালোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর। ভারতীয় দর্শকদের নিকট সিনেমার সমাদর অব্যাহত, সিনেমার প্রতি আকর্ষণের তারতম্যের প্রশ্ন এ-দেশে অনুপস্থিত। বলাবাহুল্য অর্দ্ধ সামন্ততান্ত্রিক দেশে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রচার নৈরাশ্য এনে দেয় না।

কিন্তু দর্শকদের মোহ, আগ্রহ এবং সহনশীলতার সুযোগ লাভ করে' ভারতীয় সিনেমা-প্রতিষ্ঠানগুলো অবাধে স্বেচ্ছাচারিতা করে' যাচ্ছে, ছায়া-চিত্রের সঙ্কট এখানেই ঘনায়মান। প্রয়োগকর্ত্তাদের নির্ব্বুদ্ধিতায় যে-কোন মুহূর্ত্তে দর্শকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌তে পারে। অপরিণত অবস্থায়ই এই শিল্পের মৃত্যু সম্ভাবিত। সিনেমার সে-মৃত্যু অগ্রসর বিজ্ঞান টেলিভিশানের আর অপেক্ষা রাখ্‌বে না। কাজেই তা হবে অত্যন্ত অপমানকর।

মানসিক প্রকর্ষের ধ্বজাবাহী বলে' বাংলাদেশের একটা প্রসিদ্ধি আছে। সিনেমার ব্যাপারেও তার সে প্রসিদ্ধি অক্ষুণ্ণ বলেই আমাদের বিশ্বাস। কেননা বাংলাদেশ বাংলা-চিত্র ছাড়াও অবাঙালী চিত্র, এমন কি অভারতীয় চিত্রের একটি সমৃদ্ধ বাজার বলেই গণ্য হয়ে থাকে। ষ্টুডিও-মুক্তির অব্যবহিত পরই কোলকাতার বাজারে কোনো ছবি ছাড়্‌তে বোম্বের, কি ডেন্‌হামের, কি হলিউডের কার্পণ্য দেখা যায় না। বাঙালী দর্শক ইচ্ছা করলেই সিনেমা-শিল্পের প্রায় পরম উন্নতির সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের মত পরিচিত হতে পারে। রুশ চিত্র-পরিচালকদের মৌলিক শিল্পজ্ঞানের আস্বাদ না পেলেও আশার অধিক তৃপ্তি আমরা হলিউড-চিত্র থেকে পেয়ে আস্‌ছি। আমাদের যন্ত্রশিল্পজ্ঞান হলিউড-চিত্রের আঙ্গিক নিয়ে উচ্চবাচ্য করবার স্পর্দ্ধা রাখে না। এমন কি শিল্পকলাকে যন্ত্রের সাহায্যে রূপ দান করবার মন্ত্র যাঁদের জানা আছে, সেই বাঙালী চিত্র-পরিচালকেরাও হলিউড-চিত্রের সামান্যতম ত্রুটি আবিষ্কারে অসমর্থ। তারপর চিত্রের বিষয়বস্তু বা কাহিনী: পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক চিত্রে কালোপযোগী আচার-ব্যবহার এবং জাঁকজমকের এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয় যে বহুশ্রুত, বহুপঠিত কাহিনীগুলোও দর্শকের কাছে বিন্দুমাত্র ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে না। ঘটনা-সৃষ্টির পারদর্শিতায় সামাজিক চিত্রে তুচ্ছতম গল্পও মনোজ্ঞ চিত্র-রূপ ধারণ করে দেখ্‌তে পাই। বহু গল্পে সামাজিক সমস্যাও হয়ত উঁকি দিয়ে যায় কিন্তু তাতে কোথাও চিত্রত্বের হানি হয় না। ছায়াচিত্রের যা ধর্ম্ম—প্রাণবত্তা, বেগ, আবেগ—তাকে ম্লান করে' কোন সমস্যা চিত্রকে শ্লথ, মন্থর, নীরস এবং প্রাণহীন করে' তুল্‌তে স্বভাবতই দ্বিধা বোধ করে। চার্লি চ্যাপ্‌লিনের 'মডার্ণ-টাইম্‌স্' মার্ক্সবাদের প্রচার-চিত্র নয় অথচ কারখানার শ্রমিকদের প্রতি অকপট সহানুভূতি

তাতে অভিব্যক্ত; আবেগের ছোঁয়া লেগে কাহিনীটি শিল্পোপাদান হয়ে উঠেছে—রাষ্ট্রনীতির পুঁথি হয়ে পড়েনি। 'পিগ্‌মিলিয়নে'ও সমাজতন্ত্রবাদের সূত্র আবিষ্কার করা কঠিন নয় কিন্তু চিত্রত্বে তার রূঢ়তা অনেক প্রচ্ছন্ন, নম্র, ছায়ান্বিত হয়ে এসেছে।

'পিগ্‌মিলিয়নের' প্রযোজনা ইয়াঙ্কী চিত্র-সংগঠকদের মানসিক প্রগতিশীলতাও সূচনা করে। মানুষের আভিজাত্য বা প্রকর্ষ যে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর একান্ত নির্ভরশীল ধনতান্ত্রিক দেশ হয়েও এ সত্য প্রচার করতে আমেরিকা ইতস্তত করেনি। ধনী-দরিদ্রের আসন্ন সংঘর্ষের মুখে ধনিক আমেরিকা অনায়াসেই ফ্যাসিষ্ট ভাবপুষ্ট চিত্র পরিবেশন করতে পারে, কিন্তু সেই অসুস্থ বৃত্তির পরিচয় না দিয়ে সে মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। এই মানবতার সুর হলিউডের আধুনিক বহু চিত্রেই প্রবাহিত। ' গার্ল ডাউন ষ্টেয়ার ' দেখে মনে হয় দরিদ্রের প্রতি অশ্রদ্ধা অসুস্থ জ্ঞানেই হলিউড বর্জ্জন করে' চলেছে।

বৈদেশিক চিত্রের নাতিহ্রস্ব প্রশস্তি করার যে উদ্দেশ্য নেই তা নয়। সিনেমার এই প্রগতি প্রত্যক্ষ করেও বাংলাদেশ চিত্র-গঠনে শোচনীয়রূপে অনগ্রসর। বাংলাচিত্রের অমার্জ্জিত আঙ্গিকের উল্লেখ অনাবশ্যক, কেননা অনেক ক্ষেত্রেই চিত্র-পরিচালক আপন অজ্ঞতা গোপন করে' প্রয়োগকর্ত্তার ব্যয়কুণ্ঠার অপবাদ দিয়ে অব্যাহতি পেতে চাইবে। এবং যেহেতু এ অপবাদ আংশিক সত্য, আর তাছাড়া বাংলাদেশকে আমরা দরিদ্র বলে' জানি, তাই আঙ্গিকের উৎকর্ষাপকর্ষের সমালোচনা আমাদের স্থগিত রাখতে হয়। তবে ঘি ছাড়া পোলাও রাঁধবার চেষ্টাকে মুখে সাধু বল্‌লেও, যুক্তিতে জানি ওটা হাস্যকর।

চিত্রের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে আমরা চিত্র-সংগঠকদের যথার্থ জ্ঞান এবং রুচির পরিচয় পাই। অধিকাংশ বাংলা চিত্রই পৌরাণিক আখ্যায়িকার বাহন। কিন্তু পৌরাণিক যুগকে যথাযথ চিত্রিত করবার প্রয়াস অধিকাংশ চিত্রেই অনুপস্থিত। মনে হয় যাত্রার আসর ভেঙেই আমরা ক্যামেরা আর সাউণ্ডট্র্যাক্‌ নিয়ে ছুটাছুটি করছি, তার মধ্যে নাটকের যুগ আর আসেনি। রাধাফিল্ম কোম্পানী একের পর এক অজস্র পৌরাণিক চিত্র প্রয়োগ করে' চলেছে, যেন ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সমাজ বল্‌তে কিছুই নেই, যা কিছু ছিল অতীতেই। তবু পৌরাণিক চিত্রকে একপ্রকার নিরুপদ্রব বলা যায়। সামাজিক চিত্রে যাঁরা হস্তক্ষেপ করেছেন তাঁদের বিকৃত জ্ঞান দর্শকের মনকে উত্তরোত্তর অসুস্থ করে' তুলছে। বৈদেশিক চিত্র 'পিগ্‌মিলিয়ান' হ'তে দরিদ্র বাংলাদেশ যে আশ্বাস পেতে পারে, বাংলা ছবি ত তেমন কিছু দেয়ইনি বরং নিউ থিয়েটার্সের 'অধিকার' সন্ত্রস্ত ধনিকসভ্যতার দিনেও দারিদ্র্যের উপর ধনিকের কষাঘাত চালিয়ে আত্মপ্রকাশের স্পর্দ্ধা করেছে। বাংলা সামাজিক চিত্রের উপাদান যখন বৈদেশিক গল্প হতেই আহৃত হয় তখন বৈদেশিক মননশীলতার সন্ধান করলে চিত্র-পরিচালকদের জাতিচ্যুতি হবে না নিঃসন্দেহ, বরং তাতে শিল্পজ্ঞানের উন্নতি এবং সমাজের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

আর বৈদেশিক গল্পকেই বা যে কেন বাংলা চিত্রে ঠেসেঠুসে খাপ খাইয়ে দিতে হবে তার কোন অর্থ আমরা খুঁজে পাইনে। বাঙালীর কি নিজস্ব সমাজ নেই, তাতে সমস্যা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখের কাহিনী নেই? তাকে রূপায়িত করেছে এমন ত বহুচিত্র

আমরা দেখিনি। শরৎচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের কল্পনার বাইরেও বাঙালীর সমাজ আছে—কোনো চিত্র-প্রতিষ্ঠান সে সমাজের সন্ধান করেনি। বর্ত্তমানের দিকে চোখ বুঁজে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্র-প্রতিষ্ঠান নিউথিয়েটার্স ইদানীংও প্রাচীন বাংলার সাপুড়েদের একটি কাহিনীকে চিত্রে রূপায়িত করেছে। প্রাচীন বাংলার সাপুড়ে-জীবন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য অবান্তর নয় মানি—কিন্তু 'সাপুড়ে' চিত্রেও কি বাংলাদেশ যথার্থভাবে চিত্রিত হয়েছে? সাপুড়েদের কুস্তিগীরের মত মেদবহুল চেহারা, চীনাদের মত মুখাবয়ব, কাফ্রি এবং সাঁওতালী আচার এবং নৃত্য আন্তর্জাতিকতার পরিচায়ক হ'তে পারে কিন্তু বাংলাদেশের রূপ তা নয়। ক্যামেরা, মাইক এবং সেলুলয়েড হাতে পেয়ে যথেচ্ছাচারিতা করবার নাম যে সিনেমা শিল্প নয়, বৈদেশিক চিত্র-সাফল্যের পরও যদি বাঙালী প্রযোজক ও পরিচালকের এ চৈতন্যোদয় না হয় তবে বাংলা-চিত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

আ

সমালোচনা

স্বগত—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ভারতী-ভবন। দাম আড়াই টাকা।

স্বগতের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নয়, কারণ স্বগত সমালোচনার সমষ্টি, এবং সমালোচনার সমালোচনা সুরু করলে তার শেষ সহজে হবে না। তাই স্বগতে যে সমস্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে কিছু বলবার চেষ্টা না ক'রে স্বগতের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে দুয়েকটী কথা বলাই বোধ হয় সঙ্গত।

বাংলায় সমালোচনা-সাহিত্যের দৈন্য সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত ব্যাপারেই ব্যতিক্রম, তাই তাঁর কথা ছেড়ে দিলে এ অভিযোগের সত্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। মাঝে মাঝে দুয়েকজন লেখক সমালোচনার চেষ্টা হয়তো করেছেন, কিন্তু সে চেষ্টা এত বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন যে বাংলা সাহিত্যে তার বিশেষ কোন দাগ পড়েনি। এককালে বিচিত্রা "সহযোগী সাহিত্যে" বাংলায় সমালোচনার নতুন রীতি প্রবর্ত্তন করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে প্রচেষ্টায় যতখানি আশার সঞ্চার হয়েছিল, সিদ্ধি ততখানি হয়নি। "শনিবারের চিঠি"র নামও এ প্রসঙ্গে করা চলে, যদিও অনেকের কাছেই হয়তো তা বিচিত্র ঠেকবে। তবু গোড়ার দিকে "শনিবারের চিঠি"র মধ্যে সাহিত্যিক মুক্তবুদ্ধির পরিচয় যে দেখা দিয়েছিল, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে "শনিবারের চিঠি"তে বুদ্ধির দীপ্তি থাকলেও বুদ্ধির সার্ব্বজনীনতা ছিল না। তাই অল্পদিনের মধ্যেই ব্যক্তিগত মতামত ও সংস্কারের প্রাবল্যে বুদ্ধির মুক্তির সে সাধনা চাপা পড়ে গেল। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের এ দুর্ভিক্ষের দিনে "স্বগতের" আবির্ভাব তাই স্বাগত।

সুধীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে জীবন এবং সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখেননি। জীবন এবং সাহিত্যের যোগ সত্যকারের রূপকারের দৃষ্টি কোনদিনই এড়ায়নি, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক বিদ্রোহের ফলে সে সম্বন্ধে অনেকেরই দৃষ্টিভ্রম হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার দিনে ব্যক্তির স্বাধীনতা ঘোষণার হয়তো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কোনো কোন ক্ষেত্রে সে বিদ্রোহ নৈরাশ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের বেলায় একথা খাটে, কারণ পরাধীন জাতি ইংরাজের কল্পনা-বিলাসের প্রাবল্যই দেখেছে, তার সংহতি বা গভীরতা দেখেনি। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বেচ্ছাবিলাসী কবিদের অনুকরণে আমরাও ভেবেছি যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরাকাষ্ঠায়ই সাহিত্যের চরম বিকাশ। এটা আশার কথা যে সুধীন্দ্রনাথ বাঙালীসুলভ সে সহজ ভুল করেননি, এবং তারই ফলে তাঁর কাব্যজিজ্ঞাসার মধ্যে ব্যক্তিস্বরূপের মহিমা গানের সঙ্গে সঙ্গে উঠেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বর্জ্জনের চেষ্টা। কতদূর তিনি সফল হয়েছেন, সে প্রশ্ন তোলা অবান্তর, কিন্তু সে চেষ্টা যে তিনি করেছেন, তাতেই প্রমাণ হয় যে বাংলা সাহিত্যে স্বেচ্ছাবিলাসের যুগ বোধ হয় ফুরিয়ে এল।

তবু সুধীন্দ্রনাথের মন যে সম্পূর্ণভাবে রোমান্টিক মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তারও প্রমাণ "স্বগতে" মিলবে। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ তিনি মেনে নিয়েছেন, কিন্তু নিষ্ক্রিয়ভাবে সে যোগ লক্ষ্য করেই তিনি ক্ষান্ত। সে যোগের সক্রিয়তাকে স্বীকার ক'রে নিলে জীবন এবং সাহিত্যের পরস্পরের উপর প্রভাব তীব্র হয়ে উঠে, কিন্তু তার ফলে সাহিত্যিকের মায়াবিলাসের অবকাশ থাকে না, সামাজিক উপযোগিতার মানদণ্ডে সাহিত্যের বিচার অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়ায়। সে-কথা সুধীন্দ্রনাথ স্বীকার করতে চাননি, এবং বোধ হয় পারেনও না, কারণ সে-কথা স্বীকার করলে তাঁর সাহিত্যজিজ্ঞাসার সামাজিক মূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠাও অবশ্যম্ভাবী।

নানা ভাষা এবং নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাই সুধীন্দ্রনাথের কাব্যজিজ্ঞাসা মনকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দেয় না,—এক একবার সন্দেহ জাগে সে পাণ্ডিত্যও বুঝি বা স্বেচ্ছাবিলাসেরই রূপান্তর। নৈরাত্মরীতির সাধনাও তখন হয়ে দাঁড়ায় বাস্তবকে অস্বীকার করবার পন্থাবিশেষ, এবং ফলে পাণ্ডিত্যের বিপুল সম্ভার কাব্যজিজ্ঞাসাকে সময় সময় বাধাই দেয়। এক কথায় জ্ঞানকে সংগঠিত করবার জন্য যেমন সূত্রের প্রয়োজন, সাহিত্য সাধনাকেও সজীব করবার জন্য প্রয়োজন সামাজিক সংহতি এবং রূপকারের চিত্তে তারই প্রতিচ্ছায়া। সুধীন্দ্রনাথ যে সমাজের নাগরিক, তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন আশা তাঁর নেই, অথচ তার পরিবর্ত্তে কোন নতুন সমাজস্বপ্নও আজ পর্য্যন্ত তাঁর মনে নতুন উদ্দীপনা আনেনি। তাই অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে তিনি মগ্ন: ব্যক্তি এবং সমাজের বিভিন্ন বিকাশ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে আহরণ ক'রে তাদের মূল্য বিচারের জন্য উন্মুখ, কিন্তু মূল্য বিচারের জন্য প্রয়োজন যে মানদণ্ড, সে মানদণ্ডের অভাবে তাঁর সমস্ত প্রয়াসের মধ্যে ব্যর্থতার স্পষ্ট ইঙ্গিত।

সুধীন্দ্রনাথের ভাষার জটিলতা প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তিনি নিজেও সূচনায় সে "দুর্বোধ্যতার" প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু তাঁর মানসের যে সংগঠন ও পরিণতি, তাতে তাঁর ভাষা জটিল না হয়ে পারে না। অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণের তাঁর যে সাধনা, তার প্রতিপদে মণ্ডলাকার প্রগতির লক্ষণ সুস্পষ্ট, এবং তার ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা সত্ত্বেও তাঁর রচনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়জয়কার। ভাষার ব্যাপারেও তাঁর মনের এ দোটানা মরমী পাঠকের কাছে ধরা পড়বে। অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করেই তাঁর ভাষা জটিল, কিন্তু সে জটিলতাকে আরো জটিল ক'রে তুলেছে পৌরুষের সাধনার সঙ্গে উপমাবাহুল্যের অসঙ্গতি।

দোষেগুণে মিলিয়ে বাংলার সমালোচনা সাহিত্যে "স্বগতের" আবির্ভাব স্মরণীয়। সংস্কৃতির সঙ্কটের দিনে মরমী চিত্তে সাহিত্য এবং সমাজের বিবিধ সমস্যা যে সমস্ত প্রশ্ন জাগিয়েছে, সাহিত্য হিসাবেও তার মূল্য কম নয়, কিন্তু নতুন সমালোচনা রীতির ইঙ্গিত তাঁর মধ্যে রয়েছে ব'লে তার মূল্য আরো বেশী। আমাদের অলস ভাববিলাসের ভিত্তিতে আঘাত করেছে, স্বগতের সার্থকতা এইখানে।

সুধাময় রায়

পাতাল কন্যা ঃ অজিত দত্ত। কবিতা ভবন। প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৩৮। দাম দেড় টাকা।

একদিকে ইচ্ছামৃত্যু রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে উচ্ছিষ্ট পরিবেশক নানাবিধ কবিসম্প্রদায়, এর ভেতরে অজিতবাবুর কৃশাঙ্গী কাব্যদেবী যে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিতা থেকে আজও বেঁচে আছেন, দেখে পরিতৃপ্ত হওয়া গেল। 'কুসুমের মাস' ও 'পাতাল কন্যা'র মধ্যে আট বছরের ব্যবধান। প্রথম বইয়ের সহজ ও সুখপাঠ্য কবিতা তাঁকে কবিসমাজে পরিচিত করেছিল। এই আট বছরের মধ্যে অতি আধুনিক চিন্তাজগতের পন্থাবিপর্য্যয়ে তিনি পথ হারাননি। রবিবাবুর অন্ধ অনুকরণের সলিল সমাধি, অথবা দুর্ব্বোধ্য, জটিল, উত্তম মধ্যম বামউগ্র ইত্যাদি বিবিধ পন্থার বিভীষিকা, এই দুই রকমের সমূহ সর্ব্বনাশ বাঁচিয়ে তিনি পূর্ণতর প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে এসেছেন। পাতাল কন্যার কবিতা সহজ ও সাবলীল ত বটেই, আমার মনে হয় রচনা সৌকর্য্যে অনেক বেশী পরিণত।

অজিতবাবু রোম্যাণ্টিক, অজিতবাবু কল্পনাপ্রবণ তথা এস্কেপিষ্ট্, বহুস্থানে তাঁর এই সব বিচ্যুতিগুলির উল্লেখ শুনেছি। তৎসত্ত্বেও একথা স্বীকার্য্য যে তাঁর এই সব দোষজর্জ্জর কবিতাগুলি সত্যিকারের কবিতা। পাতাল কন্যায় অবশ্য অন্য স্বাতের কবিতাও আছে, যেমন "মিস্—" এবং বিদ্রূপাত্মক আরো গুটিকয়েক। সবরকমের কবিতাই সমান সুখপাঠ্য।

পাতাল কন্যার প্রথম কবিতা কটিতে কবি একটি রূপকথার জগৎ সৃষ্টি করেছেন। পড়তে গিয়ে ছেলেবেলায় পড়া ঠাকু'মার ঝুলির কথা মনে পড়ে। মনে আছে, ঐ বইয়ের কাহিনীগুলি একদা উদ্দাম প্রবাহে মনকে আলোড়িত করেছিল। অজিতবাবুর বইয়ের রূপকথায় মনের শুকিয়ে যাওয়া উৎসমুখে সেই অনেক দিনের চেনা কল্পনাধারার প্লাবন জাগে— সেই দেশে মন গিয়ে পৌঁছয়,

> যে দেশে পাষাণপুরী, মানুষের চোখের পাতাও
> অযুত বৎসরে যেথা নাহি কাঁপে ঈষৎ স্পন্দনে,
> হীরার কুসুম ফলে যে দেশের সোনার কাননে,

এই মায়ালোক থেকে আমরা নির্ব্বাসিত হয়েছি কিন্তু কবি হননি। সেই মায়ালোকের মায়াবিনীর সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়, তাই তাঁর সাবধান বাণী,—

> "কখনো, আমার পরে, তুমি যদি সেই রাজ্যে যাও,
> তা হলে, তোমারে কহি, সে দেশে যে পাশাবতী আছে,
> মায়ার পাশাতে যেই জিনে লয় মানুষের প্রাণ,
> মোহিনী সে অপরূপ রূপময়ী মায়াবীর কাছে
> কহিয়া আমার নাম শুধাইয়ো আমার সন্ধান;
> সাবধানে যেয়ো সেথা, চোখে তব মোহ নামে পাছে,
> পাছে তার মৃদু কণ্ঠে শোনো তুমি অরণ্যের গান।"

তবে অজিতবাবুর কবিতার রূপকথা অনেক বেশী রসঘন, পরিতৃপ্তি অনেক বেশী সংহত,—অপরিণত মনে কুহক জাগানো বর্ণনাবহুল জাতের নয়। এতে কথা অল্প, ইঙ্গিত স্পষ্ট, আলোড়ন সবল, যাতে বুদ্ধিবিধ্বস্ত প্রবীণ মনেও স্বপ্নের রং লাগে।

অজিত দত্তের সৌন্দর্য্যান্বেষী মন কল্পনার উন্মুক্ত বিহারে উত্তরোত্তর এগিয়ে চলেছে। রূপকথার জগৎ পার হতে না হতে পরীস্থানের অলৌকিক লোক, সেখানে থাকে কারা?

পরী যারা শীতল শিশিরে
সাঁঝ হলে মুখ ধোয় দিবসের ঘুম থেকে উঠে
আকাশের সব তারা যে পরীরা নিয়ে যায় লুটে।
যদি তুমি কোনো দিন পাহাড়ের কিনারে কিনারে
গভীর বনের পাশে, বিশাল মাঠের মাঝখানে
একা একা ঘুরে থাকো, তবে তুমি দেখিয়াছ তারে,
তাদের গলার স্বর তবে তুমি শুনিয়াছো কানে।
যদি তুমি সেথা গিয়ে বলে থাকো,—'কে আছো এখানে?'
'কে আছো এখানে' বলে তারা সব হেসেছে তখন,
তাদের হাসির শব্দে কেঁপেছে পাহাড়, মাঠ, বন।

এ কবিতা পড়তে গা ছম্ ছম্ ক'রে ওঠে, ভয় ভয় করে। কিন্তু সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যে মন অভিভূত না হয়ে পারে না।

অজিতবাবুর কল্পনা-বিলাসী মনও যে বাস্তব সচেতন হতে জানে, পাতাল কন্যার বিদ্রূপ কবিতা ও আরো দু-একটি কবিতায় তার পরিচয় পাই। 'বড়বাজার' কবিতা আমার ভালো লাগেনি। এটি অজিতবাবুর স্বধর্ম্মী রচনা নয়। কিন্তু 'পুলিশ' কবিতাটি বড়ো ভালো,—

রাত্রির বিজন বনে পরীদল খেলা করে রোজ
গাছের পাতারা ডেকে কথা কয়, পাখী দেয় শিষ্,
তার মাঝে সারারাত চোরের ভাবনা ভেবে জাগে
রাস্তার পাহারা পুলিশ!

আহা, বেচারা পুলিশ!

হালকা ব্যঙ্গ কবিতায় তাঁর সহজাত শব্দ-সম্পদ ও সহজ কাব্যরসের সার্থক সমন্বয় হয়েছে। ফলে আমরা গুটিকয়েক কবিতা পড়তে পেলাম, যাতে বিদ্রূপ আছে, রসিকতা আছে, সর্ব্বোপরি উপভোগ্য কাব্যরস আছে।

পত্রান্তরে বুদ্ধদেব বসু মহাশয় কবিকে সব রকমের কবিতাই আরো লিখ্‌তে অনুরোধ করেছেন। আমিও কবিকে একটি অনুরোধ জানিয়ে এ আলোচনা শেষ করি। তিনি যেন

দিয়া করে মোটেই বেশী না লেখেন। তিনি যেন অল্প লেখেন, এবং পাতাল কন্যায় যেমন লিখেছেন, তেমনি সত্যিকারের ভালো কবিতা লেখেন, কারণ আমি মনে করি যে অজিত দত্তের কবিতার অন্যান্য গুণের মধ্যে রচনার স্বল্পতাও একটি প্রধান গুণ।

মণীশ ঘটক

THE CRISIS IN PHYSICS by Christopher Caudwell (Bodley Head, 7/6).

ত্রিশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই কডওয়েলের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু এই অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি যে-পরিমাণ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার চেয়ে দ্বিগুণ জীবনেও অনেকে তাহা পারে না। সাহিত্যকে তিনি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহার সমস্ত রচনার মধ্যেই নিগূঢ় সামাজিক প্রীতি। তাঁহার বিশ্বাস যে উৎপাদন প্রণালীর তারতম্যে যে কেবলমাত্র সমাজের বাহ্যিক সংগঠন বদলায়, তাহা নহে, সে তারতম্যের ফলে সমাজ-মানসের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতপক্ষে তাঁহার মতে সমাজ সংগঠন ও সমাজ-মানসকে পৃথক করিয়া দেখাও ভুল। সমাজের সংগঠন সমাজ-মানসের প্রকাশের ফল, এবং অন্য পক্ষে সমাজ-মানস সমাজ সংগঠনের প্রতিচ্ছায়া। প্রকৃতপক্ষে সমাজ সংগঠন বা সমাজ-মানসকে এই ভাবে পৃথিবীর বস্তুবৈচিত্র্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইতে বাধ্য, কারণ মানুষ বিশ্বের অন্যান্য বাস্তব সত্তার সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে যুক্ত এবং সেইজন্য সমাজ সংগঠন, সমাজ-মানস সমস্তই বিশ্বব্যাপারের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আমরা যাহাকে প্রকৃতি বলি, একমাত্র তাহারই সত্তা স্বীকার করা চলে। নির্গুণ ব্রহ্মের কল্পনাও ভ্রান্তিবিলাস, তাই নির্গুণ ব্রহ্মের স্বভাব বিচার করিতে বসিয়াই আমরা প্রমাণ করি যে ব্রহ্মের যেটুকু জ্ঞেয় বা প্রকৃতি, তাহারি সম্বন্ধে কথা বলা চলে, এবং অজ্ঞেয় বা অনির্ব্বচনীয়ের নামোল্লেখও স্ববিরোধী। এই স্ববিরোধেরও পার্থিব কারণ রহিয়াছে, এবং কডওয়েলের মতে সেই কারণের বিচারেই আমাদের দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ের ব্যর্থতা স্পষ্ট করিয়া ধরা দেয়।

বর্ত্তমান সমাজের উৎপাদন প্রণালীর মধ্যেও স্ববিরোধ, কারণ শ্রমবিভাগের ফলে সামাজিক সহযোগিতা ভিন্ন কোন দ্রব্যেরই উৎপাদন সম্ভবপর নহে। শ্রমবিভাগে যে কাগজ তৈরী করে, ছাপাখানার লোকে তাহার সঙ্গে সহযোগিতার ফলেই পুস্তক প্রকাশিত হয়, কিন্তু এই সামাজিক সহযোগিতা সত্ত্বেও বর্ত্তমান সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির দাবী আমাদের ঘাড়ে চাপে। কৃষিনির্ভর সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্থান থাকিলেও থাকিতে পারে, কারণ ব্যক্তি বা পরিবারের পরিশ্রমে সে সমাজে জীবিকা নির্ব্বাহ চলে। কিন্তু বাণিজ্য বা শিল্প-নির্ভর সমাজে তাহা সম্ভবপর নহে, ব্যক্তি বা পরিবারের শ্রমে সেখানে একদিনের জন্যও জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না। কডওয়েলের মতে এই স্ববিরোধ বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ সংগঠনের

মূলকথা, এবং সেই জন্য সমাজ-মানসেও তাহা সহস্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পদার্থ বিদ্যায় মানসকে একেবারে বাদ দিয়া প্রকৃতিকে জানিবার চেষ্টা, অন্যপক্ষে বিজ্ঞানবাদে বস্তুকে বাদ দিয়া মানসের ক্রীয়াকলাপের মধ্যে ব্রহ্মের সত্তার সন্ধান।

ধনতন্ত্রের স্ববিরোধ সমাজে আত্মপ্রকাশ করিতে সময় লাগে, বিজ্ঞানেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। যতদিন ধনতন্ত্র বর্দ্ধনশীল ছিল, ধনতন্ত্র প্রভাবিত এ দ্বৈত মনোবৃত্তিতে বিজ্ঞান-সাধনার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু ধনতন্ত্রের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানেও আজ সন্দেহ এবং দ্বিধা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহার ফলে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও আজ বিস্ময়কর-মতবিরোধ এবং লক্ষ্যভ্রান্তি। কেহ বা বিজ্ঞানের নিশ্চয়তার বদলে আধ্যাত্মিক স্বপ্নবিলাস লইয়া ব্যস্ত, কেহ বা বিজ্ঞানের নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে দেখিতেছেন নূতন স্বাধীনতার সম্ভাবনা। কডওয়েলের কৃতিত্ব এইখানে যে এই বিরোধকে তিনি ধনতন্ত্রের বিরোধের সঙ্গে সমধর্ম্মীয় বলিয়া দেখিয়াছেন, বুঝিয়াছেন যে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকবাদও যান্ত্রিকতার চরম উৎকর্ষ মাত্র।

সামাজিক বোধের যে গভীরতা থাকিলে অভিজ্ঞতার সমস্ত অঙ্গের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহারই অন্য নাম প্রতিভা। সেই প্রতিভা ছিল বলিয়াই দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত না হইয়াও কডওয়েল সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের পরস্পরের নিগূঢ় সম্বন্ধ ধরিতে পারিয়াছিলেন। তরুণ বয়সে স্পেনের রণক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু তাই ইয়োরোপিয় সভ্যতার দুর্ভাগ্য, কারণ এই বয়সেই তিনি যে সাধনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার পরিণতি আমাদের বিশ্বদৃষ্টিকে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধতর করিত। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাহার মৃত্যুকে নিয়তি বলা চলে, কারণ যে সামাজিক প্রেরণার বলে তিনি অভিজ্ঞতার মূলসূত্র এত সহজে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন, সেই প্রেরণাতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতার যে যুদ্ধ, বিশ্ব-সভ্যতাকে বাঁচাইতে হইলে সে যুদ্ধে জয়লাভ করিতেই হইবে। আপাত দৃষ্টিতে কডওয়েলের জীবনদান ব্যর্থ, স্পেনে দানবশক্তির কাছে মানবশক্তির পরাজয় হইয়াছে, কিন্তু কে জানে, হয়তো সেই পরাজয়ের মধ্যেই নতুন সাধনা এবং জয়ের ইঙ্গিত লুকাইত?

আবদুল মালেক

অনুকথা সপ্তক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী। ভারতী ভবন। দাম একটাকা।

প্রমথ চৌধুরী-মহাশয় যে জহুরী গল্প-লিখিয়ে, সে কথা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। "আহুতি" অথবা "ঘোষালের ত্রিকথা"র লেখক পরিচিতির প্রতীক্ষা করেন না। কিন্তু তাঁর রচনার আলোচনা ও রূপ-পরীষ্টির সময় উত্তীর্ণপ্রায়। বাংলা সাহিত্যে একেবারে শীর্ষস্থানীয় গল্পলেখক মাত্র যে কয়জন আছেন, তিনি তাঁদেরই অন্যতম। শুধু তাই নয়, ভাষার রাজ্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন ধারা ও লিখনভঙ্গীর জনয়িতা হিসেবে তিনি আমাদের সাহিত্যে অগ্রণী। অথচ এ কথা সত্য যে তিনি জনপ্রিয় লেখক নন্ এবং হয়ত সাধারণ

লোকে তাঁর নাম জানে, কিন্তু তাঁর বই ভালো ক'রে পড়ে না। তাঁর বইয়ের কাটতি এতো আশ্চর্য্যরকমের কম যে অতি অল্পসংখ্যক পাঠকেরই কাছে তাঁর নাম-করা সব বইগুলি পাওয়া যাবে। এমন ব্যাপার কেন ঘটছে, সে প্রশ্নের অন্ততঃ একটি উত্তর হল : চৌধুরী মহাশয়ের গল্পে রস আছে কিন্তু সস্তা উচ্ছ্বাস নেই। "চার-ইয়ারী কথা" থেকে সুরু ক'রে তাঁর সদ্য-প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে যে গল্প-বস্তু আছে, সেটা মুখ্য নয় গৌণ। অপূর্ব্ব সংযম অথচ অকল্প বাক্‌চাতুর্য্য দিয়ে তিনি যে জীবন ও চরিত্রের একটা দিক্ চিত্রিত করেছেন, তার মধ্যে আর যাই আনুষঙ্গিক থাক্, ভাবের বিনুনী নেই। প্রমথ বাবুর আঙ্গিক ও পদ্ধতি দুটো জিনিষই কঠিন এবং বুদ্ধি-মার্গীয়। তিনি সর্ব্বতোভাবে রসের প্রাধান্য স্বীকার করেন, যা কিছু ইঙ্গিত, চমক, সে তাঁর কথায় ও শিল্পে; কাজেই এ-হেন মানুষের লেখায় গতি-নেশাগ্রস্ত পাঠক প্রতিপদেই হোঁচট্ খায়। এবং যে বাঙালী পাঠক ধার ক'রে বই পড়ে থাকে, সে যে শক্ত জিনিষ চিবুতে নারাজ এটা সহজেই বোধগম্য।

"অনুকথা সপ্তক" সাতটি ছোট গল্পের সঙ্কলন। বিচক্ষণ পাঠক লক্ষ্য করবেন যে গল্পগুলি এতো ছোট যে আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা শেষ হয়ে যায়। হয়ত আমরা সে-কালের ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত-সম্প্রদায়ের একটু পরিচয় পেতে বসেছি, অথবা একটা কাহিনীর আবেষ্টনীতে মাত্র প্রবেশ করেছি, এমন সময় লেখক সেখানে যবনিকা টেনে দিলেন। তখন আমরা ভাবি, গল্পের শেষে লেখকের ছোট বক্তব্যটি। তাঁর মুখবন্ধটা থাকে শেষকালে এবং তার ইঙ্গিত জোরালো, সেইজন্য তার প্রভাব থাকে অনেকক্ষণ।

আসল কথা, প্রমথ বাবু কথাসাহিত্যে রীতির পক্ষপাতী। সেইজন্য তাঁর গল্পগুলি, কি ছোট, কি বড়, তাঁর নিজস্ব পদ্ধতির উদাহরণ বিশেষ। তাদের মধ্যে একটানা গতি নেই, কিন্তু যতি আছে, সেটা বড় শিল্পীরাই কথোপকথনের সাহায্যে আন্‌তে পারেন। আর চরিত্র-গুলি নিজেরাই নিজেদের সূক্ষ্ম দিক্‌টা ফুটিয়ে তোলে, যেটা সাধারণ পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়। প্রমথ বাবুর গল্পে থাকে শ্লেষ ও পদবিন্যাস, উচ্চাঙ্গের রসিকতা, আর গাঢ় বন্ধ ও সংহতি। তাঁর উৎকৃষ্ট গল্পগুলিকে এককেটি ধ্রুপদ গান বলা যেতে পারে। কখনো কখনো তিনি খেয়ালের পদ্ধতি অনুসরণ করেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে কোথাও দায়িত্বহীন তানের অবসর দেন না। সংস্কৃত সাহিত্যের উপমা দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় যে তাঁর গল্পগুলি আত্মসচেতন কাব্যশিল্পমার্গের বিষয়ীভূত। তবে কবি জড়োয়া অলঙ্কারে বিশ্বাস করেন না; তাঁর স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে এককেটি দানা বাঁধা স্বচ্ছ মুক্তাকে কেন্দ্র ক'রে কার্য্যকারণ-যুক্ত একাবলী-রচনার প্রতি!

"অনুকথা সপ্তকের" মধ্যে 'স্বল্প গল্প'টি আমার বিশেষ ভালো লেগেছে, তার কারণ কুমার বাহাদুরের চরিত্র অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আর বাকী গল্পগুলির মধ্যে 'মেরি ক্রিস্‌মাস্' ও 'প্রগতি রহস্য' তাদের কলানৈপুণ্যে আমায় মুগ্ধ করেছে। শেষোক্ত গল্পটি লুপ্তপ্রায় মাইকেল যুগের ইংরেজী শিক্ষানবীশদের জীবনধারা ও ধারণার ওপর অতি চমৎকার ভাষ্য! প্রমথ বাবু যে-আগুন নিয়ে 'আহুতি' জ্বালিয়েছিলেন অথবা যে-সুর দিয়ে 'বীণাবাই'-

এর অর্চনা করেছিলেন, 'অনুকথা সপ্তকের' বিষয়বস্তু অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ও স্বল্পায়তন হলেও, তাতে সে স্ফুলিঙ্গ অথবা রেশের জের আছে।

কথাসাহিত্যে প্রমথবাবুর উপাস্য হলেন লঘুপদা সরস্বতী। অধিকন্তু, তাঁর রচনাতে ফরাসী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের ছোঁয়াচ আছে। "অনুকথা সপ্তক" শেষ ক'রে আমার বারবার মনে পড়েছে Maurois কৃত Ricochets-এর কথা। প্রমথবাবুর ছোট্ট গল্পগুলি জলের ওপর ছোঁড়াগুলির মতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় সত্য, কিন্তু তারা ভরাট্—অযথা ধূমোদ্গারী নয়।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ধূলি-ধূসর—লেখক : প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রকাশক : মিত্র এণ্ড ঘোষ, দাম দেড় টাকা।

ছোট গল্পের বই ; পড়তে বসে' প্রথম মনে হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্র এবার বুঝি একটু অবসরের বিলাস চান। কারণ, এর আগে তাঁর যে সব গল্প ও উপন্যাস পড়েছি তা প্রধানতঃই সংগ্রামের, অধিকাংশর নায়ক-নায়িকাই রূঢ় বাস্তব জগতের, জীবিকা ও জীবনের জন্যে প্রাণপাত করতে চায়। অথচ আলোচ্য বই-এর প্রথম গল্প "একটি রাত" স্পষ্টই জানায় যে লেখকের মধ্যে একটা অবসাদ এসেছে বুঝি, তাই বাস্তব পৃথিবী ছেড়ে স্বপ্নে তিনি ইচ্ছাপূরণ খুঁজছেন। গল্পের আবেষ্টনী যদিও কোলকাতারই পথঘাট, তবু সেই রাতের কুয়াশা তাতে যাদু এনেছে, এবং নায়ক-নায়িকার দেখা হ'ল উগ্র অসম্ভব ভাবে। তারপর তাদের কথাবার্ত্তা আমরা জীবনে পাঁচজনের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলি তার কাছাকাছিও নয় যেন। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক :

> "—বিশ্বাস করতে পার, আমিও তোমার জন্যে ওৎ পেতে ছিলাম না ওই নির্জন রাস্তায়।"
> "বিশ্বাস না করতে পারলেই খুসী হতাম যে!"
> "তা হতে পারে। তোমার অহঙ্কারের সীমা নেই!"
> "সে অহঙ্কারকে তুমিই যে প্রশ্রয় দিচ্ছ মীরা!"
> "প্রশ্রয়ের অপেক্ষা তুমি রাখ না।"
> "আমার ওপর বড় বেশী অবিচার করছ নাকি?"

এ কথা খুবই স্পষ্ট যে প্রাত্যহিক জীবনে এমন নাটকীয় রং চড়ানো কথাবার্ত্তা আমরা বড় একটা বলে' উঠতে পারি নে' ; তাই একে ফাঁপা বলে' মনে হওয়া অসঙ্গত নয় হয়ত। অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র এ ধরণের কথাবার্ত্তার পটভূমি হিসেবে যে নাটকীয় পরিস্থিতি গড়ে তুলেছেন তাও অলৌকিকের মত দুর্লভ। তাই হয়ত পাঠকের মন এমন কিছুর জন্যেও প্রস্তুত হয়ে থাকবে যাতে প্রলাপকেও সংলাপ বলে' মনে হতে পারে।

অথচ প্রেমেন্দ্র মিত্রের আগেকার লেখায় কী বলিষ্ঠ বাস্তবতা। তাই সহজেই আমার মনে হয়েছে তিনি এবার একটু অবসর চান, এবং সমাজ সম্বন্ধে স্পষ্ট সচেতন থাকলে সে

অবসর পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ সেখানে মানুষের বিক্ষুব্ধ মিছিল। ফলে কল্পনানির্ভরই তাঁকে হতে হয়েছে। অথচ এ ধরণের অবাস্তব পরিস্থিতি এতই দুর্ব্বল যে প্রেমেন্দ্রবাবুর প্রতিভাকে পুরো মূল্য দিতে পারা ত' দূরের কথা, এমন কি চলনসই ভদ্র সম্মান দিয়েও হয়ত উঠ্‌তে পারে না। আমার ত' মনে হয় এ এক ধরণের বিজিত মনোভাবের অভিব্যক্তি।

অবশ্য কেন যে এ ধরণের ভাবালুতা বাংলার অধিকাংশ সাহিত্যিকদের মধ্যে আজ এসে পড়ছে তার কারণও খুব অস্পষ্ট নয়। কারণ বাংলার অধিকাংশ আধুনিক সাহিত্যিকই সুরু করেন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন নিয়ে। অথচ তার মধ্যে সাহিত্যের যে উপাদান আছে অনেক লেখকের কাছেই তা প্রায় নিঃশেষ। এই কারণে এখন যাঁরা মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত, তাঁদের অধিকাংশ রচনাই হয় অনর্থক পুনরাবৃত্তিতে না হয় পলাতক মনের আত্মপ্রসাদে শেষ হচ্ছে। প্রেমেন্দ্রবাবুকেই হয়ত উদাহরণ হিসেবে নেওয়া চলে। যে পাঠক তাঁর পূর্ব্ব রচনার অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় পেয়েছেন সেই পাঠকের কাছে "ধূলি-ধূসরের" কয়েকটি গল্প অত্যন্ত ফ্যাকাশে লাগতে পারে বই কি। "নিশাচর" গল্পের উদাহরণ নি'। লেখক এখানে সুরু করেন সাধারণ গৃহস্থের দৈনন্দিন তুচ্ছ ঝগড়াঝাঁটি নিয়ে। এ ধরণের গল্প প্রেমেন্দ্রবাবুর হাতে এর আগে একাধিক বার অপূর্ব্ব সফল হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য গল্পে একটা ভৌতিক কল্পনাকে আশ্রয় করতে গিয়ে গল্পটির শোচনীয় অপমৃত্যু ঘটল।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের অসাধারণ প্রতিভা আলোচ্য গল্পগুচ্ছের মধ্যে একাধিক বার প্রকাশ পেয়েছে। কয়েকটি গল্প নিঃসঙ্কোচে জানায় যে লেখক দুর্লভ প্রতিভাসম্পন্ন এবং মধ্যবিত্ত জীবন থেকেই নিতান্ত আত্মশক্তির সাহায্যে এমন উপাদান আজও বার করতে পারেন যাতে শ্রেষ্ঠ স্তরের শিল্প রচনাও সম্ভব। আমার ত' মনে হয় "পরিত্রাণ" গল্পটি এর প্রধান দৃষ্টান্ত। লেখক এখানে শুধু যে একটি বিকৃতমস্তিষ্ক ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তা নয়, নারীর মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণেও নতুন আলো ফেলেছেন। এ ছাড়াও কয়েকটি ট্রেনের গল্প, যেমন "ভিড়", "সহযাত্রিনী", "যাত্রাপথ", আমার বেশ ভাল লেগেছে। তবে "শরতের প্রথম কুয়াশা" বা "ব্যাহত রচনা" প্রভৃতি গল্প তেমন ভাল লাগল না। "শৃঙ্খল" গল্পের বিকৃত মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ খুবই ভালো। এ ধরণের গল্পগুলি অনায়াসে প্রমাণ করে যে প্রেমেন্দ্রবাবু মধ্যবিত্ত জীবনের উপাদান থেকে আজও মৌলিক ও মহৎ শিল্প রচনা করতে পারেন। এটা তাঁর প্রতিভার পরিচয়, এবং পাঠক নিঃসংশয়ে বোঝেন যে এ প্রতিভা সামান্য নয়।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

THE GLADIATORS by Arthur Koestler (Jonathan Cape).

যেখান থেকে মানুষের ইতিহাসের সুরু সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে বিভেদ, মানুষের সাথে মানুষের চাঞ্চল্যকর বৈষম্য, নিপীড়িত মানবাত্মার গ্লানি ও পরাভব।

মুষ্টিমেয় লোকের সীমাহীন আমোদের জন্যই যেন এ পৃথিবীর সৃষ্টি; এখানে বিচার নাই দরদ নাই, শুধু বিরামহীন নিষ্পেষণ ও অবিশ্রাম অত্যাচার। ভাবলে অবাক হতে হয় যুগ যুগ ধরে এই করুণভাবে হাস্যকর অবস্থা কি ক'রে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে এসেছে, কি ক'রে সমস্ত অবিচার নীরবে সহ্য ক'রে পৃথিবীর দরিদ্র-সম্প্রদায় এখনও টিকে আছে।

বিশ্ব-মৈত্রী ও মানুষের সমানাধিকারের স্বপ্ন এ পর্য্যন্ত কোন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে পারে নাই। যদিও অনেক শক্তিমান পুরুষ এ নিয়ে জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন তবুও তাঁদের সাধনা—মানব জাতির দুর্ভাগ্য বলতে হবে—শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।

সমস্যা এই, কেন এ সাধনা ব্যর্থ হয় ও স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না।

এর উত্তর দেওয়ার মত পাণ্ডিত্য ও মনীষা বর্ত্তমান লেখকের নাই। তবুও ভাবা হয়ত অসঙ্গত হবে না, দরিদ্র-সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা ও অশিক্ষা এর পেছনে কাজ করেছে। যেহেতু প্রগতির ধারা এখনও নিঃশেষিত হয় নাই, মানুষ এখনও সুপারম্যান না হযে মানুষই, সেহেতুই মানুষের এই চিরন্তন সমস্যার সমাধান অদ্যাপি হয় নাই। এই অসাফল্য বেদনাদায়ক হলেও স্বাভাবিক কারণ 'To err is human being.'

মানব-জীবনের ট্র্যাজিডিই এই। একই ভুল করা এবং এমন জায়গায় ভুল করা যেখানে সংশোধন অসম্ভব। Means এবং End-এর বিবাদ।

আমি শক্তিমান। একটি মহৎ কাজ করবার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব। কি পন্থা আমি অবলম্বন করব! যদি আমি শান্তিকামী হই আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য, কারণ শান্তির বুলি আউড়িয়ে ধনিক-সম্প্রদায়ের মন ভেজানোর কল্পনা মুনসাইন।

আর যদি স্বৈরাচার অবলম্বন করি শত্রুর সংখ্যা আমাব দ্রুত বেড়ে যাবে, পদে পদে লোকে আমায় ভুল বুঝবে। এবং সে-কারণেই আমার সাধনা হবে অথর্বই।

মাঝেও কোন পথ নাই। গান্ধীবাদ অচল। অতএব আমি নিরুপায়, মহৎ স্বপ্ন আমার ধূলিলুণ্ঠিত।

আমার আদর্শ সত্ত্বেও, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও আমার প্রতিভা পঙ্গুতায় পর্য্যবসিত।

এ-নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা সহজেই হয় কিন্তু সে-উদ্দেশ্য আমার নয়।

The Gladiators গ্রন্থটি ঐতিহাসিক। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৭৩-৭১ সালে রোম-সাম্রাজ্যের ক্রীতদাসরা স্পারটাকুস ব'লে একটি যোদ্ধার নেতৃত্বে নিজেদের বন্দীত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রে নব নব সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলে।

স্পারটাকুসের ইচ্ছা ছিল এই হতভাগ্য ক্রীতদাসদের নিয়ে Sun-state নামে এক আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করা যেখানে সকলেই সকলের সমতুল্য ও কেউ কারও অধীন দাস নয়।

থুরিয়াম নগরীর কাছে অবশেষে এই Sun-state-এর গোড়াপত্তন হয় এবং স্পারটাকুসের স্বপ্ন সফলতার দিকে ত্বরিত বেগে এগিয়ে চলে।

কিন্তু এইবার উদ্ধত মানুষের সাথে বিধাতার নির্ম্মম পরিহাস করার সময় হোল।

ক্রীতদাসদের মধ্যে দুটি দল ছিল। একদলের নেতা Crixus, অপর দলের Spartacus. সংখ্যায় অবশ্যি স্পারটাকুসের দল ক্রিক্সাসের দলের চেয়ে অনেক বেশী পরিপুষ্ট ছিল কিন্তু খালি সংখ্যা দিয়ে পৃথিবী জয় করা যায় না।

এই দুই দলের মধ্যে মতানৈক্যই শেষ পর্য্যন্ত তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেল। স্পারটাকুসের স্বপ্ন থুরিয়ামের ধূলিতে বিলীন হয়ে গেল যখন এ-মতানৈক্য দূর করবার নিমিত্ত সে অবলম্বন করল স্বৈরাচার।

তাঁর ব্যর্থতা সত্ত্বেও স্পারটাকুস অত্যন্ত বলিষ্ঠ চরিত্র। তার অনির্ব্বাণ তেজ, আশ্চর্য্য দৃঢ়তা ও ততোধিক আশ্চর্য্য স্বপ্নালু মন তার চরিত্রকে অদ্ভুতভাবে জীবন্ত ক'রে তুলেছে। কখনও মনে হয় না সে আমাদের অপরিচিত বা সে বিদেশী।

বস্তুতঃই, স্পারটাকুসের ব্যক্তিত্ব পাঠককে স্তব্ধ করে। তাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত-কিছুর উৎপত্তি ও সমাপ্তি। মাঝে মাঝে যদিও তার আচরণ অতিমাত্রায় নাটকীয় তবুও তার চরিত্রে অস্বাভাবিকত্ব খুব বেশী নয়।

এ-গ্রন্থের প্রত্যেক কটি চরিত্রই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। প্রাণ অনুভব করা যায় এদের মধ্যে। Zozimos, Essene, Crixus সব-কটা চরিত্রই জীবন্ত, চিন্তা ও কর্ম্মে সচঞ্চল।

গ্রন্থ-লেখকের অসাধারণ লিপিচাতুর্য্য সব সময় পাঠকের মনকে বিস্ময়াবিষ্ট ক'রে রাখে। আর্থার কোয়েষ্টলারের স্বচ্ছন্দগতি দ্রুত লেখনীচালনায় সমস্ত ঘটনা পাঠকের চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

দূর অতীতের এক অবজ্ঞাত ঘটনাকে গ্রন্থকার আশ্চর্য্য নৈপুণ্যে সজীব ক'রে তুলেছেন। বইটি পড়তে পড়তে মনে হয় কোন আধুনিক উপাখ্যানের সাথে আমরা পরিচিত হচ্ছি এবং স্পারটাকুস আমাদের অতি পরিচিত।

মনে হয়, এ-গ্রন্থ রচনার সময় সোভিয়েট রাশ্যার চিত্র লেখকের চোখের সামনে ভাসিছিলো। বইটিকে সোভিয়েট রাশ্যার রূপক চিত্র হিসাবেও ধরা যেতে পারে। রোমের নিপীড়িত ক্রীতদাসদের সঙ্গে লেনিন-যুগের বলশেভিকদের আশ্চর্য্য মিল। স্পারটাকুসের মধ্যেও লেনিনের ব্যক্তিত্ব যেন প্রচ্ছন্ন এবং এ দুজনের স্বপ্নও এক। দুজনেই পদদলিত মানবদের মুক্তিপ্রয়াসী। লেনিন অবশ্য তাঁর স্বপ্নকে কতকাংশে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যেতে পেরেছেন—যা স্পারটাকুস পারেনি। তফাৎ এই।

লেনিনের যে কামনা তা স্মরণাতীতকাল থেকে সংখ্যাহীন লোকের মনকে চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ ক'রে এসেছে—সমানাধিকারের আদর্শ শুধু এ-যুগেরই নয়।

কিন্তু স্থায়ীভাবে এ-ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করা দীর্ঘ সাধনাসাপেক্ষ। অতিদ্রুত কোন পন্থা অবলম্বন ক'রে সে-লক্ষ্যের দিকে পৌছানো অসম্ভব। তার আগে চাই মনের স্বাধীনতা বুদ্ধির মুক্তি—চাই অপর্য্যাপ্ত মমত্ব-বোধ।

সোভিয়েট রাশ্যা আলোকের শিশু—মধ্যাহ্ন সূর্য্যের জলন্ত প্রচণ্ডতা এখনও তারা দেখে নাই।

কতদিনে ও কি উপায়ে এই অতি পুরাতন ও চির নূতন সমস্যার সমাধান হবে তার নির্দ্দেশ কেউ দিতে পারে না। এ-গ্রন্থেও সে ইঙ্গিত নাই। এবং না থাকাই স্বাভাবিক, কারণ মানুষ নয় সুপারম্যান।

সব দিক দিয়ে বিচার ক'রে দেখলে বলতে হয় রচনাভঙ্গীই এ-গ্রন্থটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

এ দুইটি লাইন দিয়ে বইটির আরম্ভ :

It is night still.
Still no cock has crowed.

১৪ পৃষ্ঠায় :

The sun rises, the colleagues appear; sleepy minor clerks first, grumpily on their dignity.

৪০ পৃষ্ঠায় :

Dawn came, the sky over the courtyard grew grey.

৩৬৮ পৃষ্ঠায় :

He had never been to Alexandria. But he knew that was there the light, wide avenues were, and women, and the ten times thousand days....

৩৮৮ পৃষ্ঠায় :

It was getting on towards spring.

এরকম দ্রুত তীক্ষ্ণ নাটকীয় বাক্যে সমস্ত বইটি পরিপূর্ণ। অস্খলিত গতি বিরামবিহীন বিস্ময়কর বেগে এরা ছুটে চলেছে, পদে পদে শাণিত চমকপ্রদ বিভ্রান্তকারী। বর্ণনাভঙ্গীও লেখকের অপরূপ, বিশেষ ক'রে Sun-state-এর বর্ণনা তুলনাবিরল।

উপন্যাস হিসাবে The Gladiators বইটির সাফল্য নিঃসংশয়িত। ঘটনায় চরিত্রে আদর্শে এ-বইটি আশ্চর্য্যরূপে সমৃদ্ধ।

এডিথ্ সাইমন বইটির অনুবাদ করেছেন চমৎকার।

এ-গ্রন্থটির একটি দোষ এই, ঐতিহাসিক আবহাওয়া এতে ঠিক ফোটে নাই, কারণ লেখকের ষ্টাইল ২১শ শতাব্দীর।

কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে ব'লে মনে হয় না, কারণ আগেই বলা হয়েছে The Gladiators বইটি ঘটনায় চরিত্রে এক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

আবু রুশ্দ

স্বপ্নকামনা : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। শ্রীহর্ষ পুস্তক বিভাগ। দাম এক টাকা।

কিরণশঙ্কর বাবু পাঠকসমাজে একেবারে অপরিচিত নন, যদিও এই প্রথম তাঁর বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি 'স্বপ্নকামনা' নাম নিয়ে একত্র হয়ে বেরুলো। কাব্যোৎসাহীর এটা আনন্দের খবর নিশ্চয়ই। 'স্বপ্নকামনা'র কবির বয়েস বেশী নয়,—সুতরাং কবিতাগুলির বেশীর ভাগই প্রিয়ার উদ্দেশে লেখা। তবে এ-প্রেমের কবিতায় কোন কল্পনার বিদেহী কুমারীর প্রতি অতীন্দ্রিয় প্রণয়ের ব্যাজ-স্তুতি নেই। যা একান্ত সঙ্গত ও সহজ, তার প্রকাশ হওয়া উচিত ঐতিহ্যপুষ্ট নিরস্থি নমনীয়তা থেকে মুক্ত। কিরণবাবুর কাছে প্রেমের অর্থ বাস্তব, এমন কি একটু রূঢ়রকমেরই বাস্তব। 'স্বপ্নকামনা'য় স্বপ্নের চেয়ে কামনাই বেশী পরিস্ফুট। তবে সহজ অনুভূতিকে সোজা ও তীক্ষ্ণ ভাষায় বলবার সাহস যে কিরণবাবুর আছে, নীচের উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণ হবে।

> হৃদয়ের ব্যাকুল শ্বাপদ
> খুঁজে ফেরে আরক্ত শিকার
> ....
> শোন মোর ধমনির ধ্বনি
> আগে রাখো মানুষের মন !

কিংবা

> মুহূর্ত্তের মধুস্বাদে ভরে নেয় ইন্দ্রিয়ের দ্বার
> কখনও কি ক্ষমা নাহি তার ?

এ-জাতীয় কবিতা কামনা-সম্ভূত হলেও, এবং তাতে আতিশয্য ও অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও, অস্পষ্টতা-দোষ থেকে মুক্ত।

ভাষার দিক্ দিয়েও কিরণবাবুর যে কবিতার ওপর দখল আছে তার পরিচয় পাওয়া যায় শেষ কবিতা থেকে।

> অনেক স্থবির রাত্রি, ক্লান্ত সন্ধ্যা, তিক্ত দীর্ঘ দিন
> আর বহু উষাকাল, মধ্যাহ্নের বন্ধ্য দাবদাহ
> স্পন্দিত জীবনে এসে স্নায়ু সবি করে গেছে ক্ষীণ,
> হৃদয়ে এনেছে যতো জরা আর মৃত্যুর আগ্রহ।

এই লাইন কটিতে যে সুললিত মাধুর্য্যের আবেশ আছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এর সঙ্গে 'হে সমীর !' অথবা 'হাজার বছর আগে' কবিতা দুটি যদি তুলনা করা যায়, তাহলে বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে হয় না যে তারা একই কবির রচনা। শেষোক্ত কবিতা দু'টিতে কবির যে আশ্চর্য্যরকম পতন হয়েছে, তার কারণ কি ? গোড়াতেই অবশ্য কিরণবাবু লিখেছেন

যে, কবিতাগুলি গত দুই বছরের মধ্যে লেখা। এই কি তবে কারণ যে ও-কবিতা দুটি তাঁর গোড়ার দিককার লেখা? কবিতাগুলি সময়ানুক্রমিক সাজানো নয় বলেই এ-অনুমান আমরা করতে পারছি। কিন্তু এ-ভাবে সাজানোর ব্যাপারে কবির উদাসীনতার ফল পাঠকের পক্ষে খুবই আপত্তিকর হয়েছে। কবিতা এবং গদ্যকবিতাকে এমন বিশ্রীভাবে লেখক গুলিয়ে ফেলেছেন যে পড়তে গিয়ে পাঠকের মধ্যে-মধ্যে আচমকা হোঁচট খেয়ে নিজের কাছেই অপ্রস্তুত হতে হয়—কবিতা উপভোগের পক্ষে সেটা মোটেই অনুকূল নয়। এই দু-জাতীয় রচনাকে স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করলে কাব্যপাঠ এমনভাবে বিরম্বিত হত না। গদ্যকবিতা কিরণবাবুর হাতে খোলে মন্দ নয়; 'অধ্যায়' কবিতাটি আমার ভালোই লাগলো। কিন্তু কবিতায় তিনি মাঝে-মাঝে ছন্দঃপতন করেছেন। 'অনন্ত জিজ্ঞাসা' কবিতাটিতে ছন্দোনির্ণয় রীতিমত কষ্টের ব্যাপার। অবশ্য একথা মনে রাখা উচিত, 'স্বপ্নকামনা' কবির প্রথম কবিতা সংগ্রহ, যাঁর প্রতিশ্রুতি অনস্বীকার্য্য। অন্ততঃ 'জাতিস্মর' কবিতাটি পড়লে মানতেই হয় যে তাঁর কাব্যে পরিণতির বীজ নিহিত রয়েছে।

ছাপার ভুলের কথা ছেড়ে দিই; তবে বইএর প্রথমেই সুদীর্ঘ সমালোচনাটি অনেকের কাছেই হয়তো রুচিকর ঠেকবে না। ও-জিনিষ গোবিন্দ দাস বা মাইকেলের প্রামাণ্য সংস্করণের গোড়াতেই মানায়।

সৌরীন্দ্র মিত্র

Published and Printed by K. C. Banerjee at the Modern Art Press,
1/2, Durga Pituri Lane, Calcutta, Edited by Humayun Kabir
and Buddhadeva Bose.
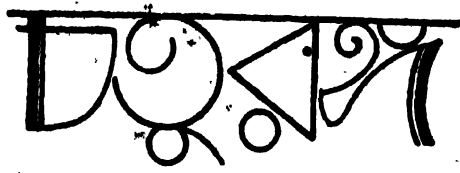
আশ্বিন হইতে বর্ষ আরম্ভ

আগামী আশ্বিন (শারদীয়া সংখ্যা) হইতে
দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল

যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত কুপন ভর্ত্তি করিয়া পাঠাইলে উপকৃত হইব।

....

কর্মাধ্যক্ষ "চতুরঙ্গ"
৫, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা,

আমি 'চতুরঙ্গে'র ২য় বর্ষের গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক। আমাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পুস্তক পাঠাইলে অনুগৃহিত হইব। টাকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইলাম।